SUPROKASH
ন্দ্রনীল
দেব সাহিত্য কুটীর

ইন্দ্রনীল
দেব সাহিত্য কুটীর

শুভ
মহালয়া
১৩৭৫

প্রকাশ করেছেন—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

ছেপেছেন—এস, সি, মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯
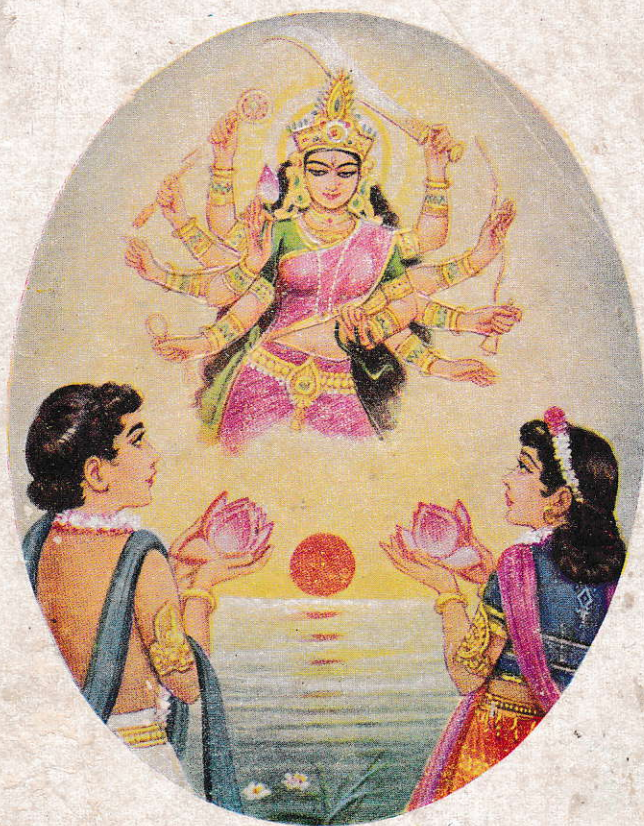
দেব সাহিত্য কুটীর

ইন্দ্রনীল

আজ বাংলার বুক জুড়ে উঠেছে হাহাকার। নদী, খাল, বিল জলে ভরে গিয়ে দুকূল ছাপিয়ে উপছে পড়েছে। বহু গ্রাম, বহু ধানের খেত ডুবে গেছে জলের তলায়। সর্বনাশা জল কেড়ে নিয়েছে মানুষের মুখের হাসি, পেটের অন্ন। তাই সকলকার মুখেই ফুটে উঠেছে একটা ব্যথার চিহ্ন। অন্তর তাদের দুঃখে ভারাক্রান্ত।

বাংলার এই দুঃখের দিনেও প্রকৃতির মধ্যে ঘোষিত হয়েছে মায়ের আগমন। মা তাঁর সন্তানদের কাছে আসছেন। তাই হাসি ফুটেছে বাঙালীর মুখে, বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখে। নতুন সাজে সজ্জিত হতে চলেছে বাঙালী।

প্রতি বছরের মত এ বছরও দেব সাহিত্য কুটীর তাদের জন্যে সাজিয়ে এনেছে পুজোর সম্ভার। এবারের নামকরণ করেছেন "ইন্দ্রনীল", অর্থাৎ মরকতমণি। যে মণির আলো সদাই নীল হয়ে জ্বলে থাকবে ছেলেদের মনে। দুঃখে ভেঙে পড়লে চলবে না। ঐ নীল আলো লক্ষ্য করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে। আজকের দিনে এইটাই ভগবানের কাছে আমাদের একমাত্র কামনা। জয় হিন্দ্

দেব সাহিত্য কুটীর

এবার যাঁরা লিখেছেন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বনফুল
অন্নদাশঙ্কর রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সরোজকুমার রায়চৌধুরী
প্রেমেন্দ্র মিত্র
আশাপূর্ণা দেবী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবোধ সান্যাল
বিমল মিত্র
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
শিবরাম চক্রবর্তী
অখিল নিয়োগী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
শক্তিপদ রাজগুরু
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
দৃষ্টিহীন
বিধায়ক ভট্টাচার্য

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়
কুমারেশ ঘোষ
যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
বিমল ঘোষ
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মায়া বসু
তুষার চ্যাটার্জী

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়
শৈল চক্রবর্তী
সুধীন্দ্রনাথ রাহা
অলকা দেবী
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
আশা দেবী
বীরু চট্টোপাধ্যায়
প্রমথনাথ বিশী
ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
হীরেন্দ্রকুমার বসু

যে সব লেখা আছে

* [ভুলবশতঃ গল্পে শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় হইয়াছে]

পাদপূরণ

যে সব ছবি আছে

ত্রিবর্ণ চিত্র

দ্বিবর্ণ চিত্র

একবর্ণ চিত্র

ইন্দ্রনীল—

আমরা হচ্ছি পেসাদার ভূত, বুঝলে

(ভূত না গবলিন···পৃঃ ১৭৮)

সোনার কাঠি

বনফুল

১

তোমরা খোকনের গল্প অনেক শুনেছ। এবার আর একটা শোনো। এটা ভারী মজার। খোকন একবার বুড়োবুড়ীর পাল্লায় পড়েছিল। সাংঘাতিক বুড়োবুড়ী। গঙ্গার ধারে তিনটে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া শ্যাওড়া গাছ ছিল। দূর থেকে মনে হত তিনটে দৈত্য বুঝি উপু হয়ে বসে মাথা ঠেকাঠেকি করে কি পরামর্শ করছে। সেই গাছ তিনটের তলায় না কি বুড়োবুড়ী আসে রাত্রে। আগে আসে বুড়োটা। তার ইয়া লম্বা দাড়ি। মাথায় জটা। হাতে লাঠি। সামনের দিকে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে। বুড়ো এসে বুড়ীর অপেক্ষা করে। খানিকক্ষণ পরে কাসতে কাসতে আর লাঠি ঠকঠক করতে করতে বুড়ী আসে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের বোঝা। আর পিঠে একটা থলি। সেই থলিতে থাকে ঘাড়-মটকানো সব ছেলেমেয়ে। বুড়ীই ঘাড় মটকাতে ওস্তাদ। সেই শিকার করে নিয়ে আসে। বুড়ো তার অপেক্ষায় বসে থাকে। বুড়ী এলে তারপর খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। হাড় চিবোনোর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—কড়মড় কড়মড়।

খোকনের দুই বন্ধু হরিশ আর তারিণী গল্পটা তারিয়ে তারিয়ে বলেছিল খোকনকে।

খোকন বিশ্বাস করেনি। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিল—বাজে কথা, একদম বাজে কথা। ও সব বুড়োফুড়ো কিচ্ছু নেই।

হরিশ বললে—"বাজে কথা ? বেশ একদিন গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো।"

"আমার কি গরজ পড়েছে রাত দুপুরে গঙ্গার ধারে যাওয়ার। মা বাবা শুনলে যেতে দেবে না। লুকিয়ে যেতে হবে। কি দরকার ওসব করবার।"

তারিণী মুচকি হেসে বললে, "আসলে তুমি ভীতুর শিরোমণি, মুখেই কেবল লম্বাই চওড়াই কর !"

"আমি মোটেই ভীতু নই।"

"খুব ভীতু। আমি বাজি রাখতে পারি তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।"

"নিশ্চয়ই পারব। কি বাজি রাখবে ?"

"আমার এই নতুন 'রিস্টওয়াচ্'টা দেব, যদি যেতে পার। আর গিয়ে যদি ভয়ে দাঁতকপাটি লাগে, তখন ?"

"দাঁতকপাটি লাগলে আমি তোমাকে নগদ দশ টাকা দেব। পূজোর সময় মামা আমাকে দশ টাকা দিয়েছিল সে টাকা খরচ করিনি।"

খোকন বাজি রাখত না। কিন্তু 'রিস্টওয়াচ্'টা দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলে না সে। অনেক দিন থেকে তার একটা 'রিস্টওয়াচ্' কেনার ইচ্ছে, বাবা কিছুতেই কিনে দিচ্ছেন না। বলছেন, যখন কলেজে ভরতি হবে তখন দেব।

বাজি রেখে খোকন খুব আনন্দিত হল মনে মনে। সে জানত সে ভয় পাবে না। বাজি জিতবেই।

"বেশ রাজী। কবে যেতে হবে—"

"কাল অমাবস্যা। কাল এসো। রাত বারোটার পর বাড়ি থেকে বেরিও। আমরাও লুকিয়ে থাকব কাছে পিঠে—"

"বেশ"

২

খোকন জেগেই ছিল। বৈঠকখানার ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল তখন আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে, আস্তে আস্তে খিল খুলে বেরিয়ে পড়ল খোকন রাস্তায়। বেরুবার আগে কপাটটায় তালা চাবি লাগিয়ে দিল। সন্ধ্যে

থেকেই সে সব ঠিক করে রেখেছিল। সঙ্গে নিল শুধু একটা টর্চ। গঙ্গার ধার তাদের বাড়ি থেকে খুব কাছে নয়। মফস্বল জায়গা। রাস্তা একেবারে নির্জন। অনেক দূরে দূরে দু'একটা বাতি জ্বলছে। মাঝে মাঝে দু'একটা কুকুর দেখা যাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে তারা। খোকনের কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। অথচ অদ্ভুতও লাগল একটু। ঘুমন্ত শহরের এ রূপ সে আগে দেখেনি কখনও। শহরে সবাই আছে অথচ কেউ জেগে নেই। অনেক দিন আগে একটা গল্প পড়েছিল 'ঘুমন্ত পুরী'। সেইটে আবছাভাবে মনে পড়ল। তাতেই কি ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা ছিল? সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভেঙেছিল যার? এই সব ভাবতে ভাবতে খোকন পথ চলতে লাগল। কিন্তু একটা কথা তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল—তার ভয় করছে। মুখে সে অনেক আস্ফালন করেছে বটে কিন্তু আসলে সে ভীতু। তা না হলে এতো গা ছমছম করছে কেন? কিছু দূর গিয়ে তার বুকটা ধক করে উঠল। ওঁ—ওঁ—ওঁ—কিসের শব্দ ওটা? তার পরেই ম্যা—ও করে লাফিয়ে পড়ল একটা বেরাল পাশের দেওয়ালের উপর থেকে। দুটো বেরালে ঝগড়া করছিল। এতেই তার হৃৎকম্প? সত্যিই মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ল খোকন। একটু জোরে জোরেই হাঁটতে লাগল। গঙ্গার ঘাটে এসে যখন পোঁছল তখন সাঁ সাঁ করে হাওয়া উঠেছে একটা। গঙ্গার জল থেকেও কেমন যেন অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। শ্যাওড়া গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখল। তাদের মধ্যে কোনও চঞ্চলতা নেই। জমাট অন্ধকারের মতো তারা উবু হয়ে মাথা ঠেকাঠেকি করে বসে আছে তিনটে দৈত্যের মতো। খোকন দূর থেকে টর্চ ফেলে দেখলে একবার। কিচ্ছু দেখতে পেলে না। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল গাছ তিনটের দিকে। কাছে গিয়ে টর্চ ফেলতেই আবার ধক করে উঠল বুকের ভিতর। দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি, হাতে লাঠি। ঠিক তার পাশেই বুড়ীটাও এসে দাঁড়াল। কাঁধে বস্তা, হাতে লাঠি, চোখ মুখ দেখা যায় না, ঝাঁকড়া চুলে সব ঢাকা। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে খোকন চেঁচিয়ে উঠল—কে তোমরা?

তারা কোনও জবাব দিল না। খিকখিক চাপা হাসি শোনা গেল শুধু একটা। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগল তারা খোকনের দিকে। খোকনের

দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল তার টুঁটি।

দাঁতকপাটি লাগে নি, কিন্তু ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে পালাতে। হয়তো সে পালিয়েই যেত, কিন্তু কি যেন কি একটা তাকে পালাতে দিলে না। হয়তো সেটা তার আত্মসম্মান। নির্নিমেষে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল বুড়োবুড়ী তার দিকে এগিয়ে আসছে। এরপর যা ঘটল তা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। খোকনের কাছেও অপ্রত্যাশিত। সে হঠাৎ মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়োর উপর আর দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল তার টুঁটি। বুড়োর দাড়ি খুলে পড়ে গেল আর তার কণ্ঠ থেকে যে আর্তস্বর বেরুল তা হরিশের। বুড়ী-বেশী তারিণী এক ছুটে অন্তর্ধান করল অন্ধকারে।

খোকন বাজি জিতেছিল, কিন্তু 'রিস্টওয়াচ'টা নেয়নি। ওই জুয়াচোরদের জিনিস নেবার প্রবৃত্তি হয়নি তার। আর একটা জিনিসও মনে হয়েছিল তার।

মুখে সে যতই আস্ফালন করুক মনে মনে সে যে খুব ভীতু এর অভ্রান্ত প্রমাণ পেয়েছিল সে সেদিন রাত্রে। সামান্য বেরালের ঝগড়া শুনেও ভয়ে আঁতকে উঠেছিল সে। পথ চলতে চলতে ক্রমাগত গা ছমছম করেছে তার। এ সব তো সাহসের লক্ষণ নয়। সুতরাং বাজি জেতবার সত্যিকার যোগ্যতা নেই তার। আর একটা উপমাও মনে হয়েছিল তার। 'ঘুমন্ত পুরী' গল্পে সেই রাজকন্যা যেমন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল তার মনের মধ্যে তার সাহসও তেমনি যেন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সেদিন রাত্রে তার যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তা ভয়ের ঠেলায়। তা সুস্থ জাগরণ নয়। যে সোনার কাঠি রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়েছিল সে সোনার কাঠি খোকন তখনও পায়নি।

৩

এই গল্পটি খোকনের মুখেই শুনেছিলাম আমি। তারপর একদিন শুনলাম খোকন বি. এ. পাস করে ভারতীয় সৈন্যদলে ঢোকবার জন্যে চেষ্টা করছে।

জিগ্যেস করলাম—এখন তোমার মনে সাহস জেগেছে ?

খোকন সগর্বে উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

" 'সোনার কাঠি' কোথায় পেলে ?"

"আমার পড়ার ঘরে আসুন—"

পড়ার ঘরে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রকাণ্ড একটি ছবি। তার আশেপাশে আরও অনেক শহীদের ছবি—ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মদনলাল ধেংড়া, সুশীল সেন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সূর্য সেন, গোপীমোহন সাহা, ভগৎ সিং, যতীন্দ্রমোহন দাস এবং আরো অনেকের।

খোকনের দিকে চাইলাম। দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

ক্যাঙারু পাখির দ্বীপ

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

শহরসুদ্ধ লোক তাঁকে রণদা-মামা বলে ডাকত, কেবল আমরা ছেলে-ছোকরার দল আড়ালে তাঁকে বলতাম—রণ-দামামা। তাঁর আসল নাম ছিল রণদাপ্রসাদ কুণ্ডু। ছোটখাটো মানুষটি, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; কিন্তু বাপরে, কী গলার আওয়াজ! ঠিক যেন দামামা বাজছে।

সে কি আজকের কথা! তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমরা আমাদের ছোট্ট শহরে কেউ বা স্কুলের বেড়া পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি, কেউ বা ঢুকব ঢুকব করছি। বিকেলবেলা ফুটবল খেলে সন্ধ্যের পর মাঠের মাঝখানেই গোল হয়ে বসে গল্প করতাম। আমাদের এই মেঠো আড্ডায় মাঝে মাঝে রণদামামা দর্শন দিতেন। দূর থেকে তাঁর হুংকার শুনতে পেতাম,—'ওহে, তোমরা এখনো মাঠে বসে আছ!'

শহরে রণদামামার একটি ছোট্ট আবকারির দোকান ছিল; আফিম, গাঁজা, ভাঙ এই সব বিক্রি করতেন। সন্ধ্যের সময় দোকান বন্ধ করে বাড়ি যেতেন। আমাদের সন্দেহ ছিল

বাড়ি যাবার আগে রণদামামা এক কলকে গাঁজায় দম দিতেন। যেদিন মাত্রা বেশী হয়ে যেত সেদিন বাড়ি না গিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে বসতেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে গল্পের ফোয়ারা ছুটত। এমন সব আষাঢ়ে আজগবী গল্প ঝাড়তেন যে আমরা চমৎকৃত হয়ে শুনতাম।

তাঁর সব গল্পই প্রায় ভুলে গেছি, এতদিন পরে মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একটা গল্প ভুলিনি। গল্পটার কতখানি গাঁজা এবং কতখানি সত্যি তা জানি না, কিন্তু বোধহয় আগা-পাস্তলা গাঁজা নয়। যাহোক, গল্পটা যখন মনে আছে তখন লিখে রাখছি। রণদামামা বহুকাল গত হয়েছেন, মনে করা যাক এই গল্পটা তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ।

দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসছে ; আমরা অর্ধচন্দ্রের আকারে ফুটবল খেলার মাঠের মাঝখানে বসেছি, আমাদের সামনে পদ্মাসনে বসেছেন রণদামামা। আজ তিনি কি রকম গল্প ঝাড়বেন কিছুই জানি না, কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি—

আকাশে ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ শোনা গেল। আমরা ঘাড় তুলে দেখলাম একটা এরোপ্লেন আসছে। সেকালে ভারতবর্ষে এরোপ্লেন এমন ন'কড়া ছ'কড়া ছিল না, কালেভদ্রে এক আধটা দেখা যেত। আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলাম। প্লেনটা প্রায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

তার ঘড়র্ ঘড়র্ শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর আমাদের দলের প্রাণধন দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করল,—'মামা, আপনি কখনো এরোপ্লেনে চড়ে আকাশে উড়েছেন ?'

রণদামামা বললেন,—'এরোপ্লেনে কখনো চড়িনি কিন্তু আকাশে উড়েছি।'

পানু বলল,—'অ্যাঁ ! বেলুনে চড়েছেন নাকি ?'

রণদামামা বললেন,—'না, বেলুন নয়। আজ তবে সেই গল্পটাই বলি।'

তিনি গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যে পেরিয়ে ক্রমে রাত্রি হল, কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ্য নেই। অন্ধকারে বসে রণদামামার গমগম গলার আওয়াজ শুনতে লাগলাম—

তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। বউ মারা যাবার পর দেশে আর মন টিকল না। দেশে তখন ফিজি দ্বীপে যাবার হিড়িক লেগেছে ; সেখানে গেলেই নাকি ভাল চাকরি পাওয়া যায়। ঠিক করলাম ফিজি দ্বীপেই যাব। আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কেবল এক দূর-

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

তিনি এক বোতল গঙ্গাজল আমার হাতে দিয়ে বললেন,—

সম্পর্কের জ্যাঠাইমা আছেন ; দেশ ছাড়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি এক বোতল গঙ্গাজল আমার হাতে দিয়ে বললেন,—'বিদেশ বিভুঁয়ে যাচ্ছিস, এই গঙ্গাজল সঙ্গে রাখ, মাঝে মাঝে দু'ফোঁটা মুখে দিস।'

জ্যাঠাইমাকে পেন্নাম করে গঙ্গাজলের বোতল নিয়ে কলকাতায় গেলাম। তারপর একদিন ফিজি-যাত্রী জাহাজে চড়ে বসলাম।

কাঠের জাহাজ ; সেকালে লোহার জাহাজ তৈরী হত না। জাহাজটির বেশ বয়স হয়েছে ; দুলে দুলে এঞ্জিনের ধমকে কাঁপতে কাঁপতে চলল। আমি আগে কখনো জাহাজে চড়িনি, ভাবলাম সব জাহাজই বুঝি এই রকম হয়। তখন কি জানি যে ইংরেজ বাহাদুর কুলি চালান দেবার জন্যে এইসব ঘুণধরা হাড়-জিরজিরে জাহাজ রেখেছে! যদি ডোবে তো কতকগুলো দিশি কুলি ডুবে মরবে বই তো নয়।

যাহোক, জাহাজ তো ম্যালেরিয়া রোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে গঙ্গা পেরিয়ে সাগরে পড়ল, সেখান থেকে পুবদিকে একটু বাঁক নিয়ে দক্ষিণ মুখে চলল। কত দিনে ফিজি পৌঁছব তার ঠিক নেই ; রাস্তা তো আর একটুখানি নয়, চার হাজার মাইল।

কিন্তু জাহাজের জীবনযাত্রার কথা যদি আরম্ভ করি তাহলে গল্প শেষ করতে রাত কাবার হয়ে যাবে। জাহাজের কথা সাটে বলছি।

জাহাজে একরকম ভালই আছি। জাহাজের দোলানিতে আমার গা বমি-বমি করে না ; খাই দাই ডেকে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে বোতল থেকে দু'ফোঁটা গঙ্গাজল হাতের তেলোয় নিয়ে মুখে দিই। সময়ের কোনো হিসেব নেই, দিনের পর দিন কাটছে। জাহাজ মাঝে মাঝে বন্দরে থামছে আবার চলছে। বঙ্গোপসাগরের পর মলক্কা প্রণালী, তারপর ছোট বড়

অসংখ্য দ্বীপ। জাহাজ তার মধ্য দিয়ে চলেছে। অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ দিকে পড়ে রইল, আমরা পুব দিকে এগিয়ে চললাম।

প্রশান্ত মহাসাগর। বেশ শান্তশিষ্ট সমুদ্র; বেশী ঢেউ নেই। আমাদের দীর্ঘ যাত্রা শেষ হয়ে আসছে, আর দু'হপ্তার মধ্যে ফিজি পৌঁছে যাব। জাহাজের একঘেয়ে জীবন এবার শেষ হবে ভেবে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

তারপর ফিজি দ্বীপপুঞ্জের এলাকায় পৌঁছুতে যখন আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে তখন হঠাৎ উত্তর দিক থেকে এল ঝড়। যাকে বলে সাইক্লোন।

সমুদ্র জাহাজ এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ঝড়ের ধাক্কায় জাহাজটা দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল; কখনো দুটো প্রকাণ্ড ঢেউ-এর মাঝখানে তলিয়ে যাচ্ছে, কখনো ঢেউ-এর মাথায় চড়ে বসছে। সে যে কী ভয়ানক দৃশ্য, বর্ণনা করা যায় না।

জাহাজের খোলের মধ্যে দৃশ্য আরো মর্মভেদী। যাত্রীরা কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। একজন খালাসী বলল,—'বুড়ো জাহাজ সাইক্লোনে পড়েছে, টিকবে কিনা সন্দেহ। আল্লার নাম কর।'

আমি দেখলাম আজ আর রক্ষে নেই, যদি বাঁচি পুনর্জন্ম হবে। আমার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল ধুতির খুঁটে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিলাম, আর গঙ্গাজলের বোতলটা দড়ি বেঁধে গলায় ঝোলালাম। যদি মরেই যাই গঙ্গালাভ হবে।

জাহাজ কিন্তু ঝড়ে ডুবল না। তার এঞ্জিন ভেঙে পড়ল, কম্পাস খারাপ হয়ে গেল, তবু সে ভেসে রইল; ঝড়ের মুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসহায়ভাবে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল। তিন দিন তিন রাত এইভাবে চলল। তারপর ঝড় ঠাণ্ডা হল।

ঝড় ঠাণ্ডা হল বটে কিন্তু সমুদ্র দুলতেই লাগল; জাহাজটা তার ওপর মোচার খোলার মত ভেসে চলেছে। এঞ্জিন ভাঙা, কম্পাসও খারাপ হয়ে গেছে, কাজেই জাহাজকে ইচ্ছে মত চালানো যাচ্ছে না। আকাশে সূর্য উঠেছে, মেঘ কেটে গেছে; কিন্তু জাহাজের অবস্থা সঙ্গীন, কখন কি হয় বলা যায় না। আমি দুর্গানাম জপ করছি আর মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা গঙ্গাজল খাচ্ছি।

তারপর চতুর্থ দিন সূর্যাস্তের সময় সর্বনাশ হল। সমুদ্রের তলায় একটা পাহাড়ের ডগা উঁচু হয়ে ছিল, জাহাজটা ভাসতে ভাসতে তাইতে মারল ধাক্কা। ব্যস্, চক্ষের নিমেষে জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাসের বাড়ির মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি ছিটকে জলে পড়লাম।

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

কিছুক্ষণের জন্যে বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। উথল-পাথার সমুদ্রের মাঝখানে আমি একা নাগর-দোলায় ওঠা-নামা করছি। অবস্থাটা ভেবে দেখ। জাহাজে প্রায় দুশো মানুষ ছিল, কেউ কোথাও নেই।

দিনের আলো নিবে এল। আর বেশীক্ষণ ভেসে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখলাম পাশ দিয়ে একটা তক্তা ভেসে যাচ্ছে; তক্তপোশের মতন একখণ্ড তক্তা, বোধহয় জাহাজেরই ভাঙা একটা অংশ। আমি হাঁচোড়-পাঁচোড় করে তার ওপর উঠে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত হল, আকাশে তারা ফুটে উঠল। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে দোল খাচ্ছি। দোল খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে ঘুম ভাঙল যখন রোদ উঠেছে।

সেই আকাশ সেই সমুদ্র; বোধহয় ঢেউগুলো একটু ছোট হয়েছে। চারদিকে দিগন্তরেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু খাব কি? খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল গঙ্গাজল। এত ব্যাপারের মধ্যেও গঙ্গাজলের বোতলটা ভাঙেনি।

সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বোতলের ছিপি খুলে এক ঢোক গঙ্গাজল খেলাম। বেশী খাবার সাহস নেই, ফুরিয়ে গেলে আর পাব না।

এইভাবে চলল। অকূল সমুদ্রে ভেসে চলেছি তক্তপোশের মত এক টুকরো কাঠের ওপর। খাবার নেই, গঙ্গাজলের বোতল শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর আর দেরি নেই।

তৃতীয় দিন সকালবেলা গঙ্গাজল ফুরিয়ে গেল। ভাগ্যিস জ্যাঠাইমা গঙ্গাজল দিয়েছিলেন নইলে আমার জীবন অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত। সমুদ্রের লোনা জল খেলে পাগল হয়ে মরতে হয়।

তৃতীয় দিন দুপুর বেলায় ক্ষিদেয় তেষ্টায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারপর সেই অবস্থায় ক'দিন কেটেছে জানি না। অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখলাম ডাবের জল খাচ্ছি। তারপর চোখ মেলে দেখি সত্যিই ডাবের জল খাচ্ছি। একটা মেয়ে নারকেল-মালায় করে আমার মুখে ডাবের জল ঢেলে দিচ্ছে।

মেয়েটার গা কোমর পর্যন্ত মাথার চুল দিয়ে ঢাকা, শুধু মুখটি দেখা যাচ্ছে; কোমর থেকে নীচে লম্বা ঘাসের ঘাগরা। আমি চোখ খুলেছি দেখে সে কিচির মিচির করে কী বলল কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে আমাকে ডাবের জল খাইয়ে চলল।

মেয়েটা আমার পানে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে আর থেকে থেকে কিচির মিচির করে কথা বলছে। তার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ডাঙায় এসে ঠেকেছি তাতে সন্দেহ নেই। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে কোন্ অজানা দেশে হাজির হয়েছি কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে গায়ে একটু বল পেয়েছি এমন সময় আমার নীচে ভিজে বালি টলমল করে নড়ে উঠল; ঠিক যেন ভূমিকম্প হল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেয়েটার মুখের পানে তাকালাম। মেয়েটা হাত উলটে কী বলল বুঝতে পারলাম না।

মাটির কাঁপুনি থামলে আমি চারিদিকে তাকালাম। সামনে অপার সমুদ্র, আমি সমুদ্রের কিনারায় বালির ওপর বসে আছি, আমার পিছনে নারকেল গাছের জঙ্গল। শুধু পিছনে নয়, সামনেও সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে এখানে ওখানে নারকেল গাছের মাথা জেগে আছে। আমি জানতাম যে সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছ জন্মায়, কিন্তু জলের মধ্যেও জন্মায় কখনো শুনিনি।

আমি উঠে বসেছি দেখে মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো; তার ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাকে সমুদ্রতীর থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আমি তার হাত ধরে দু'পা এগিয়েছি এমন সময় যা দেখলাম তাতে আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হয়ে গেল।

নারকেল গাছের জঙ্গল থেকে একটা জন্তু লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে; অনেকটা উট পাখির মত দেখতে কিন্তু উট পাখির চেয়ে দশগুণ বড়; দু'পাশে অর্ধেক পাখনা মেলে ছুটে আসছে। মনে কর একটা ছোটখাটো এরোপ্লেন।

আমার তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, আমি আবার থপ করে বসে পড়লাম। জন্তুটা যখন কাছাকাছি এসেছে তখন মেয়েটা একহাত তুলে চিৎকার করে উঠল—'খিট্টা!'

অমনি জন্তুটা দাঁড়িয়ে পড়ল। লম্বা গলা বাড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল। মেয়েটা তাকে আরো কী সব বলল। তখন সে আস্তে আস্তে পা ফেলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আমি কম্পিত কলেবরে বসে ঘাড় উঁচু করে তাকে দেখতে লাগলাম। জন্তু বললাম বটে, কিন্তু চার পেয়ে জন্তু নয়, প্রকাণ্ড একটা পাখি। ঠোঁটের গড়ন হাঁসের মতন, পায়ের আঙুলগুলোও হাঁসের মতন চামড়া দিয়ে জোড়া। কিন্তু গায়ে পাখির মতন পালক নেই। বাদামী রঙের লোম।

পাখিটা গলা বাড়িয়ে গোল গোল চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে, মেয়েটা তাকে কি যেন হুকুম করল। অমনি পাখিটা উড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে বসল, জলের ওপর সাঁতার কেটে গলা ডুবিয়ে ডুবিয়ে বোধহয় মাছ ধরতে লাগল।

আমার হৃৎকম্প থামলে আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম, মেয়েটা হাত ধরে আমাকে ভিতর দিকে নিয়ে চলল। আমি পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম পাখিটা পানকৌড়ির মতন সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে আর ভেসে উঠছে।

আমরা নারকেল বন পেরিয়ে এসে দেখলাম পাথুরে মাটি ক্রমে উঁচু দিকে উঠেছে। সবার ওপর শিরদাঁড়ার মতন একটানা পাহাড়। পাহাড় কিন্তু বেশী উঁচু নয়, বড়জোর সমুদ্র থেকে দু'শো ফুট ; তার ঢালু গা বেয়ে উঠতে কষ্ট হয় না।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে ওদিকের দৃশ্য দেখতে পেলাম। এদিকেও সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্রের কিনারায় নারকেল গাছ নেই, কেবল তীরের জল থেকে অসংখ্য নারকেল গাছ মাথা জাগিয়ে আছে। এদিকেও জমি বেশ ঢালু, কিন্তু বালি নেই। মাঝে মাঝে লম্বা ঘাসের গোছা উঁচু হয়ে আছে। এই ঘাস দিয়ে ঘাগরা তৈরি করে মেয়েটা পরেছে।

পাহাড়ের পিঠের ওপর উঠে বুঝতে পারলাম এটা একটা দ্বীপ। সামনে পিছনে যেমন সমুদ্র, ডাইনে বাঁয়ে দূরের দিকে তাকালে তেমনি সমুদ্র চোখে পড়ে। দ্বীপটা লম্বাটে ধরনের, বোধহয় দু'মাইল লম্বা হবে, আর চওড়া আধ মাইল। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ দেখতে পেলাম না।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে সারি সারি ফুটো। ফুটোগুলো প্রকৃতির তৈরী ফুটো নয়, প্রকৃতি অমন সার গেঁথে ফুটো তৈরি করে না ; মনে হল মানুষ পাহাড়ের গা খুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, এই ফুটোগুলো তার দোর।

কিন্তু এতগুলো ঘর যদি থাকে তাহলে মানুষও নিশ্চয় অনেকগুলো আছে। আমি ফুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম—'ওগুলো কী ?'

মেয়েটা বলল,—'কিচমিচ কিচমিচ।'

এর পর আর কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি ওর ভাষা বুঝি না, ও আমার ভাষা বোঝে না। মেয়েটা যেন ভারী মজা পেল, মুক্তোর মত দাঁত বের করে হেসে আমার হাত ধরে ওই ফুটোগুলোর দিকে নিয়ে চলল।

কাছে গিয়ে দেখলাম আমি যা আন্দাজ করেছিলাম মিথ্যে নয়। ফুটোর ভেতরে ছোট ছোট কুঠরি ; পাহাড়ের গা কেটে ঘর তৈরি করেছে। ফুটোগুলো হচ্ছে দরজা, ঘরগুলো

লম্বায় আন্দাজ আট হাত, চওড়ায় পাঁচ হাত। দেয়াল এবড়োখেবড়ো, জানালা নেই, কেবল ওই দোরের ফুটোটি আছে।

মেয়েটা আমাকে একটি কুঠরির মধ্যে নিয়ে গেল। মেঝের ওপর নারকেল বাল্‌দো আর লম্বা ঘাসের বিছানা পাতা; দেয়াল ঘেঁষে একসারি নারকেল মালার পাত্রে কি সব রয়েছে; অন্য দেয়ালের গায়ে খানিকটা ছাই আর কিছু জ্বালানি কাঠ। মনে হল মেয়েটা এই কুঠরিতেই থাকে, অন্য কুঠরিগুলোতে কেউ থাকে কিনা কে জানে।

আমাকে বিছানায় বসিয়ে মেয়েটা আমার সামনে বসল, আমার মুখের পানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। কথা বলার উপায় নেই। মেয়েটার চুলে-ঘেরা মুখখানা বেশ সপ্রতিভ। বয়স ঠিক বোঝা যায় না; আমাদের দেশের মেয়ে হলে বলতাম বয়স চোদ্দ কি পনেরো। আমি তার পানে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, এরা আদিম জাতের মানুষ, এখনো সভ্যতার স্বাদ পায়নি; কাপড় পরতে জানে না, ঘাসের ঘাগরা পরে বেড়ায়। কী খায় কে জানে, হয়তো এই দ্বীপে নারকেল ছাড়া আর কোনো খাবার জিনিস নেই—

এই সময় বিরাট পাখিটা উড়ে এসে দোরের ফুটোর সামনে বসল। ঘরের ভেতর গলা বাড়িয়ে বলল,—'প্যাঁক!'

তারপর আশ্চর্য ব্যাপার। মেয়েটা ছুটে গেল দোরের কাছে। আমিও পিছু পিছু গেলাম। দেখি মেয়েটা পাখির পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাছ বের করছে। আগে লক্ষ্য করিনি, পাখিটার পেটের ওপর একটা পকেট আছে। সামান্য পকেট নয়, চটের ছালার মত প্রকাণ্ড পকেট। বুঝলাম পাখিটা সমুদ্রে মাছ ধরে তখনি-তখনি খায় না, পকেটে পুরে মেয়েটার কাছে নিয়ে আসে।

মেয়েটা পাখির পকেট থেকে গোটা পাঁচেক মাঝারি গোছের মাছ বের করে নিয়ে তাকে কি বলল। পাখিটা প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে একটু দূরে সরে গেল, পকেট থেকে ঠোঁট দিয়ে মাছ বের করে টপাটপ্ গিলতে লাগল। তার পকেটে আরো অনেক মাছ ছিল।

মেয়েটা বাকী মাছগুলো নিয়ে কুঠরির মধ্যে এল, আমার পানে চেয়ে খিলখিল করে হাসল। বুঝলাম, মেয়েটা শুধু নারকেল খায় না, মাছও খায়।

সেদিন পেট ভরে আগুনে ঝলসানো মাছ খেয়েছিলাম। আর জানতে পেরেছিলাম এই দ্বীপে এই মেয়েটা ছাড়া অন্য মানুষ নেই।

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

এর পর দু'মাসের কথা বাদ দিচ্ছি। এই দু'মাসে আমি আর মেয়েটা পরস্পরের ভাষা শিখে নিলাম; অর্থাৎ ওর ভাষা আমি বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না, আর ও আমার ভাষা বলতে পারে না কিন্তু বুঝতে পারে।

মেয়েটার নাম তিতি। পাখির নাম খিট্টা।

ভাষা শেখার পর দ্বীপের ইতিহাস আস্তে আস্তে জানা গেল।

খিট্টার জাতের পাখিরাই এই দ্বীপের আদিম অধিবাসী। অন্য কোনো পাখি নয়, কেবল খিট্টার জাতের অতিকায় পাখি। তারপর কে জানে কত হাজার বছর আগে কোথা থেকে একদল মানুষ ভেলায় ভাসতে ভাসতে এখানে উপস্থিত হল। পাখিগুলো দেখতে প্রকাণ্ড বটে কিন্তু খুব নিরীহ, সহজে পোষ মানে। মানুষেরা তাদের পোষ মানাল; নারকেল আর মাছ খেয়ে দ্বীপে বাস করতে লাগল; পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে ঘর তৈরি করল। আমার বিশ্বাস মানুষগুলো প্রথম যখন এসেছিল তখন তাদের সঙ্গে লোহা কিংবা তামার যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র ছিল; সেসব বহুকাল আগে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। এখন আর দ্বীপে ধাতু নেই।

দ্বীপটা আগে আরো অনেক বড় ছিল, তার আশেপাশে দু'চার মাইলের মধ্যে আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ছিল। যখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন অনেক গোষ্ঠী অন্য দ্বীপে গিয়ে বসবাস করতে লাগল।

খিট্টা জাতের পাখি সম্বন্ধে আসল কথাটাই এখনো বলিনি। পাখিগুলো আগে নিজেরাই সমুদ্রে মাছ ধরে খেতো। মানুষেরা তাদের শেখালো মাছ ধরে পকেটে করে নিয়ে আসতে; সেই মাছ পকেট থেকে বের করে মানুষেরা খেতো। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না। গল্প শুনেছ নিশ্চয় ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চেপে আকাশে উড়ে বেড়ান। এই দ্বীপের মানুষগুলোও তেমনি পাখিদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের পকেটের মধ্যে ঢুকে উড়ে বেড়াতে লাগল।

প্রথম যেদিন কথাটা শুনলাম, সেদিন দুপুরবেলা তিতি আর আমি সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করছিলাম; খিট্টা কিছু দূরে বালির ওপর পা গুটিয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল। খিট্টার চোখে দু'টো পর্দা, একটা স্বচ্ছ অন্যটা অস্বচ্ছ। সে যখন সমুদ্রে মাথা ডুবিয়ে মাছ ধরে তখন স্বচ্ছ পর্দাটা বন্ধ রাখে, আর যখন ঘুমোয় তখন দু'টো পর্দাই তার গোল গোল চোখের ওপর নেমে আসে।

তিতি মেয়েটা অসভ্য আদিম জাতের মেয়ে বটে কিন্তু তার বেশ বুদ্ধি আছে; খুব

চটপটে হাসিখুশি স্বভাব। ভাষা শেখার পর থেকে সে অনর্গল কথা বলে। আমাকে পেয়ে সে যেন বেঁচে গেছে, একটা কথা কইবার লোক পেয়েছে।

সেদিন গল্প করতে করতে টের পেলাম মাটি দুলে উঠল। এখন আমার ভূমিকম্প অভ্যেস হয়ে গেছে, প্রায়ই মাটি দোলে। রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়, অনুভব করি দ্বীপ টলমল করে দুলছে ; তারপর দোলা থামলে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ভবিষ্যতে যা হবার হবে, এখন ভেবে লাভ নেই।

তিতি হঠাৎ প্রশ্ন করল,—'আচ্ছা, তোমাদের দেশে খিট্টা আছে ?'

আমি বললাম,—'খিট্টার মত এত বড় পাখি নেই, ছোট ছোট পাখি আছে।'

সে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল,—'তাহলে তোমরা উড়তে পার না ?'

অবাক্ হয়ে বললাম,—'উড়তে পারি না, তার মানে ? তুমি উড়তে পার নাকি ?'

তিতি ঘাড় নেড়ে বলল,—'হ্যাঁ, উড়তে পারি। খিট্টার পকেটে ঢুকে কত উড়ে বেড়িয়েছি। তুমি আসার পর আর উড়িনি, তাই তুমি জান না। খিট্টা বুড়ো হয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে বেশি দূর উড়তে পারে না।'

'অ্যাঁ! তুমি আকাশে উড়তে পার! এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। তুমি খিট্টার পকেটে ঢুকতে পার ?'

'কেন পারব না। একজন মানুষ বেশ ঢুকতে পারে। দেখবে ?—খিট্টা! খিট্টা!'

খিট্টার চোখ তখনি খুলে গেল, সে উঠে দাঁড়াল। তিতি তার কাছে গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বলল,—'বসে থাক্, বসে থাক্, আমি তোর পেটে ঢুকে উড়ব।'

খিট্টা আবার হাঁটু মুড়লো। তিতি তখন তার পেটের মধ্যে ঢুকে উবু হয়ে বসল। তার মুখখানি কেবল পকেটের ওপর বেরিয়ে রইল। পকেটে বাচ্চা নিয়ে ক্যাঙারুর ছবি দেখেছ নিশ্চয়, ঠিক সেই রকম।

তারপর খিট্টা পাখা মেলে দিয়ে দু'চার বার পাখা নাড়ল, দু'চার পা সামনে হেঁটে গিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য।

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। খিট্টা চিলের মতন পাক খেয়ে খেয়ে উঁচুতে উঠতে লাগল। অনেক উঁচুতে উঠে আবার পাক খেয়ে খেয়ে নামতে আরম্ভ করল। তারপর পাখা গুটিয়ে আমার সামনে এসে বসল।

তিতি খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে এসে খিলখিল করে হাসল। বলল,—'দেখলে উড়তে পারি কিনা! তুমি উড়বে ?'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। খিট্রা চিলের মতন···উঠতে লাগল। [পৃষ্ঠা ১৫

বললাম,—'ও বাবা, খিট্রা যদি উঁচুতে তুলে নীচে ফেলে দেয়!'

তিতি বলল,—'আচ্ছা তবে থাক। খিট্রার সঙ্গে তোমার আরো ভাব হোক, তারপর উড়ো।'

যাহোক, আকাশে ওড়ার কথাটা তোমাদের আগেই শুনিয়ে ছিলাম। এবার দ্বীপের ইতিহাসে ফিরে যাই।

দ্বীপপুঞ্জের মানুষগুলো বেশ মনের সুখে ছিল। যখন ইচ্ছে পাখিতে চড়ে উড়ে বেড়াত, এ-দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপে যেত, নেচে গেয়ে সময় কাটাত। অবশ্য তাদের খাবার জিনিসের মধ্যে কেবল নারকেল আর মাছ; কিন্তু আজন্ম তাতেই তারা অভ্যস্ত, তাই কষ্ট হত না। তাদের খাবার সংগ্রহের জন্যে তিলমাত্র কষ্ট স্বীকার করতে হত না; পাখিরা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে দেয়; নারকেল গাছে অজস্র নারকেল ফলে, পাড়ো আর খাও। চাষ করতে হয় না, জাল ফেলে মাছ ধরতে হয় না। বেপরোয়া সুখের জীবন।

এইভাবে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে কয়েকটি দ্বীপের ওপর একদল মানুষ মনের আনন্দে বাস করছিল, হঠাৎ বছর তিনেক আগে এক সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটল। দুপুর রাত্রে দ্বীপ দুলতে আরম্ভ করল। মানুষগুলো ভয় পেয়ে যে যার কোটর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দ্বীপ যেন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, চারিদিক থেকে মড়মড় ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। অন্ধকারে প্রলয়ংকর কাণ্ড।

এরা আগে কখনো ভূমিকম্প দেখেনি, কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। আধ ঘণ্টা পরে আস্তে আস্তে ভূমিকম্পের বেগ কমল, কেবল মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছে। তারপর যখন

সকাল হল, দেখা গেল দ্বীপ কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে, সমুদ্রের কিনারে যত নামাল জমি ছিল সব ডুবে গেছে, কেবল নারকেল গাছগুলোর মাথা জেগে আছে। শুধু তাই নয়, আশেপাশে যে সব দ্বীপ ছিল সেগুলো বেবাক সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে গেছে, সেখানকার মানুষগুলো ডুবে মরেছে। কেবল বিরাট পাখিগুলো আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর থেকে দ্বীপ মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। কিছুদিন পরে সকলে লক্ষ্য করল যখনই দ্বীপ নড়েচড়ে ওঠে তখনি তার খানিকটা জলের নীচে তলিয়ে যায়। দ্বীপটা যেন ফুটো জাহাজের মতন টলমল করতে করতে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এই ভাবে আরো কিছুদিন গেল; দ্বীপের মানুষগুলো বুঝল এ দ্বীপ আর বেশী দিন নয়, অন্য দ্বীপগুলোর মত এও একদিন সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। তখন কী হবে? সকলকেই ডুবে মরতে হবে।

দ্বীপের মানুষগুলোর মধ্যে যারা প্রবীণ মাতব্বর লোক ছিল তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে উপায় স্থির করল। কয়েকজন লোক পাখিতে চড়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল, দেখতে গেল বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে এমন কোনো দ্বীপ আছে কিনা যা ভূমিকম্পে মজে যাচ্ছে না।

একে একে সবাই ফিরে এল। কেউ দ্বীপ দেখতে পায়নি, কেবল যে-লোকটা দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল সে বলল, উড়তে উড়তে অনেক উঁচুতে উঠে সে দূরে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ রঙের একটা আভা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তার পাখি এদিক ওদিক উড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই সে আর অত দূর যেতে সাহস করেনি, ফিরে এসেছে।

তখন তিন জন লোক নতুন পাখিতে চড়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলল। পাঁচ দিন তাদের দেখা নেই; তারপর তারা ফিরে এসে খবর দিল, পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মস্ত বড় দ্বীপ আছে, দ্বীপে নারকেল গাছ আছে। তারা তিন দিন সেখানে থেকে দেখেছে, ভূমিকম্প নেই, দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে না।

তখন এই দ্বীপ থেকে ওই দ্বীপের দিকে যাত্রা শুরু হল। সকলে নিজের নিজের পাখিতে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে দু'চার দিনের মধ্যে এই দ্বীপ খালি হয়ে গেল। রয়ে গেল কেবল তিতি।

তিতি দুনিয়ায় একা, তার মা-বাপ মরে গেছে; আছে শুধু ওই বুড়ো পাখি খিট্টা। সেও বেরিয়েছিল খিট্টায় চড়ে অন্য দ্বীপে যাবে বলে; কিন্তু খিট্টা চার-পাঁচ মাইল গিয়ে ফিরে এল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছিল অন্য দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তার আগেই সমুদ্রে পড়ে গিয়ে তিতিকে সঙ্গে নিয়ে ডুবে যাবে। তিতি আরো কয়েকবার চেষ্টা করল তাকে অন্য

দ্বীপে নিয়ে যেতে, কিন্তু বুড়ো খিট্রা দু'চার মাইলের বেশী যায় না, ফিরে আসে। তিতিকে বয়ে নিয়ে পঁচিশ ত্রিশ মাইল উড়ে যাবার সাধ্য তার নেই।

তিতি একা দ্বীপে পড়ে রইল, তার একমাত্র সঙ্গী খিট্রা। তারপর দিনের পর দিন কাটছে। খিট্রা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনে, নারকেল গাছ থেকে নারকেল পাড়ে। তিতি জানে এ দ্বীপ থেকে তার বেরুবার উপায় নেই। দ্বীপ একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে ; এক দিন আসবে যেদিন দ্বীপ আর থাকবে না, তখন তিতিকে ডুবে মরতে হবে।

এই ভাবে প্রায় দু'বছর কাটার পর একদিন জোয়ারের মুখে ভাসতে ভাসতে আমার তক্তপোশ এসে দ্বীপের চড়ায় ঠেকল। তিতি আমার অজ্ঞান দেহটা টেনে ডাঙায় তুলল। তক্তপোশটা ভাটার টানে ভেসে গেল। তারপর থেকে যা-যা ঘটেছে মোটামুটি তোমাদের বলেছি।

পরস্পরের ভাষা আয়ত্ত করার পর আমাদের জীবন অনেকটা সহজ হয়ে এল ; রোজ মাছ-পোড়া আর ডাব-নারকেল খাওয়াও সহ্য হয়ে গেল। কেবল একটা দুঃখ কিছুতেই ঘুচল না ; এ দ্বীপে মিঠে জল নেই, জলের বদলে ডাবের জল খেতে হয়। তাতে হয়তো শরীর ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু মন মানে না ; মন চায় জলের স্বাদ। জলের খোঁজে দ্বীপময় ঘুরে বেড়াই, যদি কোথাও দেখতে পাই পাথরের ফাটল দিয়ে ঝির ঝির করে জলের ধারা ঝরে পড়ছে। কিন্তু কোথায় জল! জল থাকলে আদিম মানুষগুলো অনেক আগেই আবিষ্কার করত।

দ্বীপের আবহাওয়া ভারতবর্ষের মত নয়। দিনের বেলা কড়া রোদ্দুরে দ্বীপের পাথর আর বালি গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করে ; শেষ রাত্রে কনকনে ঠাণ্ডা।

তিতি সন্ধ্যের আগেই রান্না চড়াতো। অর্থাৎ চকমকি ঠুকে কোটরের মধ্যে আগুন জ্বালত ; তারপর মাছের পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি বার করে পেটের মধ্যে কী সব শিকড়-বাকড় পুরে আগুনে ঝলসাতে আরম্ভ করত। এরা সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করতে জানত না, কিন্তু মাছ ঝলসানোর সময় তাতে লোনা জলের ছিটে দিয়ে তাকে নোনতা করে নিতে জানত। মাছ খেতে নেহাত মন্দ হত না। নুন আর শিকড়-বাকড়ের গন্ধ মিশিয়ে বেশ স্বাদ হত। এক পেট মাছ খেয়ে খানিকটা ডাবের শাঁস আর জল খেতাম।

খাওয়া শেষ হলে আগুনে আরো শুকনো বাল্‌দো দিয়ে আমরা দু'জনে আগুনের দু'পাশে ঘাসের বিছানায় লম্বা হতাম। তিতি বলত,—'গল্প বল।'

তাকে আমাদের দেশের রকমারি গল্প শোনতাম। শহর বাজারের কথা শুনে চোখ গোল করে চেয়ে থাকত ; বাঘ ভাল্লুকের গল্প শুনে বিশ্বাস করত না, এ রকম জন্তু যে থাকতে পারে তা তার ধারণার অতীত।

শেষে গল্প শুনতে শুনতে তিতি ঘুমিয়ে পড়ত। আমি উঠে নিবন্ত আগুনে আরো কাঠ দিতাম। একটা টাটি তৈরি করেছিলাম নারকেল গাছের পাতা দিয়ে, তাই দিয়ে দোর ঢাকা দিতাম, তারপর শুয়ে পড়তাম। কুঠরি শেষ রাত্রি পর্যন্ত গরম থাকত।

এই ভাবে রাত কাটে। রাত্রে যখন ঘুম আসে না তখন শুয়ে শুয়ে ভাবি, কোনো দিন কি এই দ্বীপ থেকে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব? কি করে ফিরে যাব? এদিকে জাহাজের যাতায়াত নেই, থাকলেও জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায় ছিল না। এই সব ভাবতে ভাবতে হয়তো মাটি দুলে উঠত ; ভাবতাম এমনিভাবে দ্বীপ একটু একটু করে সমুদ্রে তলিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সলিল সমাধি হবে।

দিনের বেলা কোনো কাজ নেই। দ্বীপের কিনারে কিনারে ঘুরে বেড়াই। খিট্টার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে, সে হেঁটে হেঁটে আমার পিছনে আসে। সে এখন আমার কথা সব বুঝতে পারে, আমি কোনো হুকুম করলে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে। আমি ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে ঠেস দিয়ে বসি, খিট্টাকে হুকুম করি,—'খিট্টা, একটা কচি ডাব পেড়ে নিয়ে আয়, তেষ্টা পেয়েছে।'

খিট্টা অমনি উড়ে গিয়ে নেয়াপাতি ডাব পেড়ে আনে। আমি বলি,—'ফুটো করে দে।' খিট্টা ঠোঁটের এক ঠোকর মেরে ডাবে ফুটো করে দেয়, আমি আরামসে ডাবের জল খাই।

খিট্টার সঙ্গে ভাব হবার পর তিতি প্রায়ই আমাকে বলত,—'এবার একদিন খিট্টায় চড়ে আকাশে ওড়ো না।' আমার ভয় করত, বলতাম,—'আমি তোমার চেয়ে ওজনে অনেক ভারী, খিট্টা যদি আমাকে নিয়ে উড়তে না পারে? যদি সমুদ্রে ফেলে দেয়?' তিতি হেসে বলত,— 'না না, কোনো ভয় নেই। উড়েই দেখ না।'

একদিন মরিয়া হয়ে খিট্টার পকেটের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পকেটের মধ্যে আঁশটে গন্ধ। কিন্তু একজনের পক্ষে যথেষ্ট জায়গা। খিট্টাকে ভয়ে ভয়ে হুকুম দিলাম,—'ওড়্।' খিট্টা পাখা মেলে আকাশে উঠল। আমার বুক দুরদুর করছে। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে ভয় কেটে গেল, হৃৎকম্প থামল। খিট্টা অনেক উঁচুতে উঠে দ্বীপের কিনারা ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, সমস্ত দ্বীপটা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি। সে যে কী অপূর্ব অনুভূতি বলতে পারি না। আধঘণ্টা পরে খিট্টা নিজেই নেমে এল।

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

এই আমার প্রথম আকাশে ওড়া। তারপর আরো অনেকবার আকাশে উড়েছি, যখনই ইচ্ছে হয়েছে উড়েছি। সে আজ কত কালের কথা। এরোপ্লেন তখন কোথায়?

কিন্তু মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কোন্ দিন দ্বীপ হুস করে সমুদ্রে ডুব মারবে তার ঠিক নেই।

তবু দ্বীপের ওপর জীবনটা মন্দ কাটছে না। দ্বীপে থাকাকালে আমার সময়ের হিসেব ছিল না, কিন্তু সাত বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিলাম; মানে মোটামুটি সাত মাস সেখানে ছিলাম। শেষের দিকে কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে গিয়েছিল, তাই আমিও তিতির মতন ঘাসের ঘাগরা পরতাম।

একদিন আমি আর তিতি সমুদ্রের তীরে বসে ছিলাম, তিতি বলল,—'তুমি নাচতে জানো?'

বললাম,—'দূর, পুরুষেরা নাচে নাকি? আমাদের দেশে মেয়েরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচে।'

তিতি বলল,—'আমরা মেয়েরাও নাচি, পুরুষেরাও নাচে।'

প্রশ্ন করলাম,—'তুই নাচতে জানিস?'

তিতি বলল,—'হ্যাঁ জানি। দেখবে?'

তিতি উঠে দাঁড়াল, হাসি হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে নাচতে আরম্ভ করল। ধেই ধেই নাচ নয়, হাত পায়ের নানারকম ভঙ্গী করে নাচ। ঘুঙুর নেই, বাজনা নেই, তবু খুব ভাল লাগে।

খিট্টা খানিকটা দূরে বসে ঝিমোচ্ছিল, তিতিকে নাচতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর আধ-খোলা পাখনা মেলে পা তুলে তুলে নাচতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তিতি বলল,—'এস না তুমিও নাচবে।'

বললাম,—'আমি যে নাচতে জানি না।'

'নাচতে নাচতে শিখবে।'

কি করি, উঠলাম। তিতি এসে আমার হাত ধরল। কল্পনা কর, নির্জন সমুদ্রতীরে একটা প্রকাণ্ড পাখি আর দু'টো মানুষ নাচছে। কিন্তু দর্শক নেই।

তারপর তিতির সঙ্গে অনেকবার নেচেছি। আমি ভালো নাচতে শিখেছিলাম। প্রাণে ফুর্তি এলে নাচা খুব শক্ত নয়। পশুপক্ষীও নাচে।

এইভাবে সাত মাস কাটার পর একটা দিন এল যেটা দ্বীপে আমার শেষ দিন। আগে জানতে পারিনি। আমার দ্বীপে আসা যেমন আকস্মিক দ্বীপ ছাড়াও তেমনি আকস্মিক। হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়া। সেই দিনটার স্মৃতি কাঁটার মত আজও বুকে বিঁধে আছে।

রাত্তিরে খুব ভূমিকম্প হয়ে গেছে, আধ ঘণ্টা ধরে দ্বীপ দুলছে। সকালবেলা কোটর থেকে বেরিয়ে দেখি অর্ধেক দ্বীপ লোপাট; দু'চারটে নারকেল গাছ ছাড়া আর সব অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দ্বীপের পাথুরে মাথাটা জেগে আছে।

খিট্টা আমাদের দেখে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল; মনে হল সে ভয় পেয়েছে। আমি তিতির মুখের পানে তাকালাম; তার মুখে মৃত্যুভয়ের ছায়া। নিজের মুখটা যদি দেখতে পেতাম তাহলে সেখানেও বোধহয় ওই কালো ছায়াই দেখতে পেতাম।

আমার পানে চেয়ে নাচতে আরম্ভ করল। [পৃঃ ২০

সেদিন দুপুর বেলা আমি আর তিতি দ্বীপের উত্তর দিকে একটা উঁচু ঢিবির ওপর গিয়ে বসেছিলাম। খিট্টাও ছিল। কাল রাত্রির ভূমিকম্পের পর সে এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের সঙ্গ ছাড়ছিল না।

বসে বসে আলোচনা হচ্ছিল: দ্বীপ তো আর দু'চার দিনের মধ্যেই সমুদ্রে ডুব মারবে, তখন আমাদের বাঁচার উপায় কি? নারকেল গাছের লম্বা গুঁড়ি নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু নারকেল গাছ কাটব কি দিয়ে? ভেলা টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসাবার শক্তি কি আমাদের আছে? যদি বা কোনো মতে ভাসাতে পারি, ভেলা তো নৌকা নয়, সে নিজের ইচ্ছেমত কোন্ দিকে যাবে তার ঠিক নেই। তারপর ভেলাতে

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ভাসতে ভাসতে খাব কি? কিছু নারকেল না হয় সঙ্গে নিলাম; খিট্টাও সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কিংবা আকাশে উড়তে উড়তে আমাদের সঙ্গে যাবে, সে মাছ ধরে এনে দেবে। কিন্তু কাঁচা মাছ খাব কি করে? নারকেলই বা ক'দিন চলবে? যদি ছ'মাস ভেসে বেড়াতে হয়!

কোনো দিক দিয়েই নিস্তার নেই। সলিল-সমাধি অনিবার্য। হতাশ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইলাম।

তারপর হঠাৎ।

দেখলাম ঈশান কোণে সমুদ্র যেখানে গিয়ে আকাশে ঠেকেছে সেইখানে ছোট্ট একটি ধোঁয়ার পতাকা! চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইলাম, তারপর সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'তিতি ছাখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছিস্?'

তিতি দেখে বলল,—'ধোঁয়ার মত লাগছে। কী ওটা?'

'জাহাজ। জাহাজ আসছে।' আমি লাফিয়ে উঠে নাচতে আরম্ভ করলাম। তিতি চোখ বিস্ফারিত করে বলল,—'জাহাজ কাকে বলে?'

আমি তখন নাচ থামিয়ে তিতিকে বোঝালাম জাহাজ কাকে বলে। বললাম,—'আর ভাবনা নেই জাহাজ আমাদের নিতে আসছে। আর আমাদের ডুবে মরতে হবে না।'

ইতিমধ্যে জাহাজটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখনো চার পাঁচ মাইল দূরে; মানুষ দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার পর বুকটা ধড়াস করে উঠল। জাহাজ দ্বীপের দিকে আসছে না, চার পাঁচ মাইল দূর দিয়ে দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে চলে যাচ্ছে। সত্যিই তো! ওরা কি করে জানবে যে এই দ্বীপে মানুষ আছে, ওরা নিজের পথে চলে যাচ্ছে। এত দূর থেকে আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না। হায় হায়, যদি কাঠ-কুটো জমা করে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থা করে রাখতাম! তাহলে ওরা ধোঁয়া দেখে বুঝতে পারত। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। কাঠ-কুটো সংগ্রহ করে আগুন জ্বালতে জ্বালতে জাহাজ চলে যাবে।

হতাশ চোখে জাহাজের পানে চেয়ে বসে রইলাম। জাহাজ দ্বীপের প্রায় সামনা-সামনি এসেছে, দূরত্ব মাইল তিনেকের বেশী নয়। জাহাজের ডেক দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ডেকে মানুষ আছে কিনা দেখতে পাচ্ছি না।—

হঠাৎ তিতি বলল,—'এক কাজ করলে হয়।'

'কি কাজ ?'

'খিট্রা আমাদের জাহাজে পৌঁছে দিতে পারে।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম,—'আরে তাই তো! এ কথাটা এতক্ষণ মনে আসেনি। তিতি, তোর ভারি বুদ্ধি। খিট্রার পক্ষে আমাদের নিয়ে তিন চার মাইল উড়ে যাওয়া কিছুই নয়। —কিন্তু—কিন্তু—'

আমি আবার বসে পড়লাম—'খিট্রা আমাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে কি করে? আমরা দু'জন ওর পকেটে আঁটবো না।'

'দু'জনকে একসঙ্গে নিয়ে যাবে কেন? একজনকে আগে নিয়ে যাবে, তারপর ফিরে এসে আর একজনকে নিয়ে যাবে।'

'ঠিক তো, ঠিক তো। আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। তাহলে তুই আগে যা তিতি, জাহাজে পৌঁছে খিট্রাকে পাঠিয়ে দিস।'

তিতি বলল,—'আমি আগে গেলে চলবে না। তুমি ওদের ভাষা জানো, তুমি আগে যাও।'

তাও তো বটে। জাহাজের লোকদের ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে হবে, তাহলে তারা জাহাজ থামাবে; হয়তো দ্বীপের কাছে আসবে। তিতি আগে গেলে তা হবে না।

উঠে পড়লাম। খিট্রার কাছে গিয়ে বললাম,—'ওই জাহাজ দেখতে পাচ্ছিস, আমাকে ওখানে নিয়ে চল।' খিট্রা ঘাড় তুলে জাহাজের পানে চাইল, তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি তার পকেটে ঢুকলাম। তিতিকে বললাম,—'আচ্ছা তিতি, আমি গিয়েই খিট্রাকে পাঠিয়ে দেব।'

তিতি হেসে ঘাড় নাড়ল। তখনো জানি না তিতির সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা, ইহজীবনে আর দেখা হবে না।

খিট্রা দু'চার বার পাখনা নেড়ে আকাশে উঠল; জাহাজের দিকে মুখ করে সোজা উড়ে চলল। বেচারা খিট্রা।

আমি খিট্রার পকেটের মধ্যে বসে নানান রংবেরঙের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম; খিট্রাকেও যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, খিট্রাকে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করব। তখন আমাদের পায় কে! হায় খিট্রা।

● শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

খিট্টা জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। জাহাজও দাঁড়িয়ে নেই; তবু দেখতে দেখতে জাহাজের চেহারা বড় হচ্ছে। প্রথমে ছিল মোচার খোলার মতন, তারপর পানসির মতন, ক্রমে আরো বড়। এবার জাহাজের ডেকের ওপর মানুষ দেখতে পাচ্ছি, ইউনিফর্ম পরা মানুষগুলো ছুটে আসছে ডেকের কিনারায়, রেলিং-এর ধারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি জাহাজ অত চিনি না কিন্তু মনে হল এটা মানোয়ারী জাহাজ; তার লেজের দিকে পতাকা উড়ছে, সাদা জমির ওপর লাল চাকতি।

আমরা জাহাজের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছি, খিট্টা জাহাজের খোলা ডেকের দিকে নামতে শুরু করেছে এমন সময় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। জাহাজ থেকে দুম্ করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে খিট্টা প্যাঁক করে ডেকে উঠল; তারপর সোজা নীচের দিকে পড়তে লাগল। তোমরা পাখি শিকার করেছ, উড়ন্ত পাখি বুকে গুলি খেয়ে যেভাবে পড়ে খিট্টা ঠিক সেই ভাবে পড়তে লাগল।

কী হল ভাল ভাবে ধারণা করবার আগেই জলে পড়লাম। পড়ার বেগে খিট্টার সঙ্গে সমুদ্রে তলিয়ে গেলাম। তারপর হাঁচোড় পাঁচোড় করে খিট্টার পকেট থেকে বেরিয়ে ভেসে উঠলাম। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, জলে পড়ার সময় মাথায় চোট লেগেছিল, কেমন যেন ধন্দ লেগে গিয়েছিল। আবছা ভাবে দেখলাম জাহাজ থেকে জালি-বোট নামছে। জালি-বোট এসে আমাকে জল থেকে টেনে তুলল। তারপর কিছু মনে নেই, বোধহয় কয়েক মিনিটের জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

জ্ঞান হয়ে দেখি জাহাজের ডেকের ওপর শুয়ে আছি, আমাকে ঘিরে একদল ফৌজি পোশাক-পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সব মনে পড়ে গেল, আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মানুষগুলোর মুখ দেখে মনে হল এরা যেন স্বাভাবিক নয়। তারপরই বুঝতে পারলাম, এরা জাপানী; জাহাজটা জাপানী জাহাজ।

আমি তখন ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে চিৎকার করে বললাম,—'ও জাপানী সায়েব, তোমরা এ কি সর্বনাশ করলে! খিট্টাকে গুলি করে মেরে ফেললে কেন? তিতি এখন জাহাজে আসবে কি করে?'

জাপানীরা কেউ কথা বলল না, বাদামের মত চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে রইল। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, পাগলের মত লাফাতে লাফাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে চিৎকার করতে লাগলাম,—'থামাও থামাও, শীগগির জাহাজ থামাও। তিতিকে ফেলে

কোথায় চলে যাচ্ছ! খিট্টা মরে গেছে, এখন কে তাকে মাছ ধরে খাওয়াবে, কে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দেবে? তিতি যে না খেয়ে মরে যাবে। তোমরা কেমন লোক, বুঝতে পারছ না!'

তখন একজন জাপানী অফিসার আমার হাত ধরে ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বয়স্থ মানুষ, অল্প ইংরেজি জানেন; কিন্তু চোয়ালের হাড় লোহার মত শক্ত। তখন রুশ-জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

আমি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ক্যাপ্টেনকে সব কথা বললাম। শুনে ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন,—'এত বড় পাখি সভ্য জগতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই একজন নাবিক ভয় পেয়ে তাকে গুলি করে মেরেছে। যাহোক, আমরা বিশেষ সামরিক কাজে যাচ্ছি, এখন আর দ্বীপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বীপের অক্ষাংশ দ্রাঘিমা নোট করে নেওয়া হয়েছে। পরে এই দ্বীপে অনুসন্ধান করব।'

জিগ্যেস করলাম,—'সাহেব, কবে দ্বীপে ফিরে আসবে?'

জাপানী ক্যাপ্টেন বললেন,—'এখন যুদ্ধ চলছে, কিছুই বলা যায় না।'

তারপর ক্যাপ্টেনকে অনেক মিনতি-স্তুতি করলাম, কিন্তু ফল হল না। ওদের কাছে তিতির জীবনের কোনো মূল্য নেই।

দু'হপ্তা পরে একটা অন্ধকার রাত্রে জাপানী জাহাজ আমাকে মালয় দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে গেলাম, তারপর দেশে ফিরে এলাম। তিতিকে যখন মনে পড়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। বড় ভাল মেয়ে ছিল। যদি দেশে আনতে পারতাম তাকে বিয়ে করতাম।

রণদামামা চুপ করলেন। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতার মধ্যে রণদামামার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পেলাম।

মার্জার কাহিনী

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

একটু আগে থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। পাশবালিশ জড়িয়ে কেবল এপাশ আর ওপাশ করছি।

বেশ গরম পড়ে গিয়েছে। আমি আবার গরম একটুও সহ্য করতে পারি না। মাথার ওপর বন বন করে পাখা ঘুরছে, তাও কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা।

পাশে ত্রিলোচন অকাতরে ঘুমাচ্ছে। নাক নয় যেন সানাই। বিচিত্র সব শব্দ বের হচ্ছে।

হঠাৎ ত্রিলোচন ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল।

বলল, ওই আবার।

আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, না ভাই ত্রিলোচন সে সব কিছু নয়। আমি পাশ ফিরলাম, তাই খাটটা দুলে উঠল।

ত্রিলোচন সপ্তাহ তিনেক গৌহাটি থেকে ফিরেছে। দারুণ ভূমিকম্পের পর। একরাত্রে ষোলবার গৌহাটির মাটি কেঁপে উঠেছিল। লোকজন বাড়ির মধ্য থেকে সবাই মাঠে আর রাস্তায় এসে জড় হয়েছিল।

তারপর থেকে ত্রিলোচনের কেবল ভয়, এই বুঝি বাড়িঘর দুলছে। কথা বলতে বলতে চমকে ওঠে। ঘুমাতে ঘুমাতে বিছানায় উঠে বসে।

বলে, ওই আবার।

এবার কিন্তু ত্রিলোচন অন্য কথা বলল।

না, না, ভূমিকম্পের কথা বলছি না।

তবে?

বেড়াল, বেড়াল, রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ শুনছ না?

আমি অবশ্য শুনিনি। তবে বাড়িতে বেড়াল আছে, তা জানি। একটা দুটো নয়, গোটা পাঁচেক। রেশন কার্ড নেই, তাও তাগড়া চেহারা। তাড়া করলে পালায় না, ল্যাজ শক্ত করে গোঁফ ফুলিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মুখে বলে, ম্যাঁও।

আমাদের বাড়ি থাকে বটে, কিন্তু একটা বেড়ালও আমাদের নয়। সব আমদানী হয়েছে পাশের খাটাল থেকে। দুধ খেয়ে খেয়ে বোধ হয় মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে, তাই মুখ বদলাতে এ বাড়িতে ঢুকেছে। মাছ মাংস তো খায়ই, কিন্তু বেড়ালে কাঁচা আনাজপত্র খায় জানা ছিল না। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আলু কামড়ায়, কপি চিবোয়, শাকসবজি বাকী রাখে না।

শুধু কি তাই। ভোরবেলা খবরের কাগজ দিয়ে যায়। বারান্দায় পড়ে থাকে। নীচে নেমে পড়তে গিয়ে দেখি একটা বেড়াল সম্পাদকীয় চিবিয়ে শেষ করেছে, আর একটা সিনেমার পাতার ওপর আয়েস করে শুয়ে আছে।

একদিন ত্রিলোচন বলল, দাদা বেড়াল বিদেয় কর, নয়তো আমাকে অনুমতি দাও আমি আসামে ফিরে যাই। এর চেয়ে আমার ভূমিকম্পে মরাও ভাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কি হল কি?

কি হল না তাই বল?

ত্রিলোচন তার নতুন কেনা টেরিলিন শার্টটা তুলে দেখাল।

একটা হাতা নেই। একদিকের কলারের অর্ধেকটা চিবানো।

বিস্মিত হলাম, সে কি বেড়ালে এই করেছে?

তোমার কি ধারণা আমি ভাতের সঙ্গে খেয়েছি।

আর কিছু বললাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, আর নয়। এবার যেরকম করে হোক বেড়ালগুলো তাড়াতেই হবে।

এর আগে যে চেষ্টা করিনি, এমন নয়। বহুকষ্টে মাছের লোভ দেখিয়ে পালের

গোদা বেড়ালটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলাম। তারপর ধামা থেকে থলিতে বদলি। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম।

তারপর বাড়ি ফিরে দেখলাম বেড়ালটা আমার আগেই ফিরে এসেছে। ঠিক সিঁড়ির মুখে বসে জিভ দিয়ে গোঁফ চাটছে। আমাকে দেখে একটা চোখ বন্ধ করে বিশ্রীভাবে বলল, ম্যাও।

স্বরটা শুনে আমার যেন মনে হল, কেমন জব্দ।

মুশকিলে পড়ে গেলাম।

ইঁদুর তাড়াবার জন্য ভিটেয় বেড়াল পোষা যায়। কিন্তু বেড়াল তাড়াবে কোন্ জন্তু?

ত্রিলোচন বলল।

এক কাজ করতে পার। ভাল একটা কুকুর পোষ। বেশ বদরাগী কুকুর।

কথাটা মনে লাগল। এধারে ওধারে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলাম।

ত্রিলোচন আর একটা কথাও বলে দিয়েছিল।

দেশী কুকুর এনো না, ওদের বিশ্বাস নেই। বেড়ালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হয়তো সহ অবস্থান করবে। তোমার বিপদ কমবে না, অথচ খরচ বাড়বে। একেবারে খাস বিলিতী কুকুর খোঁজ।

পার্কসার্কাসের ওদিকে কুকুরের দোকানের একজন খবর আনল। ত্রিলোচনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

দরদস্তুর করতে করতে মাথায় হাত চাপড়ালাম।

যত ছোট কুকুর তার দাম তত বেশী। একেবারে বড় সাইজের দাম যদি হয় দুশো টাকা, ছোট্ট তুলোর একটা পুঁটলি, হাতের চেটোর সাইজ, দর হাঁকল, ছশো টাকা।

ত্রিলোচন জামার আস্তিন ধরে টান দিল।

চলে এস দাদা, ব্যাপার মোটেই সুবিধার নয়। কিছু না কিনলেও হয়তো পয়সা দিতে হবে।

দুজনে পালিয়ে বাঁচলাম।

যাক, দিন তিনেকের মধ্যে একটা ব্যবস্থা হল।

খবরের কাগজে দেখলাম, এক সাহেব বিলাত চলে যাচ্ছেন, তাঁর একটা বুলডগ কুকুর কোন কুকুরপ্রেমীকে দান করে দিয়ে যেতে চান।

এমন সুযোগ আর আসবে না।

খিদিরপুরের ঠিকানা ছিল। খুঁজে খুঁজে ফটকে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আসবার কারণ শুনে দারোয়ান সাবধান করে দিল।

সাহেবের বিলাত যাওয়ার কথা সব বাজে। দেশ মাদ্রাজে, বিলাত যাবে কি করতে। ওটা কুকুর নয় বাবু, শয়তান। এক মাস হল সাহেবের এক বন্ধু চাবাগানের ম্যানেজার কুকুরটা দিয়েছে, এর মধ্যে সাহেবের ছেলেকে কামড়েছে, মেমসাহেবকে, আর্দালীকে, ড্রাইভারকে। কাল মালীকে এমন তাড়া করেছিল বেচারী বারান্দা থেকে প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে পড়ে, গোটা চারেক দাঁত ভেঙেছে। কুকুরের নয়, নিজের। আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি, কুকুর না গেলে, আমি ফিরব না।

আমি একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, তবে?

ত্রিলোচন কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উল্লসিত।

বলল, এই রকম কুকুরই তো আমাদের দরকার। আমাদের বউও নেই, ছেলেপুলেও নেই। শুধু আমরা দুজন। শোবার ঘরে দুজনে খিল দিয়ে থাকব আর কুকুরটা খোলা থাকবে নীচেয়। ব্যস, আর দেখতে হবে না। এক একটা বেড়ালের টুঁটি টিপে ধরবে আর আছড়ে মারবে।

ত্রিলোচন মুখচোখের এমন ভাব করল, যেন এই আছড়ানোর দৃশ্য সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে এবং উপভোগ করছে।

কুকুরটা দেখলাম। মোটা চেন দিয়ে থামের সঙ্গে বাঁধা ছিল। রক্তাভ দুটি চোখ, থ্যাবড়া মুখ, নাকের বালাই নেই। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা ঝুলে পড়েছে।

আমাদের দেখে এমন একটা বিকট চিৎকার করল যে ত্রিলোচন তীরবেগে সাহেবের পিছনে আশ্রয় নিল।

আমি কদিন টনসিলে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আওয়াজে শিউরে উঠতেই মনে হল টনসিল-দুটো স্থানচ্যুত হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে পড়ে গেল।

সাহেব মহানুভব। কুকুর দিলেন, চেন দিলেন, নিয়ে যাবার জন্য নিজের মোটরও দিলেন। কুকুরটাকে সীটে বসালাম না, তাহলে আমাদের আর পাশে বসে যেতে হত না। সাহেবই বলল, কুকুরটাকে পিছনের লাগেজ কেরিয়ারে ঢুকিয়ে নিতে।

তাই হল। কুকুরটাকে তো বাড়ি নিয়ে আসা হল।

এখন সমস্যা হল, তাকে নামানো। যে কাছে যায়, তার দিকে রক্তাভ চোখ মেলে যেভাবে চাপা গর্জন করে তার আর এগোবার সাহস হয় না। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

● হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর, তুই জোয়ান চাকর, জাঁদরেল ঝি সবাই পিছিয়ে গেল।

মতলব বাতলাল সাহেবের ড্রাইভার।

বলল, আপনাদের বাড়ি ঘুমের বড়ি আছে? আমাদের খিদিরপুরে মেমসাহেবের কাছে ছিল। মেমসাহেব সাহেবের কাছ থেকে একবার পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। সাহেব বলে বলে হয়রান। ফেরত দেবার আর নাম নেই। রাত্রে শুতে এসে সাহেব তাগাদা করত বলে মেমসাহেব বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ত। সাহেবের কোন কথা কানে যেত না। দুধের সঙ্গে সেই বড়ি খাইয়ে দিলেই টাইগার ঘুমিয়ে পড়বে, তখন পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া যাবে।

মনে পড়ে গেল। সহজে ঘুম হয় না বলে এক শিশি বড়ি কিনেছিলাম, কিন্তু সাহস করে খেতে আর পারিনি। কি জানি যদি মাত্রা বেশী হয়ে যায়। তাহলেই আর ইহলোকে চোখ খোলার অবকাশ পাব না।

শিশি নিয়ে এসে বললাম, দুধের মধ্যে একটা বড়ি দিই?

ড্রাইভার হাসল, খাস বিলিতী কুকুর বাবু, একটা বড়িতে কখনও ওদের চোখ বোজানো যায়? গোটা তিনেক দিন।

তাই দিলাম। চুক চুক করে টাইগার দুধটা খেল, তারপর থাবার ওপর মুখ রেখে নিঝুম হয়ে পড়ল।

নিন বাবু, এইবার তুলে নিয়ে যান।

কুকুরটার অবস্থা দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওই বাঘা কুকুরকে কোলে তুলে নিতে সাহস হল না। কি জানি কপট নিদ্রার কৌশল তো শুধু শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া নয়।

তাই ড্রাইভারকে বললাম, তোমাকে চেনে, তুমিই তুলে বাড়ির মধ্যে দিয়ে যাও না।

ড্রাইভার হাসল, এখন আর চেনাচিনি কি বাবু। ওর কি আর সে শক্তি আছে। জ্ঞানই নেই তো আত্মীয় পর চিনবে কি করে? আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। এখনই আবার মেমসাহেবকে নিয়ে বের হতে হবে।

ড্রাইভার উঠে নিজের আসনে বসে পড়ল চালনচক্রে হাত রেখে।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে আমি আর ত্রিলোচন কুকুরটাকে বয়ে দুতলার বারান্দায় রাখলাম। ঈশ্বর জানেন ঘুমের বড়িগুলো ভেজাল কিনা। বারান্দায় শোওয়াতেই মিট মিট করে চেয়ে দেখল।

তাড়াতাড়ি চেনটা বেঁধে লাফিয়ে সরে এলাম দুজনে।

ত্রিলোচন বলল, ব্যস দাদা, বেড়ালদের অত্যাচারের হাত থেকে নিশ্চিন্ত।

দিন তিনেক বেড়ালগুলো ধারে কাছে ঘেঁষল না। চৌকাঠের ওপারে বসে জটলা করতে লাগল। কিন্তু এই তিন দিনে আমাদের অবস্থা কাহিল।

রেশনের চাল আটা খতম। মাংস মাছ চেটেপুটে নিঃশেষ করল। পাত খালি হলেই বিকট গর্জন।

ত্রিলোচনকে বললাম, ভাই, বেড়াল তাড়াতে গিয়ে আমাদের যে পথে বসতে হবে। সারাটা সপ্তাহ খাব কি?

ত্রিলোচন অভয় দিল, একটা সপ্তাহ না হয় উপোসই দিলাম দাদা, তবু তো বেড়াল-গুলো শায়েস্তা হবে।

টাইগার তীরবেগে রাস্তা দিয়ে ছুটেছে।...তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে, গোটা আটেক বেড়াল।

চতুর্থ দিন আমি আর ত্রিলোচন বারান্দায় বসে ছিলাম। পেটে ভাত নেই, বিকালের ফুরফুরে হাওয়া, তাই সেবন করেই পেট ভরাচ্ছি।

হঠাৎ একটা আর্ত কণ্ঠ।

দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলাম, তারপর যা দেখলাম তাতে আমার মাথার সমস্ত চুল খাড়া হয়ে উঠল। ত্রিলোচনের মাথায় চুলের বালাই নেই। মসৃণ টাক। সে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল।

টাইগার তীরবেগে রাস্তা দিয়ে ছুটেছে। গলায় ভাঙা চেন, আর তাকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে, গোটা আটেক বেড়াল। বাড়িতে পাঁচটা ছিল, তাই জানতাম, কিন্তু বাড়তি তিনটে বোধ হয় কোথা থেকে ভাড়া করে এনেছে। কুকুর তাড়াবার জন্য।

এমন দৃশ্য মানুষের জীবনে একবারই দেখবার সুযোগ হয়। চেয়ারে বসে পড়ে দুজনে

দেখলাম, একটু পরেই বীরবিক্রমে আটটি বেড়াল ফিরে আসছে। টাইগার ধারে কাছে কোথাও নেই।

যথারীতি আবার বেড়ালের উপদ্রব শুরু হল। তরিতরকারি, কাগজপত্র, কাচের জিনিসপত্র সব গেল।

এই সময় পাড়ার এক অধ্যাপকের কাছে দুঃখের কথা জানাতে, তিনি সদুপদেশ দিলেন। ভদ্রলোক মনস্তাত্ত্বিক। প্রাণীদের আচার আচরণ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, কিছু নয়, ওদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করতে হবে।

ত্রিলোচন সভয়ে বলল, কারা করবে ?

কেন আপনারা, নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে যান কেন ? একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, আমরা তো সেই বংশেরই সন্তান।

আমি ঢোঁক গিললাম, আটটা বেড়াল, লঙ্কাজয়ের চেয়ে খুব সোজা ব্যাপার মনে করছেন ?

শুনুন, কোন রকমে পালের গোদাটাকে বস্তাবন্দী করুন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে চেষ্টা একবার হয়ে গেছে। মোড়ের পার্কে ছেড়ে দিয়েছিলাম—

অধ্যাপক অধৈর্য হয়ে হাত নাড়লেন, না না, ওভাবে হবে না। ওদের মগজের মধ্যে ওলোটপালোট করে দিতে হবে। স্মৃতিশক্তি যাতে নষ্ট হয় তাই করতে হবে আগে।

কি রকম ?

বস্তাবন্দী করে প্রথমে নাগরদোলায় চড়ান, খুব ঘুরপাক খাক, তারপর ট্যাক্সিতে উঠিয়ে এলোমেলোভাবে ঘুরিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিন। পালের গোদার অভাব বাকী বেড়াল কটা টের পেলেই দেখবেন ওরা ভয় পেয়ে যাবে। ওদের মনোবল যাবে ভেঙে। আহারে রুচি কমে যাবে। সংসার ভাল লাগবে না। একটা দুটো করে কাছাকাছি জঙ্গলে চলে যাবে।

ত্রিলোচন বলল, বেশ, কাজটা আর এমন কি শক্ত ! তাই করা যাক।

আমি তবু সন্দেহ প্রকাশ করলাম, কিন্তু গোদাটাকে ধরা কি সোজা কথা ?

দেখাই যাক না !

দিন সাতেকের মধ্যে ত্রিলোচন অসাধ্যসাধন করল। বাগবাজার থেকে বাদামপেস্তা দেওয়া ক্ষীর এনে রান্নাঘরে রাখল। একটা ঝুড়ি পাশে রাখল কাত করে, তাতে

মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলে দাঁড় করালে

(ক্যাঙারু পাখির দ্বীপ···পৃঃ ১১)
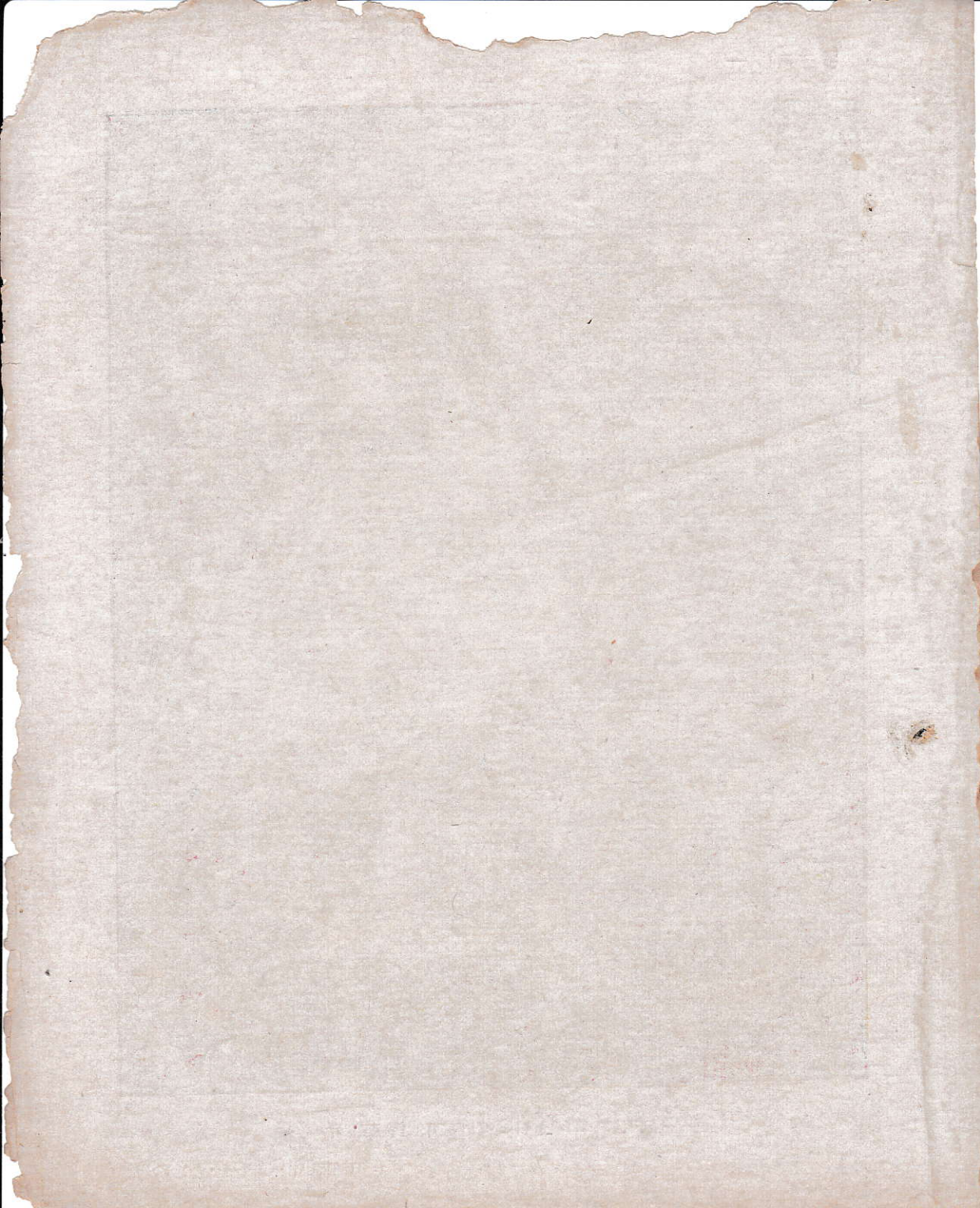
দড়ি বাঁধা। বেড়াল ক্ষীর খেতে এলেই দড়ি ধরে টান, আর ঝুড়ির তলায় বেড়াল চাপা পড়বে।

ঠিক তাই হল। তবে একসঙ্গে দুটো বেড়াল চাপা পড়ল। গোদাটা আর একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে গোদাটাকে থলিতে বন্ধ করা হল। অবশ্য ত্রিলোচন দু হাতে বক্সিং গ্লাভস পরে নিয়েছিল। পাছে আঁচড় লাগে।

আমাদের ভাগ্য ভাল। সেই সময় রাসের মেলাও আরম্ভ হয়েছিল। ঘণ্টা খানেক তাকে নাগরদোলায় ঘোরানো হল। বেড়ালের মগজের কি হল জানি না, তবে ত্রিলোচন বার তিনেক হড় হড় করে বমি করল।

তারপর ট্যাক্সি ডেকে দুভাই দুপাশে, মাঝখানে থলে, আমাদের যাত্রা শুরু হল।

ঠিক করে নিয়েছিলাম যে বেড়ালটাকে ময়দানে ছেড়ে দেব, যাতে আর লোকালয়ে প্রবেশ করতে না পারে। তাই প্রথমে গেলাম টালা, সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর, ট্যাক্সি ঘুরিয়ে বেহালা হয়ে চলে এলাম শিবানীপুর, আমতা, ফলতার গঙ্গার ধার, তারপর আবার টালিগঞ্জ, সেখান থেকে গড়ের মাঠ।

মাঝপথে ত্রিলোচনের কি মনে হল, সে বলল, দাদা, এক কাজ করলে হয়।

কি ?

হাজার হোক, কৃষ্ণের জীব, এভাবে মাঠে ময়দানে ছেড়ে দিলে কিছু হয়ে গেলে আমাদের পাপ স্পর্শ করবে।

কিন্তু লোকের বাড়ির দরজায় ছাড়াটা কি সমীচীন হবে ?

না, না, তা বলছি না। ময়দানেই ছাড়ব, তবে কোন হোটেলের উলটোদিকে। যাতে পরে হেঁটে হেঁটে হোটেলে গিয়ে উঠতে পারে। তা হলে আর অনাহারে মরবে না।

বেশ, তোমার যা ইচ্ছা।

তাই ঠিক হল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের উলটোদিকে ময়দানের পাশে ট্যাক্সি থামল।

আসল ব্যাপারটা ড্রাইভারের জানা ছিল না। উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

সব শুনে চেঁচিয়ে উঠল, এর জন্যে এত ঝামেলা। সোজা গঙ্গামায়ীর কোলে বিসর্জন দিয়ে দিন। আপনারাও বাঁচবেন, বেড়ালের আত্মারও সদ্গতি হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন কানে আঙুল দিল, ছি, ছি, সর্দারজী, ওতে পাপ হবে। ময়দানে ছেড়ে

দেওয়াই ভাল। ফাঁকা হাওয়া খাবে, বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখবে, ক্রিকেটে শখ থাকে, তাও দেখতে পারে।

ড্রাইভার কোন কথা বলল না। নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আমি বস্তাটা ধরে নামালাম। ত্রিলোচন পিছনে।

এক জায়গায় গাছের নীচে এক সন্ন্যাসী বসেছিলেন। নিমীলিতনেত্র। বিচিত্র রঙের আলখাল্লা। পাশে একটা গোপীযন্ত্র।

ভাবলাম এই সন্ন্যাসীর কাছাকাছি বেড়ালটাকে ছেড়ে দিই। পরের জিনিস খেয়ে, পরের জামাকাপড় নষ্ট করে জীবনে অনেক পাপ করেছে, তবু সাধুর সান্নিধ্যে, তাঁর অমিয়বচনের কিছুটা কানে গেলেও উদ্ধার হয়ে যাবে।

সবে থলির মুখ খুলতে গিয়েছি, পিছনে বজ্রকণ্ঠ। হিন্দীতে।

কি ওতে ?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম সন্ন্যাসী কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছেন।

ত্রিলোচন বলল, প্রভু মার্জার।

কেয়া ? এবার বজ্রকণ্ঠ আরও জোর।

আমি বললাম, আজ্ঞে বিল্লী।

আমার কথার সমর্থন করেই থলির মধ্য থেকে শব্দ হল, ম্যাঁও।

সন্ন্যাসী ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

বিপদ। আমি আর ত্রিলোচন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। বেড়ালের অত্যাচারের কাহিনী। আমাদের দুরবস্থা।

গোপীযন্ত্র দেখেছিলাম, ত্রিশূলটা লক্ষ্য করিনি।

সেই ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসী তেড়ে উঠলেন।

ভাগো হিঁয়াসে। এখানে বিল্লী ছাড়তে এসেছ ? আফিংয়ের জন্য একটু দুধ নিই, ঈশ্বরের উপাসনা করব না দুধ সামলাব ? যাও, যাও, অন্য কোথাও যাও।

সন্ন্যাসীর চেহারা দেখে থলি বগলে করে দুজনে ছুটে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সি আরো খানিকটা এগিয়ে গেল।

ত্রিলোচন বলল, বেড়ালটারই বরাত দাদা। কোথায় গ্র্যাণ্ড হোটেলের আওতায় থাকত, ভালমন্দ খেত, তা আর হল না। আমরা আর কি করব !

একটা বিরাট নালা, তার পাশে ঢালু জমি। কি একটা ক্লাবের তাঁবু। থলির ভেতর

বেড়ালটা তর্জনগর্জন করছে, তাই আর সাহস করে তাকে আমাদের পাশে রাখিনি, লাগেজ কেরিয়ারে পুরেছিলাম।

ট্যাক্সি থামিয়ে থলেটা বের করলাম। তারপর দুজনে এগিয়ে গেলাম নালার পাশে।

ও, আপনারাই রোজ এ কাজ করেন ?

চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম ঢালু জমিতে একটা দারোয়ান শুয়েছিল। সে আস্তে আস্তে উঠে বসল।

আমরা ? রোজ ?

হ্যাঁ, আজ ধরে ফেলেছি বলে বোকা সাজছেন। রোজ রোজ এখানে আবর্জনা ফেলে যান। গন্ধে ক্লাবের বাবুরা টিকতে পারে না।

আবর্জনা কেন হবে, ত্রিলোচন চেঁচিয়ে বলল, বেড়াল, বেড়াল ছাড়ছি আমরা।

বেড়াল ছাড়ছেন ? লোকটা দুটো চোখ প্রায় কপালে তুলল, তার মানে ক্লাবে বেড়াল ছাড়ছেন কি ? বছরে চাঁদা কত জানেন ? একশ কুড়ি টাকা। ঢোকবার ফি পঞ্চাশ।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বেড়ালটা ক্লাবের সদস্য হতে চায় না দারোয়ানজী। শুধু এইখানে থাকবে, ঘোরাঘুরি করবে।

বা, বেশ চমৎকার কথা বলছেন তো ? ক্লাবের তাঁবুতে থাকবে, লনে বেড়াবে, দরকার হলে মেম্বারদের চেয়ারে বসবে, সব বিনা চাঁদায়। ফিস্টের সময়ও এসে ভাগ বসাবে, একেবারে বিনামূল্যে।

ত্রিলোচন ক্ষেপে গেল। বস্তা কাঁধে ফেলে বলল।

এত কথার দরকার কি দাদা। ময়দানে কি জায়গার অভাব। অঢেল মাঠ পড়ে রয়েছে। কোন ক্লাবের কাছে আমাদের যাবার দরকার কি। চল, অন্য কোথাও ছেড়ে দিই।

বেড়াল নিয়ে আবার ফিরে এলাম। আমরা সীটে, বেড়াল লাগেজ কেরিয়ারে। ট্যাক্সি এগিয়ে চলল।

এবার এমন জায়গায় থামলাম যেখানে কাছাকাছি কোন তাঁবু নেই। কেবল ঘাসে ঢাকা মাঠ।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, বেড়াল ছাড়ার আদর্শ জায়গা। কেউ কোন আপত্তি করবে না।

এবার নির্বিবাদে থলির মুখ খুলে বেড়ালটা ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম মুক্ত হয়ে বেড়ালটা ছুটে পালিয়ে যাবে, কিন্তু তা করল না। গুঁড়ি মেরে চুপ করে বসে রইল।

বা, এ তো বেশ ভালজাতের মশাই। চমৎকার গড়ন।

এবার নির্বিবাদে থলির মুখ খুলে বেড়ালটা ছেড়ে দিলাম। [পৃঃ ৩৫

এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক পদচারণা করছিলেন, ব্যাপার দেখে তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বেড়ালটার গড়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু এই দিব্য গড়নের মূলে আমাদের সর্বনাশের মাত্রা কতখানি সেটা আর ভদ্রলোককে বোঝাবার চেষ্টা করলাম না।

তিনি নীচু হয়ে বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলেন, আর অবাক্ কাণ্ড, বেড়ালটা মড়ার মতন চোখ বুজে পড়ে রইল। হাত দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি দিলেন। বেড়ালটা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে সেবা উপভোগ করতে লাগল।

এমন বড়িয়া চিজ বিশেষ দেখা যায় না। পারসিয়ার বিল্লীই হবে বোধ হয়। একে কি ময়দানের হাওয়া খাওয়াতে এনেছেন ?

সত্যি কথাটাই বললাম।

আপদ বিদেয় করতে এসেছি। ময়দানে ছেড়ে দিয়ে যাব।

ভদ্রলোক অবাক্ হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না, তারপর অতি কষ্টে একসময়ে উচ্চারণ করলেন, মানুষ বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনারা সেই মানুষ ?

কথাটা যথেষ্ট অপমানজনক। আমাদের দু'জনকে দেখে শিম্পাঞ্জী ভাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব উদাহরণ হয়তো আমরা নয়, কিন্তু দেখলে মানুষ বলে বোঝা যায়।

তাই রেগে বললাম, কি বলতে চান আপনি ? আমরা মানুষ নইতো কি ?

ভদ্রলোক দুটি চোখ নিমীলিত করে মধুর ভঙ্গীতে হাসলেন।

দুটো হাত, দুটো পা আর এদিকে ওদিকে নাক মুখ চোখ ছড়ানো থাকলেই কি আর মানুষ হয় ? মানুষের হৃদয় কোথায় আপনাদের ? দিল ?

ত্রিলোচন বুকে হাত দিয়ে বলল, কেন? এই তো ধুক ধুক করছে। আপনার হাড়-জ্বালানো কথা শুনে তার গতি বেড়ে গেছে।

মারোয়াড়ী হাত নাড়লেন, না, না, ও শব্দ তো জানোয়ারের বুকে হাত রাখলেও পাওয়া যায়। মানুষের দয়া, মায়া, মমতা এসব আছে আপনাদের? থাকলে এই অবলা জীবকে এভাবে নির্বাসন দিতে পারতেন না। মা জানকীকে নির্বাসন দিয়ে রামজীর কি হাল হয়েছিল রামায়ণে পড়েছেন নিশ্চয়।

আমরা এমন পৌরাণিক উপমায় বিস্মিত হলাম।

মা জানকী বোধ হয় উপমাটা তারিফ করল। একটা চোখ খুলে মৃদুকণ্ঠে বলল, মিঁয়াউ।

আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে?

গাড়ি মানে ট্যাক্সি।

ঠিক আছে, চলুন। ভদ্রলোক বেড়ালটিকে আদর করতে করতে আমাদের সঙ্গে চললেন। মুখে অনর্গল বাণী।

পৃথিবীর সব সুযোগ সুবিধাটুকু আপনারা নিয়ে নিচ্ছেন। জায়গা নিয়ে মোকাম বানাচ্ছেন। গাছপালা জন্তুজানোয়ার সব আপনাদের খাদ্য করে তুলেছেন। এমন কি বিল্লীর খাদ্য মছলী, তাও আপনারা ছাড়েননি। ওদের খাদ্য কেড়ে নিয়েছেন, আবার ওদের মাথার আচ্ছাদনটুকুও কেড়ে নিতে চাইছেন। ছি, ছি।

শেষদিকে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে গেল। দু'এক ফোঁটা অশ্রুও হয়তো গোঁফের ওপর ঝরে পড়ল।

এর দিকে চোখ ফেরালেও কি আপনাদের কষ্ট হয় না? দেখুন, চেয়ে দেখুন।

আমরা চেয়ে দেখলাম। বেড়ালের দিকে নয়, ভদ্রলোকের দিকে।

ততক্ষণে তিনি মোটরের পিছনের ডালাটা খুলে বেড়ালটাকে রেখে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

যান, নিয়ে যান বাড়িতে। আপনারাই তো একে দেওতা বলেন। ষষ্ঠী ঠাকরুন। দেওতাকে বাড়িছাড়া করতে আছে?

আমরা দু' ভাই ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ট্যাক্সি ছুটল। উঁকি দিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে ভজন গাইছেন। হয়তো আমাদের মঙ্গলের জন্যই।

ত্রিলোচন বলল, দাদা, এবার আর মানুষের ধারে কাছে নয়। একেবারে জনমানবহীন মাঠে ছেড়ে দেওয়া যাক। চল ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে যাই।

● হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সেখানে কেউ থাকবে না? সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

আজ বুধবার, রেস তো সেই শনিবার। আজ আর কে থাকবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে এখন কি আর ঘোড়াদের ট্রেনিং-এর জন্য নিয়ে আসবে?

ট্যাক্সি ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে থামল। জনহীন মাঠ। কেউ কোথাও নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারও সাফ কথা বলে দিয়েছে।

এই শেষ। আর সে ঘুরতে পারবে না। বিল্লীকে এখানেই ছাড়তে হবে নয়তো বাবুরা সঙ্গে করে নিয়ে যাক।

থলিটা হাতে নিয়ে মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম।

ছাড়তে যাব এমন সময় ত্রিলোচন বাধা দিল—এক মিনিট দাদা।

আবার কি হল?

ছটা ছাব্বিশ পর্যন্ত সময়টা খারাপ। যাত্রা নাস্তি। বেড়ালের এক রকম যাত্রাই তো। নতুন ধরনের জীবনযাত্রাও বলা যেতে পারে।

ঠিক আছে। ছটা সাতাশ হতেই থলির মুখ খুলে দিলাম।

ভেবেছিলাম অচেনা জায়গায় বেড়ালটা থলি থেকে বের হতে চাইবে না, কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড, থলির মুখটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে বেরিয়ে পড়ল। এত দ্রুত যে একটা হলদে চলন্ত আভা ছাড়া আর কিছু আমাদের চোখে পড়ল না।

ত্রিলোচন বলল, মাঠের গুণ দেখুন দাদা। বেড়াল ঘোড়া হয়ে গেল। এভাবে রেসের দিন ছুটতে পারলে ট্রেনাররা ওকে লুফে নেবে। ওর বরাত খুলে যাবে।

আমি বললাম, আমরা একটা কাজ করি ত্রিলোচন, সোজা ট্যাক্সিতে না গিয়ে এখানে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাই। তাহলে বেড়ালটা আর আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না।

তুমি পাগল হয়েছ দাদা! ও এখন মুক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছে আর কি সংসারে ফিরবে।

তবু আমরা দু'জনে ঘুরতে শুরু করলাম। ঘোড়াগুলো যে পথে পাক দেয়, সেই পথে। দু'জনে যখন বেশ ঘর্মাক্ত, তখন ট্যাক্সিতে এসে উঠলাম।

পিছনের ডালাটা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ করে ত্রিলোচন আমার পাশে এসে বসল।

এতক্ষণ পরে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বেলা সাড়ে এগারোটায় ট্যাক্সি চেপেছি, এখন সাতটা বাজে। তা হোক, পালের গোদাটাকে সরিয়ে দিতে পেরেছি, এ আনন্দ আমাদের রাখবার ঠাঁই নেই।

ট্যাক্সি ছাড়তে ত্রিলোচন গান শুরু করল।

নাই, নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।

আমি বললাম, কিসের দ্বার ত্রিলোচন ?

ত্রিলোচন গান থামিয়ে বলল, বেড়াল তাড়াবার দ্বার দাদা। এইবার দেখুন না বাকী কটার কি হাল হয়। যুদ্ধে জেনারেল পালালে সৈন্যদের যেমন ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয়, ঠিক তেমনই।

বাড়ি পৌঁছলাম পৌনে নটায়।

বাড়ির সামনে থামতেই এক কাণ্ড। বাকী বেড়াল কটা ট্যাক্সি ঘিরে ফেলল। ম্যাঁও, ম্যাঁও শব্দে পাড়া মুখরিত।

ত্রিলোচন বলল, দেখলে দাদা, ওষুধ কাজ করতে আরম্ভ করেছে। ওদের মুখচোখের কি রকম অসহায় ভাব লক্ষ্য করেছ ?

নীচু হয়ে দেখলাম, কিছু বুঝতে পারলাম না। বেড়ালদের মুখচোখের ভাব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব নেই। শুধু দেখলাম, একগাদা চোখের তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

ড্রাইভার কিন্তু অন্য কথা বলল, না বাবু, আসল ব্যাপার কি জানেন, যে থলিতে বিল্লীটা পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা লাগেজ কেরিয়ারে রয়েছে, তাতে এরা মছলির গন্ধ পাচ্ছে। দেখছেন না সবাই মোটরের পিছন দিকে ঘোরাফেরা করছে।

তাও সত্যি। ওটাই আমাদের বাজারের থলি। এতেই মাছ মাংস আনা হয়।

যাক, ডালাটা খুললাম থলেটা বের করার জন্য, কিন্তু থলে বের করা আর হল না। লাফিয়ে পিছিয়ে এলাম। শুধু আমি নয়, ত্রিলোচনও।

থলেটা পাতা রয়েছে। তার ওপর গোদা বেড়ালটা ঘুমাচ্ছে। তার পাশে আরো হৃষ্টপুষ্ট কুচকুচে কালো আর একটি। গোদা বোধ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে এটিকে সংগ্রহ করে এনেছে।

ডালাটা খুলতেই বিকট শব্দে ম্যাঁও করে গোদা লাফিয়ে পড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। তার পিছনে গোদাতর কালো বেড়াল। তাদের পিছন পিছন বাকী সাতটা।

ত্রিলোচনের দিকে ফিরে দেখি সে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েছে। দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করে শব্দ হচ্ছে আর বলছে, দাদা, ভূমিকম্প, মাটি দুলছে, জল দুলছে, পৃথিবী দুলছে।

———

রহস্যময় চিত্রকর

অলকা দেবী

বাদশার আমল।

দিল্লীর বাদশা। দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা—হিন্দুরা বলে। মুসলমানেরা বলে—পয়গম্বরের প্রতিনিধি।

সেই বাদশার বিশাল প্রাসাদের সামনে একদিন সন্ধ্যাবেলায় গাধার পিঠে চেপে এক মুসলমান ফকির এসে দাঁড়াল। বললো—আমি তিনদিন কিছু খাইনি। আমাকে কিছু খাবার দিতে আজ্ঞা হোক্। দেউড়ির সিপাই তাকে ভেতরের উঠোনে যেতে বললো।

প্রাসাদের ভেতরের উঠোনের একপাশে তুজন সৈনাধ্যক্ষ বসে একমনে দাবা খেলছিল। জবর মিঞা আর তার ভাই খবর মিঞা। তুজনে বৈমাত্র ভাই। তুজনেরই ভীষণ দাবা খেলার নেশা। ফাঁক পেলেই যেখানে সেখানে বসে যায় দাবা নিয়ে। আজও সেইভাবেই দেউড়ির পাশেই বসে পড়েছিল।

হঠাৎ তুই ভাই চেয়ে দেখলো—গাধার পিঠে চড়ে দাড়িওলা ফকিরের মত দেখতে একজন লোক দেউড়ি দিয়ে ঢুকে এগিয়ে আসছে।

—কী ব্যাপার হে? চলেই আসছো যে! জবর বললো।

—বোধ হয় নিজের বাড়ি বলে ভুল করেছে। খবর জবাব দিলো।

—আমি তিনদিন কিছু খাইনি। বললো লোকটি।

—খুব ভাল করেছ। খাওয়া একটা ভারী বাজে কাজ। না খেলে শরীর বেশ ভাল থাকে। ঝরঝরে থাকে।

খবর মিঞা কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললো—মতলবটা কী বলতো ?

—একবার বাদশার সঙ্গে দেখা করবো।

—বাঃ! ভারী ভালো ইচ্ছে। পেছনে ওটা কী ?

—এটা একটা ছবি।

—বটে ? কী রকম ছবি—দেখি।

—বাদশাকে ছাড়া আর কাউকে দেখাবো না।

খবর-জবরের রাগ খুবই হল। কিন্তু করে কী ? লোকটা বলছে বাদশাকে ছাড়া আর কাউকে দেখাবে না। জোর করে দেখলে গর্দান যাবে। জবর বললো—তাহলে অপেক্ষা করো। বাদশা এইদিক দিয়ে বাগানে যাবেন, তখন দেখা কোরো। কাছে ছুরিটুরি কিছু নেইতো ?

—আজ্ঞে না। আমি শিল্পী, আমার কাছে তুলি আর বুরুশ ছাড়া আর কিছু নেই।

খবর সাবধান করে দিলো—বাপু, দয়া করে আর একটা কথা মনে রেখো। আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি। দেউড়িতে যখন পাহারা বদল হচ্ছিল, সেই ফাঁকে তুমি ঢুকে পড়ে এখানে বসে আছ। কেমন ? মনে থাকবে তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব সোজা কথা এটি। ভুলবো কেন ? বললো শিল্পী।

—তাহলে এখানে বসে বসে পরলোকের কথা ভাবো। কারণ বাদশার সঙ্গে দেখা হবার পরেই তুমি জল্লাদের জিম্মেয় যাচ্ছো। কাল সকাল নাগাদ তোমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে।

—যে আজ্ঞে।

খবর-জবর আর কোন কথা না বলে সেখান থেকে দাবা হাতে নিয়ে কেটে পড়লো।

● অলকা দেবী

সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কুর্নিশ করছে।

শিল্পী গাধাটাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে আর একটা জায়গায় চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

হঠাৎ তূর্যধ্বনি হলো। কাড়া নাকাড়া বেজে উঠলো। নকিবের হুঁশিয়ারি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে "সরো সরো" "সামাল সামাল" রব উঠলো। বাদশা আসছেন। খোজা প্রহরীরা এসে বাদশার যাবার পথে কার্পেট বিছিয়ে দিয়ে গেল।

একটু পরেই পাত্রমিত্র বয়স্য সঙ্গে নিয়ে বাদশা বেরোলেন। তারপর আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে ও মাঝে মাঝে একটু আধটু হাসি-ঠাট্টা করতে করতে সেই কার্পেট-বিছানো পথ দিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে চললেন।

হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একজন অচেনা লোক একেবারে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কুর্নিশ করছে।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে আওয়াজ উঠলো—বেত্‌মিজ···বেয়াদব···বেল্লিক···। কই হ্যায়? ইস্‌কো গর্দান লে লো। কিন্তু বাদশা চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন লোকটিকে। একটু পরে প্রশ্ন করলেন—কে তুমি?

—আমি আপনার দাসানুদাস খোদাবন্দ্ !

—বুঝলাম। কিন্তু ঢুকলে কী করে ?

—দেউড়িতে পাহারা বদলের ফাঁকে—

—কী চাও ?

—একটু কথা বলতে।

—বলো।

—আমি একজন শিল্পী। ছবি আঁকি।

—বটে ?

—আমি দুখানা ছবি এঁকেছি। আপনাকে সে দুটো উপহার দেবো বলে নিয়ে এসেছি।

—দেখাও !

বাদশার সঙ্গে যারা ছিল তারা সবাই অবাক্ হল—এই অপরিচিতের সঙ্গে বাদশার ব্যবহার দেখে। বাগানে যাবার পথের ওপর দাঁড়িয়ে এই ভাবে সময় নষ্ট করা ! বাদশার নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে।

শিল্পী তার প্রথম ছবি মেলে ধরলো। বাদশার প্রাসাদ। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চারজন লোককে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দূরে প্রাসাদের একটি ঝরোকায় দাঁড়িয়ে বাদশা আকাশে ইন্দ্রধনু উঠেছে তাই দেখছেন। তাঁর হাতে সুরাপাত্র। আসামীদের মুখের ভাবে মৃত্যুর আতঙ্ক। প্রত্যেকের হাত মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা। ছবির তলায় লেখা—"দোজখ"।

বাদশা অনেকক্ষণ ধরে ছবিটি দেখলেন। বললেন—ঝরোকায় কোন্ বাদশা ?

—যে কোন বাদশা।

—হুঁ। তোমার আঁকার ক্ষমতা আছে এটা অস্বীকার করবো না। এই আসামীদের অপরাধ কী ?

—বাঁচতে চাওয়ার অপরাধ।

—আচ্ছা। আর একটা ছবি কী ?

শিল্পী কোন কথা না বলে দ্বিতীয় ছবিখানি মেলে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে

বাদশা 'শোভানাল্লা' বলে দু পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর বিস্মিত চোখে ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন।

ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে—মরুভূমির ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। অর্ধচন্দ্র। বাঁকা আধখানা চাঁদ আকাশে লেগে আছে। আর তার ঠিক নীচেই মক্কার কাবা। ছবির নীচে লেখা—"বেহেশ্‌ত"।

বাগানে যাওয়া হল না বাদশার। তিনি প্রাসাদের দিকে ফিরে চললেন। শিল্পীকে বললেন—এস আমার সঙ্গে।

শিল্পী বললো—খোদাবন্দ্‌! যাবার আগে আমার কিছু নিবেদন ছিলো।

—বলো!

—আমার সঙ্গে একটা গাধা আছে। তার একটা ব্যবস্থা করে দিতে আজ্ঞা হোক্‌।

বাদশা হাসলেন। বললেন—তুমি গাধার পিঠে চড়ে বেড়াও?

—গাধার পিঠে না চাপলে বুদ্ধিমান মানুষ চলবে কী করে জনাব!

বাদশা একবার তাঁর পাত্রমিত্রের দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—সে কথা ঠিক। গাধাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের বাহন। এই বলে তিনি আদেশ দিলেন—গাধাকে বাদশার আস্তাবলে জায়গা করে দিতে এবং তার সবরকম সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করতে। তার সঙ্গে ব্যবহারও যেন বাদশার গাধা হিসাবে করা হয়।

সন্ধ্যার পর শিল্পীর সঙ্গে খেতে বসলেন বাদশা। কালিয়া-কোর্মা-কোপ্তা-কাবাবের প্রাচুর্যে শিল্পীর মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

বাদশা বললেন আমার খুব ইচ্ছে—তুমি আমার একখানা ছবি আঁকো।

—যে আজ্ঞে।

—না। যে আজ্ঞে নয়। আগে আমার সব কথা শোন। তারপর যে আজ্ঞে বোলো। ছবিটা আঁকা হবে আমার বসবার ঘরের দেয়ালে। সেই ছবির মধ্যে আমার মন্ত্রী, আমার প্রধান সেনাপতি, আমার খাজাঞ্চি, আমার একজন

সেনাধ্যক্ষ, একজন পাচক ও একজন পরিচারিকা থাকবে। এদের সবার মাঝখানে আমি সিংহাসনে বসে থাকবো, এবং বলা বাহুল্য যে সেই ঘরে ঢুকে অতগুলো লোকের মাঝখানে আমার ছবিটাই সকলের আগে চোখে পড়বে।

—বহুৎ খুব খোদাবন্দ্।

—খাওয়ার শেষে আমি তোমাকে সেই ঘরে নিয়ে যাব। তারপর যার যার ছবি আঁকা হবে—সকলকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু তুমি একবারের বেশী তাদের দেখতে পাবে না।

—তাই হবে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে বাদশা শিল্পীকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল—ঘরের একদিকের দেওয়াল একবারে ফাঁকা। সাদা রং করা।

এইবার বাদশা হুকুম দিলেন—একজন একজন করে সবাই এসে শিল্পীর সঙ্গে দেখা করে যেতে। বাদশার কাছ থেকে একটু দূরে ঘরের অপর প্রান্তে এই দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছিল।

প্রথমে এলেন মন্ত্রী। বয়স হয়েছে। পিঠে একটা প্রকাণ্ড কুঁজ। শুনলেন ছবির কথা। হেসে বাদশাকে কুর্নিশ করে নীচু গলায় শিল্পীকে বললেন—ছবিতে আমার চেহারাটা যেন সুন্দর দেখায়। আর পিঠের কুঁজটা বেমালুম উড়িয়ে দিও। নইলে তোমার মাথা নেবার হুকুম দেবো আমি।

—যে আজ্ঞে। বললো শিল্পী।

এরপর এলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁর নীচের ঠোঁটটা মাঝখান থেকে কাটা। তাছাড়া মুখের ডানদিকে চোখের কোণ থেকে গাল অবধি প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।

চাপা গলায় সেনাপতি বললেন—ছবিতে যেন এসব কাটা দাগটাগ না থাকে। খুব সাবধান! একটা কাটা দাগও যদি দেখতে পাই আর আমার চেহারা যদি খুবসুরত না দেখায়—তবে আমার হাতের তলোয়ারখানার কথা একটু মাথায় রেখো।

শিল্পী বললো—যে আজ্ঞে।

● অলকা দেবী

এলেন খাজাঞ্চি। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে চলেন। মুখে খামচা খামচা দাড়ি। সব শুনে গলা নামিয়ে বললেন—ছবি হচ্ছে হোক। কিন্তু ছবিতে আমার যৌবন কালের চেহারা করে দিও। যদি আমাকে কুঁজো করো, তাহলে আমিও তোমাকে কুঁজো করবো। টাকাপয়সা সব আমার হাতে—খেয়াল রেখো।

—যে আজ্ঞে। শিল্পী বললো।

এরপর এলো সেনাধ্যক্ষ। সেই আগের দেখা জবর মিঞা। সে বলে গেল—চেহারাটা ভাল করে ছাখো। শিল্পী এবার দেখলো—জবর মিঞার একটা চোখ কানা। মিঞা বললে—ছবিতে কানা-ফানা কোরো না। করলে যে দেউড়ি দিয়ে ঢুকেছ,—সেখান দিয়ে আর ফিরে যাবে না—এইটে জেনে রাখো।

—যে আজ্ঞে।

এবার এলো বাদশার খাস পাচক। মুখে দাড়ি কিন্তু মাথা ভরতি টাক। সে বলে গেল—খুব ভাল চুল ছিল আমার। ছবির মাথায় খুব সুন্দর চুল দিও। বুঝলে? নইলে কোর্মার মাংসের সঙ্গে তোমার মাংস মিশিয়ে দেব। বাদশা খুব আনন্দ করে খাবেন।

—যো হুকুম। শিল্পী বললো।

এলো পরিচারিকা। ভারী সুন্দরী দেখতে। বয়সও অল্প। কিন্তু সে যেই হেসেছে, অমনি শিল্পী দেখলো তার ওপর পাটিতে তিনটে দাঁত নেই। বললো চুপি চুপি—ছবিতে আমার হাসিমুখ দেখিয়ো না। খবরদার। যদি করো, তাহলে আমার ভালবাসার লোক জবর মিঞা—তোমাকে তিনটুকরো করবে কেটে।

—তাই হবে। বললো শিল্পী।

সবাই চলে গেলে বাদশা শিল্পীকে ডেকে বললেন—শোন, এবার একটা কথা বলি তোমাকে। যাকে যা দেখলে যে ভাবে দেখলে—যেমন দেখলে,—ছবি অবিকল সেই রকম হওয়া চাই। আর সকলের হাসিমুখ হওয়া চাই। কোন চেহারার যদি একটু এদিক ওদিক হয়, তাহলে তোমাকে জ্যান্ত গোর দেওয়ার হুকুম দেব আমি।

—যে আজ্ঞে।

খবরদার। যদি করো, তাহলে আমার ভালবাসার লোক··· [পৃঃ ৪৬

—কত লাগবে ছবির পারিশ্রমিক ?

—এক হাজার মোহর।

—তাই দেব। কিন্তু ছবি সম্বন্ধে যা বললাম—মনে থাকে যেন !

শিল্পী বললো—হুজুর ! আমাকে দুজন সহকারী দিন। যারা রঙটা তৈরি করবে। আর এই দেওয়াল বরাবর একটা পর্দা টাঙিয়ে দেওয়ালটাকে ঢেকে দিন। প্রত্যেককে অনুরোধ জানাচ্ছি—আমার বলার আগে কেউ যেন পর্দা সরিয়ে উঁকি না মারেন। এবং খোদাবন্দ্ ! আপনিও না।

● অলকা দেবী

তাই হল। বাদশা সেই মতো হুকুম দিয়ে দিলেন।

পনেরো দিন পরে বাদশা শিল্পীকে প্রশ্ন করলেন—কিহে? এগোচ্ছে কী রকম?

—আজ্ঞে এখনো আঁকা শুরু করিনি। ছকটা ভাবছি।

—ঠিক আছে।

এই ভাবে একমাস, দুমাস, তিনমাস গেল। বাদশা ক্রমশঃ চটছেন শিল্পীর ওপর। চারমাস কেটে যাবার পর বাদশা ক্ষেপে গিয়ে শিল্পীকে বললেন—আমি কাল তোমার ছবি দেখবো।

—ঠিক আছে মালিক। আমি তৈরী। তবে আমার অনুরোধ সবাই এক সঙ্গে দেখবেন ছবিটা।

—তাই হবে।

পরদিন ভোরে বাদশা সবাইকে ডাকলেন, এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে ছবি দেখবার জন্য বসবার ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন।

শিল্পী অপেক্ষা করছিল। আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বললো—সম্রাট্! ছবি দেখবার আগে আমার কিছু বলার আছে।

—বলো!

—আমার এই ছবিতে রঙের রহস্য আছে। যাঁর উচ্চবংশে জন্ম এবং জন্মের মধ্যে কোন গোলমাল বা নীচ বংশে যাঁর জন্ম নয়—তাঁরা এই ছবি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবেন। কিন্তু জন্মে গোলমাল আছে বা নীচ বংশে জন্ম এমন কেউ যদি এখানে থাকেন—তবে তিনি ছবির বদলে শুধু সাদা দেওয়াল দেখবেন। কারণ এ ছবি আমার মন্ত্রপূত।

এই বলে শিল্পী দেওয়ালের ওপর থেকে পর্দা টেনে সরিয়ে দিলেন।

বাদশা কিছুক্ষণ সাদা দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে সেনাপতিকে ডেকে বললেন—ছবি কী রকম দেখছো?

—চমৎকার! বহুকাল এত ভাল ছবি দেখিনি। আপনার ছবি সব চাইতে ভাল হয়েছে। তবে আমার ছবিটাও খুব জীবন্ত। বাঃ!

বাদসা কিছুক্ষণ সাদা দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে

(রহস্যময় চিত্রকর···পৃঃ ৪৮)

—মন্ত্রী !

—আমার মুখ দিয়ে প্রশংসার ভাষা বেরোচ্ছে না খোদাবন্দ্ ! সত্যিই লোকটা গুণী !

—খাজাঞ্চি !

—জনাব ! আমার বলার কিছু নেই। আহা—হা ! কী ছবিই এঁকেছে। আমি তো নিজেকেই চিনতে পারছিলাম না।

—হুঁ ! জবর ! তুমি কেমন দেখছো ?

—খুব ভাল—খু-উব ভাল দুনিয়ার মালিক। এছবি আঁকা যার তার কম্মো নয়।

—পাচক ইসমাইল !

—খোদাবন্দ্ ! নিজের ছবি দেখে আজ আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

—পরিচারিকা নাসিম বানু ! তুমি ?

—মালিক ! আমার কিছু বলার নেই।

—হুঁ ! বলে বাদশা চুপ করলেন।

এবার শিল্পী প্রশ্ন করলো—শাহানশাহ্ ! আপনি ছবি কেমন দেখছেন ?

—উঁ ? আমি ? আমি ছবি বেশ ভালই দেখছি। যেমনটি চেয়েছিলাম—ঠিক সেই রকমটিই হয়েছে। খাজাঞ্চি, ওকে এক হাজার মোহর দিয়ে দাও !

—যে আজ্ঞে !

মোহর এবং সাড়ে চার মাস ধরে খেয়ে খেয়ে বিশালকায় গাধাটাকে নিয়ে শিল্পী যখন প্রাসাদের দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল, তখনও বাদশা চুপ করে সেই দেওয়ালটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বলা বাহুল্য শিল্পী দেওয়ালের গায়ে রং আর তুলি দিয়ে কোন আঁচড়ই কাটেনি। দেওয়াল যেমন সাদা—তেমনি সাদাই রয়ে গেছে।

একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

আমি কখনও মায়ের দুধ খেতে পাইনি। আমি মায়ের চতুর্থ সন্তান। আমার বয়স যখন সাত মাস, তখন আমার আর একটি ভাই কি বোন হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মা নিরুপায় হয়ে বুকের দুধ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু, কিছু তো খেতে দিতে হবে। তাই ঠিক করলেন দুধের বদলে মুরগীর সূপ, আর গরুর দুধে আলুসেদ্ধ চটকে ঘেঁটে দিয়ে তার সূপ খেতে দেবেন।

কিছুদিন পরে আমার চামড়া ফেটে, মুখের মাঢ়ী ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। আমি কিছুই খেতে পারতাম না। ডাক্তার দেখলেন, তিনি নানারকমের ফল খেতে বললেন। মা আমাকে কোলে নিয়ে আপেল ছাড়াতেন, আর

সেই আপেলের টুকরো আমাকে খেতে দিতেন। আমি যখন মায়ের কোলে বসে থাকতাম, আপেলের ছালগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চিবোতাম। খোসা চিবোতে আমার খুব ভাল লাগত। আশ্চর্যের বিষয় আমি আপেলের খোসা চিবিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠলাম। আবিষ্কারের নেশা তখন থেকেই আমার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। আমার ধারণা হয়েছিল, ধারণা নয়, চরম বিশ্বাস হয়েছিল—সাধারণভাবে আমরা যা খাই, তা ছাড়াও আরও অনেক রকমের পুষ্টিকর খাদ্য আছে যা শরীরকে সুস্থ করে রাখে। সমস্ত রকমের খাবার মিলিয়ে শরীর নীরোগ ও নিটোল হয়ে ওঠে। যখন এর কোন একটা বাদ পড়ে যায়, তখনই পুষ্টিহীনতা-জনিত রোগ সৃষ্টি হয়।

মা আমাকে আপেলের টুকরো খেতে দিতেন।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি ডাক্তার হবো। আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার হয়ে, ঘরে ঘরে রোগী দেখে বেড়াবো। সকলে খুব খাতির করবে, শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু পড়াশুনা করতে করতে আমার ধারণা বদলে গেল। আমি রসায়নশাস্ত্রের মধ্যে রস পেতে আরম্ভ করলাম। রসায়নশাস্ত্রের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলো আমার কাছে জলের মত সোজা লাগল। মাস্টারমশায়রা দূরের কথা, আমি নিজেও

আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, এত শক্ত সমস্যা কি করে এত সহজে সমাধান করে ফেলি। আমি মাকে বলতাম,—মা, জানো, আমি শক্ত শক্ত পড়া একমুহূর্তে বলে ফেলি। কি করে বলি, তা জানি না, কিন্তু আমি যা বলি ভুল হয় না।

—তাহলে আর ডাক্তার হয়ে কাজ নেই। তুই রসায়নশাস্ত্রই পড়। মা উপদেশ দিতেন।

—আমার যে খুব ইচ্ছে ডাক্তার হবো।

—তোর ভাগ্য তোকে রসায়নশাস্ত্র পড়তে বলছে। ভগবান তোকে এতেই বড় করবেন।

আমি মায়ের আশীর্বাদ মাথায় করে, রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়া শুরু করলাম। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উইস্‌কন্‌সিন্‌ ইউনিভারসিটিতে ভরতি হলাম। রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্যেও আমার মাথায় উঁকি দিত সেই চিন্তা। শিশুদের খাবারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বস্তুর অভাব ঘটে, যার জন্যে শিশুরা সুস্থ হয় না।

আমার এই চিন্তার কথা অধ্যাপকদের বললে, তাঁরা বলতেন—তুমি তোমার নিজের কাজ কর বাপু। ওসব কথা ভাবতে গেলে, আসল কাজ পণ্ড হয়ে যাবে।

আমি বুঝতে পারতাম না, কোন্‌টে আমার আসল কাজ। আপাতদৃষ্টিতে যে সব খাদ্য আমরা খাই, তাছাড়াও আরও অজানা খাদ্য আমরা নিজের অজান্তে খাই, আর সেই সব খাদ্যের পুষ্টিতেই শরীর অটুট থাকে। কি সেই খাদ্য? খুঁজে বার করতেই হবে। সেই কাজই হবে, আমার আসল কাজ।

রসায়নশাস্ত্রে আমি ডক্টরেট পেলাম। সকলেই আমাকে অভিনন্দিত করলেন, কিন্তু আমার মন ভরল না। নিজের মনেই কেমন একটা অস্বস্তি। এ যেন ফাঁকি দিয়ে ডিগ্রী পেয়েছি। কিছুতেই মন ভাল লাগছে না।

একদিন আমার সহকর্মী বন্ধু মারগুরাইট্‌ ডেভিস এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এসে আমাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি হয়েছে?

—ভাল লাগছে না।

—সে কি! ডক্টরেট পেলে, সবাই তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আর তোমার ভাল লাগছে না। কি ব্যাপার বলো দেখি।

—আমার মন যে কাজ চাইছে, সে কাজ করতে পারছি না।

—কি কাজ?

—দেখো, আমার মনে হয়, শিশুদের শরীরে যেসব খাদ্যের দরকার, তার সবটাই আমরা দিতে পারি না। যা দিই, কি দিচ্ছি, না জেনেই দিই। আন্দাজে যখন সেই সব খাদ্যকণা শরীরের মধ্যে যায়, তখন স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। যখন সেইসব খাদ্যকণার অভাব ঘটে, তখনই নানারকমের রোগ ঘটে।

ডেভিস আমার কথাকে উড়িয়ে দিলেন না। বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর উত্তর দিলেন—ভাববার কথা। বেশ, চলো, আমরা দুজনেই এ নিয়ে রিসার্চ করি।

সেইমুহূর্তে আমি মত দিলাম।

রিসার্চ করতে গেলে আগেই মানুষের ওপর পরীক্ষা করা যায় না। কারণ আগে থেকে বলা সম্ভব নয়, কোন ওষুধে কি কাজ হবে। আমরা রিসার্চ করি, ওষুধ আবিষ্কার করি, পশুদের ওপর প্রথম পরীক্ষা করি। আগে দেখে নিই, পশুদের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না। পশুরা যদি ওষুধ খেয়ে মরে না যায়, যদি ওষুধ খেয়ে কিছু ফল পায়, তখন আমরা সেই ওষুধের গুণাগুণ লিখে ডাক্তারদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তাঁরা রোগীদের খাইয়ে দেখেন। তারপর তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল আমাদের জানান। যদি তাঁদের পরীক্ষায় ফল ভাল হয়, তখন সাধারণের জন্য ওষুধ সৃষ্টি করা হয়।

আমরা প্রথমে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা শুরু করলাম।

ইঁদুরগুলোকে প্রথমে আমরা অলিভ তেল, শাকপাতা ধরনের খাবার খেতে দিলাম; তাতে দেখলাম ওগুলো ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর ওদের মাখন খেতে দিলাম। কিছুদিন মাখন খাবার পর দেখলাম ওরা আবার তাজা হয়ে উঠছে। আমাদের ধারণা হল, মাখনের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু খাদ্যকণা আছে, যা শরীরকে পুষ্টি দেয়।

● ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

রিসার্চ শুরু হল মাখন নিয়ে। মাখন গালিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। কিন্তু অনেক রকমের ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া আর কিছুই পেলাম না।

ডেভিস বলল—দেখো, মাখনের মধ্যে হয়ত সেই খাদ্যকণা থাকে না, কিন্তু মাখন শরীরে গেলে, শরীর সেই পুষ্টিবাহী খাদ্যকণা তৈরি করে নেয়।

কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়।

আমরা যা খাই, সব আগে লিভারে যায়। লিভার শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি খাদ্য থেকে তৈরি করে নেয়। ডেভিসের কথায় আমি স্বাস্থ্যবান কয়েকটা ইঁদুর মেরে তাদের লিভার পরীক্ষা করতে লাগলাম।

ডেভিস বলল—শুধু স্বাস্থ্যবান ইঁদুর পরীক্ষা করলেই হবে না। তার সঙ্গে দুর্বল ইঁদুরও পরীক্ষা করতে হবে। দুর্বল ইঁদুরের শরীরে কি নেই, আর সবল ইঁদুরের শরীরে কি আছে, এই পার্থক্য পেলেই তবে আমরা আরও সঠিকভাবে কাজ করতে পারবো।

অকাট্য যুক্তি।

আমি দু রকমের ইঁদুর মেরে রিসার্চ আরম্ভ করলাম, নতুন ভাবে। খুঁজতে লাগলাম দিনরাত। সবল ইঁদুরের লিভার থেকে অনেক কিছু পেতে লাগলাম। অনেক নাম-না-জানা জিনিস। মনের আনন্দে রিসার্চ করে যেতে লাগলাম।

এমন সময় আমার মা মারা গেলেন।

শরীরটা কেমন অবশ হয়ে গেল। মন ঝাপসা হয়ে গেল। এক মুহূর্তে মনে হল আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার। যাঁকে খুশী করবার জন্যে আমার এই অভিযান, তিনিই বিদায় নিলেন। কি হবে আর কাজ করে? কার জন্যে করবো?

কাজকর্ম বন্ধ করে ঘরে বসে রইলাম।

দিন পনেরো পরে ডেভিস এসে বলল—চলো, কাজ করবে।

—না।

—কারুর মা বাবা চিরকাল বেঁচে থাকে না। সান্ত্বনা দিয়ে ডেভিস বলল—তাছাড়া তুমি যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারো, তোমার মা তোমাকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করবেন।

সান্ত্বনা দিয়ে ডেভিস বলল— [পৃঃ ৫৪

আমি চোখ মুছে জবাব দিলাম—ডেভিস, তুমি আমার মাকে দেখোনি। বুকের দুধ দিতে পারেননি বলে চিরকাল কেঁদেছেন। আমাকে বলেছেন, ওরে এমন জিনিস তুই তৈরি কর, যা মায়ের দুধের মতই উপকারী।

ডেভিস উৎসাহ পেয়ে বলল—আমিও তো তাই বলছি। তুমি যদি আবিষ্কার

● ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

করে মায়ের হাতে তুলে দিতে পারো, হাজার হাজার মা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। লক্ষ লক্ষ শিশু স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। পৃথিবীর সমস্ত মা তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, আর সেই দৃশ্য দেখে স্বর্গ থেকে তোমার মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠবেন। গর্বে বুক ফুলে উঠবে।

ডেভিসের কথায় আমার মন নরম হয়ে উঠল। চোখ মুছে, মন শক্ত করে আবার কাজে নামলাম।

ঠিক এই সময়ে ডাক্তার হণ্ট এসে বললেন—একটা রোগ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

ডাক্তার এমেট হণ্ট শিশুরোগ বিশারদ। তাঁর দরদী মন আছে, এবং প্রত্যেক রোগের কারণ বিশ্লেষণে তাঁর অসীম উৎসাহ।

—কি রোগ ?

—রোগটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না। শিশুদের হাড় শক্ত হয় না। নরম হাড় নিয়ে হামাগুড়ি দিতে পারে না, হাঁটতেও পারে না। পঙ্গু হয়ে যায়।

পঙ্গু হয়ে যায় !

চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার শিশুকাল। সমস্ত গা ফেটে রক্ত ঝরছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। মা কেঁদে আকুল। ঠিক আমারই মায়ের মত পঙ্গু শিশুকে কোলে নিয়ে তার মা-ও চোখের জল ফেলছেন। ওই চোখের জল আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে। এই আমার কর্তব্য।

—একটা কাজ করবেন ডাক্তার হণ্ট ?

—কি ?

—পঙ্গু শিশুদের মলমূত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ? পরীক্ষা করে দেখবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

আমার কথামত ডাক্তার হণ্ট পঙ্গু শিশুদের মলমূত্র পাঠিয়ে দিলেন। আমি পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। পরীক্ষা করতে করতে দেখলাম, শিশুদের মলে এবং স্বাস্থ্যবান ইঁদুরের লিভারে একই জাতীয় পদার্থ পাচ্ছি। আমার দৃঢ় ধারণা হল, এই পদার্থ শিশুদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই ওদের হাড় অত নরম।

কি সেই পদার্থ ?

দিনরাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। মাখন, চর্বি, মাছের তেল থেকেও একই রকমের পদার্থ পেলাম। সমস্ত পদার্থগুলিকেই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলাম। দীর্ঘদিন রিসার্চ করার পর পদার্থটিকে আলাদা করতে সমর্থ হলাম।

ডেভিসের মুখে হাসি ফুটল। সে বলল—কি নাম দেবে এই পদার্থের ?

আমি বললাম—এই পদার্থটি অত্যন্ত জরুরী, অর্থাৎ ভাইটাল।

ডেভিস হেসে উত্তর দিল—অ্যামাইন্ কথার মানেও কিন্তু প্রয়োজনীয়।

—বেশ। আমি রফা করে বললাম—তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। দুটো কথাকে সন্ধি করে দিই।

—তাহলে কি হবে ? ভাইটাল-অ্যামাইন্ ?

—সন্ধি করতে গেলে উভয় পক্ষের কিছু ছাড়তে হয়। আমার কথার শেষ অক্ষর, আর তোমার কথার প্রথম অক্ষর ছেড়ে দাও।

—তাহলে ভাইটা-মাইন্।

—দ্যাট্স্ রাইট। ভাইটামিন।

—ভাইটামিন অথবা ভিটামিন। ডেভিস উত্তর দিল—কিন্তু আরও ভিটামিন আছে। শুধু ভিটামিন বললে কি সবটা বোঝাবে ?

—প্রথম আবিষ্কার করেছি, তাই এর নাম 'ভিটামিন এ' থাক।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার এমার ভি. ম্যাক্‌কলাম্ প্রথম ভিটামিন এ আবিষ্কার করেন। এর দু বছর পরে আর একটি ভিটামিন আবিষ্কার করেন, তার নাম দেন ভিটামিন বি।

আমেরিকার সরকার প্রথমেই এই ভিটামিন মানুষকে খেতে দিতে ইতস্ততঃ করেন। প্রথমে পশুদের খেতে দেওয়া হয়। পশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করেই ক্রমশঃ মানুষদেরও খেতে দেন এবং পরবর্তী কালে খাদ্যের মধ্যেও মিশিয়ে দেওয়া হত।

● ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ হপ্‌কিন্সের হাইজিন্ অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ্ ইনস্টিটিউটের সভ্য হন। এই সময়ে সমস্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্‌কে খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময়ে ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্ ভিটামিন ডি তৈরি করে বলেন, ভিটামিন ডি নিশ্চিতভাবে রিকেট রোগ সারিয়ে দেয়, হাড়কে শক্ত করে তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ম্যাক্‌কলাম্ হাইজিন্ ইন্‌স্টিটিউট্ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। এমন সময় মিঃ প্রাট্ নামে এক ভদ্রলোক বহু অর্থ এনে বললেন—চলুন ডাক্তার ম্যাক্‌কলাম্, আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্‌কলাম্-প্রাট্ ইন্‌স্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত হল। হাইজিন্ ইন্‌স্টিটিউট্ ম্যাক্‌কলামের কাছে এসে বলল—আপনি একেবারে ছেড়ে দেবেন, তা হবে না। আপনাকে যেতে হবে এবং তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পথ দেখাতে হবে।

—বেশ, তাই হবে। ম্যাক্‌কলাম্ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন।

বৃদ্ধের জন্য হাইজিন্ ইন্‌স্টিটিউটের একপাশে একটি ল্যাবোরেটারী তৈরী হল। তিনি সেখানে রিসার্চ করেন, পড়াশুনা করেন। নবীন বৈজ্ঞানিকদের কোন অসুবিধে হলে, তিনি সমাধান করে দেন।

কেউ কোন কারণে বৃদ্ধকে অভিনন্দিত করতে এলে, তিনি ছলছল নয়নে, মৃদু হেসে বলেন—আমাকে নয়, আপনি আমার মাকে অভিনন্দন দিন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন,—আপনি কি ধরনের রিসার্চ ভালবাসেন ?

ম্যাক্‌কলাম্ বলেন—যে রিসার্চের মধ্যে মানুষের কল্যাণ আছে, তা যে রকমেরই হোক না কেন আমি শ্রদ্ধা করি। আমি প্রাণপণে সাহায্য করি, যাতে সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেন, যাতে মানুষের মুখে হাসি ফোটে।

ঘুমড়োলোচনের আবির্ভাব
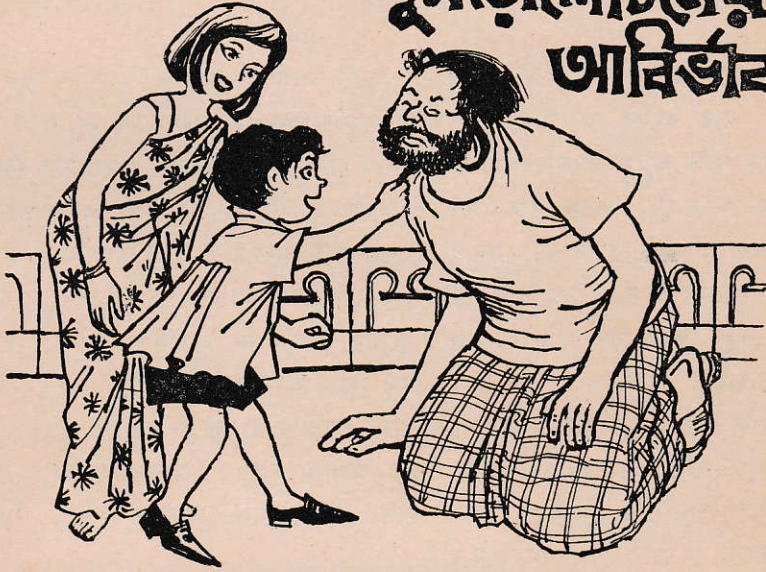
শিবরাম চক্রবর্তী

দৈত্যদানোদের যে একালেও দেখা যায় তা হয়তো তোমরা জানো না। এযুগের ছেলেমেয়েরা তা মানোও না বোধ হয়? সেই আলাদীনের আমলের প্রায় আশ্চর্য প্রদীপের ন্যায় একজনা একবার আমার বোন জবার কাছেই এসে হাজির হয়েছিল একদিন। হঠাৎ এসে হাজির! জবার কাছেই গল্পটা শোনা আমার।

জবাকে তোমরা চিনতে পারবে আশা করি। তার মেয়ে টুম্‌পা, আমার ভাগনি, তার ভাই টিকলুকে পিঠে চড়িয়ে সচিত্র হয়ে কিছুদিন আগে এই পূজাবার্ষিকীর পৃষ্ঠাতেই 'টুম্‌পা-র গল্পে' প্রকাশিত হয়েছিল—এত তাড়াতাড়ি তোমাদের তা ভুলে যাবার কথা নয়। সেই টুম্‌পা-র জননী জবা। (নিখরচায় জলযোগ বইয়ে এই জবার কাহিনী তোমরা পড়ে থাকবে হয়ত বা।)

সত্যি, আমার বোনরা সব অদ্ভুত! ভূতপ্রেত দৈত্যদানোরা কোথায় নাকি মানুষদের এসে পাকড়ায় বলে শুনে থাকি, উলটে বলব কি, তারাই কেউ ভুল করে আমার বোনদের কারো কাছাকাছি এলে ধরা পড়ে নাজেহাল হয়ে যায় শেষটায়! যেমন, আলাদীনমার্কা এই দৈত্যটাও জবার পাল্লায় পড়ে এইসা জব্দ হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত প্রায় জবাই হবার যোগাড় আর কি!

'কী হয়েছিল শোনো দাদা' (জবা-ই গল্পটা বলছিল আমায়) সেদিন ছিল টিকলুর জন্মদিন। বছর কয়েক আগে এক পুরণো আসবাবের দোকান থেকে সখ করে সেকেলে একটা চীনে প্যান আমি কিনেছিলাম, কলাই-করা বেশ দেখতে পাত্রটা, মেজে ঘষে ঝেড়ে মুছে রাখতাম মাঝে মাঝে, কিন্তু কখনো সেটাকে কাজে লাগাইনি। ভাবলুম, আজ এই পাত্রেই টিকলুর জন্যে পায়েসটা রাঁধি না কেন? রেশনের চিনিতে চা খেতেই কুলোয় না আমাদের, কিন্তু এই পাত্রটা ত চীনি, কাজেই চিনির মাত্রা একটু কম হলেও মিষ্টি হবে হয়ত। এই না ভেবে নতুন করে ফের ওটাকে মাজতে বসেছি, একটুখানি ঘষেছি যেই না, দেখি কি, পেল্লায় চেহারার বিকটাকার এক দৈত্য এসে সটান আমার সামনে খাড়া!...'

'সত্যি বলছিস?' শুনেই না আমি চমকে গেছি—দেখলে কী হত কে জানে! চেয়ার সমেত উল্‌টে পড়ি আর কি! সামলে নিয়ে বললাম—'দূর! এখনকার কালে কি আর দৈত্যদানারা দেখা দেন নাকি? এখন ওঁদের আসতে মানা, তাছাড়া ওনারা কি টিকে আছেন এখনো যে টিকি দেখাবেন আবার।'

'এক বর্ণ মিথ্যে নয় দাদা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি......ধোঁয়াটে রঙ্‌......বিচ্ছিরি চেহারা......' বর্ণনা করে জবা: 'সত্যি বলতে, গোড়ায় আমি একটু চম্‌কে গেলেও দত্যি দেখে ভড়কাবার মেয়ে আমি নই। তাছাড়া, আলাদীনের গল্পটা তো পড়াই ছিল আমার। প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোকের পরিচয় টের পেয়ে গেছি। সহজ সুরেই বলেছি—'দ্যাখো বাপু! আচমকা এইভাবে এসে এমন করে আমায় চম্‌কে দেবার মানে? ভেবেছ কি তুমি? আরেকটু হলেই এই প্যানটা আমার হাত ফস্‌কে পড়ে গিয়ে চুরমার হয়ে যেত যে...'

সে হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসে বলল—'হুকুম করুন, কী করতে হবে এখন আমায়।'

'বলি, অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?' আমি রাগ করে বললাম—'এই প্যানটা তো কিনেছি বাপু, আজ না। প্রায় বছর দশেক হবে। ঘষে ঘষে হাত ক্ষয়ে গেল আমার। কই, অ্যাদ্দিন ত দেখা দাওনি লাটসাহেব? আগে হলে কাজ দিত। অনেক কিছু করবার ছিল তখন। এখন আর কী করবে!'

'আগে আপনি ওটা তোয়ালে দিয়ে ঘষতেন কিনা! আসি আসি করেও আসতে পারিনি তাই। আজ আপনি হাত দিয়ে ঘষেছেন তো এনামেলের গায়। আপনার নখের আঁচড় লেগে দাগ পড়ল কিনা, টনক নড়লো আমার, তাই আমার মুল্লুক ছেড়ে চলে আসতে হল আমায়। এখন হুকুম করুন কী করব আমি? কিছুই কি করবার নেই আর?'

তার কথায় তখন আমি ভাবতে বসলাম, কী করতে বলা যায় লোকটাকে।···

'সে কিরে! এত ভাববার কী ছিল তোর?' জবার ভাবনার আমি জবাব দিই: 'দৈত্যদানাদের দিয়ে যতো সোনা দানা আনিয়ে নিতে হয় তাও জানিসনে! চুণি পান্না হীরে জহরৎ মণি মুক্তো এই সব আনাবি তো···তা না···'

'আহা! সে সব দিন আর আছে নাকি? সে সুখের দিন আর নেই দাদা! গোল্ড্ কণ্ট্রোল হয়ে যায়নি এখন? চোর ডাকাতের ভয় নেইকো? একালে···এই কলকাতাতেও এখন? আমাদের এই যাদবপুরেও চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি, বোমবাজি দিনরাত লেগেই রয়েছে। তাছাড়া তোমার ওই ইনকমট্যাক্সো-ওয়ালারা ধরবে না? কর্তা আবার সরকারী চাকরি করেন···পুলিস এসে পাকড়াবে না তাঁকে? কৈফিয়ৎ চাইবে না, এত সোনা দানা হোলো কোথ থেকে তোমার শুনি? ঘুষ খাচ্ছো নিশ্চয়! ব্যস্, তার চাকরি খতম্! নইলে গাভরা গয়না পরার সখ ছিল না কি আমার? দু'এক সেট জড়োয়া অলঙ্কারই কি ঐ দানাটাকে দিয়েই না আনাতাম?' জবা দীর্ঘনিশ্বাস ফ্যালে।

'তোর ঐ আঁচড়ে—মানে, তোর ঐ আঁচড়ণের জন্যে সে খুব বিরক্তি প্রকাশ করল বোধ হয়?' জিগ্যেস করি আমি।

'মোটেই না। বলল যে, তুমি কবে আঁচড়াও সেই অপেক্ষাতেই বসেছিলাম আমি অ্যাদ্দিন। এখন বল কী করতে হবে?'

'কী করবে! তুমি ত রাঁধতে জানো না যে রেঁধে বেড়ে সাহায্য করবে আমায়। আজ আমার ছেলের জন্মদিন ছিল। ভেবেছিলাম ভালোমন্দ এক আধটু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করব···।'

'তা, রাঁধবার কী দরকার?' বলল সে: 'কোথাকার খানা চাই তোমার বলোনা তাই। কাবুল, কান্দাহার, ইস্তাম্বুল, ইরাণ, তুরাণ, তুর্ক, মোগলাই, পাটনাই, চাইনীজ, প্যারী, মাদ্রাজী, ঢাকাই, লণ্ডন, সুজারল্যাণ্ড, রোম থেকে রম্না—কোথাকার খাবার চাই তোমার হুকুম করো—হাজারো রকমের ডিশ এনে হাজির করছি এই দণ্ডে।'

'আহা, এতই যদি আনিয়েছিলিস তো আমায় খবর দিসনি কেন রে?' সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে আমি সুরু করি।

'কে আনাচ্ছে দাদা? খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইন নেই নাকি? অতো সব খাবার দেখলে পাড়ার লোকদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত না? অতিথিদের তিন পদের বেশী খাদ্য দিতে গেলেই ত বিপদ! পুলিস এসে পাকড়াতো না আমাদের? পাগল হয়েছো নাকি তুমি!'

'যা বলেছিস! পুলিসের পরোয়ানার পরোয়া না করেটা কে!' আবার আমার সায় তার কথায়।

'তাহলে আমায় কী করতে হবে বলুন।' জানতে চাইল দৈত্যটা।

'তাইত ভাবচি।' ভাবিত হয়ে আমি বললাম,—'আলাদীনের কাল আর নেই ভাই! এ বাজারে হঠাৎ এখন বড়লোক হওয়া যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ টাটাবে। পুলিসে টের পেলেই জেল। হাতে দড়ি পড়ে যাবে সবাইকার। ভেবে দেখি আমি।...ভালো কথা, কী বলে ডাকবো আমি তোমায়? তোমার নামটা কি?'

'নাম ত আমার জানা নেই, তবে আমার মুলুক কোথায় বলতে পারি। জাহান্নাম।'

'না, ওরকম কট মট নামে তোমাকে আমি ডাকতে পারব না বাপু! একটা ভদ্রগোছের নাম রাখব তোমার। ধুমড়োলোচন নামটা কেমন? এটা তোমার পছন্দ?'

'ধুমড়োলোচন?' সে ভাবতে থাকে।

'নামের ভেতর এত ধুম ধাম দেখে সে ভড়কে যায় বুঝি?' আমি শুধাই।

'কে জানে!' জবা বলে: তখন আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে জানাই—'তবে হ্যাঁ, আরেকটা ভালো নামও ছিল বটে। ওর বদলে কুম্ভকর্ণও রাখা যেতে পারত। কিন্তু তাহলে আমার দাদা ভারী রাগ করবে—জানতে পারে যদি। আর জানতে ত পারবেই, তার সামনে ঐ নাম ধরে ডাকবো যখন তোমায়। না, কুম্ভকর্ণ রাখা চলবে না।'

'আমার ঘুমের ওপর নজর দিচ্ছিস? অ্যাঁ?' তক্ষুণি তক্ষুণি আমি রাগ করি।

'তাইত বললাম লোকটাকে, যে ও-নাম রাখা চলবে না। তাতে আমার দাদার ওপর কটাক্ষপাত হবে। আর, বোন হয়ে দাদার প্রতি কটাক্ষপাত করাটা কি ভালো?'

'বোধহয় ভালো নয়।' একটু দোনামোনায় বলল দানোটা। এবং তারপরই সে জানতে চাইল, তাতে খারাপটা কী হতে পারে। আর কটাক্ষপাত বস্তুটা-ই বা কী?

'এই, এখন তোমার দিকে আমি যেমন করে চেয়ে রয়েছি গো!' বলে তির্যকদৃষ্টির দ্বারা ওকে বোঝাতে চাইলাম চোখে আঙুল দিয়ে।

চেয়ে চেয়ে ও দেখল খানিক, তারপর বলল, এর ভেতর তো খারাপ কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না মোটেই।

আমি বললাম, 'এর মানে আছে। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও তাই এর মর্ম বুঝতে পারবে না। একে বলে মর্মভেদী কটাক্ষ।'

'যা বলেছিস! ওর মর্মভেদ করা কোনো দানোর কম্মো নয়।' জবাকে আমি বললাম। 'ওর মর্মভেদ করতে গিয়ে বলে আমাদেরই মর্ম ভেদ হয়ে যায়!'

'বেশ, তাহলে কুম্ভকর্ণ নয়। ঐ ধুমড়োলোচনই নাম রইল তবে তোমার। আমি ধুমড়ো বলে ডাকলেই তুমি সাড়া দেবে, কেমন? আচ্ছা, এইবার চেহারাটা তোমার পালটাতে হবে বাপু। ঐ চেহারা নিয়ে ভদ্রসমাজে বেরুনো চলবে না। তাছাড়া আমার ছেলেমেয়েরা দেখলে ভিরমি খেতে পারে। নামে ধুমড়ো হলেও, তোমার ঐ ধুমড়ো চেহারা অচল। একটা সভ্যভব্য চেহারা নিতে হবে তোমায়।'

'হুকুম করুন। কী চেহারা নেব বলুন আমায় আপনি?'

ওকে একটা চিরকুটে তোমার ঠনঠনের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বললুম, 'এই ঠিকানায় যাও, গিয়ে দেখে এসো গে আমার দাদাকে। ঐ ধারার চেহারা বানিয়ে আসবে আমার এখানে, তাহলে আর পাড়ার কেউ সন্দেহ করবে না। কোন গোল হবে না তোমাকে নিয়ে আর।'

'আমার রূপ ধারণ করতে বললি ওকে?' শুনে রাগব কি খুসি হব আমি ঠিক ঠাওর করতে পারি না।—'আমার চেহারাটা তাহলে তুই বেশ ভদ্রগোছের বলছিস?'

'তা, মন্দ কি এমন? চাকর বাকর হওয়ার পক্ষে অন্ততঃ আমি ত বেশ চলনসই চেহারা বলেই মনে করি।'

'আমার রূপ ধরে লোকটা তারপরে তোদের কাজে এসে লাগল বুঝি এখানে?' আমি জানতে চাই।

'আমায় চাকর রাখো চাকর রাখো চাকর রাখো গো!' বলে যদিও আমি গান গেয়ে সাধিনি কোনোদিন জবাকে, তাহলেও আমার ওরফে হয়ে শ্রীমান ধূম্রলোচন (কিংবা ধুমড়োলোচনের বিকল্পরূপে এই-আমি) ওদের চাকরিতে বহাল হয়ে কেমনধারা কাজ বাজালাম জানবার আমার কৌতূহল হয়।

'খানিক বাদে দেখি কি, আমাদের ঈস্ট রোড ধরে কুঁজো হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে

আসছে বেচারা। তোমারই চেহারা বানিয়ে এসেছে বটে। কিন্তু ছেঁড়া চটি পায় লুঙ্গি পরণে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এ কী চেহারা তোমার!'

ওর কথায় সেই ছড়াটা আমার মনে পড়ে···ন্যুব্জ পৃষ্ঠ কুব্জ দেহ সারি সারি উট। চালকের ইঙ্গিত মাত্রই দেয় ছুট। কিন্তু যতই বিচ্ছিরি হোক না, অমন উট্‌কো চেহারা কখনই নয় আমার।—'হতেই পারেনা কক্ষনো।' আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি।

'আমিও সেই কথাই ভেবেছি! তোমার ঐ মূর্তি তো দেখিনি কখনো আমরা।···দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তোমার কোনো অসুখ বিসুখ করল নাকি? নাকি, পড়ে গিয়ে হাত পা মচকে বসেছো। কুঁজো হয়ে অমন করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছো সেইজন্যে। আর ধুমড়ো গিয়ে তোমার সেই চেহারা দেখেই না···'

কথাটায় আমারও যেন কেমন খটকা লাগে।—'কোন মাস ছিল তখন রে? তারিখটা তুই বল ত আমায়।'

'পয়লা আষাঢ় ছিল দিনটা। আকাশ মেঘে মেঘে ভার। বেশ মনে আছে আমার। সেই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে ঐ শ্রীমূর্তি ধরে আমাদের এই ঈস্‌ট রোড দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তুমি আসছিলে।'

'হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে আমার।' আমি বলে উঠি, 'প্রথম বাদলার ঠাণ্ডায় আমার ফেরারী বাতটা ফিরে এসে চাগাড় দিয়ে উঠেছিল সেদিন ফের। রাত্তিরের লুঙ্গিটা আর ছাড়া হয়নি সকালে। তাই লুঙ্গি পরে ছেঁড়া স্লিপারটা পায় গলিয়ে কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এঘর ওঘর করছিলাম বটে। তোমার শ্রীমান তখন গিয়ে সেই কাহিল অবস্থায় দেখে থাকবে হয়ত আমায়।'

'বাত? তোমার বাত?' জবা গালে হাত দেয়—'ফক্কুরি পেয়েছো নাকি? সাত জন্মে তোমার বাত হতে দেখিনি। তোমার বাত তো আমরা জানি—কেবল তোমার ওই মুখেই। এইতো জানি আমরা। বাত ফক্কুরির আর জায়গা পাওনি নাকি? আমার কাছে চালাকি?'

'আরে, সে তো হোলো গে বাৎচিৎ—আমাদের মুল্লুকী ভাষায়; কিন্তু আমাদের সেই বিহারী বাতের কথা আমি বলছিনে। তোদের বাংলা ভাষায় যাকে বাত বলে রে···যে আগে এসে পায়ে পড়ে, তার পর হাঁটু ধরে, ক্রমে কোমর জড়ায়, তারপরে আগাপাশতলা পাকড়ে চিৎ করে ফ্যালে শেষটায়। নট নড়ন চড়ন—নট্ কিচ্ছু—সেই বাতচিতের কথাই বলছি আমি। আমাদের হিন্দীতে যাকে···'

সেই ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসী তেড়ে উঠলেন—

(মার্জার কাহিনী···পৃঃ ৩৪)

'তোমাদের হিন্দীতে যাকে মহাব্বাত বলে তাই তোমায় ধরেছিল বুঝি?' বাধা দিয়ে জানতে চায় জবা।

'মহাব্বাতের কথা রাখ্। উ বাত হামকো মৎ বাতাও। আমি বোনের মুখে মহাব্বাতের কথা শুনতে চাইনে।' ওর কথায় আমি বাধা দিই—'সে বাত তো আমার সেরে গেছে দুদিনেই। দুদিন ফক্কুরি করার পর যেমন ঝঞ্ঝাবাতের মতন সে এসেছিল তেমনি কেটে পড়েছে তারপর।'

'আমি জানব কি করে? আমি তো কোনোদিন ঐ চেহারা তোমার দেখিনি··· কুঁজোর থেকে জল গড়িয়ে খাবার সময়েই যা তোমাকে আমি কুঁজো হতে দেখেছি। সঙ্গদোষই বলা যায় হয়ত তাকে। কিন্তু তোমার সেদিনের সেই মন্থরামার্কা চেহারা আর ওই মৃদু মন্থর গতি বিলকুল আমার ধারণার বাইরে।'

'দাদার দুরবস্থা আর বোন হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে···'

'ঠিক প্রদীপের মতন না হলেও চিরকাল আমি নিবাত নিষ্কম্প।' আমি বলি—'অমন বাতাহত কদলী কাণ্ডবৎ পড়ে থাকতে হবে, অমন কাণ্ড আমি করব আমিই কি কোনোদিন তা কল্পনা করতে পেরেছিলাম? সে কথা যাক্, তার পর কী হোলো তাই বল্। আমার বিকল্পকে তোদের রাস্তা দিয়ে ঐ কুঁজো হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে কী করলি তুই তারপর?'

'আহা! তোমাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে দেখে আমি আগ বাড়িয়ে গিয়ে হাতে ধরে তোমায় নিয়ে এলাম বাড়িতে। পাছে তুমি পাড়ার কারো নজরে পড়ে যাও। দাদার এই দুরবস্থা আর বোন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখছে—এটা দেখলে লোকে বলবে কি? ভাববে-ই বা কি আমায়!'

বোনের হাতে বিকল্প আমার সমাদরটা কেমন হোলো, মনে মনে আমি কল্পনা করি।—'তা বটে তা বটে! তারপর?'
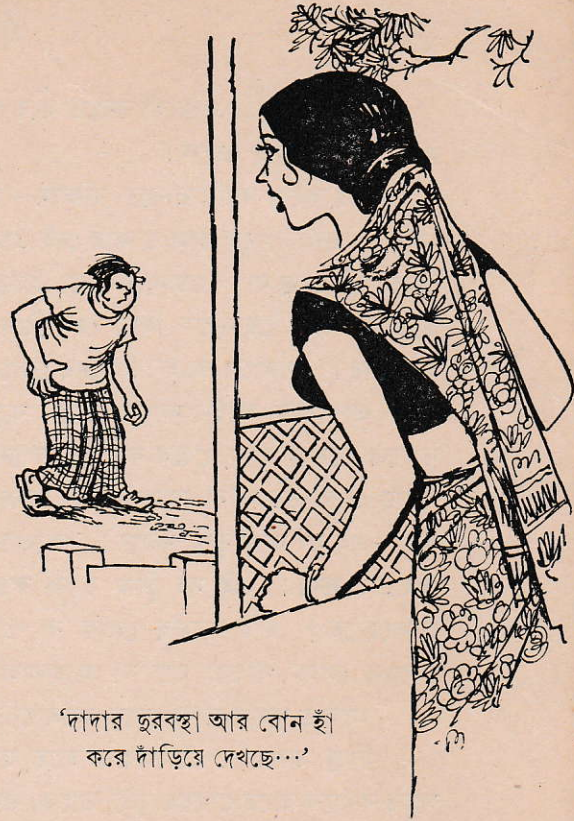
'এলাম ত! এখন কী করতে হবে আমায় বলুন তাই। বললে তখন তুমি। তুমি মানে তোমার সেই ওরফে।'

ওর কথায় আমি ভাবতে বসলাম—'তাই ত, তোমাকে দিয়ে কী করানো যায় ভেবে দেখি। আলাদীনের কাল ত আর নেই এখন। তুমি যে রাতারাতি সাত মহলা বাড়ি বানিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না। তোমাকে দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি মোহর আনাব, কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে জহরৎ, তাও হবে না। তোমাকে দিয়ে দেশ বিদেশের ভালো মন্দ খাবার আনিয়ে খাবো যে, তাও হবার নয়। সেকালে আইন টাইনের কোনো বালাই ছিল না, পুলিশ ফুলিশও ছিল না বোধ হয়। এখনকার আইন কানুন ভারী কড়া। একটুখানি ইদিক উদিক হবার যো নেই। তাহলে এসেছো যখন, থেকে যাও। কোনো না কোনো কাজে লাগবেই। বাড়ির কাজকর্ম করার লোক মেলে না আজকাল। বাসন কোসন মাজা, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, বাজার হাট করা—এই সব কাজ তুমি করবে। তোমাকে আমি লুচি ভাজতে অমলেট বানাতে শিখিয়ে দেব এক সময়। এই সব টুকি টাকি কাজ করতে পারলেও নেহাৎ কম হবে না। তাই বা করে কে? তাই করবার লোক বা পাচ্ছি কোথায়? পঞ্চাশ টাকা মাইনে হাঁকলেও কাজের লোক পাওয়া যায় না আজকাল। এই সব কাজ করবে তুমি।'

আমার কথায় মাথা নেড়ে বলল সে—যা হুকুম।

কিন্তু জবার কথায় অবাক হতে হয় আমায়—'বলিস কি রে? আলাদীনের সেই অদ্ভুত-কর্মাকে হাতে পেয়েও তুই তাকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারলিনে? ফাই-ফরমাস খাটবার ফালতু কাজে লাগালি কেবল? আশ্চর্য!'

'ভেবে দেখলে এইটেই কি কম নাকি দাদা? খুব বরাত জোর থাকলেই এমন একটা লোক পাওয়া যায় আজকাল—তা জানো? ভেবে ছ্যাখো, সব কাজ করবে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, অথচ এক পয়সা তাকে মাইনে দিতে হবে না, কোনো খোরাকীও নেই আবার! এটা কি একটা কম লাভ হল নাকি?'

'যথা লাভ!' কথাটা মানতে হয় আমাকে।

'বরাতজোর না থাকলে এমন একটা লোক, তাও মাগনা, মেলে কি এখন আজকাল? তুমিই বলো না দাদা!'

'তা, বরাত বটে তোর!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বললাম: 'পরশপাথর হাতে পেয়েও লাখ লাখ টাকার সোনা বানিয়ে নিতে পারলি না? মিনি মাইনে বিনা খোরাকীর চাকর নিয়েই খুশি হয়ে রইলি।'

'কী করব দাদা! লাখ লাখ টাকার সোনা নিয়ে কী হবে যদি তার জন্য জেলে গিয়ে সারাজীবন কাটাতে হয়? তা যাই বলো, এ বাজারে অমন একটা চাকর পাওয়াও কম ভাগ্যির কথা নয়। ঘর সংসার তো করলে না। তুমি এর মর্ম কী বুঝবে? যাই হোক, ধুমড়ো কাজ কর্ম করছিল বেশ...।'

'খুব ধুম ধাম করে?'

'না। নিঃশব্দে। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে কর্তা আপিস চলে গেলে পর সে আসত। যা কিছু করবার সব করে দিয়ে দোকান বাজার সেরে চারটে বাজার আগেই চলে যেত, কারো নজরে পড়ার কোনো জো ছিল না। সবার চোখের আড়ালে তাকে রেখেছিলাম। কাপড় কাচতে, কুটনো কুটতে, বাটনা বাটতে শিখে গেছল, অমলেট টমলেট ভাজতেও শিখিয়ে নিয়েছিলাম। এমন সময় হল কি, একদিন কে নাকি মাতব্বর মারা যাওয়ায় তাদের ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল হঠাৎ, তারা অসময়ে বাড়ি ফিরে আসতেই ধুমড়ো তাদের চোখে পড়ে গেল...টুম্পা ত তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে, ও মা! মামা যে! আর টিকলু তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে বলেছে, মামা এমন কুঁজো হয়ে গেছে কেন রে দিদি?'

'আমার ব্যারাম সেরে গেল আর তারটা সারলো না তখনো?' আমার বিস্ময় লাগে।

জবা বলল—'ও কী করে টের পাবে বলো! ও তো তার পরে তোমাকে আর দ্যাখেনি। টুম্পা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, মামা এমন খোঁড়াচ্ছে কেন মা? আমি বললাম—তোমার মামাই জানে! টিকলুও তখন ধুমড়োকে শুধায়—মামা, তুমি লুঙ্গি পরে আছ কেন গো? তোমাকে লুঙ্গি পরতে দেখিনি কখনো তো আমরা।'

ধুমড়ো ওদের দেখে অবাক হয়ে গেছল, আমাকে জিজ্ঞেস করল—'ওরা কারা?'

আমাকে তখন বলতে হল যে, তোমার মামা নয় এ, নতুন লোক, ঠিকেয় কাজ করে, তোমার মামার মতন দেখতে তাই তোমাদের ভুল হচ্ছে। এক চেহারার দুজন লোক কি দেখা যায় না? এর নাম হোলো গে ধুমড়ো, শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে ধূম্রলোচন।'

'তাহলে তো ভারী গোল বাধবে মা', বলল টুম্পা—'মামা যখন আমাদের বাড়ি আসবে, তখন দুজনের মধ্যে কে যে মামা ঠাউরে উঠতে পারব না আমরা।'

'দাঁড়া, আমি শুধরে দিচ্ছি এখুনি। তোর মামা তো গল্প লেখে, একে আমি কবি

বানিয়ে দিচ্ছি এখন। ধুমড়ো, তুমি চট করে দাড়ি বানিয়ে ফ্যালো তো ? দাঁড়িয়ে দেখছ কি, দাড়ি বানাও।'

'জানিস', জবাকে আমি বলি—'আমাদের দেহাতী ভাষায় দাড়ি বানানোর মানে দাড়ি কামানো। ওতো নাপিত নয় যে দাড়ি বানাতে পারবে। তাছাড়া, টুম্‌পা টিকলুর কি দাড়ি হয়েছে যে বানাবে, দাড়ি কামিয়ে দেবে তাদের।' ভাষা সমস্যার পরেও আরো প্রশ্ন থেকে যায় আবার—'তাছাড়া, দাড়ি হলেই কি কবি হয় নাকি রে ? কবিতা লিখতে হবে না ?'

'কবিতা কে দেখছে দাদা ? আর দেখলেই কি কবিতা বোঝা যায়, কবিতা পড়ে কি কবিতা বুঝতে পারে কেউ ? কবিতা নয়, দাড়িতেই কবির পরিচয়, হনুমানের যেমন ল্যাজে···যাকগে, বলতেই, ধুমড়ো চাপ চাপ দাড়ি বানিয়ে বসল। আমার ছেলে মেয়েরা ত অবাক। টিকলু ওর কাছে গিয়ে দাড়িটা টেনে টেনে দেখল—'না, নকল নয় ত, একেবারে আসল দাড়ি রে দিদি ! টানলে খুলছে না।' ধুমড়োও বলল—'অমন করে টেনো না দাদা ! লাগছে আমার।' কাণ্ড দেখে সবাই ওরা অবাক।

'হবার কথাই।' আমি বললাম—'কমা নয়, সেমিকোলন নয়, একেবারে দাড়ি।'

তারপর টুম্‌পা বলল, 'খেতে দাও মা, খিদে পেয়েছে ভারী।' জলখাবার তো করা হয়নি, বললাম আমি, তোরা যে এমন হুট করে আসবি আমি জানব কি করে ? তখন ধুমড়ো বলে উঠল, কী খাবে বলো না দিদি, আমি এনে দিচ্ছি এক্ষুণি। 'পারবে আনতে ?' টুম্‌পা বলে, 'বেশ, তাহলে নিয়ে এসো, কেক চকোলেট, প্যাটিজ পটাটো চীপ ; স্যান্ড্ উইচ্, কলিটির আইসক্রীম। টিকলু বলল—আমার চাই, মোগলাই পরোটা, কব্‌রেজি কাটলেট, ভীমনাগের সন্দেশ ! চক্ষের নিমেষে সব আনিয়ে দিল ধুমড়ো, হাত বাড়িয়ে আকাশ থেকে যেন পেড়ে আনল ডিশ ডিশ খাবার। খেয়ে দেয়ে তৃপ্ত হয়ে ভাইবোন বলল তখন, তুমি নিশ্চয় ম্যাজিক জানো ধুমড়ো। টাকা ওড়াতে পারো নিশ্চয় ? ধুমড়ো বলল, নিশ্চয়। দাও টাকা, উড়িয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি। টিকলু বলল—টাকা পাচ্ছি কোথায় ? আমার কি টাকা আছে ? আচ্ছা, তুমি আমার এই ফাউণ্টেন পেনটা উড়িয়ে দাও। হাতেও নিতে হল না, টিকলুর পকেট থেকেই কলমটা উধাও হয়ে গেল। বারে ! আমি এখন লিখব কী দিয়ে ? আমাকে একটা খুব ভালো আর দামী কলম এনে দাও তাহলে ! নইলে আজকে আমি আমার হোমটাস্‌ক করব কি করে ? অমনি তার জামার যথাস্থানে চমৎকার একটা কলম লটকানো দেখলাম। 'যখন ওড়াতে পারো, তখন তুমি টাকাও আনতে পারো নিশ্চয়।' বলল তাকে টিকলু—'দাও তো আমাকে গোটা পাঁচেক টাকা। সিনেমা দেখে আসি আজ

ম্যাটিনি শো-য়ে।' টুম্পাও ছাড়বার পাত্রী নয়—আমার একশ টাকা চাই কিন্তু, পছন্দসই একটা শাড়ি কিনব আমি। ফ্রক পরতে আর ভালো লাগে না আমার। তারপর একশ পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে ভাইবোনে দুটিতে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আমি তখন ধুমড়োকে বললাম—কর্তার আসার সময় হয়ে এল। তুমি তাঁর জলখাবারটা বানাও দেখি এবার? একটুখানি সুজি করো আজ, কেমন?

তারপর ধুমড়ো দোতালার রান্নাঘরে চলে যেতেই আমি আমার উল নিয়ে বুনতে বসেছি, এমন সময়ে দরজার কলিং বেল বেজে উঠল। কর্তার আগমন আন্দাজ করে আমি দরজা খুলে দিতে

হাতে হাতে একশ পাঁচ।

গেলাম। গিয়ে দেখি···যা দেখলাম তাতে তো আমার চক্ষু স্থির! আক্কেল গুড়ুম্! পুলিশের লোক দরজায়। আস্ত একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টর দাঁড়িয়ে!

'বলিস কিরে!' পুলিশের কথায় আঁতকে উঠেছি আমিও।

'তখনই বুঝলাম যে ফ্যাসাদ বাধিয়েছে ধুমড়োলোচন। একশ টাকার যে নোটখানা বানিয়ে দিয়েছে ওদের, সেটা ঠিক ঠিক আমাদের কারেন্‌সির নোট হয়নি···তাই এই পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টরের আমদানি।'

'আমি জানি দিদি।' আমি তখন বলি—'ঘরে বসে কি টাকা করা যায় না? যায়। চেষ্টা করলে আমিও হয়ত করতে পারি। কিন্তু সেই টাকা বাজারে চালাতে গেলেই মুস্কিল। কি করলো তখন ইন্‌স্‌পেক্‌টর? ধরে নিয়ে গেল তোদের সবাইকে? ধুমড়োকে শুদ্ধু?'

● শিবরাম চক্রবর্তী
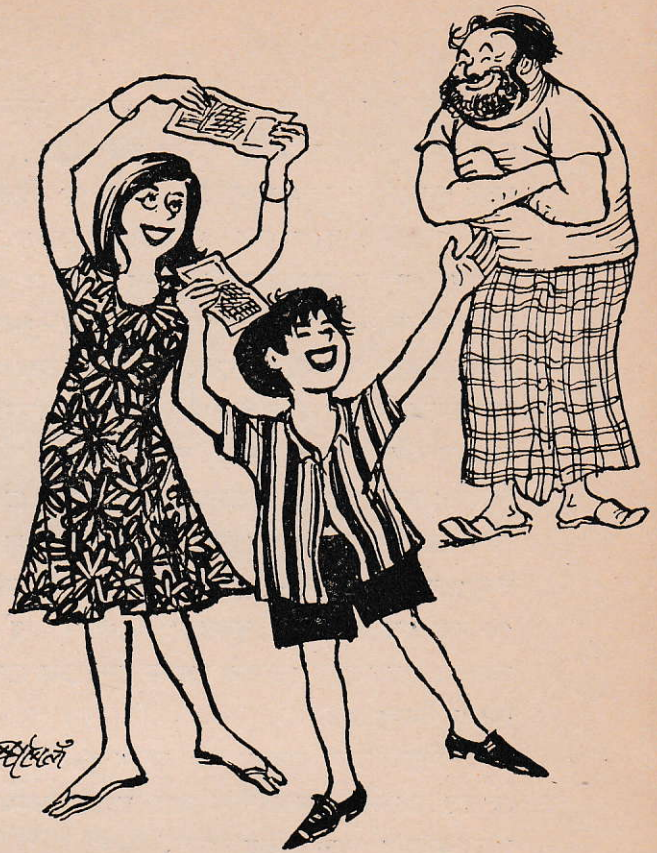
'না। সে বললে, আপনারা একজন নতুন লোক রেখেছেন আমরা খবর পেলাম। তার নাম ধাম গোত্র ঠিকানা জানতে চাই আমরা। চাকরবাকর দিয়ে বাড়ি বাড়ি চুরি চামারি হচ্ছে আজ কাল, তাই আমাদের তরফ থেকে এই সতর্কতার ব্যবস্থা। ওর টিপ সইটাও চাই, আর ফোটোও তুলে নেব একখানা। তাছাড়া, ওর রেশনকার্ডটাও পরীক্ষা করা দরকার। ডাকুন একবার লোকটাকে।' তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বললাম,—আপনি এই সোফাটায় বসুন। ডাকছি। বলে হাঁক পাড়লাম আমি—ধুমড়ো, নেমে এস। সব কাজ ফেলে সোজা—চটপট এক্ষুনি।' বলতেই সে ছাত গলে চক্ষের পলকে নেমে এল। তার ঐ আবির্ভাবে কেমন হকচকিয়ে গেলেন ইন্‌স্‌পেক্টর। চোখ মুছে নিয়ে ভদ্রলোক ধুমড়োকে শুধোলেন।—তোমার নাম কি হে? 'ধুমড়ো, ধুমড়োলোচন।' 'অদ্ভুত নাম ত! দেশ কোথায়?' 'জাহান্নাম।' 'বাব্‌বা! জায়গাটা তো আরো জব্বর। তোমার রেশনকার্ডটা দেখাও দেখি।' 'এখানে আমার কিছু নেই। সব আমার মুল্লুকে আছে। আপনাকে জাহান্নামে গিয়ে দেখতে হবে।' ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—সেখানে গিয়ে দেখবার আমার দরকার নেই। এখানে চটপট একটা রেশনকার্ড করিয়ে নিয়ো, বুঝলে? ওবেলা থানার থেকে ফোটোগ্রাফার এসে তোমার ফোটো তুলবে। চেহারাটা তোমার কেমন চেনাচেনা ঠেকছে আমার, কেন জানি না। বলে বিদায় নিলেন ইনস্‌পেক্টর।

তিনি চলে যাবার পর আমি ধুমড়োর দিকে তাকালাম, ওমা! একি! দেখতে দেখতে লোকটা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে কেমন! ওদিক থেকে পোড়া ঘিয়ের গন্ধ এসে নাকে লাগে। ধরা সুজির গন্ধ।

'ধুমড়ো! প্যানে সুজি চাপিয়ে এসেছিলে বুঝি? সুজিটা ধরে গেছে। ওমা! তুমি এমন করে চোখের উপর উপে যাচ্ছ কেন গো! কী হোলো তোমার?'

'উপচীয়মান ধুমড়োর উদ্দেশে বললি তুই?' আমি বলি।—'উপচে উঠে গেল কোথায় সে?'

'আর কী হবে। যা হবার হল।' বলতে বলতে ধুমড়ো ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল: 'তুমিই করলে তো। হীটারে প্যান বসিয়ে সুজি চাপিয়েছিলাম, তুমি সোজা নেমে আসতে বললে সটাং। আমি সোজাসুজি নেমে এলাম। প্যানটা পুড়ে গিয়ে ওর কলাইকরাটা ঝলসে গেছে সব। এখানকার মেয়াদ আমার ফুরোলো এখন। আমি চললাম।' বলে ধূম্র সত্যিই ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। 'আমি চললাম আমার জাহান্নাম! এ জীবনে আর দেখা হবে না আমাদের।' অন্তরীক্ষ থেকে আওয়াজ পেলাম তার।

ধুমড়োলোচন ততক্ষণে অন্তর্হিত!

যোগ্য পাত্র

মায়া বসু

নিয়মিত স্নান সমাপন করি গোমতীর পূত জলে,
ব্রহ্মদত্ত রাজর্ষি যবে প্রাসাদে ফিরিয়া চলে
অরণ্য মাঝে, সহসা চলার পথে,
ক্ষুদ্র মূষিক খসে পড়ে এক, বাজের নখর হতে।
প্রাণভয়ে ভীত আশ্রিত জীব দেখি তাঁর পদ পরে
কৃপা পরবশে ব্রহ্মদত্ত তুলে নিল নিজ করে।

অভয় দানিয়া কহেন মূষিকে, "বল কোন বর চাও?"
কহিল মূষিক, "হে দয়াল মোরে মানুষ করিয়া দাও।
তোমারে হেরিয়া আমারে ছাড়িয়া পলাইল বাজ স্বামী
সকলের সেরা মানব জন্ম, তাই হতে চাই আমি।"

প্রার্থনা শুনি দয়াময় মুনি বর দান করি তায়
রূপান্তরিত করেন মূষিকে এক শিশুকন্যায়।
সাথে লয়ে তারে নিজের প্রাসাদে আনি
দাসদাসী আর যত পরিজনে জানান আদেশবাণী ;
"কুড়ায়ে পেয়েছি, তবু মনে রেখ সবে,
মোর কন্যার মতই ইহারে মর্যাদা দিতে হবে।"

ক্রমে কত দিন, কত মাস কত বছর হল যে গত
পরমা রূপসী হল সে মানবী, অতিশয় উদ্ধত।
রাজকন্যার গর্বে ভুলিল 'নীচ কুলজাত' কথা,
অকৃতজ্ঞ স্বভাবেতে তার মুনি পান বড় ব্যথা।
দিনে দিনে বাড়ে দম্ভ দর্প, ধরা ভাবে সরা খান
মাননীয় জনে গর্বিতা নারী নাহি দেয় সম্মান।

একদিন তারে নানা উপদেশ ছলে,
অতি স্নেহভরে ব্রহ্মদত্ত কাছে ডেকে ধীরে বলে,
"কন্যা, তোমারে করেছি পালন নিজ আত্মজা সম
আমার বরেতে রূপে গুণে তুমি অতুলন অনুপম।
মহা দায়িত্ব বাকী আছে মোর আর
তব মনোনীত পাত্রের সাথে পরিণয় ঘটাবার।

কত রাজর্ষি নরপতি কত, ক্ষত্রিয় মহাবীর
যারে চাও তুমি এনে দিব পতি সসাগরা ধরণীর।
শৌর্যে বীর্যে তুলনাবিহীন মনুষ্য-লোক মাঝে
স্বামিরূপে বরি লও কাহারেও, পরান যাহারে যাচে।"

● যোগ্য পাত্র

মুনির বচনে মূষিকা মানবী
মনে মনে ওঠে জ্বলি,
'অতি সামান্য মানুষে গ্রহণ
করিব না স্বামী বলি।'
মুখে বলে, "পিতা, তোমার
বচনে অন্তরে পাই লাজ
এত কাল ধরে পালন করিয়া
এ কী কথা বল আজ ?
হোক সম্রাট্, রাজার পুত্র,
সামান্য নর সব,
থাক না তাদের বিপুল শক্তি
অতুলন বৈভব
ত্রিভুবন মাঝে শ্রেষ্ঠ
যে জন তারে,
তপস্যা বলে এনে দাও মোরে,
স্বামিরূপে বরিবারে।"
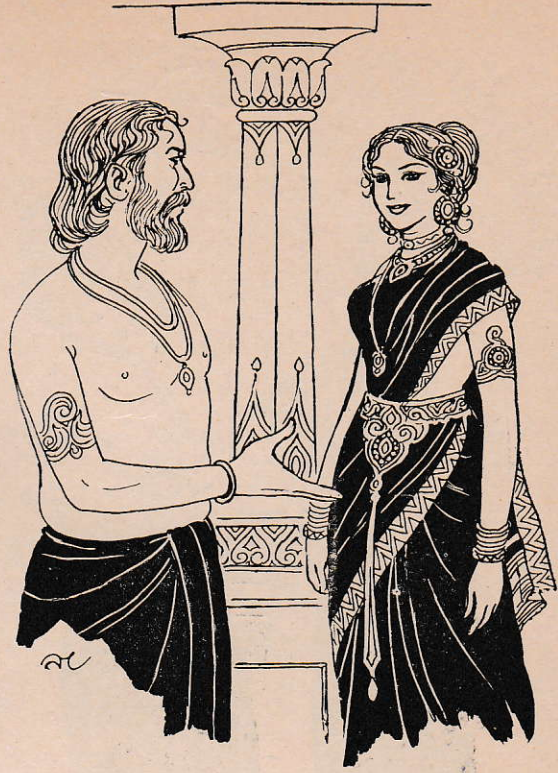
হে সুকল্যাণী শোন হয়ে স্থির মতি,
নরোত্তমের মাঝে খুঁজে লও তব মনোমত পতি।

রূপান্তরিতা মূষিকার কথা শুনি মুনি স্তম্ভিত।
কর্তব্যের বাঁধনেতে বাঁধা, হয়ে অতি বিচলিত
কহেন তাহারে, "শোন কল্যাণী ! এ কথা ভুলোনা মনে,
দেবতার সেরা সৃষ্টি যে নর, জেনো এই ত্রিভুবনে।
কীট পতঙ্গ সিংহ ব্যাঘ্র দেবাসুর আদি যত,
মানবের কাছে দৈত্যদানব সব জাতি অবনত।
হে সুকল্যাণী শোন হয়ে স্থির মতি,
নরোত্তমের মাঝে খুঁজে লও তব মনোমত পতি।"

● মায়া বসু

"শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি নই প্রভু।" সূর্য কহেন হেসে।
বিচারে তোমার ভুল করিয়াছ কন্যারে ভালবেসে।

অতি দর্পিতা রমণী তবুও
শোনে নাক কথা তাঁর
দেবতা শ্রেষ্ঠ ভাস্করে এনে
দিতে বলে বার বার।
সত্যবদ্ধ ঋষি নিরুপায়
হয়ে অতি হতমান
ক্ষুণ্ণ মনেতে করিলেন
তিনি সূর্যেরে আহ্বান।

অন্তর্যামী সূর্য বুঝিয়া
সাধুর দুর্বলতা,
চূর্ণ করিতে দ্বিজা
রমণীর স্পর্ধা প্রগল্‌ভতা
ব্রহ্মদত্ত সকাশে আসিয়া
উপনীত হন ত্বরা।
কহিলেন মুনি, "হে দেবতা
মোর কন্যা স্বয়ংবরা,
শ্রেষ্ঠ দেবতা যে জন তাঁহারে চাহে সে যে বরিবারে
মোর অনুরোধ, পত্নী রূপেতে লহ মোর কন্যারে।"

"শ্রেষ্ঠ দেবতা আমি নই প্রভু!" সূর্য কহেন হেসে।
"বিচারে তোমার ভুল করিয়াছ কন্যারে ভালবেসে।
আমার শক্তি সামর্থ্য অতি তুচ্ছ যাঁহার কাছে
সদা ভয়ে থাকি, তাঁহার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাই পাছে;

প্রবল প্রতাপশালী সে দেবতা জলদ বজ্রধর
শ্রেষ্ঠ জনাই হোক কল্যাণী ! তব মনোমত বর।"

সূর্যের কথা শুনি মুখরা কন্যা পিতারে বলে,
"তবে আমি মালা দিব নিশ্চয় বজ্রধরের গলে।"

ব্রহ্মদত্ত আহ্বান শুনি মেঘ ত্বরা উপনীত
কন্যার কাছে সমস্যা তার হয়ে সব অবহিত
ধীরে ধীরে কন, "ভুল বুঝিয়াছ, শ্রেষ্ঠ তো আমি নয়,
প্রচণ্ড বেগে উদ্দাম গতি মরুৎ যখনি বয়,
আমারে উড়ায়ে দেন মুহূর্তে অক্লেশে অবহেলে
আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে তিনি, মালা দাও তাঁরি গলে।"

মরুৎ আসিয়া করে প্রতিবাদ, "ক্ষমতা আমার আছে,
নহেক মিথ্যা, তবু পরাজিত দেব গিরিরাজ কাছে।
ভীমবেগে মোর মেঘেরে সরাতে পারি,
অটল অচল হিমালয় তাঁরে তিলেক নড়াতে নারি।
তাঁহার নিকটে অতীব তুচ্ছ সামান্য বায়ু আমি ;
কল্যাণী সেই জগৎপূজ্য, তোমার যোগ্য স্বামী।"

মরুৎ বচনে উল্লাসে মাতোয়ারা,
কহিল সে দ্বিজা আত্মগর্বে হিতাহিত জ্ঞানহারা !
"সবার শ্রেষ্ঠ গিরিরাজে আমি পতিরূপে লব বরি,
সত্যবদ্ধ পিতা তুমি তাঁরে এনে দাও ত্বরা করি।"

● মায়া বসু
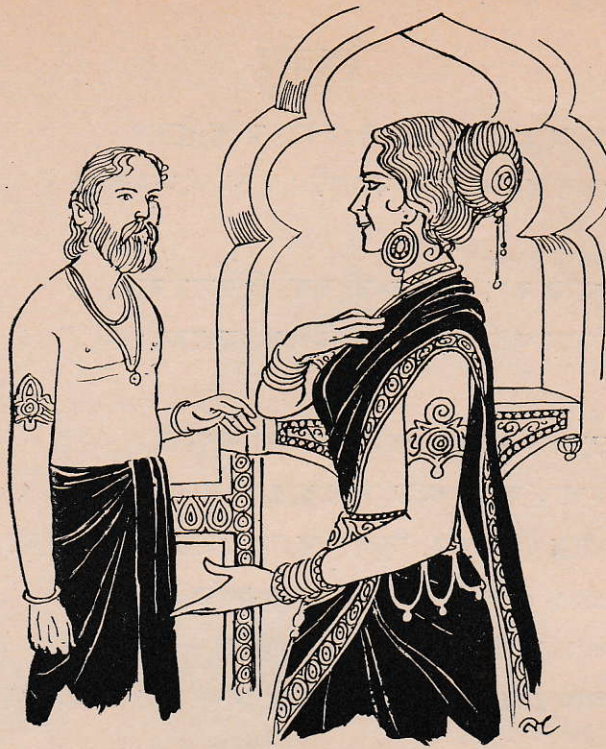
সূর্য আমারে ছাড়াতে পারে না, ভাসাতে পারে না মেঘ,
একতিল মোরে নাড়াতে পারে না প্রমত্ত বায়ু বেগ

সামান্য এক মূষিকার কাছে মহর্ষি অসহায়
হেরিয়া তাঁহার বিচলিত দশা লজ্জিত নিরুপায়
স্মিত মুখে আসি গিরিরাজ কন, মুনিকন্যার কাছে ;
"আমার চেয়েও ক্ষমতায় বেশী মূষিক যে এক আছে।

সূর্য আমারে ছাড়াতে পারে না, ভাসাতে পারে না মেঘ,
একতিল মোরে নাড়াতে পারে না প্রমত্ত বায়ু বেগ
যথার্থ বটে, তবু সর্বদা ভয়ে ভয়ে আমি রই,
সেই দুর্জয় মূষিক রাজের সমতুল কভু নই।

স্থড়ঙ্গ খোঁড়ে, আমার এ দেহ, চূর্ণ করিয়া চলে
আমি পরাজিত যার কাছে তুমি মালা দাও তারি গলে।"

গিরিরাজ বাণী শুনিয়া হর্ষ ভরে,
কহিল কন্যা, "হে পিতা পেয়েছি মম মনোনীত বরে।
ভাস্কর হতে জলদ শ্রেষ্ঠ, মরুৎ হতে যে গিরি,
গিরির চেয়েও শ্রেষ্ঠ জনেরে আমি যে কামনা করি।
জগৎপূজ্য হিমাদ্রি ভয়ে যাঁর কাছে অবনত,
মহা বলীয়ান সে মূষিকরাজ পতি মোর মনোমত।"

মূষিকা করিয়া মানবীরে ফের স্বস্তি পাইয়া মনে,
পরিণয় তারে করালেন মুনি মূষিকরাজের সনে
দেবতা কৃপায় মহাসমস্যা হল তাঁর সমাধান
মুক্তি লভিয়া শান্তিতে সাধু ঈশ্বরে সঁপে প্রাণ।

● বীর বাহাদুর
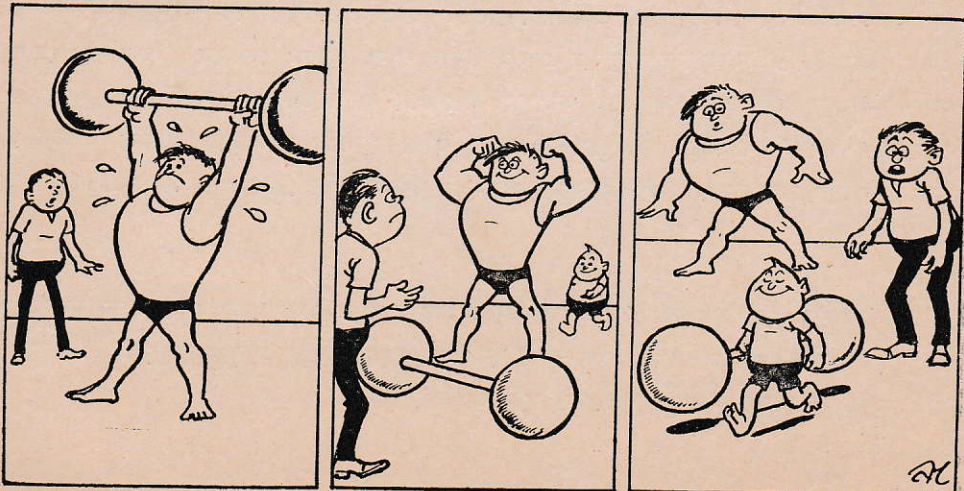
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

[**লেখক-পরিচিতি।**—অ্যাডভেঞ্চার-সাহিত্যের দিক্‌পাল রবার্ট মাইকেল ব্যালাণ্টাইনের জন্ম হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা শহরে। হাডসন বে ফার কোম্পানির চাকরি নিয়ে প্রথম যৌবনেই তিনি কানাডায় চলে যান এবং দীর্ঘ সাত বৎসর থাকেন সেখানে। জনবিরল দেশে নদী-পর্বত-সমুদ্র আর আদি-অন্তহীন অরণ্যের আবেষ্টনে অ্যাডভেঞ্চার ছিল তাঁর এই সময়কার নিত্যসঙ্গী। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরবর্তী জীবনে তিনি আঙ্গাভা, কোরাল আইল্যাণ্ড প্রভৃতি কালজয়ী অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী রচনা করেন। তাঁর মৃত্যু হয় রোম নগরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।]

১

চামড়ার তৈরী হালকা কায়াক ঢেউয়ের মাথায় মাথায় তীরের বেগে ছুটে আসছে কূলের পানে। এত দূর থেকেও ম্যাক্সিমাস স্পষ্ট চিনতে পারছে কূলের মানুষগুলোকে। ঐ বুড়ী কাগাশুকি, ঐ ঠাকুরদা সামুসাঙ্গা, ঐ-ঐ বুঝি আনিটকাও—

ম্যাক্সিমাসকেই এগিয়ে নেবার জন্য ওরা এসেছে নিশ্চয়। ব্যস্তও হয়ে পড়েছে অবশ্য। কারণ দেরি হয়েছে ম্যাক্সিমাসের। দুপুরের ভিতরে ওর ফিরবার কথা। কিন্তু শুধু হাতে, খালি পেটে ফেরে কি করে? হরিণের পাল কেনিয়াপুস্কা পারাপার করে সন্ধ্যার একটু আগে। সে-পর্যন্ত অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না।

তা, ফল হয়েছে অপেক্ষা করে। কাঁচা রক্তমাখা হরিণের মাংসে আকণ্ঠ ভরতি ম্যাক্সিমাসের, থলিতেও মাংসের বড় বড় ফালি, আনিটকা আর তার ঠাকুরদার দুটো দিন হেসে খেলে হয়ে যাবে। বুড়ী কাগাশুকিকেও দেওয়া চলবে দু'চার টুকরো। আহা! ওকে না দিলে চলে? মা-মরা ম্যাক্সিমাসকে মানুষ তো ওই করেছিল!

মাথায় নানা চিন্তা। বারো হাত লম্বা দাঁড়খানা একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে জলে পড়ছে কুমিরের লেজের মত আধা চক্কোর মেরে মেরে, এর ভিতর ম্যাক্সিমাসের মাথার কোন কাজ নেই। নিছক হাতেরই কসরত এটা, সারা জীবনের অভ্যাসের ফলে হাত দু'খানা এখন কলের মতনই কাজ করে যায়।

হাতের কাজ হাত করে, মাথা করে মাথার কাজ। মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ঐ আগুনওয়ালা ইণ্ডিয়ানদের * চিন্তা! যাদের আগুনের নল সাবাড় করে ফেলেছে এ-তল্লাটের সব এস্কিমোদের—

"আগুনওয়ালা! আগুনওয়ালা!"—ম্যাক্সিমাসের কায়াক চড়ার বালির উপর উঠে পড়েছে অর্ধেক। আর কূলে লাফিয়ে পড়তে পড়তে সে চেঁচিয়ে উঠেছে—"ছাউনি তোলো এক্ষুণি! আমি আগুনওয়ালাদের দেখে এসেছি কেনিয়াপুস্কার ডাইনের শিং-এ। কেনিয়া-পুস্কার মোহানার মাইল কুড়ি উজানে দুই পাড় থেকে দুটো খাড়া পাহাড় এসে নদীটাকে মোক্ষমভাবে চেপে ধরেছে। ঐ দুটো পাহাড়কেই বলা হয় কেনিয়াপুস্কার শিং। শিং-ওয়ালা হরিণ নিয়ে আবহমান কালের ঘাঁটাঘাঁটির ফলে এখন খাড়া উঁচু কিছু চোখে পড়লেই এস্কিমোরা তার নাম দেয় "শিং"। ওর চাইতে জোরদার উপমা তারা খুঁজে পায় না আর।

"আগুনওয়ালারা কেনিয়াপুস্কার শিং-এ?"—সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে আনিটকারা সবাই —"এইবার গেছি আমরা—"

"পালাতে হবে এক্ষুণি!"—ম্যাক্সিমাস বলে—"আরও উত্তরে! আরও উত্তরে! শক্ত

---

* উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয়।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ডাঙা ছেড়ে ভাসা বরফে আড্ডা নিতে হবে এবার। একচোখো সাহেবেরা আগুনের নল দেবে শুধু মুস্কিগান নেকড়েদের। আমাদের দেবে না জান গেলেও। দিত যদি, দেখে নিতাম ঐ নেকড়ের পালকে।"

ম্যাক্সিমাস ছুটছে ছাউনির পানে, আর মনের দুঃখ তারস্বরে জানাচ্ছে ঝড়ের দেবতা, দরিয়ার দেবতা আর কুয়াশার দেবীকে। মুস্কিগানেরা ছিল এখান থেকে তিনশো মাইল দক্ষিণে। এই তিনশো মাইল জুড়ে বিরাজ করত যে আদিম অরণ্য, তা ভেদ করবার চেষ্টা এদিক থেকে এস্কিমোরাও করেনি কোনদিন, ওদিক থেকে করেনি ইণ্ডিয়ানেরাও। এস্কিমোরা করেনি, তারা পরের উপর হামলা করা পছন্দ করে না বলে; আর ইণ্ডিয়ানেরা করেনি, হামলা করতে গেলে এস্কিমোদের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসবার ভয়ে।

কিন্তু ইদানীং পাশা উলটেছে। দরিয়ার ওপর থেকে এসেছে সাদা সাদা সাহেবের দল। তারা থাকে বহুদূর দক্ষিণে ইয়র্ক টাউনে। তারা ঐ মুস্কিগানগুলোকে বন্দুক দিয়েছে। তার বদলে নিয়েছে কী? নিয়েছে লম্বা লোমওয়ালা জানোয়ারদের লোমসুদ্ধ চামড়া। ও-চামড়া যে যত দিতে পারে যোগান, সাহেবেরা নেবেই তা। পুঁতির মালা দেবে, ছোট ছোট আয়না দেবে, ধারালো ছুরি দেবে, রঙিন রুমাল দেবে, আর দেবে ঐ আগুনওয়ালা নল, যা তাক করে আগুন ছুড়লে বাইসনের ঘাড়ও এফোঁড় ওফোঁড় গর্ত হয়ে যায়।

অভাগা এস্কিমোরা এইবার মরতে বসেছে, মরছে। লোমওয়ালা চামড়া তারাও দিতে পারে, কিন্তু সাহেবদের তারা পাচ্ছে কোথায়? তারা ইয়র্ক টাউনে বসে আছে, ইণ্ডিয়ানদের এলাকার সীমানাতেই। এস্কিমোরা তিনশো মাইল জঙ্গল ভেঙে সেখানে পোঁছোবে কেমন করে? বিশেষ যখন সে জঙ্গল তাদের চির-দুশমন মুস্কিগানদেরই রাজ্য? দুই পা এগুতে না এগুতেই ইণ্ডিয়ানদের হাতে কচুকাটা হতে হবে না?

বন্দুক পেয়েই ইণ্ডিয়ানেরা চড়াও হয়েছে এস্কিমোদের উপরে, তিনশো মাইল অরণ্য ভেঙে এসে। কানাডার এই সবচেয়ে উত্তর অঞ্চলে, কেনিয়াপুস্কার তীরে তীরে, আঙ্গাভা উপসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, পাহাড়ে, হ্রদে, অরণ্যে-ঘেরা বিজন দেশে সৃষ্টির আদিকাল থেকে এস্কিমোরা পরম শান্তিতে বাস করছিল এত দিন। এইবার তাদের পালাতে হল দেশ ছেড়ে।

ইণ্ডিয়ানেরা আসে। মাত্র বিশ চল্লিশ জন ইণ্ডিয়ান আগুন-নল হাতে নিয়ে এলেই পাঁচশো এস্কিমো মেরে মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। দুশমনের চুল-সমেত মাথার ছাল কোমরবন্ধে ঝোলাতে পারা ইণ্ডিয়ান-সমাজে বীরত্বের লক্ষণ।

তা, মাথার ছাল পুরুষদেরই নেয় ওরা, মেয়েদের নেয় না, এটা স্বীকার করতেই হবে।

● আঙ্গাভা

মেয়েদের ভিতর বয়স যাদের কম, তাদের ধরে নিয়ে যায় নিজেদের বিগোয়াঁতে * বাঁদীগিরি করবার জন্য, বুড়ীগুলোকে ধরে আর আছাড় মারে, বাঁচল কি মরল—দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখে না।

শুধু অল্পবয়সী মেয়েদের নিয়ে যায়, তাও নয়। নিয়ে যায় খাবার, নিয়ে যায় চামড়া। এস্কিমোদের হাড়ের তৈরী বল্লমেরও খুব কদর ছিল এতকাল ইণ্ডিয়ানদের কাছে। ইদানীং সে কদর খানিকটা কমেছে, ওরা বন্দুক হাতে পাওয়ার পরে।

ম্যাক্সিমাস দৌড়ে যাচ্ছে। ছাউনির প্রতি কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলছে—"গুটো ও তল্পি। আগুনওয়ালারা এসেছে। কেনিয়াপুস্কার শিং-এ আমি নিজের চোখে তাদের দেখেছি।"

কুঁড়ে মানে চার কোণে চারটি খোঁটা পোতা, গাছ যেখানে আছে, সেখানে খোঁটারও সাশ্রয়। সেই চার খোঁটাতে একটা চামড়ার চার কোণ বাঁধা। হরিণ-চামড়া, জুড়ে জুড়ে একটা চাঁদোয়ার আকারের জিনিস তৈরি করা হয়েছে। সেইটিই এখন ওদের মাথার উপর ছাদের কাজ করছে। এ-ঘর অবশ্য এই গরমের দিনের ব্যবহারের জন্যই। শীতকালে আর এর নীচে বাস করা চলে না। তখন তৈরী হয় ইগলু—বরফের ঘর।

আগুনের অস্ত্র নিয়ে ইণ্ডিয়ানেরা এসেছে শুনে প্রতি কুঁড়ে থেকে উঠতে লাগল অবিরাম চেঁচামেচি—"হে ঝড়ের দেবতা, আমাদের বাঁচাও! হে দরিয়ার দেবতা, ওদের আটকাও! হে কুয়াশার দেবী, আমাদের লুকিয়ে ফেল!"

অবশ্য চেঁচামেচিই যে করছে তারা শুধু, তা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ সবাই হাত চালাচ্ছে ক্ষিপ্রবেগে। সামান্যই জিনিস তাদের, কাঁধে নিয়ে ছুটছে সমুদ্রের দিকে। কয়েকখানা উমিয়াক নৌকো ডাঙায় তোলা ছিল, ভাসিয়েছে তাদের। মাল বোঝাই করছে তাতে।

কায়াক হল ছোট ডিঙি, একজন লোক কোনমতে তাতে বসতে পারে। উমিয়াক অনেক বড় নৌকো, দশ বারোজন মানুষ মালপত্র নিয়ে শুয়ে বসে সমুদ্রপাড়ি দিতে পারে ওতে। কায়াকের মতই উমিয়াকও চামড়ার তৈরী। স্রেফ চামড়া দিয়ে এত বড় নৌকো তৈরি করার বিদ্যে এস্কিমোরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

প্রায় সবাই উঠে বসেছে উমিয়াকে। পারেনি এখনও আনিটকা। কারণ তার দায়িত্ব অন্য মেয়েদের দ্বিগুণ। এদিকে স্বামীর ঘর, ওদিকে ঠাকুরদার ঘর। ঠাকুরদার ত্রিসংসারে

---

* ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়ের নাম—Wigwam.

কেউ নেই ঐ আনিটকা ছাড়া। কাজেই নিজের মাল উমিয়াকে তুলে আবার তাকে ডাঙায় আসতে হয়েছে ঠাকুরদার মাল নেবার জন্য।

ম্যাক্সিমাস চারদিকে খবরদারি করে বেড়াচ্ছিল। ভীতুকে সাহস দিচ্ছিল, দুর্বলকে মালপত্র বইতে সাহায্য করছিল। তার দেহের শক্তিও অসুরের মত, মনের জোরও অন্য সবাইয়ের চাইতে বেশী। মানুষটাও সে সওয়া চার হাত লম্বা, মোটাও সেই আন্দাজে। একটা দৈত্যের মতই চেহারা। এস্কিমোরা সাধারণতঃ এমন লম্বা-চওড়া হয় না।

এই অসুরের মত দেহের ভিতরে মনটা তার শিশুর মত কোমল। এই দুই গুণের জন্য ইংরেজ কুঠিওয়ালা স্ট্যানলি পরবর্তী কালে ওর নামকরণ করেছিলেন "ম্যাক্সিমাস"—যার অর্থ "সবচেয়ে বড়"। সেই নামটাই এ আখ্যায়িকার গোড়া থেকে আমরা ব্যবহার করছি। তার আসল নাম যে কী ছিল এস্কিমো-সমাজে, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ম্যাক্সিমাস উমিয়াকে উঠে দেখল—সবাই এসে গিয়েছে—একমাত্র আনিটকা ছাড়া। তা আসছে ঐ আনিটকাও, মাথায় তার ঠাকুরদার বিছানার চামড়াগুলো। তাকে সাহায্য করবার জন্যই ম্যাক্সিমাস লাফিয়ে নামল নৌকো থেকে, তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল তার দিকে।

আর দুটো মিনিট সময় যদি পেত!

গুড়ুম! সময় আর পেল না ওরা। আনিটকার পিছনে ছিল একটা ছোট্ট আগাছার ঝাড়। তারই ভিতর থেকে একটা গুলি এসে বিঁধল ম্যাক্সিমাসের কাঁধে। এসে পড়েছে আগুনওয়ালারা।

কেনিয়াপুস্কার শিং-এ ম্যাক্সিমাসই যে ইণ্ডিয়ানদের দেখেছিল শুধু, তা নয়। ইণ্ডিয়ানেরাও দেখেছিল ম্যাক্সিমাসকে, ও তা জানতে পারেনি। ইচ্ছে করলে পাহাড়ের উপর থেকে গুলি চালিয়ে ইণ্ডিয়ানেরা তখনই ওকে সাবাড় করে দিতে পারত, কিন্তু তখন তারা করেনি তা। লুকিয়ে ওর পিছনে এসে ছাউনিটা দেখেছে ওদের। ম্যাক্সিমাসের একার মাথার ছাল নিয়ে খুশী কেন হবে? ওরা আশা করছিল—গ্রামসুদ্ধ সব পুরুষের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নেবার।

কিন্তু ম্যাক্সিমাস এসেছে কায়াকে চড়ে, ওরা এসেছে পাহাড়ের মাথায় মাথায়। একটু দেরি করে ফেলেছে ওরা, তাই উমিয়াকে চড়ে বসবার সময় পেয়েছে এস্কিমোরা।

ম্যাক্সিমাস গুলি খেয়ে দড়াম্ করে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে। ওদিকে আগাছার ঝাড় থেকে একটা ইণ্ডিয়ান এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ধাবমানা আনিটকাকে। তা দেখে

একটা ইণ্ডিয়ান এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল আনিটকাকে। [পৃঃ ৮২

উমিয়াক থেকে লাফিয়ে নামল তিনটি এস্কিমো যুবক, আর নামল এক বুড়ী, সে-বুড়ী সেই কাগাশুকি, ধাই-মা ম্যাক্সিমাসের।

যুবকেরা ছুটল ইণ্ডিয়ানটার কবল থেকে আনিটকাকে উদ্ধার করবার জন্য, কাগাশুকি ধেয়ে এল অচেতন ম্যাক্সিমাসকে টেনে উমিয়াকে তুলবার জন্য।

কিন্তু ঐ ইণ্ডিয়ানটা—মিস্তাগুশ ওর নাম—আনিটকাকে ততক্ষণে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঝোপের দিকে। আর ঝোপের ভিতর থেকে গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে গুলি এসে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। তিনটি এস্কিমো যুবক বেশীদূর এগুবার আগেই গুলির আঘাতে ভূপতিত হল।

ততক্ষণে কাগাশুকি এসে ম্যাক্সিমাসকে ধরেছে। অতবড় বৃহৎ মানুষটাকে উঁচু করে তোলা বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার কোথায়? সে চুলের মুঠি ধরে ম্যাক্সিমাসকে টেনে নিয়ে জলে ফেলল। পুরুষেরা কিন্তু নেমে এসে ওকে নৌকোয় তোলার মত সাহস দেখাতে পারল না। কারণ, ইণ্ডিয়ানেরা দলে দলে দেখা দিয়েছে তখন। দেরি করলেই এস্কিমোদের নারীপুরুষ সব মারা পড়বে এক্ষুণি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অগত্যা কাগাশুকি উমিয়াকে উঠে বসে চুল ধরে রইল ম্যাক্সিমাসের। ওর দেহটা চলল জলে ভাসতে ভাসতে।

ইণ্ডিয়ানেরা দেখল ওদের পিছু নিয়ে সমুদ্রে নামলে লাভ হবে না কিছু। তারা সাঁতারে ওস্তাদ বটে, কিন্তু সাঁতার দিতে দিতে তো আর গুলি করা যায় না!

উমিয়াকগুলো উড়ে চলেছে দশ দশখানা দাঁড় বেয়ে। নারী ও পুরুষ সবাই দাঁড় টানছে। গভীর জলে গিয়ে তারা পিছনে তাকিয়ে দেখল—কেউ আর পিছনে আসছে না তাদের।

ম্যাক্সিমাসের জ্ঞান ফিরে আসছে। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল উমিয়াকে। একবার, দুইবার, তিনবার—সব কয়খানা উমিয়াকের এধার থেকে ওধার ঘুরে এল তার চোখ। সবাই জানে—কী সে খুঁজছে। তারা নির্বাক, কী বলবে তাকে? কাগাশুকি আর ঠাকুরদা সামুসাঙ্গী চোখের জল ফেলছে শুধু।

"আনিটকা আসে নি?"—নিজেকেই নিজে যেন প্রশ্ন করল ম্যাক্সিমাস। তারপর উঠে দাঁড়াল।

প্রতি উমিয়াকে একটা করে কায়াক রাখা হয়। সে কায়াক জলে নামিয়ে তাইতে উঠে বসল। একটা বল্লম হাতে নিয়ে কায়াক চালাতে লাগল ছেড়ে-আসা ছাউনির দিকে। কেউ তাকে নিষেধ করল না। বলল না যে ওখানে ইণ্ডিয়ানেরা আছে, ম্যাক্সিমাসকে দেখলেই তারা মেরে ফেলবে। কেন বলবে? ম্যাক্সিমাস কি ছেলেমানুষ? নিজের বিপদের কথা সে কি নিজে জানে না?

ম্যাক্সিমাস তীরে গিয়ে নামল। পরিত্যক্ত ছাউনি শ্মশান হয়ে পড়ে আছে। তিনটি যুবকের মাথার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ইণ্ডিয়ানেরা। আনিটকার সন্ধান নেই।

ছাউনির পিছন থেকেই অরণ্য শুরু হয়েছে। ম্যাক্সিমাস সেই অরণ্যে প্রবেশ করল। ইণ্ডিয়ানেরা কোন্ পথে গিয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। বল্লম মাত্র সম্বল করে সে বন্দুকধারী ইণ্ডিয়ানদের পিছু নিল।

২

কেনিয়াপুস্কার সেই শিং।

তারই একটুখানি উজানে নদীটা একটা হ্রদের মতই চওড়া। পশ্চিম কূলে এক প্রশস্ত মাঠ, মাঠের ওধারে একটা অনতি-উচ্চ টিলা। সেই টিলার উপর ঝরনা একটা।

ইন্দ্রনীল

ম্যাক্সিমাস যেদিন আনিটকার সন্ধানে গভীর অরণ্যে ডুব দিল, তার ঠিক এক মাস পরের কথা।

এই এক মাসের মধ্যে একটা কাঠের কেল্লা গজিয়ে উঠেছে নদীর পশ্চিম কূলের মাঠে, ঝরনাটাকে পিছনে রেখে। ইংরেজ বণিকেরা গড়েছে ঐ কেল্লা।

হাডসন বে ফার কোম্পানি এতদিন ইণ্ডিয়ানদের কাছেই ফার (লোমশ চামড়া) কিনছিল। সম্প্রতি তাদের খেয়াল হয়েছে যে ব্যবসাটা উত্তর দিকে আরও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

উত্তরে তিনশো মাইল বিস্তৃত অরণ্যের ওপারে এস্কিমোদের বাস, সাহেবেরা জানে তা। এস্কিমোদের কাছে তো ফার মিলবার কথা! মেলে যদি, সাহেবেরা তাদেরও বন্দুক দিতে পারে। বন্দুকের অভাবে এস্কিমোরা ইণ্ডিয়ানদের হাতে ঝাড়ে বংশে নির্মূল হতে বসেছে, এ খবর হাডসন বে কোম্পানি পেয়েছে, পেয়ে ব্যথিত হয়েছে।

ইণ্ডিয়ানেরা হিংস্র এবং একগুঁয়ে। সাহেবদের পরামর্শ শুনবার পাত্র তারা নয়। "এস্কিমোদের মেরো না" বললেই যে ইণ্ডিয়ানেরা শুনবে, এমন আশা করাই বাতুলতা। কাজেই বন্দুক দাও এস্কিমোদেরও, তার ফলে কোম্পানির ব্যবসারও বিস্তার হবে একদিকে, এস্কিমো জাতটাও অন্যদিকে বেঁচে যাবে।

সেই মতলব নিয়েই মুজ কেল্লার বড়কর্তা স্ট্যানলি সাহেব কেনিয়াপুস্কার তীরে এসে নতুন কেল্লা গড়েছেন। নাম তার টিমো কেল্লা। স্ট্যানলির সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছেন, বারো বছরের মেয়ে এডিথ আছে, আর আছে তাঁর কুকুর টিমো।

কুকুর টিমোর নাম অনুসারে অবশ্য এই নতুন কেল্লার নাম টিমো কেল্লা হয়নি। "টিমো" শব্দটা এস্কিমো ভাষার শব্দ, ওর অর্থ বন্ধুত্ব। এস্কিমোদের উদ্দেশে বন্ধুভাব নিয়েই বণিকেরা এসেছে, এইটি বোঝাবার জন্যই কেল্লার এ-রকম নামকরণ হয়েছে।

এডিথ কুকুর টিমোকে নিয়ে বেড়াতে যায় টিলার পিছন দিকে। ওদিকটায় পাহাড় আর বনজঙ্গল শুধু। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। একদিন এক নেকড়ে বাঘের সামনে পড়ে গেল এডিথ। তাকে বাঁচাবার জন্য টিমো তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করল নেকড়েটাকে। কুকুর হিসাবে টিমো যথেষ্ট বলবান বটে, কিন্তু তা বলে নেকড়ের সঙ্গে কখনো কুকুর পারে?

ভীষণ রক্তারক্তি যুদ্ধ চলছে টিমোতে নেকড়েতে। এডিথের উচিত ছিল, ততক্ষণে দৌড়ে কেল্লায় চলে যাওয়া এবং সেখান থেকে লোক ডেকে আনা। কিন্তু আকস্মিক বাঘের

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

আক্রমণে সে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, না পারছে দৌড়ে পালাতে, না পারছে চেঁচিয়ে সাহায্য চাইতে।

এদিকে টিমোর সারা অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরছে। নেকড়ের থাবায় তার বুক পিঠ থেকে খাবলা খাবলা মাংস উঠে এসেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই টিমো মারা পড়বে, এবং টিমো মরলে পরক্ষণেই এডিথও নেকড়ের শিকারে পরিণত হবে, তার আর সন্দেহ কী?

কিন্তু ব্যাপার ততদূর সাংঘাতিক আর হয়ে উঠতে পারল না। পিছন থেকে একখানা বল্লম নিঃশব্দে এসে নেকড়ের বুকে বিঁধে গেল।

নেকড়ে মারা পড়তেই এডিথের যেন চৈতন্য ফিরে এল। সে তার প্রাণদাতার হাত ধরে এনে বাবার কাছে হাজির করল। এ হল আমাদের ম্যাক্সিমাস।

আনিটকার সন্ধানে দক্ষিণের অরণ্যে প্রবেশ করে প্রায় পঞ্চাশ মাইল সে ঠিক ঠিক অনুসরণ করে গিয়েছিল ইণ্ডিয়ানদের। তারপরেই সমুখে পড়ল মস্ত এক নদী। বেশ বোঝা গেল নদী পার হয়ে গিয়েছে দুশমনেরা। নিশ্চয় ওদের নৌকো ছিল এখানে।

ম্যাক্সিমাসের নৌকো নেই, সে সাঁতারও জানে না। শুধু সে কেন, প্রায় কোন এস্কিমোই সাঁতার জানে না। দারুণ শীতের দেশে তাদের বাস, জলে নামতেই চায় না তারা।

কাজেই বুকের ব্যথা বুকে চেপে ম্যাক্সিমাস স্বজাতির অন্বেষণে বেরিয়েছিল আবার। আঙ্গাভা সাগরের কূলে কোথাও তারা নতুন বসতি স্থাপন করবে, এইরকমই সম্ভব। তাই সে পা চালিয়েছিল সেই দিকে।

স্ট্যানলি এডিথের মুখে সব বিবরণ শুনে অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানালেন তার উদ্ধারকর্তাকে। ওকে "ম্যাক্সিমাস" নামও তিনিই দিলেন, কারণ দেহ এবং মন দুই দিকেই লোকটি অনেক বড় অন্য পাঁচজনের চেয়ে।

নিজের কোম্পানিতে চাকরি দিতে চাইলেন তিনি ওকে। তাঁর দলে আরও দুই একজন এস্কিমো আছে অবশ্য, কিন্তু তাদের বাড়ি এ-তল্লাটে নয়। স্থানীয় এস্কিমোদের সঙ্গে ব্যবসাগত যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে ম্যাক্সিমাসের মত স্থানীয় লোকের সাহায্য খুবই দরকার হবে।

ম্যাক্সিমাসের জীবন তো এখন উদ্দেশ্যহীন, চাকরি নিতে তার আপত্তি হবে কেন?

চাকরিতে বহাল হয়েই ম্যাক্সিমাস দেখল টিমো কেল্লার সব জওয়ানই এখন শীতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। কেউ যাচ্ছে হরিণ শিকারে, কেউ যাচ্ছে মাছ ধরতে। মাছ

● আঙ্গাভা

এদিকে প্রচুর। নদী-খাল-বিল সবতেই মাছ ভরতি, কোন রকম একটা টোপ ফেললেই মাছ উঠবে।

তবে কিনা খুব বড় মাছ এখানে ধারে কাছে কোথাও নেই। দু'ঘণ্টা পুরো মেহনত করেও শেষ পর্যন্ত যে-মাছটা উঠল—সেটা হয়তো দশ সেরের বেশী নয় ওজনে। অথচ শীত এসে পড়েছে, এক বা দুই হপ্তার মধ্যে অন্ততঃ একশো মণ মাছ গুদামজাত করা চাই। এ-অঞ্চলে এত শীত যে মাছ ধরে এনে যেমনকার তেমনি গুদামে ফেলে রাখলে চিরদিন অবিকৃত থাকবে, যখন ইচ্ছা রান্না করে খাও।

ম্যাক্সিমাস বলল—আঙ্গাভা উপসাগরের পথে একটা হ্রদ আছে। তাতে অসংখ্য মাছ, আর সে-সব মাছ আকারে অতি বৃহৎ। আধ মণের নীচে মাছই নেই সে-হ্রদে। একজন লোক গিয়ে সেখানে এক হপ্তা থাকলে একশো মণ মাছ একাই নিয়ে আসতে পারে।

স্ট্যানলি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এ কথা শুনে। ঐ হ্রদে গিয়ে মাছ ধরবার ভার তিনি দিলেন তাঁর সহকারী ফ্রাংক মর্টনের উপর। মাছ ধরতে সে ওস্তাদ। তা ছাড়া অমন সাহসী ও নির্ভরযোগ্য যুবক তাঁর কেল্লায় দ্বিতীয় আর একটি নেই। স্ট্যানলি ও তাঁর স্ত্রী তাকে ছেলের মতন ভালবাসেন। আর এডিথও তাকে ভাইয়ের মত দেখে।

ফ্রাংক মর্টন তৈরী হতে লাগল। একখানা স্লেজ গাড়ি তৈরী হতে যা দেরি। স্লেজ ছাড়া অন্য গাড়ি তো বরফের রাজ্যে চলবে না।

স্লেজ জিনিসটি গাড়ি বটে, তবে সে চাকাবিহীন গাড়ি। দু'খানা লম্বা মজবুত কাঠ সমান্তরাল ভাবে ফেলা হয় মাটিতে, তিন বা চার ফুট ব্যবধান রেখে। তাদের উপর আড়া-আড়ি ভাবে কাঠ ঠোকা হয় ঘন ঘন। এই মাচাখানাই গাড়ির কাজ করে। টানে বল্‌গা হরিণে বা কুকুরে। মসৃণ বরফের উপর দিয়ে পিছলে এগিয়ে যায় ঐ লম্বা কাঠ দু'খানা।

গাড়ি বড় হলে এক এক সময় বিশটা কুকুরও স্লেজে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। ফ্রাংক মর্টনের এ-গাড়ি অবশ্য ছোটই, একা টিমোই টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

গাড়ি প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে, এমন সময় একদিন ভীষণ তুষার-ঝড় হয়ে গেল। রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুয়েছেন স্ট্যানলিরা, সকালে উঠে দরজা খুলেও আর আলো দেখতে পান না। কী ব্যাপার?

ব্যাপার শুধু এই যে রাতে বরফ পড়েছে। এত বরফ যে দরজার বাইরে দশ বারো ফুট চওড়া একটা দেয়াল গড়ে উঠেছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ভাগ্যিস ঘরে একখানা শাবল ছিল। তাই দিয়ে বরফের তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাইরের আলোতে আসতে পারেন স্ট্যানলিরা।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

সেই রাত্রে তুষারঝঞ্ঝার ভিতরে পাহাড়ের মাথায় খোলা আকাশের নীচে কেউ থাকলে সে কি প্রাণে বাঁচত ? অনভিজ্ঞ যে কোন লোকই বলবে যে সেটা অসম্ভব।

কিন্তু সত্যিই একেবারে অসম্ভব নয় সেটা। চাক্ষুষ প্রমাণ ঐ ম্যাক্সিমাস। সে সত্যিই পড়েছিল ঐ ঝড়ে, পাহাড়ের উপরে। সে গিয়েছিল দূরের এক এস্কিমো বস্তিতে। কুকুরদের জন্য সীলমাংস আনতে। ফেরার সময় এল ঝড়। কোথাও কোন আশ্রয় বা আচ্ছাদন নেই। বরফ পড়ছে প্রপাতের জলের মত অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে। হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে গায়ের উপর এক ফুট পুরু বরফের আস্তরণ জমে যাচ্ছে। অথচ হোঁচট খেতেই হচ্ছে মিনিটে মিনিটে। কারণ পায়ের নীচে পিছল বরফ, চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

এইভাবে চলবার চেষ্টা করতে থাকলে এক সময়ে হয়তো হোঁচট খাওয়ার পরে আর খাড়া হয়ে উঠবার শক্তি তার থাকবে না। আর উঠতে না পারলেই পাঁচ মিনিট পরে সে পাঁচ ফুট বরফের নীচে চাপা পড়ে যাবে। তার জীবন্ত সমাধির কবরটা যে কোনখানে, পরদিন উপর থেকে লক্ষ্য করে কেউ আর হদিসই পাবে না তার।

এ-অবস্থায় প্রাণ বাঁচাবার একটাই উপায় এস্কিমোদের জানা আছে। ম্যাক্সিমাস সেই কাজই করল। ছুরি দিয়ে একটা কবর নিজেই কাটল বরফের ভেতরে। তারপর আংরাখাটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল সেই গর্তে। দেখতে দেখতে সে ঢাকা পড়ে গেল বরফের পিরামিডের নীচে। কিন্তু সেই গর্তের ভিতরে সে নিরাপদ। বরফ আর পড়ছে না তার গায়ে মাথায়। রীতিমত গরম বোধ করছে সে। আরামে ঘুমালো ম্যাক্সিমাস সারা রাত।

পরের দিন ছুরি দিয়ে বরফ কুরে কুরে মাথার উপরকার বরফস্তূপ হালকা করতে হল তাকে। গুঁড়ো বরফ ফেলছে কোথায় ?—কোথাও না। সেটা তার দেহের উত্তাপে গলে জল হয়ে যাচ্ছে।

কবর থেকে যখন ম্যাক্সিমাস বেরুলো, তখন সূর্য পাটে বসেছে। ফোর্ট টিমোতে যখন সে পৌঁছোলো, তখন সেখানে কী উল্লাস! অত বড় তুষারঝঞ্ঝার ভিতরে পড়েও সে যে বেঁচে ফিরে আসবে, এমন আশা কেউ করেনি।

ঝড়ে একটা সুবিধা করে দিয়ে গেল। উঁচুনীচু সব জায়গা বরফে বরফে সমতল হয়ে গিয়েছে। যতদিন এ-বরফ না গলছে, ততদিন এর উপর দিয়ে স্লেজ ছুটবে বায়ুবেগে। আর বরফ গলা ? তার দেরি আছে। সারা শীতকাল তো নয়! আর দেরি নয়। শীত ঘনিয়ে আসছে, এর পরে হ্রদের জলে আর মাছ ধরা যাবে না। ফ্রাংক তৈরী হল।

স্বর লক্ষ্য করে এডিথ ছুটল

(আঙ্গাভা···পৃঃ ৯৫)
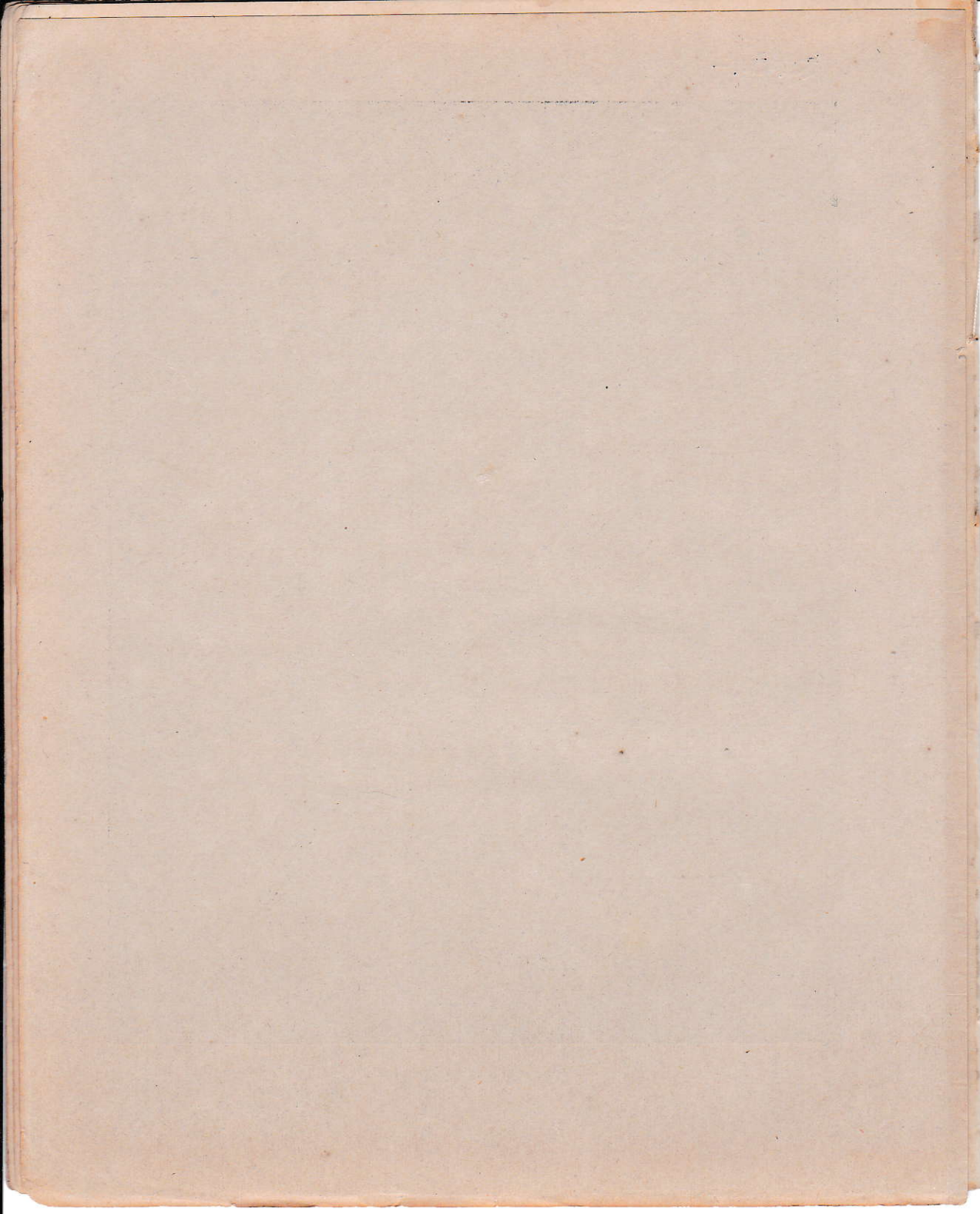
এমন সময় এডিথ ধরল বায়না, সে সঙ্গে যাবে।

স্ট্যানলি আর তাঁর স্ত্রী প্রথমে তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার জেদের সমুখে অবশেষে তাঁদের নতিস্বীকার করতেই হল। শেষকালে তাঁরা নিজেদের মনকে বোঝালেন এই বলে—"যাক না! এখানে সঙ্গী সাথী কেউ নেই, একা একা মনমরা হয়ে থাকে। তবু নতুন জায়গায় গেলে কয়েকটা দিন আনন্দে উত্তেজনায় কাটিয়ে আসতে পারবে।"

আর ফ্রাংকের উপর তো তাঁদের আঠারো আনা আস্থা। তার সঙ্গে থাকলে এডিথ যে কখনও কোন বিপদে পড়তে পারে, এমন ধারণাই তাঁদের নেই। অতএব এডিথ গেল।

ম্যাক্সিমাস সকলের আগে যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। তার সঙ্গেই চলেছে ফ্রাংক। সব শেষে স্লেজ নিয়ে আসছে টিমো, স্লেজের উপরে বসে আছে এডিথ লাগাম ধরে। পথ বলে কোথাও কিছু নেই, ছিল না কোনদিন এ-অঞ্চলে। তার উপর এখন তো বরফে বরফে সব একাকার। তবে কোথাও হয়তো পাহাড়ের একটা চূড়া এখনও জেগে আছে উঁচু হয়ে, অথবা সুগভীর একটা খদ হয়তো এখনও সম্পূর্ণ বুজে যেতে পারেনি বরফে। সেই সব জায়গায় ফ্রাংক এডিথকে তুলে নিচ্ছে কাঁধে, আর ম্যাক্সিমাস স্লেজখানাকে তুলে নিয়ে পার করে। টিমোর সাহায্য দরকার হয় না। সে নিজেই লাফিয়ে পার হতে পারে সব বাধা সব বিঘ্ন।

পুরো একদিনের পথ চলে ওরা হ্রদে পৌঁছোলো। হ্রদ? না, বরফে ঢাকা মরুভূমি? এখানে মাছ ধরা হবে কেমন করে? জলই তো নেই কোথাও!

ম্যাক্সিমাস আশ্বাস দিল—আছে জল। অগাধ জলই আছে। তবে ছয় ফুট আট ফুট বরফের তলায় পড়ে গিয়েছে সে জল। তা, সে আর এমন কী গুরুতর ব্যাপার! একটা কুয়ো খোঁড়া আধ ঘণ্টার কাজ। কুয়োর ভিতর টোপ ফেললেই মাছ।

কুয়ো পরে হবে, আগে রাত্রি যাপনের জন্য ঘর তৈরি করা চাই। ম্যাক্সিমাস লেগে গেল বরফের ঘর তৈরি করতে। একে ইগলু বলে এস্কিমোরা। একটা বৃত্ত আঁকা হয় মাটিতে, সাত আট ফুট ব্যাস রেখে। সেই বৃত্তরেখার উপরে বরফের ইট গোলাকারে বসানো হয়। ইট? জমাট শক্ত বরফ পড়ে আছে চারধারে, ছুরি দিয়ে কেটে আনো আর গেঁথে যাও। দু'খানা ইটের ভিতরে ঝুরো বরফের সিমেণ্ট।

গাঁথুনি যত উঁচু হচ্ছে, তত ভিতর দিকে ঝুঁকে সরু হয়ে আসছে। অবশেষে গম্বুজের আকারে একটা চূড়ায় গিয়ে মিলল চারদিকের গাঁথুনি। সেখানে বসিয়ে দেওয়া হল একখানা বেশ বড় কিন্তু পাতলা বরফের চাদর।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

পাশাপাশি দুটো ইগলু। একটা থেকে আর একটায় যাওয়ার পথ দুই ধারে বরফের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, মাথার উপরেও বরফের ছাউনি। ছোট ইগলুটাতে এডিথ থাকবে, বড়টাতে ফ্রাংক আর ম্যাক্সিমাস। টিমো মাঝের পথটাতে।

রাত্রিটা আরামে কাটিয়ে ভোরে উঠেই চা খাওয়া। তার পর মাছ ধরার তোড়জোড়। কুয়ো কেটে জল বার করতে হবে। তবে মাছ মিলবে। তা ম্যাক্সিমাস ঠিক আধঘণ্টার ভিতর কুয়ো কেটে ফেলল, বড় ইগলুর মেঝেতেই। বাইরে কুয়ো কাটার অসুবিধা ঘটতে পারে। কখন বরফ পড়বে, তার তো ঠিক নেই। আর বরফ পড়লেই কুয়ো বন্ধ হয়ে যাবে, মাছ ধরাও হবে বন্ধ।

ফ্রাংক ছিপ ফেলল, ম্যাক্সিমাস চলে গেল দূরবর্তী এস্কিমো পল্লীতে। সেখান থেকে সীলমাংস আনবে সে রোজই। জমা করবে এইখানেই। যাওয়ার দিন স্লেজে বোঝাই করে কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে।

৩

ম্যাক্সিমাস চলে গেল। ফ্রাংক মাছ ধরছে। কথা ঠিকই ম্যাক্সিমাসের। বিশ সের ত্রিশ সের ওজনের মাছ এক একটা। তুলতে হিমশিম খেয়ে যায় ফ্রাংক। তবু একদিনেই প্রায় বিশ মণ মাছ সে ধরল। সেগুলো গাদা করা রইল ঘরের কোণে।

সন্ধ্যাবেলা বরফের চাঁইগুলো আবার কুয়োর ভিতরে ফেলে দিল ফ্রাংক, কুয়ো বন্ধ হয়ে গেল। আবার কাল চাঁইগুলো তুলে নিলেই কুয়োতে মাছ ধরা যাবে। বরফের টুকরো, যত বড়ই হোক, সে তো আর ডোবে না!

রাত্রি ভোর হল। মাছ ধরতে বসার আগে এডিথকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুলো ফ্রাংক। সামান্য দূরই গিয়েছে, সমুখে পড়ল এক নেকড়ে। ফ্রাংক অমনি গুলি করল তাকে। নেকড়ে আহত হল, কিন্তু মরল না। সে পালাতে লাগল।

ফ্রাংক বলল—"আমি ওর পিছনে গিয়ে মেরেই আসি ওটাকে। তুমি ইগলুতে ফিরে গিয়ে দোর বন্ধ করে বসো।"

এডিথ একবার নেকড়ের মুখে পড়েছিল ফোর্ট টিমোতে। ও-জন্তুকে ওর খুব ভয়। এত কাছে নেকড়ে আছে দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে। ফ্রাংক ওটাকে মেরে আসতে চাইছে, তা যাক। ওটা মারা পড়লে এডিথ নিশ্চিন্দি হতে পারে। সে আপত্তি করল না।

টিমো ছুটল ফ্রাংকের সঙ্গে। এডিথ ঘরে ফিরল।
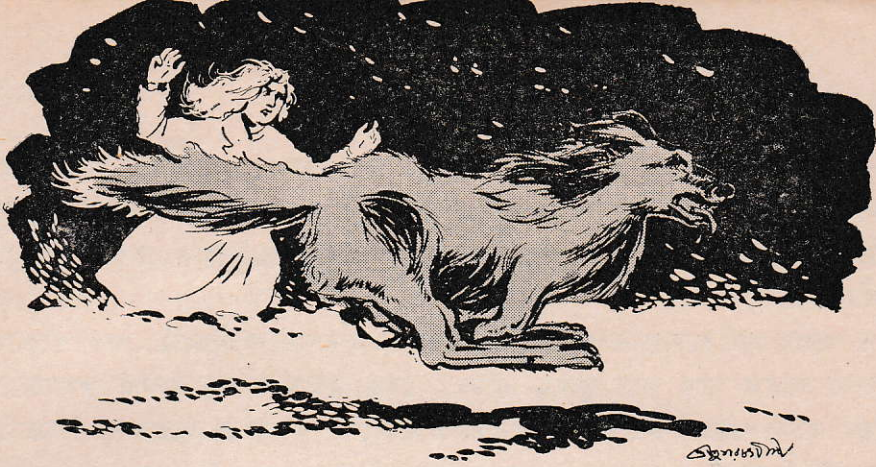
এডিথ ছুটল টিমোর পিছনে পিছনে।

নেকড়েটাকে মেরে ফিরে আসা,—এমন কিছু দেরি হওয়ার তো কথা নয়! কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্রাংক আসছে না। এডিথ চিন্তায় পড়েছে। ভয়ও পাচ্ছে। টিমোটা পর্যন্ত কাছে নেই তার।

ফ্রাংক-এর কোন বিপদ হল না তো? বেলা যে গড়িয়ে গেল। এডিথ একবার ঘর, একবার বার করছে। কী হল? কী হল?

অবশেষে টিমো এল, একা টিমো। "ফ্রাংক কই?"—ছুটে গিয়ে টিমোকে জিজ্ঞাসা করে এডিথ। তার উত্তরে টিমো টানে এডিথের ফ্রক কামড়ে ধরে। এডিথ বুঝতে পারে ফ্রাংকের বিপদই হয়েছে কিছু, টিমো তাকে ডেকে নিতে এসেছে, ফ্রাংকের সাহায্যের জন্য।

এডিথ ছুটল টিমোর পিছনে পিছনে। অনেক—অনেক দূর! হ্রদ পিছনে ফেলে পাহাড়ের রাজ্যে। অবশেষে ফ্রাংককে পেলো একটা খদের ভিতর। নেকড়ের পিছনে ছুটতে গিয়ে পায়ের নীচের খদের দিকে লক্ষ্য করেনি ফ্রাংক। পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়েছে পাথরের ঘায়ে। মাথায় লেগেছে চোট।

অজ্ঞান হয়ে আছে ফ্রাংক, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থাতেই তার ডান হাতখানা বন্দুক উঁচু করে রেখেছে। আর সেই অবশ হাতের বন্দুকই প্রাণ রক্ষা করেছে ওর। কারণ অদূরেই থাবা তুলে বসে আছে এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে। এগুতে সাহস পাচ্ছে না শুধু ঐ বন্দুকটা দেখেই। এডিথ আর টিমোকে ছুটে আসতে দেখে নেকড়ে সরে গেল।

নেকড়েটাকে দেখেছে এডিথ। কিন্তু এখন আর নেকড়ে বলে ভয় পাচ্ছে না তো! এখন যে ফ্রাংক বিপন্ন! এখন আর নেকড়ের ভয় করলে চলবে কেন এডিথের? দুঃসাহসের

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

নেশায় ভয়ভীতি সব মাথা থেকে উবে গিয়েছে বীর বালিকার। সে ছুটে গিয়ে ফ্রাংকের মাথা কোলে নিয়ে বসল। টিমো অস্থিরভাবে পায়চারি করছে তার চারধারে ঘুরে ঘুরে। এডিথ নেকড়ের সান্নিধ্যের কথা ভুলেছে সাময়িকভাবে, কিন্তু টিমোর তো তা এক মুহূর্তও ভুললে চলবে না!

ফ্রাংক-এর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। ক্রমাগত দলাইমলাই করে করে তার হাত-পা আবার গরম করে তুলছে এডিথ। কিন্তু ফ্রাংককে বড় অবসন্ন দেখাচ্ছে যে! এডিথ ভাবল এই অবসাদের কারণ তো সারাদিনের অনাহারও হতে পারে! ফ্রাংকের পকেটেই বিস্কুট ছিল, তাই ভেঙে ভেঙে ওর মুখে দিতে লাগল এডিথ। জলের বোতলও ছিল, জলও মুখে দিল কয়েক ঢোক।

সন্ধ্যার ওদিকে দেরি নেই খুব বেশী। একটু আগেই দিনের বেলাতেই নেকড়ে দেখা গিয়েছে এখানে। সন্ধ্যার পরে তারা তো দলে দলে হানা দেবে এসে! এখনও যদি ফ্রাংক উঠে বসতে না পারে, তা হলে তো নিরাপদে ইগলুতে পৌঁছনোই যাবে না।

"ফ্রাংক! ওঠো! ওঠো ফ্রাংক!"—এডিথের অনুনয় কাতর শুনে শুনে অবশেষে বুঝি হুঁশ হল ফ্রাংকের। সে উঠে বসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল কয়েক বার। উঠে বসে আবার নেতিয়ে পড়ে। দুই এক পা হাঁটে, তারপরই ধপাস্ করে শুয়ে পড়ে আবার। এডিথের কান্না পায়।

কিন্তু তবু কাঁদে না এডিথ। বাঁচাতে হবেই ফ্রাংককে। হবেই বাঁচাতে। নিজের উপর দারুণ রাগ হয়। বেরুবার সময় স্লেজখানা নিয়ে বেরোয়নি বলে।

অনেকবার উঠে পড়ে, অনেকবার শুয়ে বসে, অনেক ঘুরপথে অবশেষে খদের ভিতর থেকে সমতলে এসে পৌঁছোলো ফ্রাংক। কিন্তু আর সে পারে না। এবার যে সে শুয়ে পড়ল, আর সে উঠতে পারে না। শত চেষ্টাতেও।

এডিথ হতাশ হয়ে পড়ল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এভাবে ফ্রাংককে নিয়ে যাওয়া যাবে না কখনো। ওদিকে নেকড়েরা একটা একটা করে জানান দিচ্ছে। এই ডাইনে, এই বাঁয়ে, এই পিছনে—এই বা সমুখ পানেও। এ যে দেখি নেকড়েরই রাজ্য! হায়, ম্যাক্সি-মাসটাও যদি আসত! কিন্তু ম্যাক্সিমাস এত শীঘ্র আসতে পারে না, তা জানে এডিথ। সে আসবে আবার কাল বিকাল নাগাদ, বলেই গিয়েছে। এস্কিমো গ্রামে নাকি কে তার আত্মীয়া আছে পীড়িত। তার কাছে রাত্রিটা কাটাবে, এমনিই কথা রয়েছে। সীলমাংস যোগাড় করবে কাল সকালে, ফিরবে দুপুরের পরে, পৌঁছোবে সন্ধ্যার আগে।

তাহলে এখন উপায় ? বারো বছরের মেয়ে এডিথ ভেবে ঠিক করল যে ইগলুতে গিয়ে স্লেজ নিয়ে আসা ছাড়া ফ্রাংককে বাঁচাবার আর কোন পথই নেই।

অর্থাৎ এইখান থেকে ইগলু পর্যন্ত এডিথকে একা যেতে হবে। আবার ইগলু থেকে এই পর্যন্ত তাকে ফিরতেও হবে একা। সঙ্গে টিমোকেও নেওয়া চলবে না, কারণ অরক্ষিত অজ্ঞান ফ্রাংককে ছিঁড়ে খেতে এক মিনিটও দেরি করবে না নেকড়েরা, টিমো যদি এডিথের সাথে যায়।

আর অরক্ষিত একাকিনী এডিথকে কি ছেড়ে কথা কইবে নেকড়েরা ? ঐ সমুখে, ডাইনে, বাঁয়ে, মুহুর্মুহু ডাক শোনা যায় না তাদের ?

কিন্তু ও চিন্তা করতে গেলে আর ফ্রাংককে বাঁচানো হয় না। নিজের ভাগ্য নিয়ে বেশী ভাববার সময় এ নয়। ভগবান তো আছেন !

টিমোকে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল এডিথ যে তার স্থান এখন ফ্রাংকের পাশে। তারপর সে ছুটল ইগলুর দিকে। টিমো সেই যে একটানা চিৎকার শুরু করল মর্মবেদনায়, সে আর থামে না। বুদ্ধিমান কুকুর বুঝতে পেরেছে বর্তমানের এই উভয় সংকটের কথা। তার নিজের ইচ্ছায় কাজ করবার অধিকার থাকলে সে হয়তো এডিথেরই সঙ্গ নিত। কিন্তু তা তো নেই ! এডিথ হুকুম করেছে তাকে এখানেই থাকতে হবে।

টিমো থামে না, ক্রমাগত চিৎকার করেই চলে। কখনো করে ক্রুদ্ধ গর্জন, কখনো যেন হতাশ কান্নায় ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু তার ঐ অবিরাম চিৎকারই বোধ হয় রক্ষা করল ওদিকে এডিথ, এদিকে ফ্রাংকের জীবন। কুকুরটা যে ঠিক কোন্ দিকটাতে ডাকছে, তা ঠাহর করে উঠতে পারল না নেকড়েরা। তাদের মনে হতে লাগল চারদিকেই যেন কুকুর ডাকছে, অনেকগুলো কুকুর। একবার যদি তাদের মাথায় এ কথা আসত যে একটা অরক্ষিত বালিকা একা ছুটে বেড়াচ্ছে এই বরফক্ষেত্রে রাত্রিবেলা তাদের নাকের ডগা দিয়ে, তাহলে এডিথের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

অবশেষে স্লেজ এনে তাতে ফ্রাংককে টেনে তুলল এডিথ, আর টিমো স্লেজ টেনে এনে ফেলল ইগলুতে। তখন একটুখানি বুঝি জ্ঞান ফিরে এসেছিল ফ্রাংকের, তাই সে নিজেই উঠে ঢুকতে পারল ইগলুতে। কিন্তু বিছানায় শোবার পরেই সে যে আবার জ্ঞান হারাল, সে জ্ঞান আর কিছুতেই ফিরতে চায় না।

ফ্রাংকের লেগেছে মাথায় চোট, স্নায়ুগুলোই অসাড় হয়ে পড়েছে। এডিথ তাকে সুস্থ করে তুলবে কেমন করে ? মাঝে মাঝে গরম চা তার মুখে ধরে, কখনও তা গলা দিয়ে

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

নামে, কখনও আবার কষ বেয়ে বেরিয়ে আসে। ঘন ঘন ফ্রাংকের বুকের উপর কান পেতে শোনে ধুকধুক করছে কিনা। করছে দেখে সাময়িক আশ্বাস পায়, পরক্ষণেই ভেঙে পড়ে হতাশায়, করছে বটে এখনও ধুকধুক, থেমে যেতে কতক্ষণ ?

এ কালরাত্রি কি পোহাবে ?

এডিথের কেমন ধারণা হল যে পোহাবে না। রাত্রির ভিতরেই মরে যাবে ফ্রাংক। অথচ তার কিছুই করবার নাই। ম্যাক্সিমাস হাজির থাকলে এক্ষুণি সে স্লেজে করে ফ্রাংককে ফোর্ট টিমোতে নিয়ে যেতে পারত। মানুষটাকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা হতে পারত তাহলে কিন্তু সব মাটি হয়েছে। ম্যাক্সিমাস না থেকে।

ফোর্ট টিমোতে ? এডিথ পারে না ফ্রাংককে নিয়ে যেতে ? স্লেজ তো রয়েছে ! টানবে তো টিমো ! তবে এডিথ কেন পারে না ?

না, সত্যিই পারে না। আসার সময় এডিথ দেখেছে—স্লেজটাকে অনেকবার নীচে থেকে উপরে তুলতে হয়েছে, ঘাড়ে করে লাফিয়ে খদ পার করে আনতে হয়েছে অনেকবার। সে-কাজ ফ্রাংক পেরেছে, ম্যাক্সিমাস পেরেছে, এডিথ পারবে কেন ?

না, এডিথ পারবে না, ম্যাক্সিমাস না এলে ফ্রাংক বাঁচবে না।

কিন্তু ম্যাক্সিমাস আসবে কাল বিকালে। তার আগে তাকে আনবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে খবর দেওয়া। আর খবর দিতে হলে এডিথকে যেতে হয় তার কাছে, সেই দূরবর্তী এস্কিমো পল্লীতে। এক্ষুণি যেতে হয়। এক্ষুণি ! ঐ নেকড়ের গর্জনকে তুচ্ছ করে।

তাই যাবে সে। তাই যাবে। এক্ষুণি যাবে। ম্যাক্সিমাস কোন দিকে গিয়েছে সকালে, তা দেখেছে এডিথ। সেই দিক পানেই সে যাবে। টিমো অসাধারণ বুদ্ধিমান কুকুর। ম্যাক্সিমাসের গায়ের গন্ধ শুঁকে সে যেতে পারবে না ? বৃষ্টি বরফ তো কিছু হয়নি সে যাওয়ার পরে ! গন্ধ ধুয়ে যায় নি।

যেমন চিন্তা, তেমনি কাজ। ফ্রাংকের হাতের কাছে গরম চা আর কিছু খাবার রেখে দিয়ে এডিথ বেরিয়ে পড়ল ইগলু থেকে। বড় বড় বরফের চাঁই এনে দরজাটা শক্ত করে বন্ধ করল, যাতে নেকড়েরা ঢুকতে না পারে ভিতরে।

তারপর টিমোকে স্লেজে জুতে গভীর রাত্রে অজানা বরফের রাজ্যে বেরিয়ে পড়ল এডিথ।

ম্যাক্সিমাস ? কোথায় তুমি ? কোথায় ?

টিমো ছুটে চলল। এদিকটাতে সমতল বরফেরই রাজ্য, খাদ না থাকতে পারে। থাকে যদি, এডিথের এই যাত্রাই মহাযাত্রা। নেই মনে করেই সে টিমোকে ছুটিয়েছে। টিমোও ছুটেছে গন্ধ শুঁকে শুঁকে। ঠিক পথেই যাচ্ছে ওরা। এডিথের মনে সাহস এলো। পথ চিনতে না পারলে টিমো দ্বিধার ভাব দেখাতো একটা। তা সে দেখাচ্ছে না তো!

হঠাৎ এ কী? চোখ ধাঁধিয়ে একটা বিদ্যুৎ চমকাল, তারপরই কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল একটা। সর্বনাশ! নিজের ভাবনা নিয়েই পাগল হয়ে ছিল এডিথ, আকাশের দিকে একবারও চোখ তুলে চেয়ে দেখেনি। সেখানে যে মেঘের পরে মেঘ সেজেছে দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি, তা তো টের পায়নি সে!

হু-হু-হু-হু ঝড়ে উঠছে তুষার কান্তারে। স্লেজ উলটে যেতে চায়। ঝড় এসে আছড়ে পড়ে টিমোর আর এডিথের মুখের উপরে, দম বন্ধ হয়ে যায় তাদের। চলাও বিপজ্জনক, থেমে থাকাও অসম্ভব। কিন্তু, কারা যেন কথা কইছে না? ঐ যে অল্প দূরেই? মানুষ! মানুষের কণ্ঠ বলেই তো মনে হয় এডিথের।

সে চেঁচিয়ে উঠল—"কে ওখানে? এস, এইদিকে এস একবার।" না এল না কেউ। অথচ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মানুষের কথা। একজন দুইজন নয়, অনেকের কণ্ঠস্বর।

এডিথ আবার ডাকল—"কে গো এখানে? একবার এসো না! আমি বড় বিপদে পড়েছি।"

না, তবু কেউ আসে না, কথা তারা কয়েই যাচ্ছে। এডিথ ভাবল, 'ঝড়ের গতিটা ওদের দিক থেকে আমার দিকে হয়ত। তাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না ওরা। শুনতে পেলে কি আর আসত না? আমার ভাষা না বুঝুক, মানুষের গলা তো আর না চিনবার কথা নয়!'

ঝড়টা কোন্ দিক্ থেকে কোন্ দিকে বইছে, তা সত্যই বুঝতে পারছে না এডিথ। কখনও মনে হয় এদিক, কখনও মনে হয় ওদিক। আসলে বাতাস বইছে উলটোপালটা। আর সেই ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় ঝাপটায় বরফের প্রপাত। কী ঠাণ্ডা সে-হাওয়া। পোশাক ভেদ করে বরফ ঢোকে না, কিন্তু হাওয়া ঢোকে, আর ঢুকেই হাড়ের ভিতরটা পর্যন্ত জমিয়ে দিতে চায়।

মানুষের কথা তবু শুনতে পাচ্ছে এডিথ। অনেক ডেকেও যখন সাড়া পেলো না কারও, তখন সে নেমে পড়ল স্লেজ থেকে। অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না এক আঙ্গুলও, স্বর লক্ষ্য করে এডিথ ছুটল।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

যেখান থেকে কথা শোনা যাচ্ছিল, সেটা বেশী দূর তো হবার কথা নয়! কিন্তু যতই ছোটে, স্বর যেন আরও দূরে সরে যায়। আবার ছোটে, আবার! আবার! সে-স্বর তবু আরও একটু সমুখে, আরও একটু, আরও একটু!

কোথা থেকে টিমোর ভকভক আওয়াজ কানে আসছে, ঠিক ঠাহর হচ্ছে না এডিথের। সে এবার সন্দেহে পড়ল। যে-শব্দ সে শুনেছে, তা সত্যিই মানুষের স্বর তো? অন্য কোন শব্দকে সে মনুষ্যকণ্ঠ বলে ভুল করেনি তো?

যা হোক, আর ও-স্বরের পিছনে ধাওয়া করা উচিত হবে না বলে মনে হচ্ছে এডিথের। ঝড় তাকে বার বার উলটে ফেলে দিতে চাইছে, সে স্লেজে ফিরে যাবে ভাবল—'টিমো' বলে ডাকল সে। কোথা থেকে কে জানে টিমো সাড়া দিল 'ভক্'—

আর সেই মুহূর্তে চড় চড় চড়াৎ করে একটা আকাশ-ফাটানো আওয়াজ হল। না, বাজ পড়ে নি, তাহলে বিদ্যুৎ চমকাত। এ আওয়াজ তবে কিসের? এডিথ বুঝতে পারল না ঠিক, কিন্তু টের পেল যে তার পায়ের নীচের বরফ যেন পিছন দিকে দৌড়োতে শুরু করেছে। কাঁপছে সারা তুষারপ্রান্তর থরথর করে। এডিথ দাঁড়াতে পারে না খাড়া হয়ে, বাধ্য হয়ে বসে পড়ল।

ঝড়ের বেগে তুষারক্ষেত্রটা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে। এ জায়গাটার নীচে ডাঙ্গা নেই, আছে আঙ্গাভা সাগরের অতল জল, তা তো এডিথ জানে না!

তুষারক্ষেত্রটা ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে। একটা টুকরো বায়ুবেগে ভেসে চলেছে মেরুসমুদ্রের দিকে। সেই টুকরোটার উপরেই আটকে গিয়েছে এডিথ। ব্যাপারখানা বুঝতে না পারলেও এডিথ ভয় পেয়েছে, প্রথমতঃ সেই বিকট আওয়াজে, দ্বিতীয়তঃ তুষারক্ষেত্রের এই দ্রুত গতিবেগে। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল—"টিমো!"

বহুদূর থেকে একটা কান্নার মত স্বর অস্পষ্টভাবে কানে এল এডিথের—"ভকভক ভেউ! ভকভক ভেউ-য়া।"

৪

পরদিন বিকালবেলা সীলমাংসের বোঝা নিয়ে ম্যাক্সিমাস এসে ইগলুতে হাজির। ইগলুর দরজা বরফের চাঁই দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করা রয়েছে দেখে সে অবাক! ফ্রাংক কি এডিথকে নিয়ে হঠাৎ চলে গেল ফোর্ট টিমোতে?

কিন্তু সে-রকমটা তো কথা ছিল না! আর তারা গিয়েই যদি থাকবে, এত যত্ন করে

ইগলুর দরজা বন্ধ করবার দরকার কি ছিল? ব্যাপারটা রহস্যের মত লাগল ম্যাক্সিমাসের। সে দরজা খুলে ফেলল ইগলুর।

খুলেই তার চক্ষু স্থির। বিছানার উপর ফ্রাংক একা পড়ে আছে, অল্প অল্প জ্ঞান হচ্ছে সবে তার। এডিথ নেই, টিমো নেই, স্লেজ নেই। কোথায় গেল তারা?

একটা সম্ভাবনার কথা মনে হল ম্যাক্সিমাসের। ফ্রাংক অবশ্যই কোন দুর্ঘটনায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আর তার জ্ঞান ফিরে আসবার কোন লক্ষণ না দেখে ভয় পেয়ে এডিথ ফোর্ট টিমোতে বাবার কাছে রওনা হয়েছে স্লেজ নিয়ে।

এ ছাড়া আর কী হতে পারে? কিন্তু এইরকমই যদি হয়ে থাকে, তাহলেও তো খুব আশঙ্কার কথা। এডিথ একা কি কখনও পৌঁছোতে পারবে বাবার কাছে? রাস্তায় রয়েছে বড় বড় খদ, উঁচু উঁচু পাহাড়। কী করে সে-সব পার হবে সে?

এডিথ যে বাবার কাছে যায়নি, গিয়েছে উলটো দিকে, এটা মোটেই মাথায় আসেনি বেচারী এস্কিমোর।

যা হোক, এখন ম্যাক্সিমাসের কর্তব্য হল ফ্রাংককে ফোর্ট টিমোতে নিয়ে যাওয়া। স্লেজ নেই, সে উইলো গাছের ডাল কেটে নিয়ে এল এক বোঝা। অন্য গাছ ঐ হ্রদের ধারে জন্মায় না। সেই ডাল সব একত্র বেঁধে একটা স্লেজের মত জিনিস সে গড়ে ফেলল, আর তারই উপরে ফ্রাংককে শুইয়ে সে টানতে লাগল।

অসুরের শক্তি তার দেহে। তাই কখনও স্লেজে করে, কখনও কাঁধে করে ফ্রাংককে সে অবশেষে ফোর্ট টিমোতে নিয়ে পৌঁছে দিল। ফ্রাংকের অবস্থা দেখে স্ট্যানলি ভীত, মর্মাহত, কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে এডিথকে ম্যাক্সিমাস ইগলুতে দেখতে পায়নি—

না, এডিথকেও দেখতে পায়নি, টিমোকেও দেখতে পায়নি, দেখতে পায়নি স্লেজখানাও—

স্ট্যানলি পাগলের মত হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর হাহাকারে কেনিয়াপুস্কার তীর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আহা, একমাত্র সন্তান!

ফোর্ট টিমোর অর্ধেক লোক ছুটল সেই অপয়া হ্রদে। ইগলু থেকে শুরু করে সমুদ্রতীর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজল তারা। টিমোকে পাওয়া গেল মুমূর্ষু অবস্থায়। তখনও স্লেজের সঙ্গে সে বাঁধা রয়েছে। কিন্তু এডিথের কোন চিহ্ন কোন দিকে কেউ দেখতে পেল না।

তুষারক্ষেত্রটা যে ঝড়ের রাত্রে ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছে, এমন সন্দেহ করবার

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

কোন হেতুই তাঁরা দেখতে পাননি। ভগ্নহৃদয়ে স্ট্যানলি ফোর্ট টিমোতে ফিরে এলেন। কর্তব্য তো রয়েছে সেখানে!

ফ্রাংক সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে তার হাসি নেই। তার জন্যই এডিথ মৃত্যুবরণ করেছে—এ চিন্তা তাকে পাগল করে ফেলেছে যেন। এভাবে বেশীদিন থাকলে সে শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে মনে করে স্ট্যানলি তাকে ইয়র্ক টাউনে, কোম্পানির বড় আফিসে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করলেন। কেনিয়াপুস্কা অঞ্চলে ফার ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কী রকম, তারই সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য বড়কর্তারা একজন দায়িত্বশীল লোক পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। স্ট্যানলি নির্বাচিত করলেন ফ্রাংককেই। সে ম্যাক্সিমাসকে আর টিমোকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল নৌকোপথে।

হালকা নৌকো। কূল থেকে দূরে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া, মুস্কিগান ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে হবে যাত্রাপথে। তাদের সঙ্গে হাডসন বে কোম্পানির কারবার চলছে অনেকদিন। তাদের উপহার সামগ্রী দিতে হবে, ব্যবসা সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে হবে, যেখানে যেখানে ওদের গ্রাম আছে সমুদ্রের কাছাকাছি, ফ্রাংককে নামতেই হবে এক একবার।

এমনি এক গ্রামে ফ্রাংকের সঙ্গে মগী বুড়ীর দেখা। মগী আগে মুজ কেল্লাতে চাকরি করত। মাঝখানে তার ছেলে দিনকতক সর্দার হল ইণ্ডিয়ানদের। সর্দারের মা দাসীগিরি করবে, তা তো আর হতে পারে না। সর্দার মাকে মুজ থেকে আনিয়ে নিজের কাছে রাখল। তার পরেই সর্দার নিজে মারা গেলে, মগীর আর মন টিকছে না এখানে। সে আবার কোম্পানির চাকরিতে ফিরে যেতে চায়।

"তা তুমি চল আমার সঙ্গে"—বলল ফ্রাংক—"আমি মুজ হয়ে যাব, ইচ্ছে করলে সেখানেও তুমি থেকে যেতে পার, নয়ত আমি যখন টিমো কেল্লাতে ফিরব, আমার সঙ্গে স্ট্যানলি সাহেবের কাছেও ফিরে যেতে পারবে। তিনিই তো তোমার পুরোনো মনিব।"

সেই বন্দোবস্তই ঠিক হল। মগী চলে যাবে ফ্রাংকের সঙ্গে। কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় ফ্রাংক দেখল আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে মগীর উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। বলল—"ওটি কে?"

"ও? ও এক এস্কিমো মেয়ে। আমার ছেলে যখন সর্দার ছিল, এক এস্কিমো গ্রাম থেকে ওকে ধরে আনে। সে ওকে যত্ন করে রেখেছিল, ঐ মিস্তাগুশের হাত থেকে বরাবর

বাঁচিয়ে এসেছিল ওকে। এখন আমার ছেলে নেই, মিস্তাগুশ ওকে বিয়ে না করে ছাড়বে না। আমি আর কী করতে পারি?"

ঠিক এই সময় ম্যাক্সিমাস এসে উপস্থিত, ফ্রাংকের সঙ্গে কী একটা কথা কইতে। সে দেখল মেয়েটিকে, মেয়েটি দেখল তাকে। দু'জনেই চমকে উঠল, তারপর চোখে চোখে ইশারা। ম্যাক্সিমাস ফ্রাংককে বলল—"ঐ আমার হারানো স্ত্রী।"

ফ্রাংক তক্ষুণি গিয়ে নতুন সর্দারকে বলল—"ঐ মেয়েটিকে আমি নিয়ে যেতে চাই। ও এস্কিমো। আমার এই সহচরের স্ত্রী।"

সর্দার সাহেব কোম্পানির সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ সাহেবেরা রেগে গেলে বন্দুক সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে অনুমতি দিল—আনিটকা চলে যেতে পারে ফ্রাংকের সঙ্গে।

কিন্তু এ আদেশ মিস্তাগুশ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারল না। সে সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া করল এ নিয়ে, তারপর কয়েক জন বন্ধু নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল অরণ্যের ভিতর।

তা যাক, ফ্রাংককে তারা ঘাঁটাতে সাহস পেলো না। সাহেবকে তাদের বড় ভয়। ফ্রাংক ম্যাক্সিমাস, আনিটকা, মগী বুড়ী—সবাইকে নিয়ে নৌকোয় উঠল আবার।

ইয়র্ক টাউনে গিয়ে খ্রীস্টধর্মমতে নতুন করে ফ্রাংক বিয়ে দিল ম্যাক্সিমাস আর আনিটকার। তারপর, ইয়র্ক টাউন থেকে নিজের শীঘ্র ফেরার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে সে সঙ্গীদের সবাইকে টিমো কেল্লাতে ফেরত পাঠিয়ে দিল। নৌকায় করে রওনা হয়ে গেল ম্যাক্সিমাস, আনিটকা, মগী আর টিমো।

সমুদ্রযাত্রার প্রথম দিকটা তারা বেশ আরামেই কাটাল। বিপদ দেখা দিল সেইখানে এসে, যে-অঞ্চলটাতে মুস্কিগানদের বাস। মিস্তাগুশ নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে, আর আনিটকাকে কেড়ে নেবার জন্য সে আর একটা আপ্রাণ চেষ্টা করবেই।

ম্যাক্সিমাসের মুশকিল হল তার নৌকোখানা খুবই ছোট। এ নৌকো সমুদ্রের কূলে কূলে বেয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তা ছাড়া, দিনের বেলা গাদাগাদি হয়ে বসলে সব কয়টা লোক এবং একটা কুকুরের জায়গা একরকম সংকুলান এতে হয়, কিন্তু রাত্রে তো একটু ঘুমের দরকার। বিশেষ করে ম্যাক্সিমাসের, কারণ সারা দিন দাঁড় টানবার দায়িত্ব তার।

তাই, সারাদিন কূল থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকলেও রাত্রে একবার কূলে উঠতে

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ম্যাক্সিমাস বাঁধা হাত তু'খানাই উঁচু করল বল্লমের আঘাত ঠেকাতে।

হয়ই ম্যাক্সিমাসকে। অরণ্যের অতি নিভৃত কোনও স্থানে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে আবার রাত থাকতেই সে নৌকোয় ওঠে।

কিন্তু একদিন তবু বিপদ ঘটল। মিস্তাগুশ ধরে ফেলল ম্যাক্সিমাসকে। সে পাহাড়ের চূড়া থেকেই হোক, বা কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকেই হোক, বরাবর নজর রেখেছে ম্যাক্সিমাসের নৌকোর উপরে।

সে রাত্রে কূলের কাছেই একটা পাহাড়ের গুহা পেয়ে ওরা তার ভিতরেই শুয়েছিল। হঠাৎ এক সময় টিমো লাফিয়ে উঠে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল। এ-রকমটা করার কথা নয় টিমোর। শত্রুপুরীতে এসে ডাকাডাকি বন্ধ করে থাকতে হবে, এ কথা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবু সে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরুলো। অর্থাৎ বিপদ রীতিমত সাংঘাতিক। ম্যাক্সিমাস ধড়মড় করে উঠে বসতে না বসতে ঝড়ের বেগে একদল ইণ্ডিয়ান ঢুকে পড়ল গুহার ভিতরে আর চেপে ধরল ম্যাক্সিমাসকে। যত বড় শক্তিমানই হোক, চার পাঁচটা বলবান ইণ্ডিয়ানকে ঠেলে ফেলে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারল না।

আনিটকাকে আগেই ধরে নিয়ে গিয়েছে আর কয়েকজন ইণ্ডিয়ান। বেশী দূরে নয়, বনের ভিতরেই একটা ফাঁকা জায়গায়। সেইখানেই রাত্রিশেষে বন্দী ম্যাক্সিমাসকে নিয়ে এল তারা। উদ্দেশ্য আনিটকার সমুখেই তাকে হত্যা করা। বীরত্ব দেখানো চাইত!

ম্যাক্সিমাসকে দাঁড় করিয়ে মিস্তাগুশ বল্লম ছুড়ল তার মাথা লক্ষ্য করে। ম্যাক্সিমাসের হাত বাঁধা ছিল বটে, কিন্তু পিছমোড়া করে নয়। সে বাঁধা হাত তু'খানাই

উঁচু করল বল্লমের আঘাত ঠেকাতে। একখানা হাত অনেকখানি কেটে গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেটে গেল হাতের বাঁধনও।

তখন ম্যাক্সিমাসকে পায় কে? সে ভীমবেগে এক লাথি মারল মিস্তাগুশের পেটে, সে ছিটকে পড়ে গেল বন্ধুদের ঘাড়ে। আর, তারা সামলে উঠবার আগেই আনিটকাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ম্যাক্সিমাস দিল দৌড়।

মিস্তাগুশেরা গুলি চালাতে শুরু করল যখন, তখন ম্যাক্সিমাস সেই গুহায় পৌঁছে গিয়েছে আবার। পৌঁছে গিয়েছে টিমো এবং মগীও।

ফ্রাংক দুটো বন্দুক দিয়েছিল ম্যাক্সিমাসকে। গুহাতেই ছিল সে দুটো। ইণ্ডিয়ানেরা লক্ষ্য করেনি সে মহামূল্য জিনিস। এখন সারাদিন ধরে থেকে থেকে গুলি বিনিময় চলতে থাকল দুই পক্ষে।

সারাদিন নৌকোয় চড়বার কোন চেষ্টাই করেনি ম্যাক্সিমাস। কারণ তা করলে, নৌকোটা ঠিক কোথায় আছে—টের পেয়ে যাবে শত্রুরা। একটা গুলি মেরে নৌকোটা ডুবিয়েও দিতে পারে।

সে-চেষ্টা করল রাত্রির অন্ধকারে। সবাইকে নিয়ে নৌকোর কাছে গেল সে। কিন্তু নৌকো সরে গিয়েছে অথই জলে। এদিকে এরা কেউ সাঁতার জানে না। এ বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করল টিমো। সে সাঁতার দিয়ে নৌকোর কাছে গেল, আর তার পিঠ ধরে ধরে গেল ম্যাক্সিমাস। তারপর নৌকো ভেসে চলল কেনিয়াপুস্কার মোহনার দিকে।

৫

এইবার একবার মেরুসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। এডিথকে নিয়ে ভাসমান তুষারক্ষেত্র যেদিকে ছুটে গিয়েছিল সেই ঝড়ের রাত্রে।

সারা রাত্রি ঘোর দুর্যোগ চলল। গভীর অন্ধকারের ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে এডিথ। সেই কণ্ঠস্বরগুলো এখনও থেকে থেকে কানে আসে তার। তবে ক্রমে সে বুঝেছে —ও স্বর মানুষের কণ্ঠের নয়। হাওয়ার শব্দ, ঢেউয়ের শব্দ, বরফ বৃষ্টির শব্দ সব একসাথে মিশে সৃষ্টি করেছে ঐ বিটকেল আওয়াজ।

সারা রাত্রি এক ফুট সমুখের কোন জিনিস সে নজরে আনতে পারেনি। অবশেষে রাত্রি প্রভাত হল যখন, সে দেখল তার নিজস্ব বরফক্ষেত্রটা এসে বেমালুম মিশে গিয়েছে আর একটা হাজার গুণ বড় বরফরাজ্যের গায়ে। এ-রাজ্যে উঁচু পাহাড় আছে, তাও বরফে ঢাকা।

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

এ-রাজ্যে সমতল লোকালয় আছে, বরফে ঢাকা তাও, কিংবা বলা যায় বরফের জমিতে— বরফের ঘর গড়ে বাস করছে এখানকার লোকেরা।

এস্কিমো এরা। স্বভাবে যেমন নোংরা, পোশাকে তেমনি জবড়জঙ্গ। কিন্তু এদিকে আবার তেমনি সরল, তেমনি সহৃদয়। এডিথের ভাষা এরা বুঝল না, কিন্তু এটা বুঝল যে ঠাণ্ডায় মেয়েটা মারা যেতে বসেছে। তাকে তুলে নিয়ে এক রাশি লোমওয়ালা চামড়ার ভিতর ঢাকা দিল তার আপাদমস্তক।

সেইখানেই এডিথ বাস করে। কান্নাকাটি করে না। করলেও অতি গোপনে। এস্কিমোদের কথা বুঝবার চেষ্টা করে। তাদের সর্দার আনাটকের বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে পিঠে করে, যদিও সেটা অত্যন্তই নোংরা। ছেলেটা অবিশ্রান্ত হাসছে, হাসাই তার স্বভাব। কাঁদে কেবল যখন এডিথ তার গায়ের ময়লা তুলবার জন্য ঘষাঘষি করে।

এস্কিমোরা বরফের ইগলুতে বাস করে, বৃহৎ সব ইগলু, যাতে আট দশটা লোক সারা গেরস্তালির জিনিস নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বাস করতে পারে। এডিথকে তারা আলাদা একটা ইগলু তৈরি করে দিয়েছে, সেটিকে পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য এডিথের চেষ্টার অন্ত নেই।

এস্কিমোরা কাঁচা মাংস খায়, এডিথ খায় রান্না করে। ঐ একই মাংস অবশ্য, যা এস্কিমোরা নিজেরা খায়। যখন যা জোটে—হরিণ, ভালুক, সীল, সিন্ধুঘোটক। ও-বিষয়ে বাছ-বিচার করতে গেলে এডিথকে না খেয়ে মরতে হয়।

নিজের উদ্ধারের চিন্তা সে স্বভাবতঃই করে, প্রকাশ্যে কান্নাকাটি না করলেও। উপায় ঠিক করতে পারে না কিছু। এক রাত্রির ঝড় তাকে কত শো মাইল উত্তরে ঠেলে এনেছে, সে-সম্বন্ধে কোন আন্দাজ নেই তার। জিজ্ঞাসা করে দেখেছে, এই এস্কিমোরা কেনিয়াপুস্কা নদী বা আঙ্গাভা সাগর বা কানাডা দেশ—কোন কিছুর কথাই কোনদিন কানে শোনেনি। সে-সব যে কোথায় কত দূরে কোন্ দিকে, এরা তা কিছুই বলতে পারে না।

তার উপরে এদের কায়াক আর উমিয়াক ছাড়া কোন নৌকো নেই, সে সব শীতের শেষে, এই গ্রামের নীচে বরফ ফেটে সমুদ্রের জল দেখা দেয় যখন, তখন এরা ব্যবহার করে কাছাকাছির ভিতরে। বাহির সমুদ্রে সে-সব ব্যবহারের কোন উপায় নেই।

তবে? কী করে বেরুবে এডিথ এদেশ থেকে? কী করে কবে আবার দেখা পাবে তার বাবার, তার স্নেহময়ী মায়ের?

ভেবে ভেবে একটা উপায় সে মাথা থেকে বার করল। সিন্ধুঘোটকের হাড়ের ছোট ছোট টুকরো সংগ্রহ করল এস্কিমোদের কাছ থেকে। আর সংগ্রহ করল ঐ হাড়েরই ছুরি।

● আঙ্গাভা

সেই ছুরি দিয়ে সেই হাড়ের টুকরোগুলিতে পাঁচটা করে ইংরেজী অক্ষর সে খোদাই করল অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে। সেই পাঁচটি অক্ষর হল E, D, I, T, H। একত্র পড়লে হবে "এডিথ"।

খোদাই শেষ হলে সীলের শুকনো নাড়িতে বেঁধে এক একটা হাড়ের টুকরো সে এক একজন মাতব্বর এস্কিমোর গলায় ঝুলিয়ে দিল। মাতব্বরেরা তো হেসেই অস্থির। তাদের ধারণা আশ্রয় এবং খাদ্যের বিনিময়ে মেয়েটা তাদের কৃতজ্ঞতার উপহার দিয়েছে এক একটা। শিশুর মত সরল প্রাণ তাদের, খুব খুশী তারা গয়না পেয়ে।

এইবার শীত কমছে। গ্রামের নীচে দুই একটা ফাটল দেখা দিচ্ছে বরফে। নীল জল চিকচিক করছে তার নীচে। এই সময়ে এস্কিমোরা শিকারে বেরোয় একবার। এরপর শিকার ধরা কঠিন হবে। খোলা জলে সীল বা সিন্ধুঘোটক শিকার করার বিদ্যে ওদের জানা নেই। বরফের তলা থেকে জন্তুগুলো যখন ঢুঁ মেরে মেরে উপরে ওঠে, খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার জন্য, তখনই ওরা বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলে তাদের। এই বল্লমও অবশ্য সিন্ধুঘোটকের হাড় দিয়ে তৈরী।

সর্দার আনাটক মস্ত শিকারী এদের মধ্যে। তার ভাইপো পিটুট এসে ডেকে নিয়ে গেল এডিথকে শিকার দেখবার জন্য। স্লেজে চড়ে এডিথ চলল অন্য সব মেয়েদের সাথে। অবশ্য যাওয়ার সময় স্লেজ খালি পেয়েছে বলেই মেয়েরা চেপে বসেছে ওতে। ফিরবার সময় স্লেজ বোঝাই হয়ে আসবে নিহত সীল, সিন্ধুঘোটক বা শ্বেত ভল্লুকের মাংসে।

বাহাদুর আনাটক! একটা সিন্ধুঘোটক সে দেখতে দেখতে শিকার করে ফেলল। সেটাকে কেটে কেটে স্লেজ বোঝাই করছে মেয়েরা, এমন সময় আনাটক দেখতে পেল বরফ-ক্ষেত্রের মাথায় এক বল্গা হরিণ।

আনাটক ছুটল হরিণ শিকারের জন্য। হরিণও প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে, পিছনে দৌড়ুচ্ছে আনাটকও। বাহির সমুদ্রের পানে। এদিকে গোটা এস্কিমো পল্লীর মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। আনাটকের হরিণ শিকার একটা দেখবার মত জিনিস।

যারা দূর থেকে দু'চক্ষু বিস্ফারিত করে শিকার দেখছিল—তাদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। গ্রামের নীচে বরফক্ষেত্রে প্রকাণ্ড ফাটল বেরিয়েছে। অন্ততঃ পনেরো ফুট জায়গায় সমুদ্রের ঢেউ উঠছে উত্তাল হয়ে।

বহুকণ্ঠের সেই চিৎকার বহুদূরে ধাবমান আনাটকও শুনতে পেল। থমকে দাঁড়িয়ে

● শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

পিছনের ফাটল সেও দেখল। তারপরই শিকারের নেশা বিলকুল উবে গেল তার। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য বায়ুবেগে ছুটল গ্রামের দিকে। আনাটক ছুটে আসছে, এদিকে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ফাটল দেখা দিচ্ছে বরফক্ষেত্রে। দু'চার পা ছুটছে আনাটক। আর ঘুরে অন্য পথ ধরতে হচ্ছে নতুন একটা জলরেখাকে এড়িয়ে যাবার জন্য।

তীরের লোকেরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে? পারবে কি? আনাটক পারবে কি পৌঁছোতে?

না, পারল না। একটা চড়চড় চড়াৎ শব্দ হল—এমন শব্দ সেই ঝড়ের রাতের আগেও একবার শুনেছিল এডিথ। শব্দটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফক্ষেত্রটা দুই টুকরো হয়ে গেল। এ আর ফাটল নয়, যতদূর দৃষ্টি চলে—একটা অন্তহীন খাড়ি। আনাটক সাঁতার জানে না যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এদিকে খাড়ির জলে এমন ঢেউ উঠছে যে তাতে কায়াক নামানোও চলে না। তা ছাড়া খাড়ি হাতের কাছে নয়। কায়াক নিয়ে সেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে করতে আনাটক কোথায় চলে যাবে, ঠিক কী?

চলেই গেল আনাটক। তাকে নিয়ে বিস্তীর্ণ বরফক্ষেত্র ভেসে চলল অজানা সমুদ্রে। সবাই দেখল আনাটক একবার খাড়ির এ-মাথার দিকে ছুটছে, আর একবার ও-মাথার দিকে। ঠিক পাগলের মত।

দেখল এডিথও। সেও একদিন এইভাবেই ভেসে এসেছিল। তখন গভীর রাত্রি। তা নইলে সেও হয়ত অমনি পাগলের মতই ছুটোছুটি করত সেদিন।

* * * *

প্রতিবৎসর এই সময়ে ইয়র্ক টাউন থেকে একটা জাহাজ আসে ফোর্ট টিমোতে, সারা বৎসরের মত কুঠিয়ালদের প্রয়োজনীয় সবরকম জিনিসের চালান নিয়ে। এবারও আসবে শীঘ্রই। ঠিক কোন্ তারিখে আসবে, তা তো জানা নেই। তাই আঙ্গাভা সাগরে কেনিয়া-পুস্কার মোহানায় এসে ফোর্ট টিমোর দু'জন লোক ডিক প্রিন্স আর গ্যাসপার্ড অপেক্ষা করছে কয়েকদিন ধরে। জাহাজ এলে ওরাই আবার ফোর্টে খবর দেবে লোকজন পাঠাবার জন্য। তারা এসে মাল বয়ে নেবে। জাহাজ কেনিয়াপুস্কায় ঢুকবে না, নদীটা বেশীদূর নাব্য নয়।

লোক দুটো হঠাৎ দেখল একটা ভাসমান বরফস্তূপ কাছেই এসে পড়েছে, আর, অবাক কাণ্ড, স্তূপের মাথায় একটা লোক।

এরা সে লোকটাকে নামিয়ে নিয়ে এল। এ আনাটক। সেই বিশাল তুষারক্ষেত্র যত

দক্ষিণে এগিয়েছে, ততই ভেঙে ভেঙে ছোট হয়েছে, শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে এই ছোট্ট স্তূপটি আনাটককে নিয়ে।

আনাটক তখন শীতে ও ক্ষুধায় মরণাপন্ন। নৌকোয় তুলে ডিক প্রিন্সরা তার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল গরম করবার জন্য। ডলতে ডলতে আনাটকের বুকের কাছে শক্ত কি একটা হাতে ঠেকল তাদের।

তুলে দেখে—এক টুকরো হাড়ের উপর লেখা আছে একটা নাম—"এডিথ"।

এডিথ? এডিথ? এডিথ?

পরদিনই নৌকো নিয়ে ফোর্ট টিমো থেকে অভিযান বেরুলো আনাটকের দেশের উদ্দেশে। এডিথকে উদ্ধার করে আনবার জন্য। আনাটক এসেছিল বরফে চড়ে, ফিরল নৌকোয়।

জাহাজ এলো আরও কয়েক দিন পরে। ফ্রাংক দাঁড়িয়ে ছিল জাহাজের ডেকের উপরে। সে দেখল—একদিক থেকে আসছে এডিথের নৌকো, আর এক দিক থেকে আনিটকার। দুই হারানো মেয়েকেই সে জাহাজে তুলে নিল। বিশ্রাম করুক ওরা, চাঙ্গা হয়ে উঠুক। তারপর যাত্রা শুরু হবে ফোর্ট টিমোর দিকে।

———

● **মোড়লির ফল**

বোলতা বসাকের ব্যবসা

শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

বোলতা নামটা ও অন্নপ্রাশনে পায়নি।

ওর মুখে-ভাতের সময় খুব ধুম হয়েছিল।

বহু লোক নেমন্তন্ন খেয়ে ঢেকুর তুলে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু ঠাকুমার দেওয়া 'বোলতা' নামটাই শেষ পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে চলতে থাকে।

খুব ছোট বয়স থেকেই ও যা ধরত—একেবারে বোলতার কামড়ের মতো মরণ-পণে আঁকড়ে ধরত। ওর কান্নার জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাই ওর আবদার বাড়ির লোকের মেনে নিতেই হত!

এই সব কাণ্ড দেখে ঠাকুমা ওর নতুন নাম দিয়েছিল 'বোলতা'।

সেই বোলতা নাম এখন আর সব নামকে ছাপিয়ে গেছে!

যখন ইস্কুলের একটু ওপরের ক্লাসে উঠল—তখন থেকেই ওর ক্ষুদে মগজে ঢুকলো—ব্যবসা করতে হবে।

ওর বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনিয়ার, কেউ সরকারী চাকুরে, জজ ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন কেউ কেউ!

আরো কয়েক পুরুষ আগে খোঁজ করলে জানা যাবে এরা ছিল জমিদার। লুটপাট আর ডাকাতি ছিল ব্যবসা। এখন দিন কাল পালটে গেছে।

কিন্তু বাড়িটি এখনো রমরমা গমগমা আছে।

এরই মাঝখানে বোলতার মগজে কি ভাবে ব্যবসার পোকাগুলি কিলবিল করে বাড়তে লাগলো, সে খবরের হদিস কেউ রাখে না!

সে সবাইকে শুনিয়ে বলে বেড়াতে লাগলো,—ব্যবসাই হচ্ছে লক্ষ্মী লাভের আসল পথ। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। কিন্তু বাণিজ্যের সেই সপ্ত ডিঙা সে কোন সাগরে পাল তুলে ছেড়ে দেবে সেইটেই হচ্ছে আসল সমস্যা।

প্রায়ই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা সে সবাইকে শুনিয়ে বেড়ায়। পি. সি. রায় কি বলেছে জানিস?—এই বাঙালী জাতটা ব্যবসা না করেই ডুবতে বসেছে! সুতরাং কোমর বেঁধে লাগতেই হবে। ব্যবসা করে বড় হওয়া ছাড়া আর লক্ষ্মী লাভের অন্য পথ নেই!

বোলতার বন্ধুর দল এই সব বড় বড় কথা শুনে একেবারে হকচকিয়ে যায়।

বোলতার বন্ধুরা যখন লাট্টু ঘোরায়, ঘুড়ি ওড়ায়, পায়রা ধরে তার ঠ্যাঙে কাগজ বেঁধে দেয়, কিংবা বন-ভোজন করে বাহাদুরী দেখায়,—সেই সময় স্বয়ং বোলতা ব্যবসার বড় বড় কথা বলে সকলকে একেবারে হতবাক্ করে তোলে!

কেউ বলে, এ ছেলে বাঁচলে হয়! কেউ বলে, ছেলেবেলা থেকে বেশী আদর পেয়ে পেয়ে ছেলেটা এঁচোড়-পক্ক হয়ে গেছে! কেউ আবার তারিফ করে বলে, ওর মগজে বুদ্ধি আছে। সেই বুদ্ধি যখন সত্যি পাকবে, তখন বোলতা আর 'বোলতা' থাকবে না, একেবারে 'ভিমরুল' হয়ে যাবে।

বোলতা নিজে কিন্তু কোনো টিপ্পনীতেই দমবার ছেলে নয়। ব্যবসা করে বড় তাকে হতেই হবে।

● শ্রীঅখিল নিয়োগী

একদিন তার বন্ধুদের ডেকে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসিয়ে দিল। বললে, ব্যবসার একটি অভিনব 'প্ল্যান' তার মাথায় এসেছে।

বন্ধুরা জানতে চাইলে, কি সে প্ল্যান ?

বোলতা উত্তর দিলে, বোস্ সবাই, বলছি।

সবাই তখন গুছিয়ে বসে। কারণ বোলতা যখন তার ঘরে ডেকে এনেছে, তখন মুড়ি-বেগুনী, কিংবা গরম জিলিপি এই আলোচনার পেছনে ওত পেতে আছে।

বোলতা শুরু করলে, তোরা নিশ্চয়ই জানিস, খড়দা অঞ্চলে আমাদের একটা বড় বাগানবাড়ি আছে। আর সেইখানে আছে বিশাল এক পুকুর। আর সেই পুকুরে বড় বড় রুই মাছ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাছ নয় তো যেন এক একটা হাতির বাচ্চা।

বোলতার মুখে বিবরণ শুনেই বন্ধুদের মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ার মতো হল।

একজন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। লাফিয়ে উঠে, চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, ও! পিকনিকের ব্যবস্থা করবি বুঝি ? কী মজা !

বোলতা ওকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে, হচ্ছে ব্যবসার কথা, আর তার মধ্যে পিকনিককে টেনে নিয়ে এলি ?

বোলতা একটু চুপ করে রইল। তারপর চোখ দুটোকে গোল-গোল করে বললে, শোন, মাছের ব্যবসা করবো আমরা, এতে অনেক লাভ। বাজারে দেখছিস না, মাছ একেবারে পড়তে পাচ্ছে না; সবাই ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে! আর দামও খুব চড়া। ওই পুকুর থেকে মাছ ধরে একেবারে কলকাতার বৈঠকখানার বাজারে ছাড়বো। দেখবি, কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা একেবারে লাল হয়ে যাবো।

সেই দিনই ঠিক হয়ে গেল, আসছে রোববার ওরা দল বেঁধে খড়দা যাবে। ওদের দুটো মালী বাগানেই থাকে। তাদের কাছে জালও আছে। সুতরাং মাছ ধরতে কোনো অসুবিধে হবে না। তারপর সেই মাছ টেম্পোতে চাপিয়ে যদি বৈঠকখানার বাজারে এনে হাজির করা যায় তাহলে 'টু হান্‌ড্রেড্ পারসেন্ট' লাভ !

প্ল্যানের বিশদ আলোচনা করে বোলতা জানিয়ে দিলে, সমবায় পদ্ধতিতে এই ব্যবসা চালু করা হবে। তাতে বন্ধুদের সকলেরই অংশ থাকবে। সময়মত সরকারের

কাছ থেকেও ভালো রকম সমবায় ঋণ পাওয়া যাবে। ওদের মাছের ব্যবসা তাহলে একেবারে গড়গড়িয়ে চলবে।

কত 'স্পীডে' ওরা এগিয়ে যেতে পারবে সেটাও 'গ্রাফ্' এঁকে বোলতা বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলে।

পরের রবিবার নির্ধারিত দিনে ওরা দল বেঁধে খুব ভোরে উঠে খড়দার বাগান-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

মালী দুটো ওদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। বাগানের ফল-পাকুড় বিক্রী করে ওদের ট্যাকে বেশ কিছু আসে। তার ভেতর সাত-সকালে বোলতাবাবুকে দলবল নিয়ে আসতে দেখে ওদের দু'জনের মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। আজ ফল পেড়ে বেশ কিছু রোজগার-পত্র হত,—সেটা তো সকালবেলাতেই বন্ধ হয়ে গেল! তারপর যখন জাল দিয়ে মাছ মারার আদেশ পেলো, তখন ওদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু বোলতাবাবুকে কিছু বলবার সাধ্যি ওদের নেই! একেবারে যাকে বলে 'বিচ্ছু' বাবু।

সেই বিচ্ছুবাবু ওদের মাছ ধরার কাজে লাগিয়ে দিয়ে খোস মেজাজে বললে, তোরা কাজ করে যা, আমি একটা ট্রাক কিংবা টেম্পো ভাড়া করে নিয়ে আসি। বৈঠকখানার বাজারে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হবে তো?

ব্যস্তবাগীশ ব্যবসায়ী বোলতা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

মনমরা হয়ে মালী দুটো জাল নিয়ে মাছ ধরা শুরু করে দিলে।

ততক্ষণে লোভী বন্ধুদের রসনায় লালা ঝরতে শুরু করেছে।

ওরা মালীর ঘরের তোলা উনুনে দিব্যি মাছ ভাজতে শুরু করে দিয়েছে। পুরুষ্টু মাছ ভাজার সঙ্গে গরম গরম চা। খুরিতে করে চুমুক দিতে ভারী আরাম। কিছু পয়সা দিতে মালীরাও এই মহোৎসবে এগিয়ে এসেছে।

এক দিক দিয়ে যদি ক্ষতি হল, অন্য দিক দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেওয়াই ভালো। মালীরাও সম্মতি জানালে।

সুতরাং মহানন্দে এগিয়ে চললো—মাছ ভাজা মচ্ছব!

● শ্রীঅখিল নিয়োগী

তরুণ ব্যবসায়ী বোলতা যখন ট্রাক ভাড়া করে ফিরে এলো,—তখন দেখা গেল, বিছানো কলাপাতার ওপর রাশি রাশি ভাজা মাছ। চারদিকে মাছি ভনভন করছে। আর আশেপাশের বস্তি অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা সেই ভাজা মাছগুলি গোগ্রাসে গিলছে। বোলতার বন্ধুর দল তাদের সামলাতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে সর্বহারার মতো তাকিয়ে আছে!

এই দৃশ্য দেখে তরুণ-উদ্যমশীল-ব্যবসায়ী বোলতা সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে মূর্ছিত হয়ে পড়ল!

বোলতা বসাক এরপর কয়েকদিন ধরে ভারী মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

উস্কু-খুস্কু চেহারা, ছেঁড়া জামা, ময়লা ধুতি···যেন তার সর্বনাশ হয়ে গেছে! কারো দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না পর্যন্ত!

বন্ধুরা এসে ডাকাডাকি করে,—বোলতা চল, একটা ভালো টার্জেনের ছবি দেখে আসি—

বোলতা বলে, না রে, আমার মাথা ধরেছে, সিনেমা দেখতে পারবো না।

সহপাঠীর দল আর একদিন এসে বলে,—চল, বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে বেড়িয়ে আসি—

বোলতা উত্তর দেয়,—আমার পায়ে বড্ড ব্যথা হয়েছে, কোথাও যেতে পারবো না—

আর একদিন একটি বন্ধু এসে বলে,—চল, তোদের গাড়ি করেই না হয় ডায়মণ্ডহারবার থেকে বেড়িয়ে আসি—

বোলতা বসাক মুখ বেঁকিয়ে বলে,—না রে, গাড়ি বিগড়ে গেছে। কারখানায় সারাতে দিয়েছে।

শুনে বন্ধুরা বিরক্ত হয়।

না হয় খানকয়েক ভাজা মাছ বস্তির ছেলেমেয়েরা ক্ষিদের মুখে খেয়েই ফেলেছে!

তাই বলে আমাদের সঙ্গে তুই একেবারে অসহযোগ শুরু করে দিবি? এ কেমন কথা?

বোলতা বসাক দিনরাত শুধু গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবে। তার শোকটা মাছের নয়। ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে যে মনোব্যথা পেলো, সেইটেই সে কিছুতে ভুলতে পারছে না! শুভকাজে এমন বাধা!

সেদিন বিকেলে ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। দুটো ঘুড়ির লড়ালড়ি দেখছিল।

হঠাৎ তার মগজে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা জেগে উঠল।

সামনেই বিশ্বকর্মা পূজো। প্রতি বাড়ির ছেলেরাই তো ঘুড়ি ওড়ায়। আজকাল মেয়েরাও গাছকোমর বেঁধে দিব্যি লাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়াতে শুরু করেছে। আচ্ছা, এই মৌকায় ঘুড়ির ব্যবসা করলে কেমন হয়? নানা রঙের, নানা ডিজাইনের ঘুড়ি! তারপর এক একটা ঘুড়ির গায়ে এক এক রকম কবিতা লিখে দেওয়া যেতে পারে—

উলটে গিয়ে গোত্তা খা—
তার পরেতে মারবি ঘা—

অথবা—

সুতো দিয়ে মারলে টান—
দেখবি কেমন মাঞ্জাখান—

চমৎকার আইডিয়া!

বোলতা বসাক বসে ছিল,—এইবার তিড়িং লাফ লাফিয়ে উঠল।

ভীমসেনকে দুর্যোধন ছেলেবেলায় বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল। তারপর বাসুকীর রাজ্যে পৌঁছে সাপের কামড় খেয়ে হল বিষে বিষক্ষয়। হাজার হাতির বল গায়ে।

বোলতা বসাক মাছের ব্যবসাতে মার খেয়েছে,—এইবার ঘুড়ির ব্যবসায় সোজা আকাশে উড়বে।

রাতারাতি সব ব্যবস্থা করে ফেললো তরুণ ব্যবসায়ী বোলতা বসাক।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বন্ধুদের মান ভাঙিয়ে আবার খোসামোদ করে ডেকে নিয়ে এলো।

রাশি রাশি রঙ-বেরঙের কাগজ আসতে লাগল ঘরে। ছাদের চিলে-কোঠা একেবারে চিত্রবিচিত্র করা রঙীন কাগজে ঠাসাঠাসি।

একদিকে ঘুড়ি তৈরি হবে, আর একদিকে কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা চলবে। প্রতিটি ঘুড়ির ওপর মজাদার সব কবিতা লিখে দিতে হবে। তবে তো হবে ঘুড়ির কদর।

কাগজ-পেনসিল দিয়ে বন্ধুদের ছাদের নানা কোণে বসিয়ে দিয়েছে। দেখি কে কটা কবিতা লিখতে পারে। ঝাল চানাচুর আর ফুচকার মতো মজাদার ঝাল ঝাল কবিতা প্রচুর চাই। লিখে যাও যে যেমন পারো—

কেউ লিখলো—

লাটাই থাকে আমার হাতে—
ঘুড়ি ওড়ে আকাশে ;
তোর ঘুড়িটা কটাং কেটে
হাসবে হাসি বাঁকা সে ॥

আবার আর একজন তৈরি করল—

ঘুড়ি—ঘুড়ি—ঘুড়ি
নীল আকাশে উড়ি !
কাটবো চিলের ঠ্যাং
নাচবো ড্যাড্যাং ড্যাং ॥

আবার কেউ ছন্দ মেলালো—

কাচের গুড়োয় মাঞ্জা দেওয়া
দেখবি সুতোর ধার ;
কচ করে তোর নাকটি কেটে
ফেলবে চমৎকার ॥

এই ভাবে সন্ধ্যে থেকে রাশি রাশি কবিতা তৈরি হতে থাকলো বোলতা বসাকের ছাদের ওপর।

সেদিন রাত্রে ওদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্ধুর দল ছাদের নানা দিকে সতরঞ্চি আর মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। বাড়ি থেকে আগেই ছুটি নিয়ে এসেছে—বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে বলে। আবার পরদিন ভোরবেলা লুচি-হালুয়া খেয়েই কাজে লাগতে হবে।

বোলতার মা বুঝেছে,—ছেলের মাথার পোকাগুলি আবার কিলবিল করে উঠেছে। আদাড়ে-পাদাড়ে ঘোরার চাইতে বাড়িতে বসে পাগলামি করা অনেক ভালো। তাই হাজার অসুবিধেতেও তিনি নিশ্চিন্ত আছেন।

গভীর রাত্রে ছেলেদের 'আগুন' 'আগুন' চিৎকারে বাড়িসুদ্ধু লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

দেখা গেল ছাদের চিলেকোঠায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে।

বোলতা ছুটে এসে পাগলের মতো মাথা চাপড়াতে লাগলো।

ওই কুঠরীতে ছিল যত রাজ্যের রঙীন কাগজ। তাই দিয়ে ঘুড়ি তৈরি হবে।

বিচ্ছুমামা যে রোজ ছাদে শোয়, আর সারা রাত বিড়ি খেয়ে এখানে-ওখানে ছুড়ে ফেলে,—এ কথা কি বোলতার আগে খেয়াল হয়েছিল? তাহলে বিচ্ছু মামাকে ছাদে উঠতেই দিত না।

হায়—হায়—বিড়ির আগুনে এতবড় ব্যবসাটা এক রাত্তিরের মধ্যে একেবারে ছারেখারে গেল! আর এমন মজাদার সব কবিতা?

আগুনের শিখায় সব কবিতার নির্বাণ লাভ ঘটেছে!

ক'দিন ধরে বোলতা কারো সঙ্গে কথা কয় না, দু'বেলা শুধু পাতে বসে, ভাত মুখে তোলে না! ঘন ঘন শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আর উদাস নেত্রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

এমন বিস্ময়কর পরিকল্পনাটা একেবারে মাঠে মারা গেল!

বোলতার মা ডাক্তার ডাকালেন—

বৌঠাকুরুনরা জোর করে ওকে ঘোল খাওয়াতে চেষ্টা করল—

বন্ধুর দল ওকে হাসাবার চেষ্টা করল—

কিন্তু কিছুতে কিছু নয়।

সবাই ভয় পেলে,—বোলতার একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ না নয়।

কেউ কেউ কইলে, বোলতা সন্ন্যাসী হয়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে না যায়—

শেষকালে দেখা গেল, বোলতা কোনো রকমে ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে—

দিন কয়েক পরেই বন্ধুর দল জানতে পারল, বোলতা "মৌমাছি পালনের" ব্যবসা করবে—

বোলতার সঙ্গে মৌমাছির কি সম্পর্ক তা অনেকেই জানে না। মাসতুতো ভাই কিনা—সেটা বন্ধুর দল গবেষণা করে বের করবার চেষ্টা করতে লাগলো—!

এদিকে বোলতা কিন্তু যাকে বলে, উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে !!

আবার নতুন কর্ম-পরিকল্পনা !

নতুন ব্যবসায়ের ভিত্তি-স্থাপন।

রাশি রাশি কাঠ আর তক্তা আসতে লাগলো ছাদের ওপর মৌমাছি-পালনের বিরাট মহল গড়ে উঠবে। বিরাট ছাদের একটা অংশ ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। সেইখানেই মৌমাছি পালনের জন্যে নানা আকারের বাক্স গড়ে উঠতে লাগলো।

বোলতা বসাক বন্ধুদের কাছে আবেগভরে ঘোষণা করল, দেশের ছেলে-মেয়েরা চিনি পাচ্ছে না। আজে-বাজে মিষ্টি খেয়ে শরীর নষ্ট করছে। মধুই হচ্ছে একমাত্র বস্তু, যা ছোটদের দেহের পুষ্টি সাধন করতে পারে। সুতরাং "মৌমাছি পালনই" হবে আমাদের একমাত্র ব্রত। বাজারে যা মধু পাওয়া যায়, তা' জ্বাল দেওয়া গুড়ের সঙ্গে অনেক আজে-বাজে জিনিস মেশানো। দেশকে গড়তে হলে ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে আগে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ছেলেরা স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠুক, এইটেই হবে আমাদের একমাত্র ব্রত। সুতরাং আমাদের বাণী হবে—'গ্রো মোর ফুড' নয়—'গ্রো মোর মধু'।

বোলতার নতুন ব্যবসার উদ্দেশ্য শুনে তার বন্ধুবান্ধবের দল জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল—

—বোলতা বসাক বেঁচে থাকো—!

—বোলতা বসাক বেঁচে থাকো !!

—বোলতা বসাক বেঁচে থাকো !!!

দ্রুত বেগে পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে চললো,—করাতের কর্তন, র‍্যাদার আর্তনাদ, পেরেকের পটপট—সব কিছু জড়িয়ে বাড়িসুদ্ধু সবাইকে সচকিত করে তুললো।

বোলতার মা ছেলের নতুন পাগলামি দেখে প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলের দলের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করছেন। তবু তো ছেলের মুখে আবার হাসি ফুটেছে, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আবার হল্লা করে মুড়ি-বেগুনী কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে, দল বেঁধে আবার চৌবাচ্চা থেকে জল ঢালছে তপ্ত মাথায় !

এর মাস খানেক পরের ঘটনা।

সন্ধ্যেবেলায় ছেলের দল এসে জমেছে ছাদে !

আজ মৌমাছি পালনের মহা-উৎসব। ছেলের দল সারারাত ধরে ছাদেই কাটাবে। বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে সবাই। বোলতার মা ঘন ঘন গরম ভাজা-ভুজি পাঠিয়ে দিচ্ছেন ছাদে। আজ তাঁর আনন্দের সীমা নেই। ওই তো একমাত্র শিবরাত্রের সলতে তাঁর। সে মুখগোমরা করে ঘুরলে—মায়ের মন এমনিতেই আকু-পাকু করে।

জলখাবারের পর বেশ খানিকক্ষণ চললো—আবৃত্তি, গান, ম্যাজিক, কৌতুক আর মূকাভিনয়। একান্নবর্তী পরিবার। বহু মানুষ নিয়ে সংসার। সবাই এসে একসঙ্গে বসে আনন্দ উপভোগ করছে। জ্যাঠতুতো আর খুড়তুতো ভাই অনেক। তাদের বউরাও এসে দল বেঁধে বসেছে মজা দেখতে। বোলতার পাগলামি ওদের প্রিয়। বউদিরা মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটছে, বোলতাকে নিয়ে। জিজ্ঞেস করছে, বোলতার বাসা কবে বাঁধবে ঠাকুরপো ?

বোলতা মুখ টিপে শুধু হাসছে !

মুখে বলছে,—হবে হবে,—সব হবে। তার আগে বোতল ভরতি মধু চাই !!

বিচিত্র-অনুষ্ঠান উপভোগ করে সবাই খুশী। উৎসবের পর নৈশ ভোজ !

● শ্রীঅখিল নিয়োগী

তারপর বন্ধুর দল যে যেখানে খুশী ছাদের এখানে ওখানে গড়িয়ে পড়ল। প্রচুর খাওয়া হয়েছে সবাইকার।

গভীর রাত্রে বন্ধুদের ঘুম ভেঙে গেল।

চায়ের তেষ্টা পেয়েছে সবাইকার।

চিলে কোঠায় খুঁজে দেখা গেল,—স্টোভ, চা, দুধ, কুঁজো ভরতি জল, চায়ের কাপ, চামচ সব আছে। শুধু নেই চিনি।

একজন বললে,—দাঁড়া আগে বোলতাকে ডেকে তুলি। আর এক বন্ধু উত্তর দিলে,—থাক, থাক। বেচারী সারাদিন দারুণ খেটেছে। এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আয়, আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নি—

কিন্তু এত রাত্তিরে কি সে ব্যবস্থা ?

সকলের মুখেই উৎসুক প্রশ্ন।

এই ছাদে বসেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। নিচে নামবার জো নেই। ছাদের দরজায় ও পাশ থেকে তালা দেওয়া। বোলতার মা সকালবেলা খুলে দেবেন।

—তাহলে উপায় ?

একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকায়। একজন উৎসাহী বন্ধু লাফিয়ে উঠে বললে,—ঠিক ! ঠিক ! সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে !

—কা সে সমাধান ?

—আরে, ভাই, মধু তো রয়েছে মৌমাছি পালনের কোটরে। একটি কাপ ভরতি করে নিয়ে আসছি। মধু মিশিয়ে নিশীথ রাতের চা যা জমবে না,—অপূর্ব।

সবাই এই পরিকল্পনায় সম্মতি জানালে—

তার পরের ঘটনা যা ঘটল—তা একেবারে অভিনব !

গভীর রাত্রে মৌমাছিদের বিরক্ত করা মাত্র তারা এক জোট হয়ে আক্রমণ করল সবাইকে। নির্বিচারে কামড়াতে লাগলো সকলকে। এমন কি ঘুমন্ত বোলতা বসাককেও রেহাই দিল না।

নিচে পালিয়ে যাবার উপায় নেই!

সিঁড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কামড় খেয়ে সবাই প্রাণের দায়ে সারা ছাদময় ছুটোছুটি করতে লাগলো।

কিন্তু মৌমাছির দল আশ মিটিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করল।

পরদিন সকালবেলা বোলতার মা দরজার চাবি খুলে দেখলেন—শ্রীমানরা আলু-ভাতে হয়ে একেবারে ছাদে গড়াগড়ি দিচ্ছে! মুখ দেখে আর চেনবার জো নেই—কে রাম আর কে শ্যাম!

মৌমাছির কামড়ে বোলতার কী দুর্গতি!

কামড় খেয়ে সবাই প্রাণের দায়ে সারা ছাদময় ছুটোছুটি করতে লাগলো।

কম্প দিয়ে জ্বর এলো সবার।

তারপর পনেরো দিন একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি! প্রাণে অবশ্য কেউ মারা যায়নি। কিন্তু ভালো হয়ে উঠে সবাই চা নিবারণী সভার সভ্য হয়ে গেল।

বোলতা সারাক্ষণ বসে কী ভাবে কেউ জানে না। শুধু কাগজে হিজিবিজি কাটে—

কেউ বলে, ছবি আঁকছে—

কেউ মন্তব্য করে, জ্যামিতির সমস্যার সমাধান করছে। আবার অন্য একজন টিপ্পনী কাটে, নতুন ব্যবসার প্ল্যান তৈরি করছে—

● শ্রীঅখিল নিয়োগী

মুখে কোনো কথা নেই, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ—বদনে নেই হাসি—!

বউঠাকুরুনরা বলে, চিরতার জল খাইয়ে দেবো ঠাকুরপো ?

বোলতা কিন্তু নির্বিকার—

শিবনেত্র হয়ে শুধু বসে থাকে—

আর না হয় কাগজে হিজিবিজি কাটে ! ওর কিসের তপস্যা কে জানে !

অবশেষে বন্ধুদের ডেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে এক নতুন পরিকল্পনা শোনালো বোলতা।

এবারকার ব্যবসার পরিকল্পনা সত্যই অভিনব।

সামনেই পরীক্ষা। স্কুল ফাইনাল। হায়ার সেকেণ্ডারী।

সেই পরীক্ষায় ছেলেদের সকল রকম প্রশ্নের "উত্তর" সরবরাহ করা হবে।

এই ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষককেও হাত করতে হবে। একটি গোপন ঘাঁটি তৈরি করা হবে। সেখানে একদল ছেলে থাকবে,—যারা তাড়াতাড়ি সব কিছু প্রশ্নের উত্তর নকল করতে পারবে। দলের শিক্ষকরা সাহায্য করবেন।

পরীক্ষার হলে একটি ছেলে প্রশ্নপত্র পেয়েই সুতো বেঁধে জানলা গলিয়ে নিচে ঝুলিয়ে দেবে। নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটি ছেলে। সে হবে প্রশ্নের উত্তর সরবরাহের প্রতিনিধি।

একটি বাঁশি বাজিয়ে পরীক্ষার্থী ছেলে জানিয়ে দেবে—প্রশ্নপত্র ঝোলানো হল।

দুটি বাঁশি বাজিয়ে নিচের প্রতিনিধি আশ্বাস দেবে—প্রশ্নপত্র হস্তগত হল। জবাব যাচ্ছে—

তখন গোপন ঘাঁটিতে সেই প্রশ্নের উত্তর লেখা হবে। কাজ সমাধা হলে— তিনটি বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে—"উত্তর" প্রস্তুত।

আবার সেই সুতোয় বেঁধে প্রশ্নপত্র নিঃশব্দে ওপরে চলে যাবে।

এই ভাবে সারা হলে—প্রশ্নপত্রের উত্তর সরবরাহ করা হবে। যারা এই সমিতির সভ্য হবে—তাদের আগাম টাকা জমা দিতে হবে। নম্বর অনুসারে পর পর প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করা হবে।

এই অভিনব ব্যবসাতে পরীক্ষার্থী উপকৃত হবে, সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের

প্রতিনিধিরা লাভবান হবে, সাহায্যকারী শিক্ষকরাও "প্রণামী" থেকে বঞ্চিত হবেন না।

এই পরিকল্পনা অনুসারে নীরবে কাজ শুরু হয়ে গেল।

প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ হতে থাকলো।

ঘন ঘন বাঁশি বাজতে লাগলো—

আরো উত্তর চাই—

আরো সরবরাহ চালাও—

সরবরাহকারী দলকে পুলিস দল…ঘেরাও করে ফেলেছে।

যন্ত্রের মতো কাজ এগিয়ে চলেছিল—কিন্তু তারই মাঝখানে কে যে বিশ্বাসঘাতকতা করল—কেউ জানে না।

হঠাৎ দেখা গেল,—সরবরাহকারী দলকে পুলিস দল একেবারে ঘেরাও করে ফেলেছে।

তখন আর পালাবার কোনো পথ নেই। সবাই যেন একই পুকুর থেকে একই জালে ধরা পড়েছে। জাল ছিঁড়ে পালাবার পথ নেই!

কিন্তু এরই মাঝখান থেকে তরুণ ব্যবসায়ী বোলতা বসাক যে কোন ইন্দ্রজালের বলে কোথায় উধাও হয়ে গেল—কেউ তার হদিস দিতে পারল না!

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

বউঠাকরুনের দল হরির লুট মানত করলে।

বোলতার মা ছেলের শোকে নাওয়া-খাওয়া ভুলে একেবারে শিবমন্দিরে গিয়ে ধরনা দিলেন।

কিন্তু বোলতা কোন্ ভোজবাজিতে একেবারে কর্পূরের মত উপে গেল কেউ তার হদিস দিতে পারল না।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বোলতাদের বাড়ি থেকে নানা অঞ্চলে লোক পাঠানো হতে থাকলো—

পাঞ্জাব—

সিন্ধু—

গুজরাট—

মারাঠা—

দ্রাবিড়—

উৎকল—

বঙ্গ—

এমন কি আসাম পর্যন্ত—!

সব অঞ্চলেই বোলতাদের আত্মীয়স্বজন আছে—কিন্তু কেউ সেই ক্ষণজন্মা ব্যবসায়ী বোলতার কোনো সন্ধান রাখে না!

অবশেষে বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হল—

বাছা বোলতা,

তুমি বাড়ি ফিরে যত খুশী ব্যবসা করো, আমরা কেউ আপত্তি করবো না। তোমার মা কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ হয়েছে। তোমার বউঠাকুরুনরা সব সাজ-সজ্জা ত্যাগ করেছে। সিনেমা দেখা বন্ধ। আমাদের নয়নেও নিদ্রা নেই! তুমি শুধু ঘরে ফিরে এসো—। টাকা চেয়ে পাঠাও। শোকসাগরে মগ্ন দাদামশাই!

তবু বোলতার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না!

ইতিমধ্যে বোলতার বন্ধু-বান্ধব দল,—যারা প্রশ্নপত্রের উত্তর সরবরাহের কাজে ধরা পড়েছিল, তাদের সবাইকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছে—

কিন্তু বোলতা তবুও নিখোঁজ হয়ে রইল।

ছয় মাস বাদে একটি গোপন সংবাদ পাওয়া গেল।

বোলতা বসাক হরিদ্বারে গিয়ে মহেশ যোগীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে এখন বিট্‌ল্‌দের দলে মিশে সকাল-সন্ধ্যা যোগ অভ্যাস করছে!

নন্টীর ফন্দি
এবারে টীম থেকে আমাকে বাদ দিয়েছে— আচ্ছা!
স্কুল নোটিশ বোর্ড
ফুটবল টীম
ন্যাপলা
হোঁৎকা
গুলটে
ল্যাংচা
পুঁটে
জ্যাবলা
ক্যাবলা
ঘন্টা
ন্যাড়া
হেবো
খ্যাঁচা

ন্যাপ্‌লা! আমার বদলে তোকে গোলে খেলতে নিয়েছে। তাই তোর এখন একটু প্র্যাক্‌টিস করা দরকার!
ঠিক বলেছিস!

হিঃ-হিঃ! বলটা একবার চালায় পড়লে হয়!
বাজে সট্!
দম্!

ধপ্!
অ্যাঁক!

কিছু মনে করিসনা! তোর যদি লেগে থাকে তবে তুই বরং বাড়ি চলে যা!
না-না! কিচ্ছু হয়নি!

এখানে প্র্যাক্‌টিস কর! এখানে চালার ওপর কোন বস্তা টস্তা নেই!
ঠিক আছে!

ঝন্‌-ন্‌-!
এইরে!
অ্যাঃ!

হতচ্ছাড়া! আমার জানলা ভাঙলি!
কেটে পড়ি!
ন্যাপলা! এদিকে দিয়ে পালা!

ঝট করে টেম্পোটাতে উঠে পড়!
ওঃ! বাঁচলুম!

ও নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে যাবে– খেলার সময় পৌঁছতে পারবে না! তাহলেই----
বাঃ! দিব্যি সরে পড়ল!
টা-টা!
হুস্!

কিন্তু একটু পরেই
টেম্পোটা ট্রাফিক আলোর সামনে থামতেই, আমি লাফিয়ে নেমে পড়ে ছুটতে ছুটতে আসছি! কিন্তু ম্যাচে পৌঁছতে বোধ হয় দেরি হয়ে যাবে!
ওফ্!
হবেনা! আমার পুরাণো সাইকেলটা নিয়ে শন্ শন্ করে পৌঁছে যাবি!

এঃ! সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা খুলে এলো যেরে!
এইরে! ওটা যে আলগা, সেটা তোকে বলতে ভুলে গেছি!

ধড়াম!
ইক! পচা নর্দমা!
ছপাৎ!

পরে
তোর হাত ভেঙেছে বলে তোর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! কিন্তু তোর চেয়ে গোলে আমি খারাপ খেলিনা!
হুম!

কিন্তু
উফ! কি গোঁয়ার গোবিন্দ টীমের সঙ্গে খেলছিরে বাবা!

ম্যাচের পরে
তুই সত্যি খেলোয়াড় নন্দী! তুই আমাকে এই অলুক্ষুণে ম্যাচের গুঁতুনি থেকে রক্ষে করেছিস!
গ্যাঁও!

ষষ্ঠী অবতার

শক্তিপদ রাজগুরু

আমাদের ষষ্ঠীচরণের অবশ্য একাধিক নামই ছিল। স্কুলের ড্রইংমাস্টার মতিলাল-বাবু বলতেন ওকে যম অবতার। অবশ্য ষষ্ঠী লোকের পুকুরের এন্তার মাছ চুরি করে ছিপ দিয়েই সাবাড় করতো। কারো হাঁস মুরগী থাকার উপায় ছিল না, নধর পাঁঠা থাকলেও ওর নজর সেই দিকেই। তাই মতিলালবাবু বলতেন—ষষ্ঠী তো বংশ-বৃদ্ধির দেবী, তুই তো বংশনাশের অবতার।

দত্তমশায় অবশ্য অন্য নাম দিয়েছিলেন। তাঁর বাগানের তাবড় নারকেল গাছে ডাব ফলবার উপায় ছিল না। ইয়া লম্বা গাছগুলোয় টিকটিকির মত উঠে যেতো। দত্তমশায় বলতেন ওকে পবননন্দন অবতার।

আর হেডমাস্টারমশায় ডাকতেন রাসভ অবতার। অবশ্য ষষ্ঠীচরণ স্কুলের অনেকদিনের বনেদী ছাত্র। যখন মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনির স্কুল ছিল সেই সময় থেকেই পড়ছে ষষ্ঠী, তারপর মাটির দেওয়াল টিনের চাল হলো, তারপর হলো পাকাবাড়ি, তখনও ষষ্ঠীচরণ এক এক ক্লাসে দু'বছর করে পড়ে পড়ে একেবারে ঝুনো পোক্ত হয়ে উঠছে।

টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসের শেষ বেঞ্চ থেকে উঠে ওপাশের বাগানের চাতালে গিয়ে সভা আলো করে বসে, এন্তার বিড়ি টানে আর এর ওর দোষগুণের বিচার করে। বেল পড়লে বেশ খানিকটা কচি পেয়ারাপাতা চিবিয়ে বিড়ির গন্ধ দূর করে ক্লাসে ঢুকে সটান বেঞ্চের উপর গিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেকেণ্ড-মাস্টারের ইংরেজীর ক্লাস, ওটা তার আসে না। তাই পড়া ধরে শাস্তি দেবার আগে নিজেই মানে মানে উঠে দাঁড়ায় ষষ্ঠীচরণ। অবশ্য ষষ্ঠীচরণ জানায়—ইংরেজী পড়ে কি হবে বল? দেশ তো স্বাধীন হলো বলে। তখন আর ইংরেজীর কদর কি থাকবে?

এ সব ভবিষ্যৎ চিন্তাও করে সে মাঝে মাঝে।

আর পাঁচজনের মত ষষ্ঠীরও আপনজন ছিল। বাবা সদরে চাকরি করতেন, মাকে তার আবছা মনে পড়ে। একটি বেদনাময় সেই স্মৃতি। বাবা পরে আবার বিয়ে করেছেন শহরের কোন এক স্কুল মিসট্রেসকে। তিনি গ্রামে আসেন না। গ্রামে নাকি মানুষই থাকতে পারে না। তাই এখানে হাল ধরে আছে ষষ্ঠীর এক বিধবা পিসীমা। বাবা মাঝে মাঝে আসেন, দু দশদিন থেকে উদ্বৃত্ত ধান, বাগানের নারকেল, এটা সেটা বিক্রি করে শহরে ফিরে যান।

হঠাৎ সেদিন দেখি ষষ্ঠীচরণ সেকেণ্ডমাস্টারের ইংরেজীর পিরিয়ডে সঠিক বানান মানেগুলো টকটক বলে যায়। মাস্টারমশায়ও খুশী হন—তা একটু মন দিয়ে পড়লেই তো পারিস ষষ্ঠে। দিব্যি পাস করে যাবি। জবাব দিল না ষষ্ঠী।

স্কুলের ছুটির পর নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছি। ছায়া নামছে আমবাগানে, ছায়া পড়েছে দিঘির কালো জলে, নির্জন পাখিডাকা অপরাহ্ন। কাঁঠালীচাপার সুবাস জায়গাটাকে কেমন বেদনাময় করে তুলেছে। ষষ্ঠী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, ডাগর দুটো বেদনাভরা চোখ তুলে বলে,—পড়াশোনা আমার দ্বারা হবে না।

অবাক হই—কেন রে? বেশ তো পড়ছিস!

—ছাই! হঠাৎ পিঠের জামা খুলে দেখায়। অবাক হই। পিঠে কয়েকটা সাট-সাট দাগ, ঘায়ের মত হয়েছে।

ষষ্ঠী জানায়—বাবা প্রায়ই মারে। আমি নাকি বখাটে বাঁদর। পড়াশোনা করি না। এবার পাস করতে না পারলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে বলেছে। বাড়ি থেকে দূর করে দেবার কথা ভাবতেই পারি না। দিনের বেলায় তবু কাটানো যায়, রাতের অন্ধকারে মনে হয় দুনিয়ার ভূত পেত্নী এসে ঘাড়ে ভর করবে।

সভয়ে প্রশ্ন করি—কি করবি তাহলে ?

—জানি না। বাবা সেদিন আরও রেগে গেছল ওই নুলো পঞ্চাঠাকুরের কথায়। ব্যাটা মিছিমিছি বাবাকে যা তা বলেছে আমার নামে।

নুলো পঞ্চা ঠাকুরবাড়ির সেবাইত। কপালে হাতে হরিনামের ছোপ, গায়ে নামাবলী, মুখে দিনরাত হরিনাম করে। সন্ধ্যার সময় ধুতিচাদর পরে গলায় মালা ঝুলিয়ে ভাগবত কথকতা করে আর মাঝে মাঝে প্রণামী সংগ্রহের জন্য রাখা ঐ থালাটার দিকে আড়-চোখে চায়। কত জমা হল বোধহয় হিসাব করে ব্যাখ্যা শোনায়।

তবু লোকটা ঠাকুরবিশ্বাসী। জবাব দিই ষষ্ঠীর কথায়—ও যে দিনরাত ঠাকুর নিয়ে থাকে, পুণ্যবান লোক।

গজরায় ষষ্ঠীচরণ—পুণ্যবান! ব্যাটা হাড়পাজী বকধার্মিক। চুরি করে ঠাকুরের ধান-ফসল জিনিসপত্র বিক্রি করে নিজে মারে। সদাব্রতের চাল অর্ধেক মেরে দেয়। ঠাকুরের বাগানের আম-নারকেল-কলা সবকিছু ওই বেচে দেয় ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে। বাবুদের কানে কথাটা তুলেছিলাম, গরিব লোকগুলো তবু যদি খেতে পায়। তা পাঁচু ঠাকুর কিনা যা-তা করে মিছে কথা বলে এল বাবাকে। বাবাও ওরই সামনে আমাকে তুলোধোনা করে দিলে। ও ব্যাটা একটা শব্দ করেও প্রতিবাদ জানালো না। মানুষ শয়তান ওটা। ফের যদি টেণ্ডাইমেণ্ডাই করে, ওই ব্যাটার ঠাকুরসুদ্ধ ওকে নদীতে চুবিয়ে দোব।

ভয় পাই—বলিস কি রে ? ঠাকুর দেবতার নামে ওসব কথা বলিস না।

হাসে ষষ্ঠীচরণ—ঠাকুর! ও পাথরের ঠাকুর, ওই শয়তানকে ঠাকুর পূজো করতে দেখে মনে হয় সব স্রেফ ফক্কিবাজি।

তবু কথাটা ওর মত এত সহজে মেনে নিতে পারি না। তবে ষষ্ঠীচরণকে বিশ্বাস নেই। ও সব করতে পারে।

বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। ধান-কলাই-ফলফসল বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে শহরে ফিরে যাবার সময় বাবা ষষ্ঠীকে শাসিয়ে যান।

—এইবার ফেল করলেই দূর করে দোব। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। জানবো এমন কুলাঙ্গার ছেলে আমার নেই।

পিসীমা ষষ্ঠীকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে, তাই ভাইকে বলে—ওকি কথা তোর যতী, একটা মাত্র ছেলে তাকেও পর করে দিয়েছিস। আবার তাড়াবার কথা কেন?

যতীনবাবুর নতুন স্ত্রী বারবার বলেছে শহরে বাড়ি করতে, তার জন্য দেশের বাড়ি জমিজায়গাও বিক্রি করে দিতে বলেছে। কিন্তু পারেননি ওই ছেলেটার জন্য। তাই স্ত্রীর কথাও শুনতে হয়—নানা কথা। তাই মনে মনে চটে ওঠেন ছেলের উপরই। সব রাগটা তার উপরই ঝেড়ে যান—যদি কোনদিন কোন কথা কানে আসে, আমি দূর করে দোব বাড়ি থেকে।

বাবা ফিরে যেতেই ষষ্ঠীচরণ আবার নিজমূর্তি ধরে। প্রথম চোট পড়ে ওই নুলো পঞ্চার উপরই। ওর ঠাকুরবাড়ির খোল খত্তাল কাঁসর ঘণ্টা একদিন বিলকুল লোপাট হয়ে যায়। সেদিন মন্দিরে আরতি হল নীরবে, অবশ্য পঞ্চাঠাকুরের চিৎকার বেড়ে ওঠে—অধঃপাতে যাবি এইবার। ঠাকুরের জিনিস চুরি করা! দোব একদিন বেহ্মশাপ—ধ্বংস হয়ে যাবি।

অবশ্য সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ষষ্ঠীচরণ নিরাপদেই ফুটবল পেটে, নদীতে সাঁতার কাটে ঘণ্টা কয়েক ধরে। সেদিন নদীতে নুলো পঞ্চাঠাকুরের ছেলে ডুবতে ডুবতে রয়ে গেল ওই ষষ্ঠীচরণের জন্যই। ঘাটের ওদিকে একটা দহ, সেখানে জল অনবরত কলকল শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওই ঘূর্ণির মধ্যে কি করে গিয়ে পড়েছে ছেলেটা। লাট্টুর মত পাক দিচ্ছে আর চিৎকার করছে ছেলেটা। তীরে দাঁড়িয়ে দেখছে অনেক লোক।

নিশ্চিত মৃত্যুকে তারা সামনে দেখে শিউরে ওঠে। কোত্থেকে ছুটে এসে নদীতে লাফ দেয় ষষ্ঠী, হাতে একটা দড়ি। তারই একপ্রান্ত ছুড়ে দেয় ছেলেটার দিকে। ছেলেটা দড়ি ধরে ফেলে, ওই দারুণ স্রোতের উজানে টেনে ষষ্ঠীচরণ তাকে তীরের কাছে এনে ধরে ফেলে।

ওকে তীরে তুলে আনতেই নুলো পঞ্চানন জড়িয়ে ধরে ষষ্ঠীকে।—দীর্ঘজীবী হও বাবা। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করবেন।

হাঁপাচ্ছে ষষ্ঠীচরণ। লোকটাকে আজও ঘৃণা করে সে। মিথ্যেবাদী শয়তান।

বলে ষষ্ঠীচরণ—কই বেহ্মশাপ দাও, দেখি তোমার তেজ। তোমার বেহ্মশাপও যেমন ভোঁতা আশীব্বাদও তাই। সবই তোমার ভুয়ো ঠাকুর। বিলকুল ফক্কা।

অন্য সময় হলে নুলো পঞ্চা এই নিয়েই তুমুল কাণ্ড বাধাতো। আজ নেহাত কৃতজ্ঞতার জন্যই চুপ করে গেল।

ষষ্ঠীও বেশ অনুভব করেছে ওর আশীর্বাদেও কোন ফল হয়নি। পিসীমার বয়স হয়েছিল, শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। হঠাৎ দুদিনের জ্বরে ওর পিসীমা মারা গেল। খবর পেয়ে আমরাও গেলাম। দেখি ষষ্ঠীর চোখে জল। কোনদিন তাকে কাঁদতে দেখিনি। ওর মন ভরে শুধু ছিল জ্বালা আর বিদ্রূপ, আজ চোখে জল নেমেছে। বলে ষষ্ঠী—আমার সব হারিয়ে গেল সতে, আমার আর কিছু হবে না দেখে নিস্।

কথাটার অর্থ তখন বুঝিনি, পরে বুঝলাম।

মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ষষ্ঠীর বাবাও এসেছিলেন ওর নতুন মাকে সঙ্গে করে। শহুরে, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। ষষ্ঠীর নিজের মাকে তেমন মনে পড়ে না। তার মনের সবটুকু জুড়ে ছিল ওই পিসীমা। আর কাউকে মেনে নিতে পারে না সে।

নতুন মা গ্রামে এসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাটির বাড়ি। তাছাড়া এখন এখানকার বিষয়-আশয় কেই বা দেখবে? বোঝা হয়ে উঠেছে ওই ছেলেটা। শহরেই ওকে নিয়ে যাবে, এখানকার বাড়ি জমি বেচে এইবার তারা শহরে ছোট্ট একখানা বাড়ি করবে। সেই কথাটাই স্বামীকে জানায় সে—এসব রেখে কোন লাভ নেই। ও ষষ্ঠীও চলুক শহরে।

কথাটা ষষ্ঠী শুনে চুপ করে থাকে। মনে হয় কেউ যেন তাকে নির্বাসনদণ্ড দেবার কথাই বলছে। এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে তাকে ওই বাবা-মায়ের কাছে! কেমন ভয় করে তার। আজ মনে হয় সব তার হারিয়ে গেছে। এত বড় দুনিয়ায় তার জন্য কোথাও এতটুকু শান্তির ঠাঁই নেই। ভালবাসারও কেউ নেই। মা-পিসীমাকে মনে পড়ে। মনে হয় পাপ পুণ্য সব ওদের মনগড়া, মিথ্যে একটা বস্তু। কই জীবনে সে তো কোন পাপ করেনি, তবে তার মা-পিসীমা, ভালবাসার সব ক'জন তাকে ফেলে চলে গেল কেন?

সকালের সোনালী আলো হলুদ হয়ে আসছে। হঠাৎ নতুন মায়ের ডাকে মুখ তুলে চাইল ষষ্ঠী। রান্নাঘরে এঁটো বাসনপত্র নামানো রয়েছে রাত থেকে।

—মুখের ওপর কথা ! বাঁদর কোথাকার—

নতুন মা বলে ওকে—ওগুলো ধুয়ে আন ঘাট থেকে। ঘরে দোরে ঝাঁট পড়েনি, তাও দেখিস না। ওগুলো ধুয়ে এনে ঝাঁটপাট দিয়ে দে।

ষষ্ঠী বলে—স্কুলের পড়াশোনা আছে।

—কোন্ ক্লাসে পড়িস ? ক্লাস এইটে ? এই বয়সে আর এইটে পড়ে না! পড়ে আর কাজ নেই।

ষষ্ঠী চমকে ওঠে। এতদিন বোঝেনি পড়াটা কত দরকার। আজ মনে হয়েছে সেই কথা। তার নিজের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। এত বড় ত্বনিয়ায় সে একা। তাই পড়ার প্রয়োজনটা অনুভব করেছে এবার। এমনি দিনে নতুন মা তাকে পড়া ছাড়িয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে শহরে। সেখানে তাকে এইসব কাজ করতে হবে, স্রেফ চাকরের মত বাঁচতে হবে, এটা কল্পনাও করতে পারে না সে—তাই নতুন মায়ের কথায় বেশ জোরেই জানায়—স্কুলেই যাবো আমি।

নতুন মা ওর মুখের উপর ছেলেটাকে কথা বলতে দেখে ফোঁস করে ওঠে। তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবে ওই বাঁদর ছেলেটা। গর্জে ওঠে নিমেষের মধ্যে। নতুন মা ওর গালে প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় কষে দিয়ে গর্জাতে থাকে—মুখের ওপর কথা ! বাঁদর কোথাকার—সহবত জানিস না ? ভয়ডর নেই তোর ?

ওর গর্জনে বাবাও ছুটে আসেন। ষষ্ঠী তখনও গর্জাচ্ছে—মারবে না—না ?

বাকীটা বাবাই ওকে পুষিয়ে দেন। কিল চড় লাথি বৃষ্টি চলছে ওর উপর। বাবাও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। এমন বেয়াদব ছেলেকে খুন করেই ফেলবেন তিনি।

নতুন মা তখনও গলা সপ্তমে চড়িয়ে শোনায়—ডাকাত পুষেছো বাড়িতে ? গায়ে

হাত দিতে আসে? মাগো মা! ছিঃ ছিঃ এই আমার বরাত। এমনি সতীনকাঁটা নিয়ে বাঁচতে হবে আমায়! এর চেয়ে মরাই ভালো।

বাবার মারের তেজ তত বাড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ষষ্ঠী। নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করে। কোন অন্যায় সে করেনি। কিন্তু তবু ওরা তাকে অপমান করতে ছাড়ে না। বাবা বিনা বিচারে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে চলেছেন। জামাকাপড়ে লাগে রক্তের দাগ। বাবা ওর হাত থেকে বই খাতাপত্র কেড়ে নিয়ে ছত্রাকার করে ছিটিয়ে দিয়ে জানান—বেরিয়ে যা। দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে।

কথাটা গ্রামে রটতে দেরি হয়নি। আমরাও শুনেছিলাম। কিন্তু ষষ্ঠীর দেখা আর কেউ পায়নি। ও এক কাপড়জামাতেই বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছে। দিনকতক ওর বাবা এদিকওদিকে খোঁজ খবর করলেন, থানাতেও জানানো হল। ওর নতুন মা মনে মনে খুশীই হয়েছে। অবশেষে একদিন ওর বাবা গ্রামের সেই পৈতৃক ভিটে জমি জায়গা সবই বিক্রি করে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে শহরেই ফিরে গেলেন। সেইখানেই এবার বাড়িঘর করবেন। আমরাও জানলাম ষষ্ঠী যদি কোনদিন ফিরেও আসে এখানে, তার আর স্থান নেই, রইল না।

খেলার মাঠে তবু ষষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। সে থাকলে আমরা এমনি করে হারতাম না। তার সামনে দিয়ে বল যেতে পারে কিন্তু কোন প্লেয়ার যেতে পারতো না। নদীর ঘাটে সাঁতারের পাল্লাও আর জমে না। দত্তমশায়ের বাগানে নারকেল গাছে কাঁদি কাঁদি ডাব ফলেছে, পাড়বার কেউ নেই। নুলো পঞ্চাঠাকুর এইবার বিনা বাধায় সদাব্রতের ওই চাল ডাল বিক্রি করে গরিবদের খাওয়া বন্ধ করে নিজেই লুঠছে, বলবারও কেউ নেই। তবু আমরা ক্রমশঃ ভুলে গেছি ওই ষষ্ঠীকে। পরীক্ষার পড়া, পাস করার ভাবনা, তারপর পাস করে গ্রাম ছেড়ে কলেজে আসা —নানা ঘটনার ভিড়ে ষষ্ঠীর সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা হাসিভরা মুখখানা ক্রমশঃ ভুলে যাই।

দীর্ঘদিন পর হরিদ্বার গেছি বেড়াতে। গঙ্গার ধারে হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। অবিকল ষষ্ঠীর মতই চেহারা। তবে অনেক সুন্দর মুখে তেমনি মিষ্টি হাসি—চিনতে পারিস সতে?

ষষ্ঠীই। কিন্তু তাকে এইখানে এইভাবে কোনদিন দেখবো ভাবিনি। একেবারে

সাধু মহারাজ সেজে গেছে। কিছুতেই ছাড়ল না। সঙ্গে করে নিয়ে গেল তাদের আস্তানায়। গঙ্গার ধারে হরকীপ্যারীর একটু ওপাশে মনোরম একটা আশ্রয়। এখানে সেও তীর্থ করতে এসেছে। আসে মাঝে মাঝে। আজ ষষ্ঠীর দিন বদলেছে। কোন বিরাট দেবোত্তর এস্টেটের সর্বময় কর্তা; বিলাস ব্যসনের অভাব নেই। ভক্তরাও তার হুকুমের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

রাত নামছে। আমাদের সেই পলাতক ডানপিটে ষষ্ঠীচরণই বলেছিল কথাগুলো। পাহাড়ে পাহাড়ে অন্ধকার জমে উঠেছে, বাতাসে ওঠে গঙ্গার কলধ্বনি। আজ থেকে বহু অতীতের অন্ধকারে আমরা দুজন যেন ফিরে গেছি। ষষ্ঠীও তার জীবনের সেই চরম দুঃখের দিনগুলোকে ভোলেনি। মনে হয় আজকের এই বিলাস ঐশ্বর্য তার কাছে বড় নয়, তাই হয়তো অতীত দিনগুলোকে সে ভোলেনি আজও এই ভাগ্য-পরিবর্তনের পর।

অবশ্য এই ভাগ্যপরিবর্তনটা ঘটেছিল নির্মম রসিকতার মধ্য দিয়েই।

বাড়ি থেকে সেদিন বাবার হাতে নিগৃহীত হয়ে বের হয়েছিল ষষ্ঠী, কোথায় যাবে জানে না, চলেছে লক্ষ্যভ্রষ্টের মত।

কদিন পথে পথে ঘুরেছে। পথের ধুলোয় জামাকাপড় মলিন বিবর্ণ, মাথার চুলগুলো উষ্কখুষ্ক। সন্ধ্যার সময় কোন এক গ্রামে কার বাড়ির সামনে হাজির হয়, যদি রাতের জন্য আশ্রয় আহার্য মেলে। ভদ্রলোক ওর কথা শুনে ফোঁস করে ওঠে—তারপর রাতের অন্ধকারে সব নিয়েথুয়ে কেটে পড়ো! চোরের খবরদার দেখছি তুমি! কাটো দিকি, জেলে পুলিসে দেবো।

সরে গেল ষষ্ঠীচরণ। তবু গঞ্জের হাটে যদি ঠাঁই মেলে। সেখানকার কোন মহাজন বলে—সোমত্ত ছেলে ব্যবসা করোগে! নিদেন ফিরি করেও দিন কাটাও। ভিক্ষে করবে কি হে?

অগত্যা সেখান থেকে ফিরতে হয়। ব্যবসা করা যেন সবচেয়ে সোজা কাজ—এইভাবেই মহাজন কথাটা বলেন। পথে পথে ঘুরে চলেছে, কোন দিন উপবাসে কোন দিন জল খেয়ে। কোন স্কুল-বোর্ডিং-এ গিয়ে হাজির হয় একদিন। মাস্টারমশায়রা যদি সাহায্য করেন তাহলে হয়তো বোর্ডিং-এ থেকে কোনমতে পড়াশোনা করতে পারবে। একদিন যে সুযোগ সে হেলায় হারিয়েছে, আজ তারই জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করবে সে। লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে।

কথাটা সবিনয়ে বোর্ডিং-এর শিক্ষকমশায়কে জানায় ষষ্ঠীচরণ। আশা ভরে চেয়ে থাকে। বলে—তার জন্য আপনাদের কাজকম্মোও করে দোব, যা বলবেন, শুধু পড়ার একটু সুবিধে করে দিন।

ওর ভিখারীর মত চেহারা দেখে মাস্টারমশায় গর্জে ওঠেন—দূর হও দিকি, ফেরেববাজির কারবার পেয়েছো এখানে? এটা সদাব্রত নয়, ভাগো!

দূর করে দিলেন তাকে। ষষ্ঠীচরণ দেখেছে শুধু মানুষের নীচ স্বার্থপরতা আর লোভ। কেউ তাকে কোনরকম সাহায্য করেনি। শুধু শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবু এ পথের শেষ নেই।

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন এসে পৌঁছলো এক বিরাট পাঁচিল-ঘেরা মন্দিরের সামনে। বিশাল এলাকা জুড়ে মঠ-আশ্রম নানাকিছু গড়ে উঠেছে। দেবতা নাকি খুব জাগ্রত। বিরাট ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। দুদিন খাওয়া জোটেনি, পথে কোন চাষীর খামারে ধান তুলে দিয়েছিল, সেই চাষীই দয়া করে তাকে কিছু চাল দিয়েছে। সেগুলো রান্না করার সুযোগও হয়নি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে মন্দিরের দেবতার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সারা মন দিয়ে ওই দেবতার কাছে তার দুঃখের কথা জানাতে চায়। প্রণাম করছে।

নাটমন্দিরে কীর্তন চলেছে। আশপাশে ঘুরছে নধরকান্তি মঠের বাবাজীরা। ভোগপুষ্ট দেহ। মাথায় পুরুষ্ট টিকি। প্রচণ্ড শব্দে কীর্তন চলেছে। দেবতার সামনে থরে থরে সাজানো ঘৃতপক্ক লুচি সন্দেশ রকমারি ফলমূল। বাতাসে তার সুবাস ওঠে।

ষষ্ঠীর নাড়ীগুলো পাক দিচ্ছে অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণায়। হঠাৎ কে হুংকার দিয়ে ওঠে—অ্যাই, অ্যাই! দিলি তো নাটমন্দিরে উঠে সব অপবিত্র করে! জয় প্রভু —একি মহা অপরাধ হয়ে গেল প্রভু!

কলরব ওঠে। ছুটে আসে মন্দিরের বাবাজীরা। বড় মোহান্ত তখনও গর্জন করছেন—এই সব ভিখারীর দলকে ওই অশুচি পোশাকে কে ঢুকতে দিল! দেখিস না তোরা কিছুই!…তাড়া—তাড়া!

ধরে আনতে বললে বাবাজীরা বেঁধে আনে। এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ষষ্ঠীচরণকে ছিটকে ফেলে দেয়। কপালটা কেটে গেছে। বুভুক্ষু দেহ কাঁপছে ওদের আঘাতে। বড়

মোহান্ত মহারাজ বলেন—আহা কেষ্টোর জীব, দেবতার সামনে মারিস না। তফাতে নিয়ে গিয়ে যা হয় কর।

ষষ্ঠীচরণ প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে—আমি জানতাম না।

মনে মনে সে ঠাকুরের কাছেও অভিযোগ জানায়, সে কোন দোষী নয়। কিন্তু কোন বিচারই করে না ওই দারুময় দেবমূর্তি। ও নিষ্প্রাণ। এদের ভণ্ডামির প্রতিমূর্তিতেই যেন পরিণত হয়েছে। নুলো পঞ্চাননের কথা মনে পড়ে। তাকেও একদিন ঠাট্টা করেছিল সে। এরা সবই একজাতের।

তখনও ওরা কিল চাপড় বসিয়ে চলেছে, ঠেলে ওকে বের করে দিল।

রাত হয়ে গেছে। বিরাট মন্দিরের সেই অগণিত ভক্ত যাত্রীর দলও ফিরে গেছে। অন্ধকারে ওই মন্দির চূড়াটা কী ধোঁকাবাজির প্রতীক হয়ে আকাশে মাথা তুলেছে। বুঝতে পারে ষষ্ঠীচরণ, খিদেও লেগেছে। ওটা যেন বাড়ি ছাড়ার পর থেকে তার নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। কোত্থেকে একটা বাতিল হাঁড়ি ও যোগাড় করেছে, খানকয়েক ইঁট দিয়ে উনুনমত করা গেছে। কিন্তু কাঠ! কিছু কাঠ হলে তবু ওই চালচাট্টি ফুটিয়ে খেতে পারবে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মন্দিরের পাশেই একটা চালাঘরের মাচায় ভোগের জন্য অনেক কাঠ রাখা আছে। ওদের চাট্টি কাঠই নেবে সে। খেতে হবে তাকে।

বাবাজীর দল গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মন্দিরে কোনদিন এসব ঘটনা ঘটেনি, তাই তারা নিশ্চিন্তই রয়েছে। অন্ধকারে এগিয়ে যায় ষষ্ঠীচরণ। মাচার উপরে কাঠগুলো নাগালের বাইরে। কোন কিছু দিয়ে একটু টেনে আনতে পারলে তবে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। হাতের কাছে সেরকম কিছু দু'তিন হাত লম্বা বস্তুও নেই। এদিকে কাঠ তার চাইই। হঠাৎ মন্দিরের দিকে নজর পড়ে। মন্দিরের দরজা খোলা, দারুমূর্তি দেবতা তেমনি হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণের মনে হয় ওই দিয়েই কাজ হবে। কেউ নেই, আবছা অন্ধকারে মন্দিরে ঢুকে সেই মূর্তিটাকে ঘাড়ে করে এনে কাঠচালায় হাজির হয়। এদিকওদিকের কাঠগুলো ওই লম্বা মূর্তি দিয়ে খুঁচিয়ে ঠেলে হাতের কাছে আনে। কাজ হয়ে গেছে। মন্দিরেব ঠাকুরকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে কাঠগুলো নিয়ে বের হয়ে আসছে—হঠাৎ কোন বাবাজীর নাক ডাকা থেমে যায়। জানলা দিয়ে ছায়ামূর্তি দেখে সে ঘুমের ঘোরেই চিৎকার করে ওঠে—চোর—চোর!

কলরব ওঠে। ধড়মড় করে জেগে ওঠে বাবাজীরা, ঘুমন্ত প্রহরীর দল। তার আগেই ষষ্ঠীচরণ কাঠ নিয়ে বাইরে পুকুরপাড়ে সেই উনুনের ধারে এসে হাজির হয়। এইবার চাট্টি ফুটিয়ে নিতে পারবে। পেটের নাড়ীগুলো খিদেতে জ্বলছে। চেয়ে থাকে ওই ফুটন্ত চালগুলোর দিকে।

মন্দিরের লোকজন বাবাজীর দল তখন এদিকওদিকে চোরের সন্ধানে হানা দিয়েছে। হইচই পড়ে যায়। কয়েকজন বাবাজীও এখানে এসে হাজির হয়। ষষ্ঠীচরণকে দেখে তারা চিনতে পারে, এই ছেলেটাকেই তারা মেরে মন্দির থেকে বের করে দিয়েছিল। হঠাৎ কাঠগুলো দেখে তারা চিনতে পারে। গর্জে ওঠে বাবাজীরা—ভোগের কাঠ চুরি করতে গিইছিলি? ব্যাটা চোর কোথাকার!

ওরা ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে। এক লাঠির আঘাতে ওর সেই আধফোটা চালগুলোকে ছিটিয়ে দিল, মাটির হাঁড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হাতে-নাতে চোর ধরেছে। মারতে মারতে ওরা নিয়ে গেল তাকে মন্দিরে।

বড় মোহান্ত, অন্যান্য সকলেই হাজির হয়েছেন। ষষ্ঠীচরণও বুঝতে পারে তার বরাতে আরও দুঃখ আছে। ওরা জেরা করছে—বল্ কাঠ পেলি কোথায়? চুরি করেছিস?

ষষ্ঠী দেখেছে জীবনে অনেক কিছুই। এত দুঃখ বিপদেও তার সেই বুদ্ধিটা হারায়নি।

বলে ওঠে—দুদিন খেতে পাইনি বাবাজী, তাই মন্দিরের ঠাকুরকে ডাকছিলাম, একমনে ডাকছিলাম। হঠাৎ দেখি অন্ধকার আলো করে একটি সুন্দর ছেলে এসে বললে, তুই ডাকছিস আমাকে? সুন্দর নাক তেমনি টানাটানা চোখ।

কোন বাবাজী ধমক দিয়ে ওঠে—থাম ব্যাটা শয়তান।

বড় বাবাজী তবু জিজ্ঞাসা করেন—তারপর?

ষষ্ঠীচরণ দেখেছে তার ওষুধ ধরছে। তাই গদ্‌গদ চিত্তে পরম ভক্তিভরে বলে চলে—তিনিই নিজে মাথায় করে এই কাঠ দিয়ে চলে গেলেন! কাঠ আর চাল।

ষষ্ঠী হাত দিয়ে দেখায়—ওই দিকে চলে গেলেন, আর দেখতে পেলাম না। তবু বাতাসে তাঁর দেহের মিষ্টি সুবাস জেগে থাকে।…খুঁজলাম—দেখতে পেলাম না। মন্দিরের ওদিকে কোথায় চলে গেলেন।

—মিছে কথা। ব্যাটা হারামজাদা! কোন প্রহরী গর্জে ওঠে।

হঠাৎ বড় মোহান্ত মহারাজ ওকে থামান।

ষষ্ঠীচরণ বলে চলেছে—তিনি বললেন, ওরা তোকে মেরেছে, ছাখ সে আঘাত বেজেছে আমারই মুখে গায়ে।

হঠাৎ বড় মোহান্তজী মন্দিরের দেবতার দিকে এগিয়ে যান, সকলেই চমকে ওঠে।

জয় প্রভু!

দেখা যায় ওই সুন্দর মূর্তির মাথায় লেগে আছে ঝুল-কালি, কাঠের খোঁচায় মুখ-নাক-হাত-পায়ের রং ছড়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, এ যেন ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে দেবতা দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরে। ওরা অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে। বড় মোহান্ত বিশাল বপু নিয়ে কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়েন ষষ্ঠীচরণের পায়ে আর ফোঁসফোঁস করে ওঠেন—ওরে তুই ধন্য! প্রভু তোকে দর্শন দিয়েছেন। তোর বেদনা নিজের বুকে তুলে নিয়েছেন। ওরে তুই সাক্ষাৎ ভক্ত! জয় প্রভু—ভক্তবৎসল প্রভু! অহো—

চারদিক থেকে তখন ষষ্ঠীচরণের ধূলিধূসর পায়ের ধুলো নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

মোহান্তমহারাজ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন।

তারপর থেকেই রয়ে গেছে ষষ্ঠীচরণ এই আশ্রমে। মহারাজের সব করুণা এখন ওর উপরেই বর্ষিত হয়ে চলেছে। ঘুরতে ঘুরতে এসেছে ষষ্ঠীচরণ এই তীর্থে। এর পরে সেইই হবে এ এস্টেটের সর্বময় কর্তা। ধনসম্পদের অভাব নেই।

রাত নামছে। গঙ্গার কলধ্বনি শোনা যায়। আকাশে জ্বলছে দু'একটা নির্জন তারার আলো। পাহাড়গুলো কালো মেঘের মত ঢেকে রেখেছে সবকিছু। ষষ্ঠীচরণ বলে—এখানে ভালো লাগছে না সতে। এই জীবন বিষিয়ে উঠেছে। মানুষের ভণ্ডামি, ধর্মের নামে দেবতার নামে সব পাপগুলোকে দেখে এখান থেকে পালাতে ইচ্ছে করে। মানুষের মত আমি বাঁচতে চাই সতে। হাঁপিয়ে উঠেছি এখানে।

তবে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। ও জানে না বোধহয় তার বাবা মারা গেছেন। মাও কটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কষ্টেই রয়েছে। ওসব জগতের মানুষ ও নয়, তাই ওসব কথাও বলিনি।

—খুব অবাক হচ্ছিস নারে সতে ?

তারপর আর অনেক-দিন দেখা নেই ওর সঙ্গে। তার কথা ভুলে গেছি। মনে হয় ষষ্ঠীচরণও বদলে গেছে। প্রথমে সকলেই ভালো থাকে—নীতিকে বিশ্বাস করে। তারপর এই ত্নুনিয়ার চাপে একেবারে বদলে যায়, লোভী হয়ে ওঠে, নীচ হয়ে ওঠে। ষষ্ঠীচরণও বদলাবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে!

তবুও জীবনে অনেক-কিছুই ঘটে, মানুষ হয়তো একজায়গায় আজও বদলায়-নি। কয়েকবছর কেটে গেছে, ভুলে গেছি ষষ্ঠীচরণের কথা। হালিশহরের ওদিকে গেছি সেদিন। বিকাল নামছে। আকাশে বাতাসে চটকলের ভোঁ-এর শব্দ ওঠে। রাস্তায় জমেছে কুলীদের ভিড়। ধূলিধূসর পরিবেশ। হঠাৎ ওই ভিড়ের মধ্যে কাকে ডাকতে দেখে দাঁড়ালাম। এগিয়ে আসে তেলকালির দাগধরা জামা আর নীল ফুলপ্যাণ্ট পরা একটি মূর্তি। ওকে দেখে চমকে উঠি। ওকে অতীতে দেখেছিলাম ছেলেবেলায়, তারপর দেখেছিলাম হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে, সেদিন ও ছিল বিলাস ব্যসন আর সম্পদের বেড়ায় ঘেরা সেই মঠে। আজ তাকে এই খেটে খাওয়া মানুষের ভিড়ে এই পোশাকে দেখবো ভাবতেই পারিনি। ষষ্ঠীচরণ বলে—খুব অবাক হচ্ছিস নারে সতে ?

হবারই কথা। সেইই টানতে টানতে আমাকে নিয়ে চলে তার কোয়ার্টারের দিকে। নোংরা পরিবেশ। কলরব করছে ছেলেমেয়েগুলো, কোথায় জল জমেছে। ময়লা জল। নরদমায় থিকথিক করছে ময়লা। ওরই মাঝে বাসা বেঁধেছে আজকের

ষষ্ঠীচরণ। ওর নতুন মাও বের হয়ে আসে। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিপদেই পড়েছিল স্বামী মারা যাবার পর। আজ ষষ্ঠীচরণই তাদের এখানে নিয়ে এসেছে, সেই গজদন্তমিনার থেকে বের হয়ে সে নেমে এসেছে মানুষের জগতে। ওর নতুন মা নিয়ে আসে চা আর দু'খানা রুটি।

ষষ্ঠীচরণ বলে—বেশ আছি বুঝলি। লোক ঠকাতে পারলাম না তাই নিজেই ঠকবার জন্যই মানুষের ভিড়ে এসে মিশলাম। খেটে খাওয়ার—বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে সতে। তবু পরম সান্ত্বনা—আমি কাউকে ঠকাইনি। ওদের জন্য আজ সবই মেনে নিয়ে আনন্দে আছি।

ওর মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির আভাস। এই হাসিটুকু সেদিন হরিদ্বারে ওর মুখে দেখিনি, সব মোহের মুখোশ খুলে সে আজ সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। তাই ভালো লাগলো ষষ্ঠীকে।

● খোকার শাগরেদ

ওস্তাদ
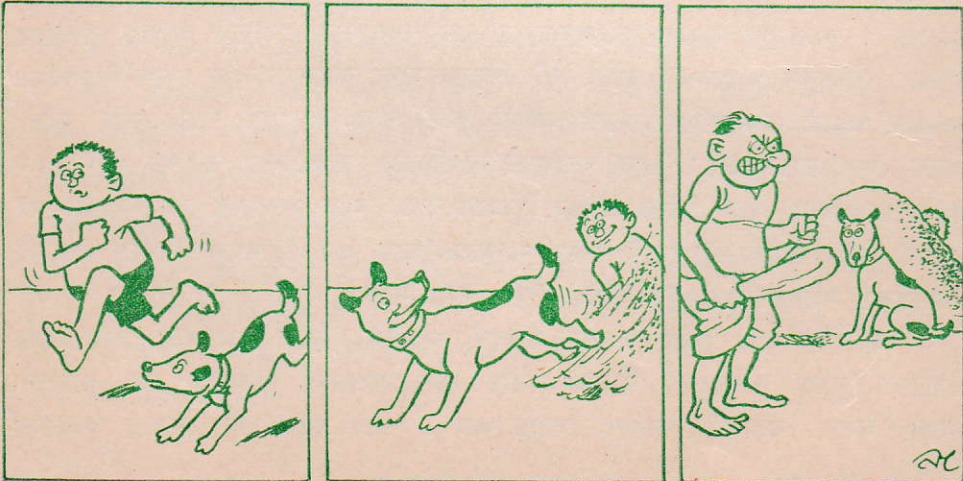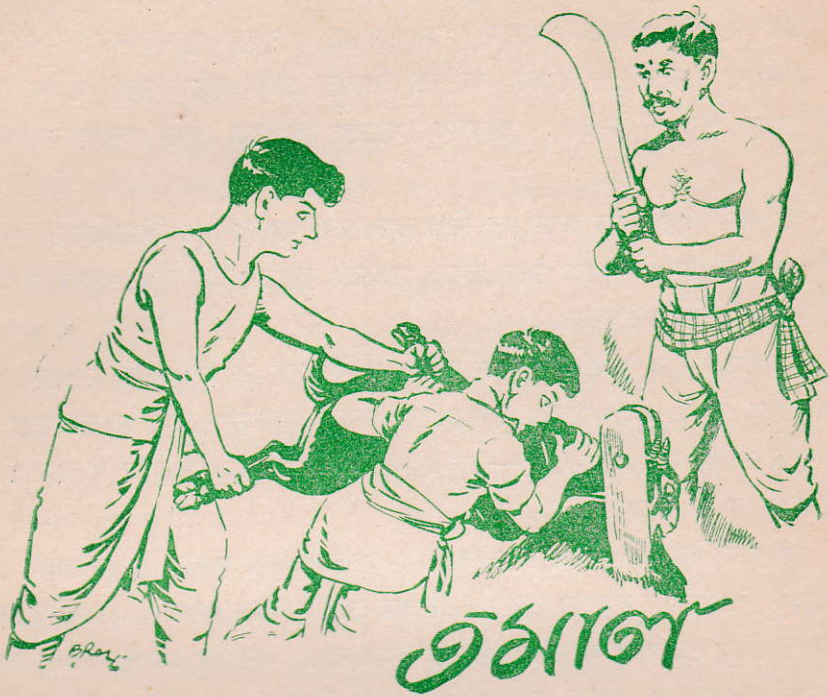
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার এই গল্পের নায়কের নাম খোকা, বয়স ছয়। রোগা রোগা ফরসা ফরসা চেহারা। ঠোঁট দুটো টুকটুক করছে, মনে হয় কে যেন রং দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছে! খোকা থাকে কলকাতার কাছেই পাইকপাড়া অঞ্চলে। এখন অবশ্য পাইকপাড়াটা কলকাতার মধ্যেই। এখানকার পুরনো বাসিন্দারা শ্যামবাজার বৌবাজার যাবার সময় বলে কলকাতা যাচ্ছি।

খোকা রোজ বল খেলতে যায় দত্তবাগানের কাছে একটা মাঠে। যাবার সময় একটা কালীবাড়ি পড়ে। সেখানে বারোমাস কালীপূজো হয়। প্রতিদিন খেলতে

যাবার সময় খোকা আর তার বন্ধুরা কালী ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায়। যেদিন ম্যাচ থাকে সেদিন ফুল দিয়ে পূজোও দেয়। খুব জাগ্রত কালী।

এই কালী সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। বুড়ো পুরুতমশাই ফুল দিয়ে মাকে সাজান, মায়ের যে হাতটা বরাভয় দিচ্ছে সেই হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করে পূজো করেন। তারপর মায়ের পায়ের ফুল ভক্তদের মাথায় ঠেকান।

বহু বছর আগে এক ভক্ত খুব নিষ্ঠা সহকারে পূজোর ফুল দিয়েছিল। পুরুত মশাই পূজো করছেন। পূজো শেষ হল। মায়ের হাতে গোঁজা ফুল, পুরুতমশাইয়ের মাথায় আশীর্বাদের মতন পড়ল।

তারপর থেকে সেই ফুল যার মাথায় ঠেকিয়েছে তারই ভাল হয়েছে। সে অনেকদিনের কথা। এখন আর সে ফুলের একটি পাপড়িও নেই, আর মায়ের বরাভয়ের হাত থেকে ফুলও পড়ে না—তবু এ কালী জাগ্রত। খোকার মা-বাবাও এই কালীকে খুব ভক্তি করেন।

খোকার দিন বেশ ভাল ভাবে কাটে। সকাল বেলা স্কুল। দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম। তারপর পড়া। বিকেল বেলা ফুটবল খেলা। খোকার খেলায় খুব শখ। কিন্তু রোগা বলে ভাল খেলতে পারে না। একদিন খেলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। খোকার বন্ধুরা তাড়াতাড়ি একটা রিকশা করে বাড়িতে নিয়ে এলো। খোকার মা-বাবা তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনেন। ডাক্তার আসার আগেই খোকার জ্ঞান হয়।

ডাক্তার মিত্র আসেন। তিনি খোকাকে জন্মাতে দেখেছেন। খোকাকে পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন—"বড্ড উইক, দুর্বল। দুধটুধ বেশী করে খাওয়ান।"

খোকার মা বলেন—"দুধ একেবারে হজম করতে পারে না।"

"ডিম টিম দোব"—খোকার বাবা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেন।

ডাক্তারবাবু কটমট করে খোকার বাবার দিকে তাকান।

ডাক্তার মিত্র এই যেচে উপদেশ পছন্দ করেন না, "না না, ডিম রোজ রোজ সহ্য হবে না। দুধই খাওয়াতে হবে।"

কথাগুলো বলে ডাক্তার মিত্র ভাবেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন—"ছাগলের দুধ খাওয়াতে পারবেন ?"

"চেষ্টা করে দেখি।"—খোকার বাবা উত্তর দেন।

অনেক চেষ্টা করে পাওয়া গেল। এক অবাঙ্গালী বুড়ী রোজ একটা বিরাট রামছাগল এনে সামনে দুধ দুয়ে যেতো। ছাগলের দুধ খেয়ে খোকার শরীর ভাল হতে থাকে। কিন্তু কয়েক দিন পর সেই ছাগলের দুধউলি 'মুলুক' মানে নিজের দেশে চলে গেল। খোকার ছাগলের দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

কি করা যায়। খোকার বাবা খোকার মাকে বললেন,—"দেখ না এবার গরুর দুধ দিয়ে।"

গরুর দুধ খেয়ে খোকার আবার শরীর খারাপ হয়ে গেল। তারপর খোকার বাবা কোথা থেকে একটা সাদা রঙের ছাগল কিনে আনলেন। ছাগলটার দুটো বাচ্চা—একটা কালো, আর একটা সাদাকালো। ছাগল আর বাচ্চা দুটো পেয়ে খোকার খুব মজা হল।

রাতদিন দু বগলে দুটো বাচ্চাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ছাগলটা আসার পরই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। খোকা পার্কে খেলছিল। ছাগলের মা-টাও খোকার কাছেই চরছিল। ছাগলের বাচ্চা দুটো রাস্তা পার হচ্ছিল। কালো বাচ্চাটা পার হয়ে গেল, সাদাকালোটা পার হতে গিয়ে লরি চাপা পড়ে মরে গেল। খোকা, খোকার মা-বাবার খুব দুঃখ হল।

দিন যায়। খোকা এখন কালো বাচ্চাটাকে নিয়ে ভুলে থাকে। খোকাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন ধীরেনবাবুরা। তাঁরা খোকাকে ভালবাসেন। ধীরেনবাবুর স্ত্রীকে খোকা বলে পিসী। পিসী খোকাকে ঠাট্টা করে বলে—"খোকা গান্ধীজী হয়েছে।"

"কেন ?"—খোকা বড় বড় চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

"গান্ধীজীও তোর মতন ছাগলের দুধ খেতেন।" পিসী বুঝিয়ে দেন।

খোকা গম্ভীরভাবে বলে—"তাই বুঝি।"

এখন কালো ছাগলের বাচ্চাটাই খোকার দিনরাত্রের সাথী। এই বাচ্চা

পাঁঠাটাও খোকাকে খুব ভালবাসে। রাত্রে খোকার বিছানায় গিয়ে বসে থাকে। খোকার মা বেরো বেরো বলে খোকার পাশবালিশটা গদার মতন তুলে ধরেন। খোকা এক মুখ হেসে, ছোট্ট বাচ্চাটাকে জড়িয়ে তুলে নেয়।

ধীরেনবাবু আর তাঁর ছেলে পণ্টু মাংস খেতে খুব ভালবাসেন। পণ্টু খোকার চেয়ে বড়, এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছে। খোকা ফ্ল্যাটের প্যাসেজে বাচ্চা পাঁঠার গলায় একটা লাল রিবন বেঁধে দিচ্ছিল।

পণ্টু জিভ চেটে বলে—"খোকা তোর পাঁঠাটা দে। মাংস খাই।"

খোকা অবাক হয়ে বলে—"মাংস—এর মাংস খাবি!"

ধীরেনবাবু বাধা দিয়ে বলেন—"ওর এখন কতটুকু মাংস হবে। আলুভাতের মতন ভাতে খাওয়া যেতে পারে।"

"একে খাবে পিসেমশাই?"—খোকা সভয়ে বলে।

"না না।" ধীরেনবাবু খোকাকে নিশ্চিন্ত করেন।

খোকার কিন্তু ভরসা হয় না। ছাগলের বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে ঘরে চলে যায়।

তিন মাস হয়ে গেছে।

এই তিন মাস ধরে খোকা আর ওই কালো বাচ্চাটা ছাগলের দুধ খেয়ে বেশ তাগড়া হয়েছে। ছাগলটা আর দুধ দেয় না।

ডাক্তার মিত্র বললেন—"এবার গরুর দুধ খাইয়ে দেখুন তো খোকাকে!"

সত্যি এবার খোকার গরুর দুধও হজম হতে লাগল।

ডাক্তার মিত্র রায় দিলেন,—"আর ছাগলের দুধ খেতে হবে না।"

খোকার বাবা ছাগল আর তার বাচ্চাটা বিক্রি করে দেবেন ঠিক করলেন। একটা বেঁটে কালো মতন লোক কিনতে এলো।

লোকটার থুতনির কাছে ওই ছাগলটার মতন এক গোছা দাড়ি। খোকার বাবার সঙ্গে সেই লোকটার টাকার দরদস্তুর হয়ে গেল। যেই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে, খোকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাগলবাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে, "না বাবা, একে দোব না।"

ছাগলবাচ্চাটাও ব্যা ব্যা করে কাঁদে।

শেষটায় খোকার মা বলতে খোকার বাবা বাচ্চাটাকে আর বেচলেন না।

যে লোকটা কিনতে এসেছিল, সে নিরাশ হয়ে বললে—"দিলে ভাল করতেন, পাঁঠা নিয়ে কি কোরবেন, দেন আর পাঁচ টাকা বেশী দিচ্ছি।"

কিন্তু খোকার বায়নার জন্যে খোকার বাবা ছাগলবাচ্চাটা রেখেই দিলেন।

এই বাচ্চা পাঁঠাটা এখন বেশ বড় হয়েছে। কুচকুচে কালো রং। সেইজন্যে ওর নাম রাখা হয়েছে তমাল। খোকা আদর করে তম্লু, তমা বলে ডাকে। খোকা এখন পাঁঠা অন্ত প্রাণ। পাঁঠাটাও খুব দুষ্টু হয়েছে। ছোট ছোট পটলের মতন দুটো শিং গজিয়েছে। খোকা, খোকার বাবা-মা ছাড়া অন্য কাউকে দেখলে গুঁতুতে আসে। ভাল মন্দ খেয়ে খেয়ে গায়ে বেশ জোরও হয়েছে।

কাছেই বাঁড়ুজ্যেদের সুন্দর বাগান। বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে এই বাগানের মালিক। রিটায়ারড্ স্টেশনমাস্টার। অতিকষ্টে এই পাকপাড়ায় বাড়ি আর বাগানটি করেছেন। ভদ্রলোক খুবই হিসেবী এবং খিটখিটে। ভদ্রলোকের ঘাড়টা একটু বাঁকা, সেইজন্যে ঘাড় ঘোরাতে পারেন না। যেদিকে তাকান সমস্ত শরীরটা সেদিকে ঘুরিয়ে দেখেন। বাগানে নানান রকম ফুল ছাড়াও শশা, ঢেঁড়স, ঝিঙে, কুমড়ো, লাউ হেন তরকারি নেই যে লাগাননি। বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে কিন্তু একটি ফুলও কাউকে ছুঁতে দেন না। সেদিন তিনি খুরপি হাতে বাগানে ঢুকেছেন। বেশ কচি কচি ঢেঁড়স হয়েছে। বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁকে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে চলে যাওয়া হেলে সাপের মতন একটা হাসি খেলে যায়। তারপর সমস্ত শরীরটা ঘুরিয়ে অদূরে ডুমুর গাছটার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। তারপর কান পেতে কি শোনেন। খসখস, কচকচ। বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করেন। তাঁর উপুড় করা কড়ির মতন চোখ দুটো পিটপিট করে স্থির হয়ে যায়। দেখেন তমাল মনের আনন্দে কচি কচি ঢেঁড়সগুলোর সদ্ব্যবহার করে চলেছে।

"তবে রে!" বাঁড়ুজ্যেমশাই খুরপিটাকে পিস্তলের মতন ধরে প্রায় ছুটে এগিয়ে

বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের ভুঁড়িতে খুব জোরে ঢুঁ মারে।

এসে, যেই মারতে যাবেন, তমালও খুব বিরক্ত বোধ করে। একটু পেছিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের দিকে জোরে এগিয়ে গিয়ে দু পায়ে দাঁড়িয়ে ফুটবলের হেড করার মতন বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের ভুঁড়িতে খুব জোরে ঢুঁ মারে। বাঁড়ুজ্যেমশাই উলটে পড়ে যান। তমাল আরো কয়েকটা ঢেঁড়স ছিঁড়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যায়।

বন্ধু বাঁড়ুজ্যে খেপে ওঠেন। জানতে পারেন কাদের ছাগল। সেই অবস্থায় ছুটে আসেন খোকাদের বাড়ি। ভাগ্যিস খোকার বাবা ছিলেন না। খোকার মাকে শাসিয়ে গেলেন—"পাঁঠাকে বেঁধে রাখবেন। নাহলে ও আর ফিরবে না।" এই বলে স্টিফ বাঁকা ঘাড়টাকে না নাড়িয়ে একটা চলমান স্ট্যাচুর মতন চলে যান।

খোকার মা তমালকে দু থাপ্পড় মারেন। খোকা এসে বাঁচায়। "আহা দুটো ঢেঁড়স খেয়েছে বই তো নয়।" তারপর মায়ের কাছ থেকে টফি খাবার নাম করে দু আনা পয়সা নিয়ে বাজার থেকে ঢেঁড়স এনে তমালকে খাওয়ায়।

কিন্তু তমাল সম্বন্ধে নালিশ প্রায় প্রতিদিনই আসে। পাশের ফ্ল্যাটে পিসেমশাই মানে ধীরেনবাবু পায়জামা পরতে গিয়ে দেখেন, পায়জামার একটা পা অর্ধেকটা খাওয়া। জানা গেল তমালের কীর্তি। খোকার বাবাকে বলেন, "ওকে কেটে খেয়ে ফেলুন।" খোকার বাবা হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যান। খোকার বন্ধুরাও খোকাকে ঠাট্টা করে, "ওরে পাঁঠার সঙ্গে মিশে মিশে তুইও পাঁঠা হয়ে যাবি।"

খোকা ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাগল বাচ্ছাটাকে বুকে ধরে

(তমাল…পৃঃ ১৪২)
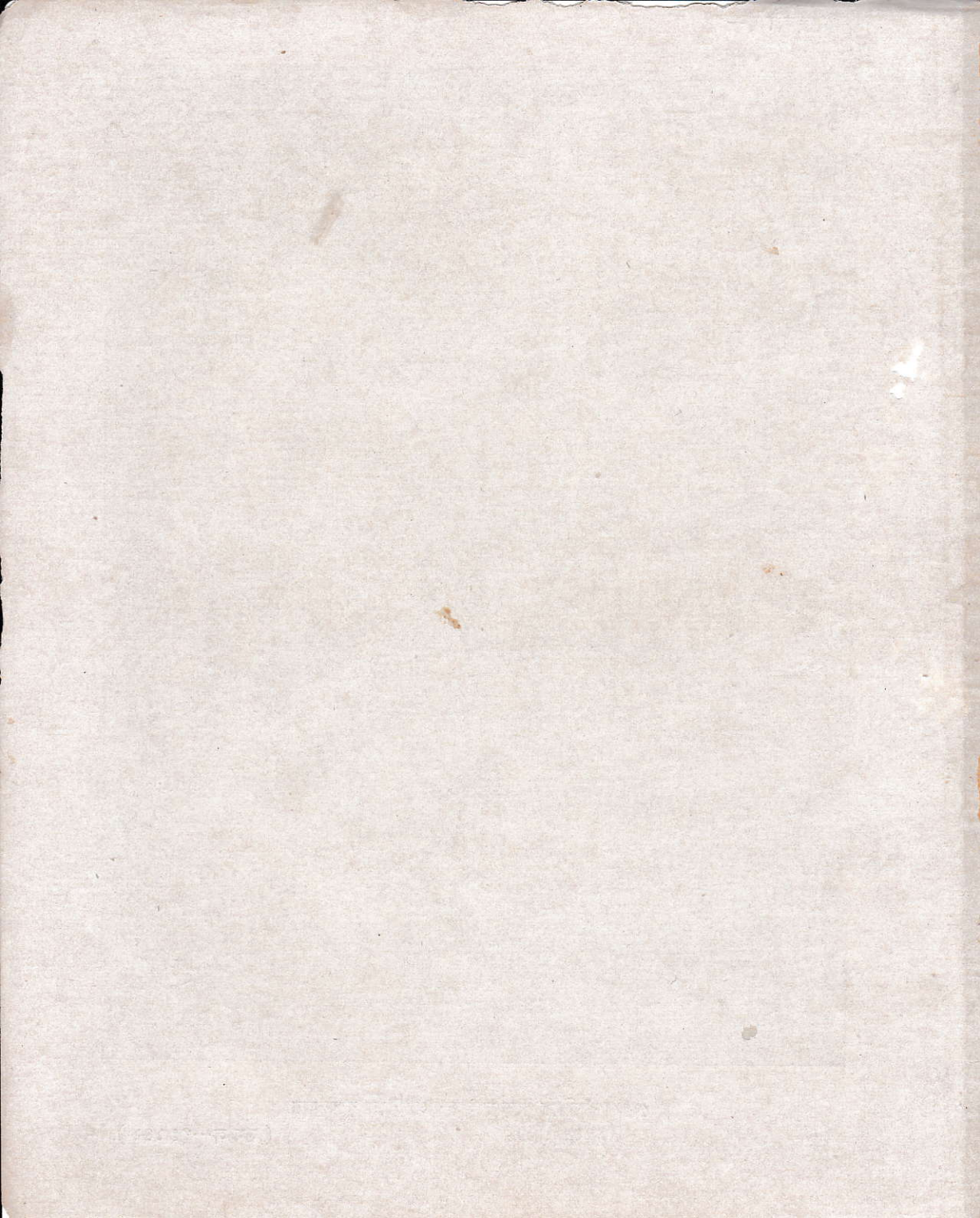
খোকা কিন্তু কারো কথা শোনে না, কারো কাছে যায় না, তমাল অন্ত প্রাণ।

ধীরেনবাবু হেসে বলেন—"খোকা বুদ্ধিমান, তমালকে বড় করছে—ওর পৈতেতে লাগবে।"

ধীরেনবাবুর ছেলে পণ্টু তাড়াতাড়ি বলে—"তমাল ততদিনে বড়ো হয়ে বোকা পাঁঠা হয়ে যাবে। মাংসে বোটকা গন্ধ ছাড়বে, খাওয়া যাবে না।"

ধীরেনবাবুর স্ত্রী, মানে খোকার পাতানো পিসী বলেন—"না না, খোকার পৈতে আমরা তাড়াতাড়ি দোব।"

আলোচনাটা হচ্ছিল খোকাদের বাড়ির বৈঠকখানায়। খোকার বাবা নীরবে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, খোকার মা রান্নাঘরে। রান্নাঘরটা বৈঠকখানার পাশেই—পিসী দাঁড়িয়েছিলেন রান্নাঘরের সামনে। খোকা স্কুলে, তমাল নেই। স্ত্রীর কথার জের টেনে ধীরেনবাবু বলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোকার তো সাত পূর্ণ হল, কি বলেন ?"

খোকার বাবা স্বরটা নামিয়ে মৃদু হেসে মন্তব্য করেন—"আজকাল পৈতে দিয়ে কি লাভ, দুদিন বাদে তো ফেলে দেবে !"

ধীরেনবাবু প্রতিবাদ করেন। "তা বলে ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতে হবে না ?"

"হয়ে কি হবে ?"—খোকার বাবা বলেন।

"আমি বামুনের ছেলে হয়ে বেনে হয়েছি।' আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে জুতোর দোকান করেছেন। এখন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বটুকু বেঁচে আছে নামের শেষে পদবীতে।"

আলোচনাটা আর একটু এগুতো হঠাৎ বাইরে থেকে তমাল ছুটে ঘরে ঢুকল। মুখে তার একটা মুক্তকেশী বেগুন। তমাল সোজা ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন ঘাড়-বাঁকা বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে।

কোন ভূমিকা না করে চিৎকার করে বলেন—"আপনার ওই ডেন্‌জারাস গোটের যদি কোন ব্যবস্থা না করেন—"

"শুধু গোট নয়, হি-গোট।" পণ্টু খবরের কাগজের পাতা উলটে মন্তব্য করে।

"মানে ?" বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে পণ্টুর দিকে রাইট টার্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেন। এপাশ থেকে ধীরেনবাবু উত্তর দেন—"মানে বোকা পাঁঠা।"

বাঁড়ুজ্যে ধীরেনবাবুর দিকে লেফট টার্ন করে বলেন—"মোটেই বোকা নয়, এক নম্বরের ধূর্ত, শয়তান।"

খোকার বাবা দাড়ি কামানো বন্ধ করে, এক গাল সাবানমাখা সাদা মুখে দেঁতো হাসি টেনে সসম্ভ্রমে বলেন—"বসুন বঙ্কুবাবু।"

বাঁড়ুজ্যে আবার লেফট টার্ন করে উত্তর দেন—"দেখুন, আমি পুলিসে কেস করব।"

পুলিসে! সবাই একসঙ্গে আঁতকে ওঠে।

"হ্যাঁ।" বাঁড়ুজ্যে বলে যান—"ওটা আপনাদের ট্রেণ্ড পাঁঠা।"

"ছি ছি!" খোকার বাবার সাবানমাখা মুখটা মূকাভিনেতার মতন নড়েচড়ে ওঠে।

"ছি ছি কি, যা সত্যি তাই বললাম।" বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে খেপে ওঠেন।

"এ কি বলছেন বঙ্কুদা?" ধীরেনবাবু আত্মীয়তার ভাব এনে হাসিমুখে বাধা দেন—"আপনি কি মনে করেন, দাদা পাঁঠাকে দিয়ে আপনার বাগানের বেগুন এনে ভাজা খাবেন—না না, নেভার।"

খোকার বাবা ভেতরে গিয়ে তমাল এবং বেগুনটা এনে প্রথমে তমালকে দু লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দেন, তারপর বেগুনটা বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের সামনে তুলে ধরে বলেন—"এই নিন আপনার বেগুন।"

বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে আড়চোখে বেগুনটাকে দেখে শুঁয়ো পোকার মতন ভুরু দুটোকে নাচিয়ে বলেন—"ছাগলের ছোঁয়া বেগুন আমি ছুঁই না।" অ্যাবাউট টার্ন করে গটগট করে চলে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরে ধীরেনবাবু খোকার বাবাকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন—"দাড়িটা কামিয়ে ফেলুন।"

স্কুল থেকে খোকা ফিরে তমালকে খোঁজে—"মা তমাল কোথায়?"

দেখুন আমি পুলিসে কেস করবো। [পৃঃ ১৪৬

মা বিরক্ত হয়ে বলেন—"জানি না।"

বাবা অফিসে গেছেন। খোকা এ-গলি সে-গলি খোঁজে—তমালকে পায় না। খোকার মন খারাপ হয়ে যায়। মাকে আবার জিজ্ঞেস করে। মা কিছু বলেন না। খোকা পার্কে যায়—ডাকে—তমাল, তমলু, তমা, তমু। কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে খোকা ডাকলেই তমাল গলা কাঁপিয়ে ব্যা-ব্যা করে উত্তর দিত। আজ কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বেলা একটা বাজে। স্কুল থেকে এসেই খোকা বেরিয়েছে, মাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। পণ্টুকে খুঁজতে পাঠান। খোকা তখন টালা ট্যাঙ্কের পাশে তমাল তমাল বলে আর্তনাদ করছে। পাড়ার একজন লোক খোকাকে জিজ্ঞেস করে—"তমাল তোমার কে? ভাই?"

খোকা মাথা নাড়ে। ওখান থেকে চলে যায়। খোকার বড় বড় চোখ ছলছল করছে। খোকা আবার পার্কে এলো—কান্না মাখা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ডাকে—"তমাল, তমা—তমলু—"

"ব্যা……।" ঝোপের আড়াল থেকে তমালের উত্তর শুনতে পায়। খোকা ছুটে ঝোপটির দিকে দেখে তমাল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

● অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

খোকা তমালকে নিয়ে যখন ফিরল তখন দুটো বেজে গেছে। মা খোকার মুখ দেখে কিছু আর বললেন না।

সন্ধ্যে থেকেই খোকার কিন্তু জ্বর এলো। মা তমালের দিকে তাকিয়ে বলেন—"এই মুখপোড়াকে খুঁজতে গিয়ে খোকার জ্বর হল।"

তমাল নির্বিকারভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

খোকার কিন্তু জ্বর ছাড়ে না। আজ সাত দিন। ডাক্তার মিত্র দেখতে এলেন। খোকাকে দেখে গম্ভীরভাবে বলেন—"ভাল বুঝছি না।"

খোকার মা-বাবার দিনে রাতে ঘুম নেই। তমাল খোকার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। খোকা ছাড়া সবাইয়ের কিন্তু তমালের ওপর রাগ। খোকার জ্ঞান নেই।

ধীরেনবাবু, তাঁর স্ত্রী, পল্টু ওঁরাও প্রায় সব সময়ে এসে খোকাকে দেখছেন, খোকার মা-বাবাকে সাহায্য করছেন। দিন পনেরো যমে মানুষের টানাটানির পর খোকার জ্বর ছাড়ল। তার কয়েকদিন পর ডাক্তার মিত্র পথ্য দিলেন।

খোকা এখনও বেশ দুর্বল, বাইরের ঘরে খাটটিতে চুপ করে বসে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে জুলজুল করে চেয়ে থাকে। তমালও খাটের নীচে মেঝেতে বসে থাকে।

এদিকে পাশের ঘরে পিসী মানে ধীরেনবাবুর স্ত্রী আর খোকার মা ফিসফিস করে কি যেন ষড়যন্ত্র করছেন।

পিসী বলেন—"উনি বলছিলেন মানতটা এবারে পালন করা উচিত। মায়ের দয়ায় খোকা যখন ভাল হয়ে গেছে।"

খোকার মা সভয়ে বলেন—"সে তো উচিত, কিন্তু খোকা যদি জানতে পারে?"

পিসী হাত নেড়ে ভরসা দেন, "কিন্তু জানতে পারবে না।"

কিন্তু খোকার মা দ্বিধাগ্রস্ত।

পিসী ভয় দেখান—"কিন্তু মানত না পালন করলে আবার অমঙ্গল হবে। তুমি কিছু ভেব না, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

খোকার মা বোকার মতন চেয়ে থাকেন। পিসীর সামনের দাঁতগুলো বড় বড়, নীচের ঠোঁটটার ওপরে কার্নিসের মতন ঝুলে আছে। পিসী হাসলে মনে হয়, ঠোঁটের হাসি, দাঁতের কার্নিসে লেগে ছিটকে পড়ছে। সেই রকম পড়ে যাওয়া হাসি হেসে

পিসী বলেন—"কাল শনিবার তার ওপর অমাবস্যা, অদ্ভুত যোগাযোগ, কোন চিন্তা কোরো না।"

পিসী ভরসা দিয়ে চলে যান।

তার পরদিন সকালে উঠে খোকা হরলিকস খেয়ে বাইরের ঘরে বসে। খবরের কাগজে খেলার পাতাটা দেখে। মাকে জিজ্ঞেস করে,—"মা, বাবা কোথায়?"

মা অন্যমনস্ক হয়ে বলেন—"বাইরে গেছেন।"

খোকা আবার খবরের কাগজের খেলার পাতায় মন দেয়—একটু পরে এধার ওধার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—"তমাল কোথায়?"

মা তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলেন—"ও একটু আগে ঘর থেকে যেন পালিয়ে গেল।"

খোকা অবাক হয়। "কি হল" বলে ভেতরে যায় খোকা। ভেতরের ঘরে যেতে গিয়ে বাইরে থেকে শোনে, পিসী মাকে বলছেন, "তুমিও যদি এমনি করো তাহলে মুশকিল। আমি মানত করেছিলাম, মা কালী খোকা ভাল হলে তোমায় একটা কালো পাঁঠা দোব।"

"কিন্তু তা বলে তমালকে—" মা আর বলতে পারেন না।

"তাতে কি হয়েছে! তমালও তো পাঁঠা।" পিসী নির্বিকারভাবে বলেন।

খোকা চিৎকার করে বলে—"মা, তমাল কোথা?"

মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন। পিসী দাঁতগুলো ঠোঁটের ওপর কোপাতে থাকেন।

ওদিকে দত্তবাগানের কাছে জাগ্রত কালীর সামনে ধীরেনবাবু, পণ্টু তমালকে গঙ্গায় চান করিয়ে এনে হাড়কাঠটার সামনে বেঁধে রেখেছেন। খোকার বাবা দুহাতে ফুলের ডালা নিয়ে মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে। ঘাড় বাঁকা বন্ধু বাঁড়ুজ্যেও এসেছেন। তিনি প্রতি শনি মঙ্গলবার এখানে পূজো দিতে আসেন। তমালের পরিণতি দেখে তিনিও খুব খুশী। পুরুতমশাই ফুল দিয়ে মাকে সাজাচ্ছেন আর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা খাঁড়া হাতে একটা রোগা জোয়ান লোককে বলছেন—"জগা, সে বারের মতন করিসনি।"

বঙ্কুবাবু লেফ্‌ট টান করে হেসে জিজ্ঞেস করেন—“কি করেছিল ?”

পুরুতমশাইও হাসিমুখে বলেন—“যে কাটে সে মুণ্ডুটা পায়। সেবারে জগা মুণ্ডুর সঙ্গে বেশী মাংস পাবে বলে একেবারে সামনের পায়ে মেরেছে কোপ। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড, শেষকালে আবার প্রায়শ্চিত্ত করে বলি দিতে হয়।”

হা হা করে পুরুতমশাই আর বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে একসঙ্গে হাসেন।

ওদিকে খোকার মা “খোকা যাসনে যাসনে” বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

খোকা কিন্তু শোনে না। সামনের রাস্তা ধরে ছোটে।

জগা তমালের গলাটা জোর করে হাড়কাঠে ঢোকালো। তমাল ব্যা-ব্যা করে ডাকবার চেষ্টা করে। পল্টু জিভের জলটা টেনে নেয়। ধীরেনবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে, আর বঙ্কুবাবুর গোঁফের ফাঁকে হাসিটা সাপের মতন কিলবিল করছে। পুরুতমশাই তমালের মাথায় মায়ের পায়ের জবাফুল ঠেকান।

দুর্বল খোকা যেন কোথা থেকে বল পেয়ে গেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে।

তমালের পেছনের পা দুটো ধরে আছে পল্টু। জগা খাঁড়াটা শূন্যে তুলল। যেই কোপ মারতে যাবে খোকা এসে তমালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুটা যেন জীবনের ধাক্কায় একটু পেছু হেঁটে দাঁড়িয়ে গেল।

ধীরেনবাবু তাড়াতাড়ি বলেন—“এ কি করছিস, খোকা, ছাড় ছাড়।”

পল্টু জোর করে ছাড়াবার চেষ্টা করে।

তমালকে আঁকড়ে ধরে খোকা গম্ভীরভাবে বলে—“না।”

পুরুতমশাই তখন মায়ের পায়ের কাছে হেঁট হয়ে কি করছিলেন। মায়ের হাতের ফুলটা ঠিক সেইসময় পুরুতমশাইয়ের মাথায় আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়ে। পুরুতমশাই চমকে ওঠেন। “মায়ের হাতের ফুল আবার পড়েছে”—পুরুতমশাই চিৎকার করে ফুলটাকে দু হাতে মাথায় চেপে পাগলের মতন বেরিয়ে আসেন। সবাই সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে। পুরুতমশাই বলেন—“আজ আমি ধন্য।” খোকার বাবাকেও বলেন—“আপনি, আপনার ছেলে সবাই ধন্য।”

বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে ড্রিল করার সময় রাইট টার্ন করার মতন করে পুরুতের দিকে এগিয়ে এসে বলেন—"এদিকে যে ছোঁড়াটা পাঁঠাটাকে কাটতে দিচ্ছে না যে।"

পুরুতমশাই দেখেন খোকা হাড়কাঠের তমালকে জড়িয়ে আছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে—"না, আমি আমার তমালকে ছাড়ব না।"

পুরুতমশাইয়ের দু' চোখ জলে ভরে যায়। তারপর হাড়কাঠের কাছে গিয়ে নিজে তমালকে হাড়কাঠ থেকে খুলে তার গলায় হাত বুলিয়ে, খোকার মাথায় মায়ের হাতের ফুল ঠেকিয়ে সস্নেহে বলেন—"যাও বাবা, তোমার তমালকে নিয়ে যাও।"

ধীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন—"সে কি, বলি হবে না?"

পুরুতমশাই মাথা নেড়ে বলেন—"না।" তারপর জগাকে আদেশ করেন—"জগা, হাড়কাঠটা উপড়ে ফেলে দে।"

ওদিকে খোকার বাবা, খোকা মা কালীকে, পুরুতমশাইকে প্রণাম করে, তমালকে নিয়ে একটা রিকশা করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

ধীরেনবাবু, পল্টু, বঙ্কু বাঁড়ুজ্যে মমির মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

● বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়
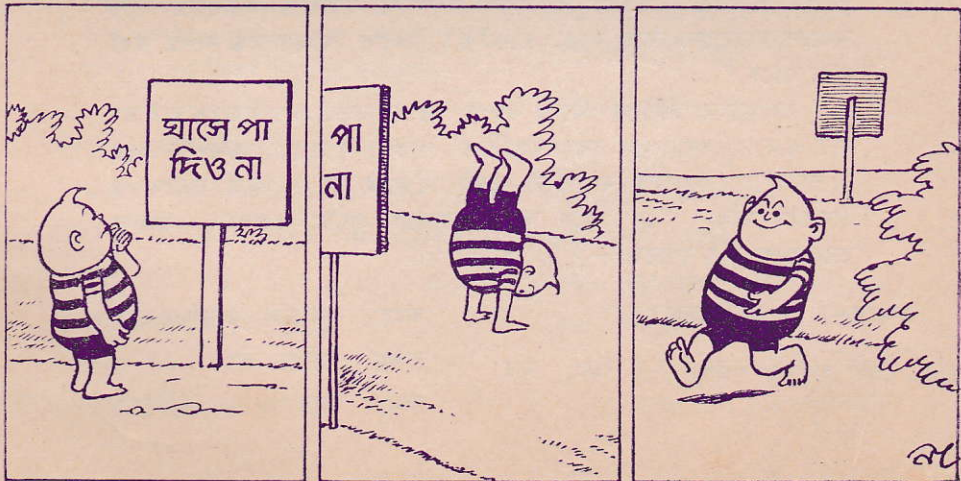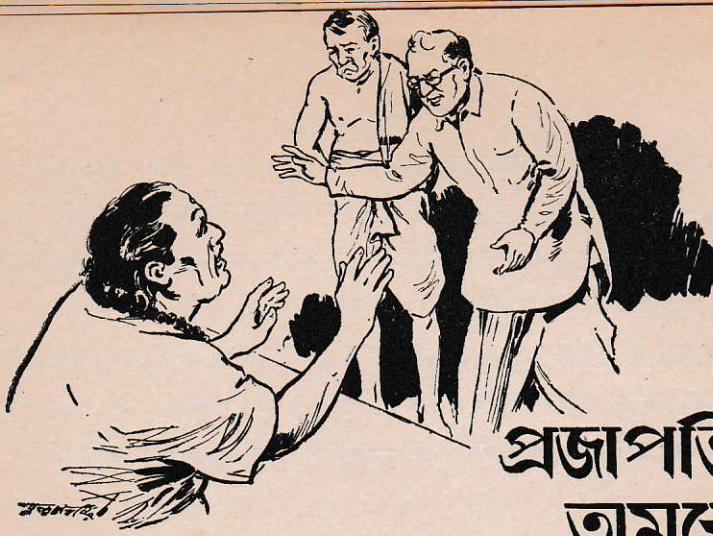
প্রজাপতি ঋষি অমরেশ

বিধায়ক ভট্টাচার্য

[অমরেশের সেই চিরপরিচিত বাইরের ঘর। এত বছরের মধ্যে তার আসবাবপত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই একপাশে একটি চৌকি পাতা, ছোট্ট একটি ডেস্কজাতীয় হাতবাক্স, ঘরে অন্যান্য ছবির মধ্যে এবার দেখা যাচ্ছে একটি গণেশের বড় ছবি। এ অবধি বাড়ির বাইরে অনেক রকমের সাইনবোর্ড দেখা গেছে। এবার একটি নতুন সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। "প্রজাপতি ঋষি অমরেশ। এই আশ্রমে সর্বপ্রকার বিবাহ সম্পাদন করা হয়। হিন্দু মতে, গন্ধর্ব মতে, রেজেস্ট্রী মতে এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের সর্বপ্রকার মতে বিবাহ সংযোগ ও সমাধা করা হয়। জাতিবর্ণের প্রশ্ন নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। প্রণামী বা দক্ষিণা সম্পর্কিত কথাবার্তা প্রজাপতি ঋষি অমরেশ মহারাজের সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিবাহ বিচ্ছেদাদিও সম্পন্ন করা হ'য়ে-থাকে।"

সকালবেলা স্নানান্তে গরদের কাপড়, গরদের ফতুয়া পরে অমরেশ বাইরের ঘরে এল। দেখা গেল চুল বাবরিতে পরিণত হয়েছে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো। কপালের মাঝখানে একটি সিঁদুরের টিপ। গলায় রুদ্রাক্ষ ও প্রবালের মালা। সে এসে আগে গণেশকে প্রণাম করলো। তারপর তক্তপোশে বসে ডাকলো—]

অমরেশ। বংকা! বংকা!

এই চাকরটা নতুন। অল্প বয়স। ঘরে ঢুকলো বংকা।

অমঃ। ধূপধুনো দিয়েছিস ঘরে?

বংকা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমঃ। ঘরে গঙ্গাজল ছিটিয়েছিস?

বংকা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমঃ। এবার গিয়ে দরজার বাইরে টুল পেতে বসে থাক্। খদ্দের এলে আগে দাঁড় করাবি। তারপর এসে আমাকে খবর দিবি। আমি হ্যাঁ বললে—তবে তাকে ভেতরে আনবি। বুঝলি ?

বংকা। যে আজ্ঞে।

অমঃ। যা এখন।

বংকা চলে গেল।

চিরকালের সুখী অমরেশ। স্বামী আর স্ত্রী, দুটি প্রাণী। অর্থের অভাব নেই। এমনিতে খাওয়া দাওয়া খুব ভাল। কিন্তু বাড়িতে লোকজন এলেই অমরেশের মাথা খারাপ হয়ে যায়। অথচ অমরেশের স্ত্রী দীপার মতামত আলাদা। সে বলে—"লোকজন আসুক, আনন্দ করি। মরে গেলে তো এই সম্পত্তি পাঁচ ভূতে খাবে।" দীপা যথারীতি স্বামীর প্রাতরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বড় ডিশে খান দশ-বারো ফুলকো লুচি, তরকারি, একটা রাজভোগ, আর একহাতে জলের গ্লাস। তক্তপোশের সামনে ছোট্ট টুলের ওপর রেখে বলল—

দীপা। খেয়ে নাও।

অমরেশ পত্রপাঠ খেতে শুরু করলো।

দীপা। হ্যাঁগো! বাইরে ও কিসের সাইনবোর্ড টাঙিয়েছ ?

অমঃ। প্রজাপতি ঋষির।

দীপা। সেটাতো পড়েইছি। তার মানে কী ?

অমঃ। মানে ব্রহ্মা। (দীপা চেয়ে আছে দেখে) ঘটক।

দীপা। কিসের ঘটক ? বিয়ের ?

অমঃ। হ্যাঁ। পৈতে আর অন্নপ্রাশনের তো ঘটক হয় না।

দীপা। তাতো জানি। কিন্তু ঘটক সেজে কার বিয়ে দেবে ? নিজের নাকি ?

অমঃ। মানব জাতির। তোমার হাতের ফুলকো লুচি খেয়ে খেয়ে জীবনসূর্যকে তো প্রায় মাঝ আকাশ পার করে দিয়েছি। এবার কিছু মানুষের সেবা করি, আর্তের সেবা।

দীপা কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে ডাকলো—

দীপা। বংকু! (বংকা ঢুকলো) আমার সঙ্গে আয়। বাবুর চাটা নিয়ে আসবি।

বংকাকে নিয়ে দীপা চলে গেলে অমরেশ আহার শেষ করে জল খেল। ইতিমধ্যে বংকা এসে চায়ের কাপটি নামিয়ে ডিশ ও গেলাস নিয়ে ভেতরে গিয়ে আবার ফিরে এসে দরজার বাইরে চলে গেল। অমরেশ চা খেতে লাগলো। বংকা ঢুকলো।

বংকা। একজন বাবু—

অমঃ। এসেছেন ?

বংকা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমঃ। কী বলছেন ?

বংকা। খুব জরুরী দরকার বলছেন।

অমঃ। নিয়ে আয়।

বংকা চলে গেল। একটু পরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

অমঃ। বসুন।

প্রৌঢ়। আজ্ঞে হ্যাঁ। (বসলো) আমার নাম ধনঞ্জয় মাইতি। আমি একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে এলাম।

অমঃ। বলুন!

ধনঞ্জয়। বিষয়টা খুব গুরুতর। (একটু থেমে) এবং সংকটজনকও বটে।

অমঃ। বলুন!

ধনঞ্জয়। তবে শুনে—বিষয়টি আদ্যো-পান্ত বেশ করে অনুধাবন করে, আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন।

অমঃ। বলুন!

ধনঃ। তবে পরামর্শের মধ্যে যেন কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকতা থাকে, কেননা—

অমঃ। বলুন!

ধনঃ। কেননা এর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব জড়িত। যেহেতু—

অমরেশ ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই আর 'বলুন' না বলে চুপ করে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ধনঃ। যেহেতু—আপনার বলা, এবং আমার শোনার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকা দরকার। এবং যোগসূত্র না থাকলে একটা আন্তরিক বিশৃঙ্খলা ঘটবে, সেইহেতু—

অমঃ। বংকা!

বংকা এসে দাঁড়াল।

অমঃ। এই ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে যা!

ধনঃ। তার মানে?

অমঃ। তার মানে আপনার কথা শেষ হবার পর—আমার আর পরামর্শ দেবার মতো অবস্থা থাকবে না। ডাক্তার ডাকতে হবে।

ধনঃ। আরে না না। ছিঃ! আমি এখনি বলছি। কথা হচ্ছে—আমি বিবাহ করতে চাই।

অমঃ। পথে আসুন। যা বংকা। (বংকার প্রস্থান) বলুন!

ধনঃ। ওই যে বললাম। বিবাহ করতে চাই।

অমঃ। মাইতি বললেন না?

ধনঃ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমঃ। কত বয়েস আপনার?

ধনঃ। ইস্কুলের না এমনি?

অমঃ। এমনি।

ধনঃ। এমনি সাতচল্লিশ।

অমঃ। অকৃতদার?

ধনঃ। না। কৃত। তবে অকৃতি অধমকে ফেলে রেখে সুকৃতি চলে গেছে।

অমঃ। বংকা!

ধনঃ। বংকা কী মশায়? সুকৃতি আমার মৃতা স্ত্রীর নাম।

অমঃ। ও! কী রকম পাত্রী চাই—বলুন!

ধনঃ। ভাল পাত্রী। লেখাপড়া জানা, কুড়ির ওপর—পঁচিশের নীচে বয়েস হবে।

গায়ের রং গৌর, অথবা কমপক্ষে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও চলবে।

অমঃ। কী করেন আপনি?

ধনঃ। পাঁশকুড়ায় চালের কল আছে।

অমঃ। দাবি-দাওয়া?

ধনঃ। না। আপনাকে কত দিতে হবে?

অমঃ। এখন একশো টাকা। বিয়ের রাত্রে বিয়ের আগে দুশো টাকা।

ধনঃ। এখন কিন্তু এক পয়সাও দিতে পারবো না। নেই কিছু।

অমঃ। বংকা!

বংকা ঢুকলো।

অমঃ। ভদ্রলোকের পকেট সার্চ করে কী আছে বার কর্!

চোখের পলকে বংকা ছোঁ মেরে ধনঞ্জয়ের পকেট থেকে ব্যাগ তুলে নিল। খুললো।

বংকা। দুশো টাকা আর খুচরো পয়সা।

অমঃ। একখানা নোট দে আমাকে। (বংকা দিল। অমরেশ সেটি নিয়ে কাগজে লিখলো) অদ্য ৪৭ বৎসর বয়স্ক শ্রীধনঞ্জয় মাইতির নিকট হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করিবার নিমিত্ত একশত টাকা অগ্রিম পাইলাম। বাকী দুইশত টাকা বিবাহের রাত্রে দেয়। সম্বন্ধ না জুটিলে এই একশত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

ধনঃ। বাঃ।

অমঃ। হ্যাঁ। আমার কাজের এই ধারা। এক বিন্দু অন্যায় পাবেন না। এই খাতায় নাম ঠিকানা আর গোত্র লিখে দিন।

ধনঞ্জয় লিখে দিল।

অমঃ। বংকা ভদ্রলোককে বার করে দে!

ধনঃ। বাঃ! (প্রস্থান)

অমরেশ জাবদা খাতার পাতা উলটে দেখতে লাগলো।

অমঃ। ধনঞ্জয় মাইতি। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে—মাইতি পাত্রের জন্য সুন্দরী গাঁইতি পাত্রী চাই। গাঁইতি বলে কি কোন পদবী আছে? মরুকগে যাক। দিয়ে তো দিই—লাগে তুক্,—না লাগে তাক্।

বংকা ঢুকলো।

বংকা। একটা মেয়ে এসেছে। (দরজার দিকে চেয়ে) কই আসুন!

মাথায় কাপড় দেওয়া একটি তরুণী প্রবেশ করলো।

তরুণী। আপনি কি প্রজাপতি ঋষি—

অমঃ। শ্রীঅমরেশ। (মেয়েটি অমরেশের পায়ের ধুলো নিলো) থাক্—থাক্। কী দরকার বলা হোক্।

তরুণী। আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স করতে চাই।

অমঃ। কী নাম স্বামীর?

তরুণী। হিন্দু মেয়ে—স্বামীর নাম কী করে বলবো?

অমঃ। মরুকগে যাক্। কী করেন তিনি?

তরুণী। দেশে বড় স্টেশনারী দোকান আছে। আমি কোলকাতায় আমার মাসতুতো বোনের বিয়েতে এসেছি। আপনার বিজ্ঞাপন দেখে ভাবলাম—ব্যাপারটা চুকিয়ে যাই।

অমঃ। কী নাম তোমার?

তরুণী। আমার নাম শ্যামা।

অমঃ। স্বামী বুঝি খুব অত্যেচার করে?

শ্যামা। অত্যেচার নয়। খুবই ভালবাসে। কিন্তু বড্ড অবহেলা করে। রাতদিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারে। আমার কথা মনেই থাকে না তার। এই দেখুন না,—আজ থেকে তো তিন দিন ছুটি আছে; দেখবেন—ঠিক কোলকাতায় চলে এসেছে বন্ধুদের কাছে।

অমরেশ ভাবছে।

তাই আমি আমার স্বামীকে ডিভোর্স করতে চাই। দরকার নেই অমন স্বামীতে আমার। শুনলাম—আপনার তো সব রকম ব্যবস্থাই আছে।

অমঃ। ঠিক আছে। তাই হবে।

শ্যামা। আপনার তো অনেকগুলো ভাগ্নে আছে? তাই নয়?

অমঃ। তা আছে। আপন-পর মিলিয়ে।

শ্যামা। তাহ'লে তাদের যে কোন একজনের সঙ্গে, মানে ডির্ভোসের পর, আপনি নিশ্চয় ব্যবস্থা করতে পারেন।

অমঃ। সে ব্যাটাচ্ছেলেরা সবাই যে বিয়ে করে ফেলেছে।

শ্যামা। তবু একটু দেখবেন। এই আমার ছবি রইল। দরকার হলে তাঁদের দেখাবেন।

অমঃ। বেশ রেখে যাও। আর এই খাতায় তোমার স্বামীর নাম, তোমার ঠিকানা—সব লিখে দাও।

শ্যামা লিখতে লাগলো।

অমঃ। ব্রাত্য হালদার। এ কী রকম নাম তোমার স্বামীর?

শ্যামা। ওই নাম। আর এই ঠিকানা আমার মাসীর বাড়ির। আপনার কত ফী?

অমঃ। ফীয়ের কথা পরে হবে। আগে উকিলের মতামত জিগ্যেস করি। তুমি আপাততঃ আমাকে একটা টাকা দিয়ে যাও মা!

শ্যামা টাকা দিল।

শ্যামা। তাহ'লে আমি এখন যাই। আমার কথাটা মনে রাখবেন। আর, আপনার ভাগ্নেদের কারুর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি খুব খুশী হবো।

অমঃ। আচ্ছা, আচ্ছা, মনে রাখবো।

শ্যামা অমরেশকে প্রণাম করে চলে গেল।

অমঃ। কী হচ্ছে দিনকে দিন দেশটা। ভালবাসে অথচ অবহেলা করে! ছি ছি! কিন্তু ব্রাত্য হালদার? এ কী রকম নাম? কখনো শুনিনি।

নেপথ্যে বংকা। এই—এই! যাবেন না বলছি। প্রজাপতি ঋষি রেগে যাবেন।

নেপথ্যে। চোপরও!

আর একজন। ছুড়ে ফেলে দেব।

সদলবলে অমিয়, ভুবন, পতিত, গদাই ও পরিতোষ প্রবেশ করলো।

অমঃ। তোরা!

অমিয়। হ্যাঁ। কেন? খুশী হচ্ছো না আমাদের দেখে?

অমঃ। খুশী অখুশীর কথা নয়। দিন-কাল খারাপ। তাই বলা।

ভুবন। সেকি মামা! আমরা কতো-দিন পরে ছুট্-ছুট্-ছুট্—

অমঃ। না। ছুটতে ছুটতে তোমরা আসোনি। এসেছো খোস্ মেজাজে বহাল তবিয়তে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে। চিরকালই তো জ্বালাচ্ছিস বাবা!

ভুবন। না-না। বলছি। আমরা তো ছুট্ ছুট্ ছুট্—

অমঃ। ছুটোছুটি?

ভুবন। না। ছুট্-ছুট্ই পেয়েছি তিনদিন।

পতিত। তাই ভাবলাম—তিনটি দিন বৃথা নষ্ট না করে মামীর হাতের অমৃত অন্ন—

অমঃ। নেই। অমৃত নেই,—এখন মৃত। অতএব কেটে পড়।

গদাই। কী মৃত?

অমঃ। অন্ন। এখন কোলকাতায় চালের আগম নেই, নিগম নেই, আছে শুধু গম। রেশনশপ্ গমগম করছে। (পরিতোষকে) কী মশায়? আপনি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে এখন আর বেরোতে পারছেন না বুঝি?

পরিতোষ। (হেসে) না।

অমঃ। (শ্যামার ছবি দেখতে দেখতে) সে কথা বলছি না। এসেছ যখন, ভেতরে যাও। মামীকে প্রণাম করে দুটো করে সিঙাড়া আর একটা করে গুঁজিয়া খেয়ে যে যার মেসে চলে যাও।

অমিয়। মাঝে মাঝে তুমি খুব দুঃখ দাও মামা!

অমঃ। কী করবো বাবা? দুঃখ পাচ্ছি বলেই দুঃখ দিচ্ছি। তোমাদের তিনদিন বাড়িতে রেখে আর বেশী দুঃখিত হতে চাই না।

পতিত। ওটা কার ছবি দেখছো মামা?

অমঃ। আমার একজন ক্লায়েণ্টের। স্বামী ভালবাসে, অথচ অবহেলা করে। দিনরাত বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই ডিভোর্সের ব্যবস্থা করতে এসেছিল। তোদের কপালেও একদিন এই হবে। যা গ্যাজাচ্ছিস আজকাল! বৌমারা স্যুট ফাইল করলো বলে।

পতিত। ছবিটা একবার দেখবো মামা?

অমঃ। দ্যাখো, তবে খুব কন্‌ফি-ডেন্সিয়াল। ফাঁস না হয়। (ছবি দিল)

পতিত। বাঃ! বেশ তো দেখতে মেয়েটি। খ্যাখ্ অমিয়!

অমিয় দেখলো, ভুবন দেখলো, গদাই দেখে পরিতোষের হাতে দিতেই—তিনি যেন একটু চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে নিলো পতিত।

পতিত। কী এর স্বামীর নাম?

অমঃ। ব্রাত্য হালদার।

পতিত। (অমিয়কে) দেখলি?

অমঃ। অমিয়র কিছ্যু দেখবার নেই। দেখবো আমি। শুনবো আমি আর বুঝবোও আমি।

ভুবন। তুমি কী ভীস্-ভীষণ বোকা মামা!

অমঃ। চোপরাও ব্যাটাচ্ছেলে! আমি বোকা? ওরে শুয়োর!

গদাই। খুব বোকা!

অমঃ। অমিয়! এ ব্যাটারা বলে কী?

অমিয়। বলবেই মামা! পতের বৌ এসে তোমার চোখে ধুলো দিয়ে গেল, আর তুমি টেরও পেলে না?

অমঃ। মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোদের? পতের বৌকে আমি বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম আর আমি তাকে চিনতে পারলাম না? পতের বৌয়ের নাম তো—ইয়ে—কালীমতী।

পতিত। এর নাম শ্যামা।

অমঃ। এঁ্যা!

ভুবন। আর কালীমতী যা শ্যা-শ্যা-শ্যাম-শ্যাম—

অমঃ। অমিয়! ওকে থামা। আচ্ছা, তা যেন হ'ল। কিন্তু এই যে স্বামীর নাম লিখেছে ব্রাত্য হালদার। তাহ'লে?

পতিত। ব্রাত্য মানে কী মামা?

ভুবন। ব্রাত্য মানে পৎ পৎ পৎ পৎ—

গদাই। পতাকা?

ভুবন। আরে না।

গদাই। তাহ'লে পৎ পৎ করে কী ওড়ে?

পরিঃ। ব্রাত্য মানে পতিত।

অমঃ। ব্যস! মল্লিনাথ তো সঙ্গেই আছেন। গোটা ডিক্স্নারী একবারে কণ্ঠস্থ। আচ্ছা। বুঝলাম। তাহ'লে পতে ব্যাটাচ্ছেলে বৌমাকে অবহেলা করে বোঝা গেল। নইলে—

পতিত। অবহেলা মানে? সে কলকাতায় এসেছে তার মাসতুতো বোনের বিয়েতে। এই গলিতেই ওদের বাড়ি। আমাকে সেখানে থাকতে বলেছিল। আমি বলেছি—ওটা পারবো না। কারণ অমিয়র মেসে থাকতে হবে আমাকে।

ব্যাগ হাতে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশ।

পুণ্ডঃ। বাবা অমরেশ। আমি প্র্যাক্টিক্যালি এলাম। তিন দিনের ছুটি ছিল—তার সঙ্গে আরো সাতাশ দিন যোগ

করে—প্র্যাক্‌টিক্যালি একবারে পুরো একমাসের করে নিয়ে চলে এলাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমরেশ উঠে প্রণাম করলো।

এরপর ভাগ্নেরা।

পুণ্ডঃ। এটা কি অমিয় দাদা নাকি রে?

অমিয়। হ্যাঁ দাদু।

পুণ্ডঃ। আ হা হা! বড় আনন্দ হ'ল। পুঁটলী কেমন আছে ভাই?

অমিয়। ভাল।

পুণ্ডঃ। এই যে সবাই এসেছ! বা-বা! আবার মাসখানেক হইহই করে কাটানো যাবে।

অমঃ। ওটা হইহই না করে হায় হায় করে কাটাতে হবে।

পুণ্ডঃ। কেন বাবা অমরেশ?

অমঃ। কী খাবেন?

পুণ্ডঃ। কেন? প্র্যাক্‌টিক্যালি ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ—

অমঃ। রোখ্‌কে। পাওয়া যায় না।

পুণ্ডঃ। কী?

অমঃ। চাল।

পুণ্ডরীকাক্ষ বসে পড়লেন।

পুণ্ডঃ। এমন খারাপ দশা হয়েছে কোলকাতার?

পরিঃ। চরম।

চোপরাও ব্যাটাচ্ছেলে! আমি বোকা? [পৃঃ ১৫৮

পুণ্ডঃ। তা—প্র্যাক্‌টিক্যালি খাওয়া-দাওয়া কী হচ্ছে?

পতিত। গম।

পুণ্ডঃ। বাঃ! তাহ'লে আর অসুবিধে কোথায়? দিব্যি লুচি পরোটা খেয়ে মাসখানেক কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

ব্যাগ নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

অমঃ। আমি বহু চেষ্টা করছি—যাতে মামা হত্যার পাতকটা তোদের না হয়। কিন্তু আমি দেখছি ওটা হবেই তোদের।

● বিধায়ক ভট্টাচার্য

ভুবন। খ্যা—খ্যা—খ্যা—

অমঃ। আবার খ্যাক্—খ্যাক্? পুণ্ডরী-খ্যাঁক্কোর গাওয়া ঘিয়ের লুচি না খেলে ঘুম হয় না। এখন এই পুরো এক মাস গাওয়া ঘিয়ের হোম চলবে!

পতিত। সর্বনাশ!

অমঃ। আর কারো নয়। আমার। তোদের তো পৌষ মাস। আচ্ছা, তাহ'লে এবার তোরা যা। ভেতরে আর গিয়ে কাজ নেই। গেলেই তো আবার সেই ভদ্রমহিলা লুচি ভাজতে বসবে। বসবে বলছি কেন? পুণ্ডরীখ্যাঁক্কোকে পেন্নাম করেই স্টোভে কড়া চাপাবে। আচ্ছা—যা এখন।

অমিয়। ভেতরে তো যেতেই হবে মামা।

অমঃ। না গেলে—খুব খেতি হবে?

অমিয়। হ্যাঁ। গোখ্‌রো মামীর কাছে আছে।

অমঃ। গোখ্‌রো মানে তোর—আমার বৌমা?

অমিয়। হ্যাঁ।

ভুবন। শক্—শক্—শক্—

অমঃ। না। পাবোনা। শক্ পাবোনা। তুই বল। তোরা যার ভাগ্নে, তার শক্ পাওয়া বিলাসিতা।

ভুবন। না-না। শক্—শক্—শক্উন্তলাও আছে যে মাম্—মামীর সঙ্গে!

অমঃ। ও! তাহ'লে পতে, তুইও কালীমতীকে ডেকে নিয়ে এসে মাসখানেক থেকে যা।

গদাই। না। ছুটির তিনটে দিন।

সবাই উঠলো। এক এক করে ভেতরে চলে গেল। গোখ্‌রো আর শকুন্তলা ঢুকে অমরেশকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

অমঃ। কেমন আছ মামণিরা?

দুজনে। ভাল।

গোখ্‌রো। মামা! আপনি তো এখন প্রজাপতি ঋষি?

অমঃ। হ্যাঁ মা।

গোখ্‌রো। আমার ছোট বোন কেউটের জন্যে একটা ভাল ছেলে দেখে দিন না।

অমঃ। মাগো! কিছু মনে কোরো না। তোমার বাপের নাম জরৎকারু হওয়া উচিত ছিল। তা দেব। তুমি সব লিখে দিও।

শকু। আর আমার ছোট ভায়ের জন্যে একটা ভাল মেয়ে।

অমঃ। খুব ভাল কথা। লিখে দিও নাম গোত্র। নিশ্চয় করে দেবো। এখন তো দিনরাত শুধু এই করছি মা।

দীপা ঢুকলো।

গোখ্‌রো। মামা, আপনি কি ডিভোর্সও করান?

অমঃ। হ্যাঁ। তাও করতে হয় বৈকি মা! এইতো আজ একটু আগেই—মরুকগে যাক্। কার জন্যে ডিভোর্স চাই?

শকু। আমাদের দুজনের।

ইন্দ্রনীল—

তরুণী। আপনি কি প্রজাপতি ঋষি

(প্রজাপতি ঋষি অমরেশ···পৃঃ ১৫৪)
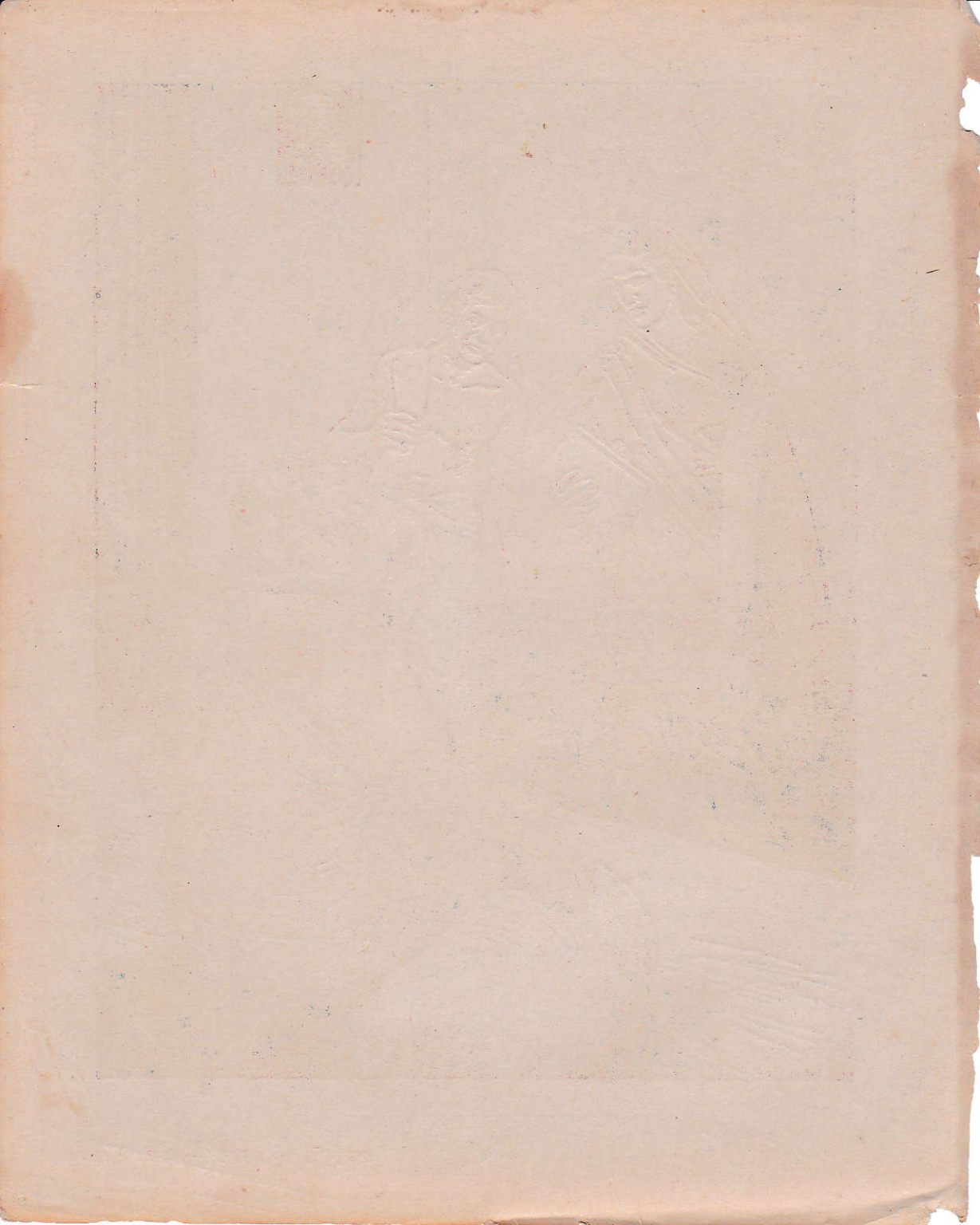
অমঃ। এঁ্যা!

দীপা। এঁ্যা-কী? এঁ্যা? কথাগুলো মন দিয়ে শোন! তোমার ভাগ্নেদের কীর্তি! যেমন মামা, তেমনি ভাগ্নে।

অমঃ। কী করেছে মা ওরা—আমাকে বলতো?

গোখ্‌রো। আমাকে একদিন হাত ধরে টেনেছিল। আর একটু হলে কব্জির হাড় ভেঙে যেতো।

শকু। আমি ওর কথা বুঝতে পারিনে। খালি তো-তো করলে কী করে বুঝবো বলুন তো?

গোখ্‌রো। তাই আমরা ঠিক করেছি—ডিভোর্স নিয়ে—বিয়ে আর করবো না। কেননা তাতে—

শকু। শ্বশুরবাড়ির কলঙ্ক হবে।

গোখ্‌রো। হ্যাঁ। আমরা একটা অনাথ আশ্রমে গিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াব।

অমঃ। ও! ইয়ে—তা—কী বলে—মানে—অনাথ আশ্রমে কেন?

দীপা। কী রকম বোকার মতো কথা বলে—দেখেছিস? বলি নাথকে তো ডিভোর্স করে চলে যাচ্ছে। অনাথ নয়তো কী?

অমরেশ কিছুক্ষণ বোকার মতো বসে থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

অমঃ। না না। এর প্রতীকার করা দরকার। বৌ নিয়ে ছেলেমানুষী? তোমরা

এঁ্যা-কী? এঁ্যা? কথাগুলো মন দিয়ে শোন!

ভেতরে গিয়ে ওই হারামজাদাগুলোকে একটু পাঠিয়ে দাও তো মা! ওদের বাপের নাম আমি ভুলিয়ে দিচ্ছি আজ।

তিনজনে চলে গেল।
একটু পরে ভাগ্নেরা ঢুকলো।

অমিয়। কী মামা?

ভুবন। খ্যি-খ্যি-খ্যি বলছো মামা?

পতিত। ডাকলে কেন?

● বিধায়ক ভট্টাচার্য

গদাই। শীগ্‌গির বলো। খেতে খেতে উঠে এসেছি।

অমঃ। হারামজাদা ব্যাটারা! উল্লুকের বাচ্চারা! বৌয়ের সঙ্গে ইয়ারকি মারতে যাও, জানোনা এটা কী যুগ?

অমিয়। কী যুগ?

অমঃ। হাত ধরে টেনে কব্জির হাড় ভেঙে দিয়েছিস! তো-তো-তো করে কথা কম্‌প্লিট করতে পারিস না। বৌরা তোদের ডিভোর্স করবে না তো কে করবে? আমার আর কি? মক্কেল হয়ে এলে আমাকে সুট্ ফাইল করতেই হবে। কেমন স্বামী হতে হবে—আমাকে দেখে শেখ্। এমন কড়া শাসনে রেখেছি যে আওয়াজ করবার যোটি নেই। একে বলে পুরুষ-সিংহ। কই, বলুক তো তোর মামী একবার ডিভোর্সের কথা!

> পোস্টম্যান প্রবেশ করে অমরেশকে এক-খানা রেজেস্ট্রী চিঠি সই করিয়ে রসিদ নিয়ে চলে গেল। চিঠি পড়ে অমরেশের মুখ সাদা হয়ে গেল!

অমিয়। কার চিঠি মামা?

অমঃ। সেন-মজুমদার—অ্যাটর্নী ফার্মের।

ভুবন। কোন-কে-কে-কেস নাকি?

অমঃ। না। তোদের মামীও ডিভোর্স সুট্ ফাইল করেছে।

> অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে বসলো।

অমঃ। না। আগে অজ্ঞান হলে চলবে না। কাজটা সেরে তবে অজ্ঞান হতে হবে। বংকা। (বংকা ঢুকলো) বাইরে থেকে সাইনবোর্ডটা খুলে ফ্যাল্। আচ্ছা থাক্। তুই শুধু প্রজাপতির পতিটা আর ঋষিটা মুছে দে। প্রজা অমরেশ থাক্। অমিয়! তোর মামীকে বলিস—চিঠি পেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। মিনিট কুড়ি পরে আমার মাথায় জল দিস্। তার আগে দিস্‌নি। কাল থেকে সর্দি হয়েছে। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এবার অজ্ঞান হচ্ছি।

(অজ্ঞান)

পতিত। (চুপি চুপি অমিয়কে) কী ব্যাপার রে?

অমিয়। (ফিসফিস করে) সেন-মজুমদার—মামীর দাদার ফার্ম! স্রেফ ঠাট্টা।

ভুবন। (মুখে আঙুল দিয়ে) চ্যু-চ্যু-চু-চু-চ্যুপ্!

> সবাই অপেক্ষা করতে লাগলো। দুজন গিয়ে জল নিয়ে এল। অমিয় তার হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ডাইনী বাঘ

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কুঁই-কুঁই-কুঁই—

একটু আগে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। এখন থেমে গেছে। গাছপালাগুলো ভিজে জবজবে। এখনও টুপটাপ করে গাছের পাতা চুয়ে জল পড়ছে। সারা বনজঙ্গল শান্ত ধীর স্থির। ঝড়ের সেই ফোঁসফোঁসানি নেই। বৃষ্টির সেই ঝমঝম আওয়াজ নেই। শুধু থেকে থেকে একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। কুঁই-কুঁই-কুঁই—

গাছের উপর বসে বসে বানরী সেই কান্না শুনছে। আর তার মাতৃত্বের উপর গিয়ে আঘাত পড়ছে। বানরী অস্থির হয়ে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাইতে লাগলো এদিকওদিক। কাউকে সে দেখতে পেল না। বানরী মাথা চুলকাল, পেটের মাঝখানটাও হাত দিয়ে চুলকিয়ে নিলো। কানটা খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করলো—কান্নাটা কোথা থেকে আসছে।

বনেতে তখনও অন্ধকার নেমে আসেনি। পাখিরা ফিরে আসেনি তাদের নীড়ে। এখনও বনের নিদ্রা ভাঙেনি। বানরী কান পেতে বুঝে নিলো, কান্নাটা গাছের নীচ হতে আসছে। বানরী কি মনে করে একটা ডালে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেখান হতে আর একটা ডালে। তারপর গাছের কাণ্ড ধরে সরসর করে নীচে নামতে লাগলো।

গাছটার আধা পথ এসে থমকে গেল বানরী। ভয়ে বুকটা ঢিবঢিব করে উঠলো। "ওরে বাবারে, এ যে বাঘ। বনের রাজা।" বানরী আবার তরতর করে উপরে উঠতে লাগলো।

কুঁই-কুঁই-কুঁই—

আবার বাঘটা কেঁদে উঠলো। বানরীর আর উপরে ওঠা হল না। সে থেমে গেল। অবাক হল একটু। সারা জীবনটা সে বনে কাটিয়েছে, কিন্তু বাঘকে কোন-দিন কাঁদতে দেখেনি। বানরী আবার একটু নীচে নেমে এল। দূর থেকেই সে জিজ্ঞেস করলো—হ্যাঁ-গা, তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

বাঘ বলল—খিদে পেয়েছে। কদিন কিছু খাইনি।

বানরী ফিক করে হেসে ফেলল, বলল—তুমি বাঘ, বনের রাজা। তার উপর তুমি জোয়ান। তুমি খাওনি, কে বিশ্বাস করবে বল?

বাঘ বলল—তুমি কে? কেনই বা আমাকে এ সব জিজ্ঞেস করছ?

—আমি বানরী এই গাছেই থাকি। জীবনে কখনও বাঘকে কাঁদতে দেখিনি, তাই জিজ্ঞেস করছি।

—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না?

—বনের যিনি রাজা, তিনি খিদেয় কাঁদবেন, এ বিশ্বাস হয় না।

—তুমি জান না। আমি অন্ধ, চোখে দেখি না। তাই শিকারও ধরতে পারি না। খাব কি করে, তুমিই বল?

বানরী অবাক হল, বলল—তুমি অন্ধ, তবে এখানে এলে কি করে? আর এত দিন খেলেই বা কি করে?

বাঘ বলল—মা-ই এতদিন খাইয়েছেন। আর এখানে এসেছি শুধু আন্দাজে।

—তবে, মার কাছ হতে এলে কেন ?

বাঘ বলল—তুমি তো বানর। তুমি কি করে আমাদের সমাজের কথা জানবে ? আমাদের সমাজে যতদিন যৌবন না আসে, মা-ই আমাদের খাওয়াবে পরাবে। শত্রুর হাত হতে রক্ষা করবে। কিন্তু যৌবন এলেই, মা আমাদের ফেলে চলে যায়। আমার মাও ক দিন হল চলে গেছে। তাই আমার এত কষ্ট।

বাঘের কথা শুনে বানরীর খুব দুঃখ হল। আহা বেচারী অন্ধ! ক দিন খায়নি। তাই সান্ত্বনার সুরে বলল—তুমি কোথাও যেও না। এখানে থাকো। আমিই তোমাকে খাওয়াব।

এত দুঃখেও বাঘ হেসে ফেলল, বলল—মার মুখে শুনেছি, তোমরা ফলমূল খাও। আমি বাঘ, আমি মাংস খাই। তুমি কি খাওয়াবে ?

—তোমাকে মাংস খাওয়াব।

বাঘ বলল—তুমি তো হিংসে করো না। মাংস খাওয়াবে কি করে ?

বানরী বলল—আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি কোন দিন শিকার করোনি ?

—করেছি বইকি।

বানরী বলল—কি করে শিকার শিখলে তুমি ? তুমি তো অন্ধ !

বাঘ বলল—মা শিকার ধরে আওয়াজ দিতেন, বলতেন, খোকা, শব্দ লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ো, আমিও লাফিয়ে পড়তাম। কিন্তু মা তো নেই, এখন কে আমাকে শিকার দেখে আওয়াজ দেবে।

বানরী খুশী হয়ে বলল—ধর, যদি আমি শিকার দেখে আওয়াজ দিই, তুমি শিকার ধরতে পারবে ?

বাঘ বলল—যেদিকে শিকার, সেদিক হতে শব্দ করতে হবে, নইলে কোন্ দিকে শিকার আমি বুঝব কি করে ?

—বেশ, তাই দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। কিন্তু খবরদার, আমার কোন ক্ষতি করতে যেও না।

বাঘ বলল—রাম! সে কি হয়। তোমার ক্ষতি হলে যে, আমিও না খেয়ে

● ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মরবো। কিন্তু, আর যে বকবক করতে পারছিনে, খিদেয় মরে গেলুম। কিছু খেতে দাও।

বানরী বলল—একটু সবুর করো। এক্ষুণি সন্ধ্যে হবে। আমি তোমাকে পাখি ধরে খাওয়াব। কেঁদো না।

সেই থেকে বাঘ গাছের নীচেই থাকে। বানরী তাকে খাওয়াচ্ছে। শিকার দেখলেই, তার কাছে গিয়ে বানরী দাঁড়িয়ে 'কু' দেয়। বাঘ অমনি শব্দ লক্ষ্য করে তার উপর লাফিয়ে পড়ে। তারপর মজা করে সেখানে বসেই খায়। প্রথম ছোট প্রাণী। তারপর বড় বড় প্রাণী। শেষে মানুষ ধরে খেতে লাগলো। মানুষ আসত কাঠ কাটতে, মধু নিতে; কিন্তু কেউ এ জঙ্গলে একা এলে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারত না। বানরী ওদের দেখে ছুটে যেত, 'কু' দিত, বাঘও তাক করে শব্দ লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ত মানুষের ঘাড়ে। তারপর বাঘ মজা করে খেত। বানরী আনন্দে লাফাত।

এ জঙ্গলে আগে বাঘ ছিল না। এখন বাঘের ভয়ে সারা বন কাঁপে, ভয়ে কেউ বনে ঢোকে না। ফলে বনের আয় কমে গেল। কথাটা সরকারের কানে গেল। সরকার বাঘ মারার জন্য শিকারী পাঠালেন। তাকে বাঘে খেল। তারপর এলো আর একজন, সেও গেল বাঘের পেটে। একে একে তিনজনই মরলো বাঘের হাতে। এরপর আর কোন শিকারী বাঘ শিকার করতে যেতে চায় না। তাদের ধারণা এ বাঘ নয় ডাইনী। শুধু বাঘ হলে এতো দিনে মারা পড়ত।

বাঘ আবার মুশকিলে পড়লো। বনে কোন জীবজন্তুই ঢোকে না, খাবে কি করে। বলল—এবার অনাহারেই মরতে হবে, বুঝলে?

বানরী বলল—তোমাকে না খাইয়ে রাখব না। চল হরিণের বনে যাই, তোমাকে হরিণ খাইয়ে আনব।

বাঘ বলল—তুমি তো বললে, কিন্তু আমি যাব কি করে। শেষে কোন গর্তে টর্তে পড়ে মরে পড়ে থাকি আর কি!

বানরী বলল—আমি তোমার পিঠে বসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বাঘ বলল—তবে চল। আমার পিঠে উঠে বসো।

পিঠে উঠে বলল—চল সোজা।

বানরী তড়াক করে বাঘের পিঠে উঠে বলল—চল সোজা।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা হরিণের বনে এলো। বানরী বলল—এই ঝোপে লুকিয়ে থাকো, 'কু' দিলেই লাফ দিও। বলে সে পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। তারপর হরিণ তাড়িয়ে নিয়ে এলো যেখানে বাঘ বসে আছে। কাছে এসেই 'কু' দিল। ব্যস্। অমনি বাঘ লাফিয়ে পড়ল হরিণের ঘাড়ে। বানরী আনন্দে নাচতে থাকে। বাঘের খাওয়া শেষ হলে, তাকে ফিরে নিয়ে আসে গাছের তলায়। এভাবে বাঘের দিনগুলো ভালই কাটছিল।

একদিন দুপুরে বসে বাঘ বিশ্রাম করছিল। এমন সময় বানরী নাচতে নাচতে এলো। বলল—বাঘ ভাই বাঘ ভাই, ঘুমোচ্ছ?

বাঘ বলল—না!

—এবার তোমাকে মানুষের মাংস খাওয়াব। তোমাকে শিকার করতে মানুষ

● ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এসেছে। এইমাত্র দেখে এলাম। মানুষটা বন্দুক নিয়ে ডাকবাংলোর ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—তুমি কি করে বুঝলে ও লোকটা শিকারী?

—শিকারীর হাবভাব দেখলেই চেনা যায়। তোমার চোখ থাকলে তুমিও চিনতে। বলে বানরী নাচতে লাগলো।

অজিতকুমার এসেছেন বাঘ শিকার করতে ডাহুক বনে। এখানে এসে অবধি ডাইনী বাঘের গল্প শুনছেন। তার আগে এই বাংলোয় তিনজন শিকারী এসেছিলেন। ডাইনী বাঘকে মারতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেননি। সকলেই বাঘের পেটে গেছেন। সরকার এ বাঘ মারবার জন্য তিনশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

অজিতকুমার সব শুনে বললেন—এ বাঘ আমি শিকার করব। তোমরা শিকারের ব্যবস্থা করে দাও।

হোসেন এ জঙ্গলের পথপ্রদর্শক। যেমন জোয়ান, তেমনি সাহসী। বলল—হুজুর, ও কাজ করবেন না। জান (প্রাণ) যাবে। এ হল ডাইনী বাঘ। একে মারা সোজা নয়। কোথায় লুকিয়ে থেকে শিকারীর খবর নেয়, তা ভগবান জানেন। শেষে সুযোগ সুবিধে বুঝে শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর সেখানেই বসে মজা করে খায়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে জঙ্গলের ভিতর এসে পড়লো। একটা ফাঁকা জায়গায় আসতেই অজিতকুমারের গা ছমছম করে উঠলো, বললেন—এ জায়গাটার কথা না বলছিলে হোসেন—?

হোসেন বলল—হুজুরের অনুমান ঠিক। তিন তিনজন শিকারী এখানেই বাঘের পেটে গেছেন। ঐ যে গর্ত দেখছেন, ওখানে আমরা গাছের ডালপালা দিয়ে একটা কৃত্রিম ঝোপ তৈরি করে রাখতাম। সন্ধ্যার আগে শিকারী এসে ওর ভিতর লুকিয়ে থাকতেন। সকালে আমরা দলবল নিয়ে এসে দেখি, বাঘ শিকারীকে খেয়ে চলে গেছে। শুধু তাঁর মাথা, হাত, পা গর্তের বাইরে পড়ে আছে। আমরা তাই তুলে নিয়ে চলে আসতাম।

অজিতকুমার বললেন—চল গর্তটার কাছে, একবার পরীক্ষা করব।

দু'জনে গর্তের কাছে এলেন। গর্তের চারদিকে এখনও ডালগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেই শুধু তার পাতা, শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। ডালের গায় হতভাগ্য শিকারীর গায়ের জামার টুকরো ঝুলছে।

অজিতকুমার ভাল করে জায়গাটা পরীক্ষা করলেন। বাঘের পায়ের ছাপও দেখলেন। কিন্তু ছাপটা বরাবর একই দিক হতে এসেছে। ঝোপের অন্যদিকে বাঘের পায়ের ছাপ নেই। অজিতকুমার এর কারণ কি বুঝে উঠতে পারলেন না। কিন্তু মনের ভাব হোসেনকে জানালেন না। বললেন—তুমি তো শিকারীর মৃতদেহ নিয়ে যেতে হোসেন?

হোসেন বলল—আমি ছাড়া কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে হুজুর। সকলেই তো ভয়ে মরবে। কাজেই, আমাকেই আসতে হত।

—মৃতদেহ কি তুমি বরাবর একই জায়গায় পেতে হোসেন?

—হ্যাঁ, হুজুর। বরাবর একই জায়গায়। এইখানে। দেখিয়ে দিল হোসেন।

অজিতকুমার বললেন—আজও তুমি অন্য বারের মত ঝোপ তৈরি করে রেখো হোসেন, আমি সন্ধ্যায় আসব।

—হুজুর, অধীনের একটা কথা রাখবেন?

—বল, কি কথা।

—আমি মাচা তৈরি করে দিই। আপনি মাচায় বসে শিকার করুন। এবার ঝোপে বসে শিকার করবেন না।

—তা হয় না হোসেন। বাঘ ঝোপটা চিনে নিয়েছে। ঝোপ দেখলে মানুষের লোভে তাকে আসতেই হবে। তারপর আমার বরাত আর তার বরাত। আজ একজনকে মরতেই হবে। এই বলে অজিতকুমার চলে গেলেন।

সন্ধ্যার অনেক আগেই অজিতকুমার শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সকলে সজল নয়নে তাঁকে বিদায় দিল। রামপ্রসাদ জীপে করে জঙ্গলের ধারে পৌঁছিয়ে দিল। রাইফেল, টর্চ ও জলের বোতল কাঁধে নিয়ে একা একা জঙ্গলে প্রবেশ করলেন অজিতকুমার।

● ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এক ঘণ্টা হাঁটার পর ঝোপের কাছে এসে দাঁড়ালেন অজিতকুমার। হোসেন বেশ সুন্দর করে ঝোপ বানিয়েছে। কে বলবে এ কৃত্রিম ঝোপ। অজিতকুমার ঝোপের চারদিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। ক্ষণিকের জন্য তাঁর বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। কে বলতে পারে, তাঁরও অবস্থা আগের শিকারীর মত হবে না। হয়তো সকালে হোসেন তাঁরও মৃতদেহ নিতে আসবে।

যেদিক হতে বাঘের পায়ের ছাপ ছিল, সেদিকে মুখ করে অজিতকুমার দাঁড়ালেন। নীরব নিস্তব্ধ বনভূমি। কেবল ঝিঁঝি পোকাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। অজিতকুমার ভাবছেন, বাঘের কথা। সে কি করে বোঝে, ঝোপের ভিতর মানুষ বসে আছে। আর যখন আসে একদিক হতে আসে কেন? নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। অজিতকুমার ভাবতে লাগলেন।

অন্ধ বাঘটা গাছের নীচে বসে ছিল। বানরী এসে বলল—কি-হে বাঘ, ঘুমোচ্ছ নাকি?

—না। খিদেয় পেট জ্বলছে, এতে কি ঘুম হয় নাকি?

বানরী বলল—আজ তোমায় নরমাংস খাওয়াব। যে শিকারীর কথা তোমাকে বলেছিলাম, সে এসেছে তোমাকে মারতে। এসে সেই ঝোপটার ভিতর আস্তানা করেছে। তা কখন যাবে?

বাঘ বলল—এখনই চল না। রাত হলে তো তুমি আবার ভাল দেখতে পাও না।

—তবে চলো। দেরি করে কি হবে। এই বলে বানরী বাঘের ঘাড়ে উঠে বসলো।

—চল সোজা চল।

বনের ভিতর অন্ধকার নেমে এসেছে। পাখিরা সব উড়ে আসছে যার যার বাসায়। বাঘকে সঙ্গে করে বানরী একটা গাছের আড়ালে দাঁড় করাল। বলল—এখানে তুমি দাঁড়াও। 'কু' দিলেই এখান থেকে ছুটে যাবে, মাত্র ত্রিশ গজ দূর।

—এটা কি আগের জায়গা?

—হ্যাঁ! তুমি যেমন করে আগের শিকারীদের ধরেছ, সেই রকম করে ধরবে। বুঝলে! এই বলে বানরী নেমে চলে গেল।

অজিতকুমার তখনও ঝোপের ভিতর যাননি। তাঁর দৃষ্টি বাঘের পায়ের ছাপের দিকে। তিনি তখনও বুঝে উঠতে পারেননি, বাঘের পায়ের ছাপ একদিক হতে আসবে কেন? বাঘ কি কেবল একদিক হতেই আসে। তবে তো অন্যদিক নিরাপদ। অজিতকুমার ঝোপের ভিতর ঢুকবেন, না ঝোপের বাইরে থাকবেন—এই সব কথা ভাবছেন। এমন সময় খ্যাঁখ্যাঁ আওয়াজ শুনে তিনি একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, একটা বানর তাঁর পিছন দিক হতে তাঁর দিকে আসছে। অজিতকুমার তাড়াতাড়ি তার দিকে ফিরতে গিয়েও ফিরলেন না। বানর কখনও বন্দুকধারী মানুষকে এভাবে আক্রমণ করে না। তবে কি বানরটা পাগল! আচ্ছা দেখাই যাক, ও কি করে। অজিতকুমার পিছন না ফিরে রাইফেল নিয়ে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বানরটা তাঁর পিছনের পাঁচ গজ দূরে লাফাচ্ছে, দাঁত খিঁচুচ্ছে; কিন্তু আক্রমণ করলো না। অজিতকুমার আর একবার আড় চোখে দেখে নিলেন, কিন্তু নড়লেন না।

বানরটা এবার লাফানি বন্ধ করে 'কু' দিল। অজিতকুমার এতক্ষণ বানরের আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু বানর তাঁকে আক্রমণ না করে 'কু' দিল কেন? বানরের 'কু' দেওয়ার অর্থ তো হল ডাকা। ও কাউকে ডাকছে নাকি? কি রকম রহস্যজনক ব্যাপার বলে মনে হল। হোসেন বলেছিল, "হুজুর, এ ডাইনীর বাঘ, একে কেউ মারতে পারে না।" তবে কি এ ডাইনীর খেলা! বানর পাঠিয়ে দিয়ে, শেষে নিজে বাঘ হয়ে আসবে নাকি। দেখা যাক, কি হয়। অজিতকুমার বাঘের আসা-পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এখন বুঝে নিয়েছেন, বানর তাঁকে আক্রমণ করবে না।

বানরী আবার 'কু' দিল।

গোধূলি লগ্ন। মাঠে তখন আঁধার নেমেছে। এমন সময় ভীষণ গর্জন করে বাঘ গাছটার পিছন হতে ছুটে এলো। পাখিরা, যারা গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছিল তারা ভয়ে কলরব করে উড়তে লাগলো।

অজিতকুমার দেখলেন, একটা বাঘ বিদ্যুদ্বেগে ছুটে আসছে তাঁর দিকে। মাত্র
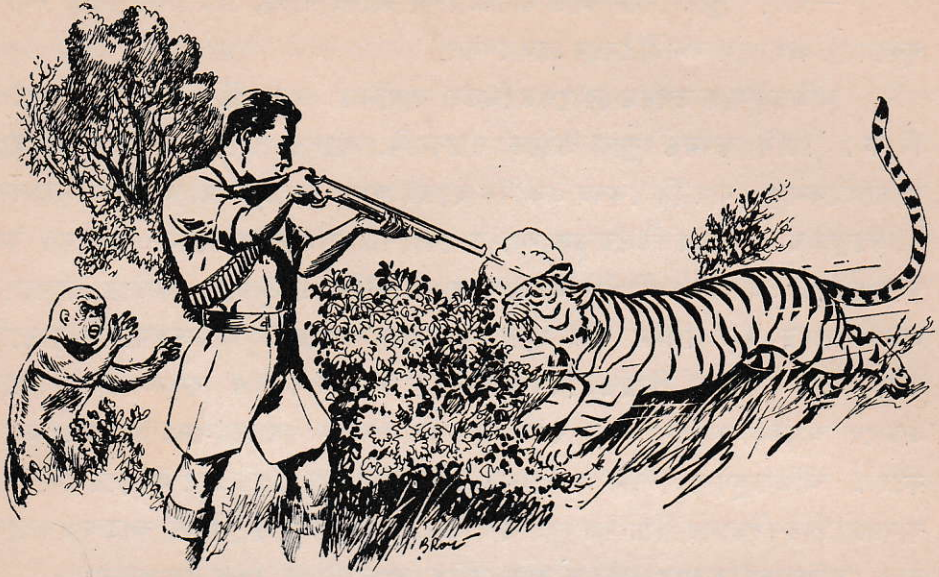
রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপলেন।

কয়েক গজ দূরে। একটু বিলম্ব হলেই বাঘটা তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে। অজিতকুমার তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে গেলেন—রাইফেল তুলে ট্রিগার টিপলেন।

—'গুড়ুম!'

গুলিটা গিয়ে বাঘের ফুসফুস ভেদ করলো। বাঘ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়েই সে তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অজিতকুমার তার আগেই আর একটা গুলি করলেন। সেটা গিয়ে লাগলো বাঘের কপালে। বাঘ আবার পড়ে গেল, আর উঠলো না।

এতক্ষণ বানরীটা আনন্দে লাফাচ্ছিল। বাঘকে পড়ে যেতে দেখে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অজিতকুমারকে আক্রমণ করলো। অজিতকুমার আগে হতেই প্রস্তুত ছিলেন। বানরী আক্রমণ করতেই তাঁর হাতের রাইফেল আবার গর্জে উঠল। বানরী ওলটপালট খেয়ে পড়ে গেল। গুলিটা তার পেটে গিয়ে লেগেছে।

সে রাত্রে একা ডাকবাংলোয় ফিরে এলেন অজিতকুমার। সকাল হতেই দলবল নিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেলেন। ঝোপের কাছে আসতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন বানরীটা বাঘের গলা জড়িয়ে ধরে মরে পড়ে আছে। অজিতকুমার বানরীকে সরিয়ে, বাঘটাকে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন বাঘটা জন্মান্ধ।

এতক্ষণে অজিতকুমারের কাছে সব রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই বানরীই হল ডাইনী শয়তানী। ওই বাঘকে লালনপালন করেছে। শিকারের খবর দেয়, শিকার কোথায় লুকিয়ে থাকে, সেদিকে বাঘটাকে নিয়ে আসে। শিকারের কাছেপিঠে বাঘটাকে লুকিয়ে রাখে। তারপর সে নিজে গিয়ে শিকারের পিছন থেকে ভয় দেখায়। শিকারী তার ফাঁদে পা দেয়। ভাবে বানরটা বোধহয় পাগল। তাকে আক্রমণ করবে। শিকারী তখন বানরটার আক্রমণ হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে। সেই ফাঁকে বানরী 'কু' দেয়। অমনি বাঘ গর্জন করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেচারী তখন আত্মরক্ষা করবার সময় পায় না। এই ভাবেই তিনজন শিকারী বাঘের পেটে গিয়েছে। তিনি বানরীর ধোঁকাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই বেঁচে গেছেন, নইলে তাঁর অবস্থা পূর্বের শিকারীদের মত হত।

সব শুনে হোসেন তো অবাক। সঙ্গের লোকেরা বানরী ও বাঘটাকে জীপে তুলে নিলো। তারপর তারা বিজয়গর্বে ডাকবাংলোর দিকে রওনা হলো।

সকলে বানরীর গল্প শুনে ছুটে দেখতে এলো।

● নেড়া যায় বেলতলায়
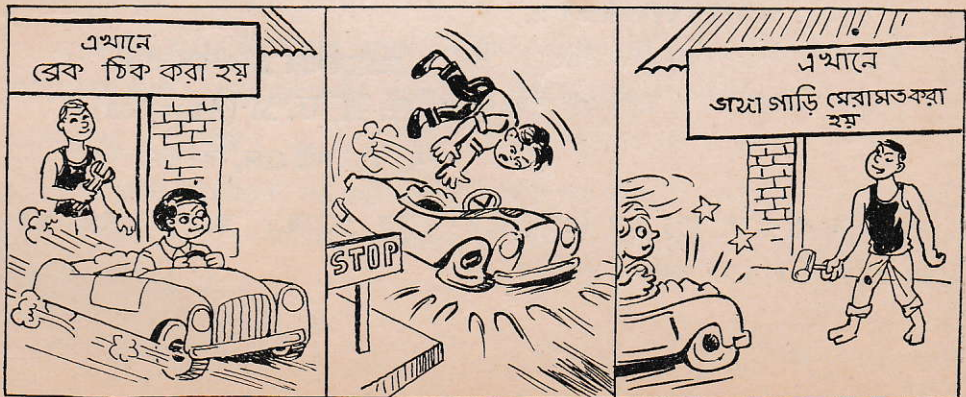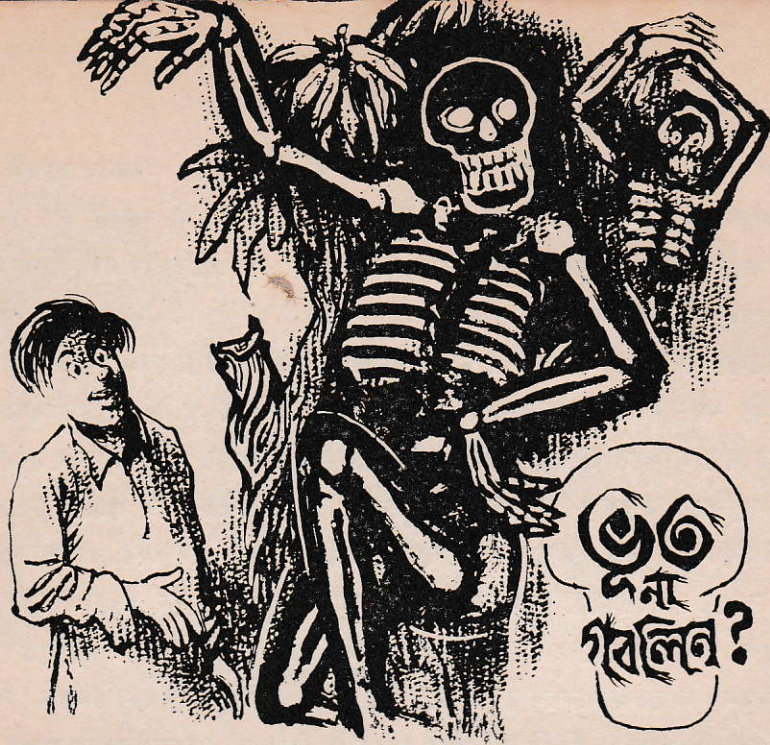
শৈল চক্রবর্তী

বৌবাজার দিয়ে যাচ্ছি একদিন, একটা হ্যাণ্ডবিল হঠাৎ এসে পড়ল আমার হাতে। কে যেন গুঁজে দিয়েছে।

হ্যাণ্ডবিলে লেখা আছে ঃ

> বাড়িতে ভৌতিক উপদ্রব করাইতে হইলে আসুন আমাদের কাছে।··· কনট্রাক্ট নিয়ে কার্য সমাধা করা হয়···বিশেষ বিবরণের জন্য আপিসে দেখা করুন।
>
> প্রোফেসার ব্ল্যাক-হুড-বক্সি
> A. G. M. U. M (America)
> ৬৭নং ঝাড়ুপট্টি লেন, কলিকাতা।

বটুদা হ্যাণ্ডবিল পড়ে বলে উঠল, হুররে! ঠিক হয়েছে। আমার মাথায় এই রকম একটা আইডিয়াই ঘুরছিল, বুঝলি ?

হুম, বলে ভাবতে থাকি আমি।

ছাই বুঝেছিস, বটুদা এক ঝটকায় আমায় উড়িয়ে দিয়ে তার আইডিয়া প্রাঞ্জল করতে থাকে।

শোন এই যে দেখছিস ব্ল্যাক-হুড-বক্সি—এর দ্বারাই আমাদের কাজ হবে। ব্যাটা দশরথকে তাড়ানোর এই হচ্ছে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। ভূতের ভয় সবারই আছে, ও ব্যাটারও আছে নিশ্চয়। ভৌতিক উপদ্রব হলে 'বাপলো' বলে বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেবে। কি রকম? হাঃ হাঃ হাঃ…

দুজনেই হেসে উঠি।

তা যদি হয়, তাহলে খুব ভাল হয় বটুদা! ব্যাটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—কত চাকর দেখেছি কিন্তু এর মত শয়তান আর দুটি নেই।

দুজনে তখন বেরুলাম ঝাড়ুপট্টির সন্ধানে।

আগের কথা একটু বলে নিই।

বটুদা আর আমি দুজনেই যেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছি সেটা আমার মাসীর বাড়ি। বটুদার পিসীর বাড়ি। মাসীমার ছেলেপিলে নেই। আমাদেরই পুত্রবৎ যত্ন করেন। মেসোমশাই হাজারিবাগে চাকরি করেন মাইকা মাইনসে।

মাসীমা একা থাকেন বলে আমরা মাঝে মাঝে এসে উঠি চেতলা ফার্স্ট লেনের এই বাড়িতে। মিথ্যে বলব না বেশ রাজার হালেই থাকি সেথা। খাওয়াদাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা—কিন্তু যত গোল বাধায় এই দশরথ। মাসীমার পিয়ারের চাকর।

কথায় কথায় আমাদের নামে নালিশ। এই তো সেদিন, রান্নাঘরে মাসীমার আচারের জার থেকে কয়েকটা আম মাত্র টেস্ট করেছি। আর অমনি দশরথ গিয়ে মাসীমাকে লাগিয়েছে!

আচার খেয়েছি তা হয়েছেটা কি? তাতে ওর কি?

বটুদা একদিন আমসত্ব চেখেছিল। অবশ্য আমাকেও ভাগ দিয়েছিল একটু। কিন্তু তাই নিয়ে কী কাণ্ড!

● শৈল চক্রবর্তী
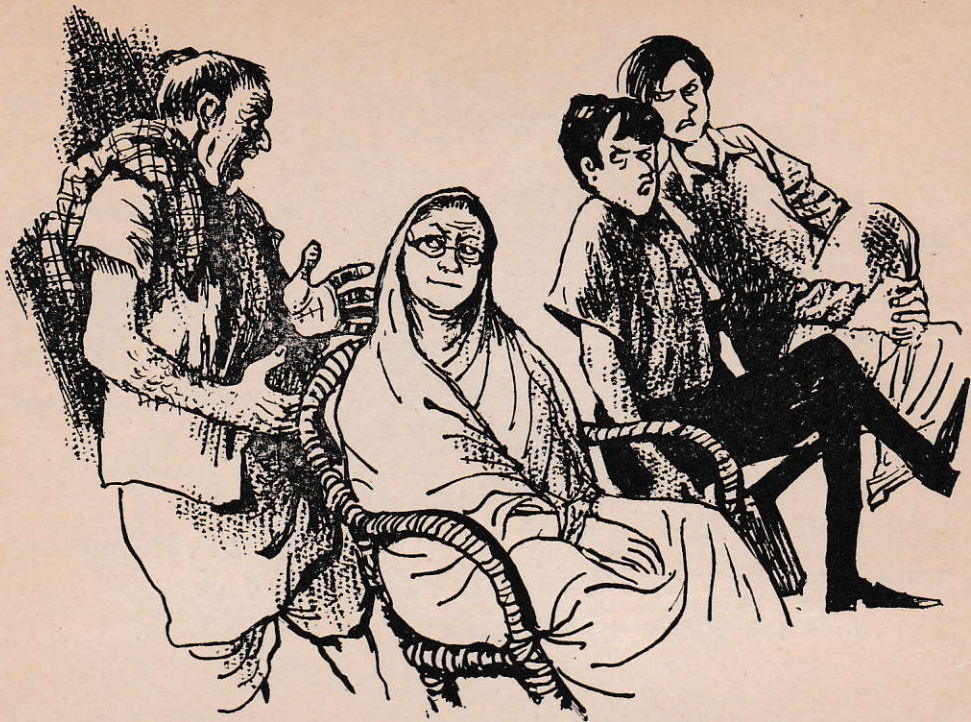
আপুনি ত জান না, মনিষ্য কিমতি রাক্ষস-অ হয়ি যায় !

হ্যারে, মাসীমা বলে ওঠেন, অতখানি আমসত্ত্ব উপে গেল ? একটা জিনিস কি রাখবার জো নেই ? ও দশরথ, বলি তুই বাড়িতে আছিস কি জন্যে ? ভাঁড়ার ঘর থেকে জিনিস উধাও হয় কেন ? আমসত্ত্বর কি ডানা গজাল ?

ও শয়তানটা বললে কি, বললে, কঁড় করিমু মা ? মু ত নজর রাখুছি। পরন্তু দাদাবাবুরা ঘরে আসিলে জিনিস-অ উড়ি যাউছি—মু কঁড় করিমু ?

তা বলে, দাদাবাবুরা ঘরে ঢুকবে না ? একি কথা ? ঘরে ঢুকলেই ওরা খাবে, একি হয় নাকি ?

আপুনি ত জান না, মনিষ্য কিমতি রাক্ষস-অ হয়ি যায় !

এ রকম কথা শুনলে গা জ্বালা করে না ?

আমরা যাই করি ওর সহ্য হবে না। কোথায় একটু আড্ডা দেব, কোথায় একটু সিনেমা দেখে দেরি করে আসব তা ওর সইবে না। ওর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইয়ার বন্ধু জুটে যদি ফুচকা খেতে বসি তাতেই তো দেড় ঘণ্টা লেগে যায়—ওর হুকুমে

রাত দশটার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে! ইস্, লাটসাহেবি ফলাতে এসেছে! কিন্তু, বলবার কিছু নেই। মাসীমার আবার টান বেশী ওটার ওপর।

তাই ফন্দি করে ওকে তাড়াতে হবে।

ঝাড়ুপট্টি খুঁজতেই ঝড়োকাক বনে গেলুম আমরা। তারপরে আবার সাতষট্টি। অনেক বাঁকাচোরা ঘিঞ্জি চোরাগলি পেরিয়ে শেষে দর্শন পেলুম সাতষট্টির।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে দোতালায়। সেটা দিয়ে উঠতে গিয়ে মচমচ করে নড়ে উঠল। গাটা কেমন যেন ছমছম করছে।

বটুদা পেছন থেকে উদাত্ত কণ্ঠে ছাড়ল, ঘাবড়াসনি! মহৎ কাজে বাধা অনেক। ভয় করলেই সব মাটি!

'কে—এ ?' ওপর থেকে আওয়াজ এল।

আমরা, মানে বটুক আর নিকুঞ্জ, হেঁকে বললুম।

এসো, ভেতরে এসো!

ছোট আধা অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখলুম গোঁফওয়ালা ভারিক্কি চেহারার এক ভদ্রলোক আমাদের সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

আপনার হ্যাণ্ডবিল দেখেই এসেছি এখানে—

টেক ইওর সীট! আই মীন সীটস্!

আমরা একটা গদি আঁটা সোফায় বসতেই সেটা তুমড়ে কাত হয়ে গেল। ওখান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে আমরা বসলাম দুটো লোহার চেয়ারে।

আমিই হচ্ছি প্রোফেসার বক্সি, বললেন ভদ্রলোক। ঐ সোফাটা কত দিনের জান? ১৬৬২ সালে ডিক্সন লেনের এক ভূতের বাড়ি থেকে ওটি আমদানি। ওতে একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটা ভূত বসতো এককালে। মানুষ বসতে পারত না। আচ্ছা, তোমাদের যা বক্তব্য আছে চটপট বলে ফেলো এবার।

দেখুন, বটুদাই শুরু করে, আমাদের চেতলার বাড়িতে একজন উড়ে চাকরকে ভয় দেখাতে হবে।

হেঃ হেঃ হেঃ···প্রোফেসারের গোঁফটা দুদিকে নেচে উঠল হাসিতে। একে

উড়িয়া তায় ভৃত্য ! এতে আমার যাওয়া লাগবে না। আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরাই পারবে—কি রকম ভয় দেখানো চাও ?

মানে, ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পালায়, এই রকম হলেই চলবে, জানাই আমি। অন্য কোনো ভাবে ওকে হটানো যাচ্ছে না কিনা।

ভয় তো পাবেই, তবে এক রকম তো নয় বহু রকমের ভয় আছে। ঐ যে ঐখানে লিস্ট করা আছে—দেখে নাও।

সত্যিই আমরা দেখি একটা চার্ট ঝুলছে। তাতে লেখা আছে—গা ছমছম, মৃদু ভয়, বুক গুরগুর, কপালে চোখ তোলা, আঁতকে ওঠা (ভাড়াটে তোলার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট), মাথা বনবন, ভিরমি যাওয়া ইত্যাদি বহুরকমের তালিকা। তালিকার শেষেরটি হল, দাঁতকপাটি, ফ্ল্যাট পতন ও মূর্ছা। তার নীচের লাইনে ব্র্যাকেটে লেখা ঃ প্রত্যেকের চার্জ আলাদা।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটল।

ইতিমধ্যে প্রোফেসার মাথায় একটা লম্বা কালো টুপি পরেছেন আর হাঁটু অবধি ঝোলা কালো লং কোট চাপিয়েছেন। কোটের সারা বুক জুড়ে ঝকঝক করছে ছোট বড় লম্বা চৌকো চেপটা ত্যাবড়া নানান মেডেল।

আপনারা কিভাবে কাজ করেন স্যার ? বটুদার প্রশ্ন।

আমরা হচ্ছি পেশাদার ভূত, বুঝলে ! আমেরিকার ওহিও থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি। মোস্ট সায়েন্টিফিক টেকনিক আমাদের। যাক্, এখন চটপট বলে ফেল ক'নম্বর ভয় চাও তোমরা ?

দেখুন, এমন করতে হবে যাতে ঐ শয়তান চাকরটা বাবা বাবা বলে বাড়ি ছেড়ে পালায়।

অত্যন্ত সহজ কাজ ! চার নম্বরেই হয়ে যাবে। ঠিকানাটা কি ?

১০৩।২।১, চেতলা ফার্স্ট বাই লেন—

নম্বর গোলমাল হয় না যেন, প্রোফেসারের সাবধান বাণী। একবার কি হয়েছিল জানো ? ঐ নম্বর ভুল হওয়াতে ভাড়াটে তুলতে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে পালাতে হয়েছিল। হ্যাঁ, এডভান্স কিছু রেখে যাও। ইলেকট্রিক কনেক্শান আছে বাড়িতে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাছাকাছি কোনো গাছ আছে?

বাড়ির উঠোনে একটা আম গাছ আছে। আর বাইরে একটু দূরে তিনটে তাল গাছ—

বাস বাস, ঐ আম গাছই যথেষ্ট। ভৌতিক ক্রিয়ার জন্যে এগুলো খুবই দরকার। নিমগাছ থাকলে তো কথাই ছিল না। আজকাল শহরের বাড়িওলারা সব আমার মক্কেল। এত কল আসছে যে একা ম্যানেজ করতে পারছি না। কোর্ট মামলা কথাবন্ধ জলবন্ধ—এসবে কিস্সু হয় না। একমাত্র আমিই পারি ভাড়াটেকে তুলতে—ফাইভ রুপিজ এডভান্স রেখে যাও, বাকী থারটি পরে দিও।

পাঁচটা টাকা টেবিলে রেখে সেই মচমচে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম আমরা।

নামবার সময় আমার চোখে পড়ল, একটা আবছায়া অন্ধকার ঘরে দুজন লোক হাত তুলে এক ঠ্যাংএ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তাদের একটা করে কালো মুখোশ।

দর্শক যুগলকে দেখে সুড়ুৎ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তারা।

কি জানিস? বটুদা বললে, ওরা রিহার্স্যাল দিচ্ছিল।

সে দিন রাত আটটা।

মাসীমা ঠাকুরঘরে জপ করছেন। দশরথ রান্নাঘরে খুন্তি নাড়ছে। আমরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।

বটুদা একবার মেইন সুইচের ঘরে গিয়ে কি যেন করে এল আর দপদপ করে নিভে গেল সব আলো।

চারদিক অন্ধকার। অন্য আলোই বা কোথা যে জ্বালবে? শহরের কটা বাড়িতে মোমবাতি আর হ্যারিকেন থাকে!

লা-ই-ট-অ ফি-উ-জ-অ, চেঁচিয়ে উঠল দশরথ।

মাসীমা ঠাকুরঘর থেকে চিৎকার করে ওঠেন, ও বটু, ও নিকুঞ্জ, শীগ্‌গির যা একটা মিস্ত্রী ডেকে আন। হ্যারে, সব আলো নিভেছে নাকি? কি হবে গো! ও দশরথ—

কে কার কথা শোনে তখন! কারুর সাড়া নেই।

● শৈল চক্রবর্তী

মনে হল বাড়ির সর্বত্র ধুপ্ ধাপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ব্ল্যাক্ হুডের খেল শুরু হল বুঝি। শুনতে পাচ্ছি, যেন কারা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

দশরথ রাগে গরগর করছে আর এদিক ওদিক হাতড়াচ্ছে। একটা মোমবাতিও ছাই পাচ্ছে না খুঁজে। খাটে মাথা ঠুকল দু'বার, কেরোসিনের বোতল ওলটাল। গজর গজর করছে সে আর ভেবে নিয়েছে যে এ আমাদেরই কর্ম।

ও বিচ্ছু দু'টারে জব্দ করিমু, বলে উঠল একবার।

এদিকে আমগাছের মধ্যে ফটাফট হাততালির শব্দ ফেটে পড়ছে। ভূতের হাতে কেমন তালি বাজে জানি না। তবে এ এক অদ্ভুত শব্দ। আর ছাদ থেকে নাকী সুরে (চন্দ্রবিন্দু সহযোগে) ডায়ালগ আর ভৌতিক গান শুরু হয়েছে।

আমি ছিলুম রকের ওপর। হঠাৎ আমগাছ থেকে সড়াক্ করে নেমে এল এক কঙ্কাল—ঠিক আমার নাকের সামনে।

ওরে বাবারে, বলে চিৎকার ছেড়েই আমি ছুটে পালাতে গিয়ে পড়লুম চৌবাচ্চায়।

কী কাণ্ড হচ্ছেরে তোদের—অ বটু। অ দশরথ! অন্ধকারে সব ভূতের নেত্য! বললুম মিস্ত্রী ডাক……কথা শেষ হবার আগেই এক কাপড়ঢাকা মূর্তি লাফ দিয়ে চলে গেল মাসীমার সামনে দিয়ে। তাঁর বাক্য আর শেষ হল না, ভয়ে কাঠ মেরে তিনি 'রাম' 'রাম' করেন শুধু।

বটুদা এতক্ষণ ব্ল্যাক-হুড দলের সঙ্গে ছিল, তাদের সহযোগিতা করছিল হয়ত। কিন্তু দশরথের কোনো পাত্তা নেই। তার টিকি দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হল, হয়ত সে কোথাও ফেন্ট হয়ে পড়ে আছে। তাই যদি হয়। অন্ধকারে তাকে খুঁজে বার করি কেমন করে!

ইতিমধ্যে একটি কঙ্কালকে দেখলুম মনের আনন্দে নাচছে। তাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হল থামতে, কেননা আসল লোকই তো নেই। কিন্তু সে নির্বিকার। শেষে জোর করে থামাতে সে বললে, সাদা গবলিন যে মনের আনন্দে দাপাদাপি করছে মশাই!

বলতে বলতেই দেখি আপাদমস্তক ঢাকা সাদা গবলিন তুড়ি লাফ খেয়ে বেরিয়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে।

● ভূত না গবলিন?

ব্ল্যাক-হুড পার্টি লোক তাকে তাদের দলভুক্ত বলেই ধরে নিয়েছিল, কিন্তু সে থামছে না কেন? এবং কঙ্কালের পোশাক না পরে সাদা ভূত সাজল কার হুকুমে? প্রোফেসারের ভৌতিক আইনে শাস্তির ঠেলাটা পেলে টের পাবেন বাছাধন!

কঙ্কালের দল তিনজন একজায়গায় হয়ে মুখোশের চোখের ফুটো দিয়ে গুনে দেখল ঠিক তিন জনই আছে তারা।

তবে ঐ সাদা গবলিনটা আবার কে?

ওদের মুখ দিয়ে বাক্য সরে না। কালো আলপাকার পোশাকগুলো অন্ধকারে দেখা না গেলেও তার ওপর সাদা পেন্টে আঁকা হাড় পাঁজরাগুলো বেশ কেঁপে উঠল।

কঙ্কালের একজন বলল, রিয়্যাল ভূত, নাকি? না কোনো চালবাজ? আমাদের ওপর টেক্কা মারবার মতলব?

আর এক কঙ্কাল বলে উঠল, এরকম কন্‌ডিশান তো ছিল না আমাদের সঙ্গে।

এরই মধ্যে ওরা দেখল, রান্নাঘরের কোণ থেকে সেই সাদা গবলিন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে—তার হাতে একটা চেলা কাঠ!

ওরে বাব্বা! এ নির্ঘাত রিয়্যাল ভূত! শেষে মার খাব নাকি? কঙ্কালেরা রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। তারপর সুট্ সুট্ করে কখন তারা সরে পড়েছে বাড়ি থেকে। তাদের সাজ-সরঞ্জামের সুটকেশটিও তাদের সঙ্গে অন্ধকারে উধাও হয়েছে। তাদের গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বাক্সটিও তারা ফেলে গেল না।

বটুদা কখন মিস্ত্রী এনেছে জানি না। হঠাৎ দপ্ করে সব আলো জ্বলে উঠল।

আমার কাছে কঙ্কাল ও গবলিনের আচরণগুলো যথেষ্ট রহস্যজনক লেগেছিল। যাই হোক, ভৌতিক তাণ্ডব কম হয়নি বাড়িতে। দশরথ যে এই তাণ্ডবলীলা সুস্থভাবে সহ্য করেছে এ কখনই হতে পারে না। সে নিশ্চয়ই পলাতক হয়েছে!

ওয়াণ্ডারফুল সাক্সেস্! আমার উচ্ছ্বাসোক্তি।

বটুদাও তাল রাখল, সাবাস, ব্ল্যাক-হুড বক্সি!

চোরের মত মাসীমার ঘরে ঢুকলুম আমরা। মাসীমা তখনও কাঠ হয়ে শুয়ে 'রামনাম' জপ করছেন।

● শৈল চক্রবর্তী

আলো জ্বলে গেছে পিসীমা, বটুদা বললে। এই নিকু, তুই পিসীমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেনা একটু।

তুইও বোস এখানে, ভয়ে ভয়েই বলি।

কেন? ভয় করছে নাকি তোর?

না, ঘুম পাচ্ছে—

কত রাত হয়েছে রে? মাসীমা চোখ খুলে জিজ্ঞেস করেন। আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম না কী বল তো? কিছুই বুঝতে পারছি না।

ও কিছু না পিসী, বটুদা বলে ওঠে। কি হয়েছিল জানো? একটা ধেড়ে বেড়াল ঢুকেছিল ঘরে। আর সেই সময় যত চামচিকে ক্ষেপে গিয়ে কিচমিচ করছিল। একটু চা খাবে, পিসী?

চা? হ্যাঁরে, অপদেবতা নাকি তাই বল তো? বেড়ালের অত বড় পা হয় নাকি? নিশ্চয় কোনো অপদেবতা। অনেক দিন আগে এক ব্রহ্মদত্যি নাকি ছিলেন এ বাড়িতে। তাঁরও সারা অঙ্গ শ্বেতবস্ত্রে ঢাকা।

তাই নাকি পিসী? বটুদার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তারপর আর দেখা দেননি। আজ শ্বেতমূর্তি দেখিসনি তোরা? কোথায় ছিলি? আর ঐ হতভাগা দশরথটার যদি টিকি দেখা যায়!

ওটি তোমার একটি অপদেবতা মাসীমা, ফোড়ন কাটলুম আমি।

ও কথা বলিস না, ওনাদের নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। আমার সামনে দিয়েই তো শ্বেতমূর্তি চলে গেল দেখলুম। যা দিকিন, দশরথকে বল চায়ের কেটলিটা চাপাতে···ওঃ বুকটা ধড়ফড় করছে রে···হার্টের অসুখটা বাড়বে নাকি কে জানে?

বীরদর্পে আমরা চলে গেলুম দশরথের ঘরে। ঘরে কেউ নেই। খাটিয়ার ওপর দশরথের বিছানা লণ্ডভণ্ড।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা রান্নাঘর অভিমুখে অভিযান চালালুম। দালান পেরিয়ে রোয়াক, তারপর রান্নাঘর। রোয়াকের কাছে যে আলোর পয়েন্টটা ছিল তাতে বাল্‌ব ছিল না। তাই সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার।

হঠাৎ চোখে পড়ল সাদা মত কি যেন নড়ছে।

বটুদা বললে, ছাতার বাঁটটা নিয়ে আয় তো নিকু।

কোথায় ছাতা তখন! ভূতের সঙ্গে ছাতাছাতি বা হাতাহাতি কোনোটাই আমার পছন্দ নয়।

ইতিমধ্যে দেখি সেই শ্বেতমূর্তি রান্নাঘরের পাশ থেকে বেরিয়ে সুট্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। একি ব্ল্যাক-হুডের ধ্বংসাবশেষ, না—?

মাসীমা ওঁর কথাই বোধহয় বলছিলেন, আড়ষ্ট গলায় বললুম।

বেম্ভদত্যি না কি যেন? বটুদারও গলা ঘড় ঘড় করছে।

এমনি ওঁরা কিছু বলেন না কিন্তু চটে গেলে সাংঘাতিক—মতবাদ ছাড়লুম আমি।

সেই মুহূর্তে দেখি সেই শ্বেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে আমাদের কাছে—একেবারে আমাদের পেছনে।

ওরে বাব্বা!! বটুদা এক চিৎকার ছেড়েছে।

গেছি রে বাবা! আমিও প্রায় ঐক্যতানে ডাক ছেড়েছি।

গবলিনের কোনো হাঁকডাক নেই—সে শুধু নাচতে নাচতে মেরেছে এক লাফ! আবছা অন্ধকারে মনে হল তার কোটরগত চোখ দুটো জ্বলছে—

আমি বললুম, বটুদা, আমার মনে হচ্ছে, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব—

ঘাবড়াসনি, আয় এদিকে আয়। কম্পমান বটুদা উঠোনের দিকে এগোয়।

সদরের দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। তারপর দৌড়, চোঁচা দৌড়। পেছনে না তাকিয়েই। আমার মাসী আর বটুদার পিসীকে বেহ্মদত্যির জিম্মায় রেখেই কেটে পড়লুম আমরা। বুড়ো মানুষ তায় মেয়েছেলে, বেহ্মদত্যির এ কাণ্ডজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতিবাক্যই মানা ভাল।

খান চার পাঁচ বাড়ি পেরিয়ে বটুদার বন্ধু শচীন্দরের বাড়ি ঢুকে পড়লুম হুড়মুড় করে। সে রাত্রে ওখানেই আশ্রয় নেওয়া গেল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা আটটা।

● শৈল চক্রবর্তী

সেই মুহূর্তে দেখি শ্বেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে···আমাদের পেছনে। [পৃঃ ১৮৩

চা খাচ্ছি। এমন সময় শচীন্দরের বাড়ির ঠিকে ঝি এক সংবাদ পরিবেশন করল।

কাল তোমাদের বাড়িতে খুব ভূতের দৌরাত্ম্যি হয়েছিল না কি গো বাবু ?

হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে গা ? জিজ্ঞেস করি।

আমি যে গিয়েছিলুম ও বাড়িতে। গিন্নী বললে, ছেলে দুটো ভয় পেয়ে কোথায় যে চলে গেল—ছেলেমানুষ তো! হাজারিবাগ থেকে এলে আবার ওদের খবর দেব। আজই উনি দশরথকে নিয়ে হাজারিবাগ চলে যাচ্ছেন কিনা।

দশরথ ? দশরথ আছে নাকি ? আমরা দুজনেই হাঁ হয়ে যাই।

কেন থাকবেনি গো ? সে বলে কি, কাল সন্ঝাবেলা মু দেখিল কি মনিষ্যরা আমগাছে চড়ুছি। মু বুঝি নিলা অন্ধকারে মোরে ভয় দেখাইবাকু মতলব। মু এক বুদ্ধি করিলা, সাদা কাপড়ে দেহ ঢাকিকিরি খুব নাচ করিলা—

অ্যাঁ—ঐ ব্যাটা ভূত! বেহ্মদত্যি! গবলিন!! আমার আর বটুদার দুজনেরই চোখ কপালে উঠে গেছে।

———

হীরামোতি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

রডস্ এণ্ড কোং।

ইংরেজীতে লেখা দোকানের সাইন বোর্ডটা চোখে পড়লে মনে হবে বুঝি কোন বিদেশীর জুতোর দোকান, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে রুইদাস এণ্ড কোম্পানি বিচিত্র-ভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে রডস্।

নীচে লেখা বিখ্যাত সু মেকার্স।

একসময় সাইন বোর্ডের লেখাগুলো হয়ত পরিষ্কার ও ঝকঝকে ছিল কিন্তু এখন রং উঠে অস্পষ্ট হয়ে ঠিক বোঝবারও উপায় নেই।

দোকানটাও আজকের নয়—তা প্রায় সত্তর আশি বছরের তো হবেই।

রডস্ও দোকানের পরবর্তী নাম।

আগে নাম ছিল লুং চিং সু হাউস।

লুং চিংয়ের হাতে তৈরী জুতো পরবার জন্য সাহেব সুবো থেকে কলকাতার বড় বড় ধনীরাও একসময় তার দোকানে এসে পা ফেলত।

দোকানে লুং চিং ও তার স্ত্রী ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী বা কারিগর ছিল না।

স্বামী-স্ত্রী চার হাতে জুতো তৈরি করত।

ছেলেপেলে নেই, হু'জনার সংসার—কাজকর্মই বা কি আর সংসারের—সব সময়ই তাই প্রায় স্বামী-স্ত্রী হু'জনে বসে বসে জুতো তৈরি করত।

গভীর রাত্রে পর্যন্ত যখন সারাটা পাড়া নিঝুম হয়ে যেত—ঘরের মধ্যে লুং চিং আর স্ত্রী হু'জনে বসে বসে ঠুক্‌ঠুক্ করে জুতো তৈরি করে চলেছে।

জুতো তৈরি যেন ছিল ওদের নেশা—ওদের প্রাণ।

কি যে হলো একদিন হঠাৎ লুং চিং কাশতে শুরু করল। খুক্ খুক্ করে দিনরাত্র কাশছে।

ডাক্তার দেখায়—হাসপাতালে যায় কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হয় না।

ক্রমশঃ এমন হয় যে আর কাজ করতেই যেন পারে না।

খদ্দেররা এসে ফিরে ফিরে যেতে লাগল।

সেই সময় মুচির ছেলে রুইদাস গাঁ থেকে কলকাতায় এসে পথে পথে চাকরির জন্য ঘুরতে ঘুরতে একদিন লুং চিংয়ের দোকানের সামনে এসে হাজির।

একটা কাজ দাও না চীনা সাহেব—

দীর্ঘকাল বাংলা দেশে থেকে লুং চিং চমৎকার বাংলা বলতে জানত।

জিজ্ঞাসা করে, কি কাজ জান ?

সব কাজ পারব—

সব কাজ পারবে—জুতো সেলাইও করতে পারবে ?

ও তো ছোটবেলা থেকেই জানি, রুইদাস বলে, আমাদের কুলকর্ম।

কেমন কৌতূহল হলো লুং চিংয়ের। রুইদাসকে দোকানের মধ্যে ডেকে একটা সোল সেলাই করতে বললে।

হাতের কাজ দেখে রুইদাসের লুং চিং খুশী। লুং চিং সু হাউসেই রুইদাসের চাকরি হয়ে গেল।

বুদ্ধি আছে—চটপটে—পরিশ্রমী ছোকরা—লুং চিং খুব খুশী।

কয়েক মাসের মধ্যেই দেখতে দেখতে রুইদাস জুতো তৈরির ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিল।

নতুন করে খরিদ্দারের ভিড় বাড়তে লাগল।

কিন্তু লুং চিংয়ের শরীরটা সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল—এক শীতের রাত্রে কাশতে কাশতেই তার প্রাণটা বের হয়ে গেল।

● হীরা মোতি

বুড়ীর তো ত্রিসংসারে আর কেউ নেই—সে একদিন রুইদাসকে বললে, বেটা—আমার তো আর কেউ নেই—তুইই আমার ছেলে—দোকানটা তুইই নে—

কিন্তু অত টাকা আমি পাবো কোথায়? রুইদাস বলে।

টাকা কি হবে—কিছু দিতে হবে না—দোকানটা তোকে এমনই দিলাম। আমাকে দুটি কেবল খেতে দিস বেটা।

রুইদাস কি বলবে ভেবে পায় না। চোখে তার জল ভরে আসে।

দু'হাতে বুড়ীকে জড়িয়ে ধরে রুইদাস বলে, তুমি সত্যিই আমার মা—

রুইদাস হলো দোকানের মালিক। দিবারাত্র খেটে খেটে রুইদাস দোকানের আরো শ্রীবৃদ্ধি করে।

রুইদাসের তৈরী জুতোর চাহিদা সারাটা শহরে।

প্রত্যহ হরেক রকম খরিদ্দারের আনাগোনা। চার পাঁচ জন লোক রাখে রুইদাস।

দিন রাত্রি জুতো তৈরী হয়।

কত রকমের জুতো—ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলের নতুন নতুন ডিজাইনের জুতো।

তারপর একদিন বুড়ীও মারা গেল।

রুইদাস এবারে লুং চিং সু হাউসের পুরানো সাইন বোর্ডটা সরিয়ে নতুন সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিল দোকানের মাথায়।

বিচিত্র নাম।

রডস্ এণ্ড কোং।

সু মেকার।

আরো ক বছর তারপর গড়িয়ে গেল—

রুইদাসের ছেলে মহীদাস হলো মালিক, তারপর তার ছেলে মদন দাস—

বাপের একমাত্র ছেলে মদন দাস!

বিখ্যাত সু মার্চেন্ট—মহীদাসের ছেলে—দোকানে সে আসে না—কাজকর্মও দেখে না—কেবল ফূর্তি করে বেড়ায়।

দুহাতে টাকা ওড়ায়।

এবং মহীদাস মরবার পাঁচ বছরের মধ্যেই রডস্ কোং-এর সমস্ত ইজ্জত ও গৌরব গেল—একে একে কর্মচারীরা বিদায় হলো।

দিন আর চলে না।

● নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মদন দাসের একমাত্র ছেলে রতন দাস। ছোটবেলা ঠাকুর্দা মহীদাসের পাশে বসে ঠুক্ ঠুক্ করে জুতো তৈরি করত খেলার ছলে—

বয়স সবে বার বছর—সেই এখন দোকান দেখাশোনা করে—কারণ বাপ মদন দাস পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

কিন্তু আশ্চর্য—যেন তার প্রপিতামহ রুইদাসের প্রতিভা নিয়ে সে জন্মেছে।

ঐটুকু ছেলে কিন্তু তার হাতের তৈরী জুতো দেখলে বিস্ময়ে যেন চোখ ফেরান যায় না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জুতো তৈরি করে। দোকানের ধুলো বালি পড়া শূন্য শো কেসে জুতো এক জোড়া ত্নজোড়া সাজিয়ে রাখে বিক্রির আশায়।

পুরানো ভাঙ্গা দোকানে কে আর খরিদ্দার আসবে—তবু মধ্যে মধ্যে এক আধ জোড়া বিক্রি হয়—

তাইতেই বাপ বেটার কোন মতে চলে যায়।

রতনের মা তার ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল।

রডস্ এণ্ড কোং ঠিক বড় রাস্তার উপরে না হলেও—দোকান থেকে বড় রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

সেদিন বিকেলের দিকে আপন মনে প্রায় অন্ধকার ঘরে বসে রতন এক জোড়া জুতো সেলাই করছিল—

হঠাৎ তার নজর পড়ল বিরাট একটা সাদা রঙের গাড়ি বড় রাস্তার উপর এসে থামল—ঠিক তাদের গলির মুখটায়।

রতন চেয়ে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে।

জীবনে অত বড় গাড়ি এর আগে কখনো দেখেনি—

গাড়ি থেকে নামল প্রথমে বিরাট লম্বা চওড়া এক পুরুষ—সাদা কালোর মত ঢেউ-খেলানো বাবরি চুল—

গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি।

হাতে রূপার লাঠি।

আর তার পিছনে পিছনে নামল—ফুলের মত ত্নটি ছেলে—বয়স তাদের ৮৷৯এর মধ্যে হবে।

লাল ভেলভেটের জামা গায়ে।

২

রতন কেমন যেন অবাক্ হয়ে যায়।

সেই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটি তাদেরই দোকানের দিকে আসছে—

রতন ভাবে হয়ত তারা এদিকে কোথায়ও এসেছে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যায় যখন সেই বৃদ্ধ ছেলে দুটিকে নিয়ে তাদেরই দোকানে এসে ঢোকে।

সসম্ভ্রমে রতন উঠে দাঁড়ায়।

এলোমেলো দোকান—শূন্য সব ভাঙ্গা আলমারি—ধুলো বালি—ঝুল নোংরায় ভরতি।

খোকা মহীদাস আছে ?

বৃদ্ধ তাকেই প্রশ্নটা করে—

আজ্ঞে—

মহীদাস আছে ?

আজ্ঞে নাতো—

ছেলে দুটি তখন রতনের হাতের তৈরী প্রায় সমাপ্ত জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

একজন বলে, দাদু দেখ—দেখ কি সুন্দর জুতো—

ওদের দাদু বৃদ্ধ সে কথায় কান না দিয়ে রতনকেই আবার প্রশ্ন করে, কোথায় সে ? তাকে একবার ডাক—বল চৌধুরীমশাই এসেছেন তাঁর নাতিদের জন্য জুতোর অর্ডার দিতে—

আজ্ঞে ঠাকুরদা মশাই তো বেঁচে নেই ! রতন বলে।

বেঁচে নেই !

না—

মারা গেছে ?

আজ্ঞে—

কবে ?

তা বছর সাতেক হলো—

তুমি কে ?

তার নাতি—

হুঁ—তোমার বাবা ?

বাবার খুব অসুখ—বিছানা থেকে উঠতে পারেন না—

তা দোকানের এ হাল হোল কেন ?

রতন আর কি জবাব দেবে—চুপ করে থাকে।

চৌধুরীমশাই অতঃপর তাঁর নাতিদের দিকে ফিরে বলেন, তবে আর কি হবে দাদুভাইরা—ভেবেছিলাম তোমাদের এমন জুতো তৈরি করে দোব যে তোমাদের তাক লেগে যাবে। চল মার্কেটেই যাওয়া যাক—

একজন নাতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কেন দাদু—ঐ দেখ কি সুন্দর জুতো করছে—অমনি জুতো আমাদের করে দাও—

চৌধুরীমশাইয়েরও ইতিমধ্যে রতনের তৈরী জুতো জোড়ার 'পরে নজর পড়েছিল—তিনি রতনকে প্রশ্ন করেন, ও জুতো কে তৈরি করেছে—

আজ্ঞে বাবু মশাই আমি—

তুমি—

চৌধুরীমশাইয়ের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই। ওই রোগা পটকা ছেলেটা ঐ জুতো তৈরি করেছে—

সত্যি বলছো তুমি ?

হ্যাঁ বাবু মশাই—তারপর একটু থেমে বলে, আপনি যদি অনুমতি করেন তো খোকাবাবুদের জুতো আমি তৈরি করে দেবো—

এক নাতি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, খুব তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে কিন্তু—

অন্যজন বলে, হ্যাঁ পুজোর ছুটিতে আমরা সিমলা যাবো—ছুটির আর বার দিন মাত্র বাকী—তার মধ্যে দিতে হবে কিন্তু—

তাই দেবো—

তবু চৌধুরীমশাইয়ের যেন বিশ্বাস হয় না—মন সরে না—নাতিদের দিকে ফিরে বলেন, চল দাদুভাইরা মার্কেটে—

একজন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না—দাদু—ঐ আমাদের জুতো তৈরি করে দেবে—

অন্যজন সায় দেয়, হ্যাঁ—ঐ দেবে—তুমি পারবে না ? রতনের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে।

রতন মাথা নেড়ে নিঃশব্দে বলে, হ্যাঁ—

কি আর করেন চৌধুরীমশাই—নাতিরা যখন জিদ ধরেছে—মানবে না কিছুতেই।

বলেন রতনের দিকে চেয়ে তবে নাও ওদের পায়ের মাপ।

রতন অনেকক্ষণ ধরে যত্ন করে ওদের পায়ের মাপ নেয় কাগজের উপরে।

ছু'জনার পা-ই মোটামুটি সমান সাইজের—

একজন নাতি বলে, ঠিক সাত দিন পরে আসবো—হয়ে যাবে না জুতো ?

রতন বলে, তা হয়ত হয়ে যাবে !

ওর থেকেও সুন্দর জুতো করতে হবে কিন্তু—একজন নাতি রতন যে জুতো জোড়া প্রায় তৈরি শেষ করে এনেছে সেটা দেখায়।

তাই হবে খোকাবাবু, তোমার জুতোর নাম হীরা ওর জুতোর নাম মোতি।

জুতোর নাম হীরা মোতি ! একজন শুধায়।

হ্যাঁ—এক এক প্যাটার্নের জুতোর এক এক নাম।

ঐ যে জুতোটা তৈরি করেছো ওটার নাম ?

ওটা তো রাজা।

জুতোর নাম রাজা বাঃ বেশ নাম তো।

হ্যাঁ, পুজোর ছুটিতে আমরা সিমলা যাবো— [পৃঃ ১৯০

ছুই নাতি মহা উৎসাহে রতনের সঙ্গে গল্প শুরু করে দেয়—ওদের দাছু চৌধুরীমশাই তাড়া দেন, চল দাছুভাইরা চলো, রাত হয়ে গেল—

ছুই নাতিকে নিয়ে বৃদ্ধ চৌধুরীমশাই চলে গেলেন।

রতন অন্ধকার গলিটার দিকে তাকিয়ে থাকে—গলির গ্যাসের আলোটা কয় দিন হলো খারাপ হয়ে আছে।

● নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অন্ধকার।

গলির ঠিক মুখেই স্পষ্ট দেখা যায় আলোকিত রাজপথ।

গাড়িটা—সেই সাদা বিরাট গাড়িটা চলে গিয়েছে।

রতন—

ভিতর থেকে ওর বাপ মদন দাসের গলা শোনা গেল।

রতন—

যাই বাবা—

রতন পাশের অন্ধকার ঘরটার মধ্যে গিয়ে ঢোকে। টিমটিম করে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে ঘরটার মধ্যে।

এক কোণে চামড়ার টুকরো জমে পাহাড় হয়ে আছে।

একটা কেমন কটু গন্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাসে। এক কোণে একটা খাটিয়ার উপর মদন দাস শুয়ে।

বিছানার সঙ্গে যেন একেবারে লেগে গিয়েছে মানুষটা দীর্ঘ দিন ধরে ভুগে ভুগে আর শয্যাশায়ী থেকে থেকে।

কে এসেছিল রে—কার সঙ্গে কথা বলছিলি—

মস্ত বড় একজন খদ্দের এসেছিল বাবা।

খদ্দের।

হ্যাঁ—মনে হলো দাদুকে চিনতেন—এসেই দাদুর খোঁজ করছিলেন—

বাবার তো অনেক বড় বড় খদ্দের ছিল—

খুব লম্বা চওড়া—মাথায় সাদা বাবরি চুল—ধবধব করছে গায়ের রং—বিরাট একটা সাদা গাড়িতে করে এসেছিলেন।

ও বুঝেছি, চৌধুরীমশাই, হাতে একটা রুপার লাঠি ছিল না।

হ্যাঁ—

৩

কেন এসেছিলেন ?

দাদুর খোঁজে, জুতো তৈরি করতে দেবেন দুই নাতির জন্য—

আহা—মস্ত ধনী লোক রে রতন—ওঁকে দেখছি বরাবর দাদুর কাছে আসতেন—দাদু তখন

অথর্ব হয়ে পড়েছে—ভাল করে চোখে দেখে না—তবু চৌধুরীমশাইকে এক জোড়া জুতো তৈরি করে দিতেই হতো—জুতোর দাম যাই হোক না কেন একটা কড়কড়ে একশো টাকার নোট ফেলে দিয়ে যেতেন চৌধুরীমশাই, তারপর দাদু মরার বছর তিনেক আগে হঠাৎ আসা তাঁর বন্ধ হয়ে গেল—এতদিন পরে আবার এলেন।

মদন দাসও জানে না।

রাজনারায়ণ চৌধুরী কেন হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন রডস্ এণ্ড কোং-তে।

একমাত্র ছেলে সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে নিহত হবার পর থেকে চৌধুরীমশাই আর সাতবছর বাড়ির বাইরেই বেরোননি।

দুই নাতি—রাজীব আর সঞ্জীব আবার তাঁকে বাইরের জগতে টেনে এনেছে।

ঐ দিন দুপুরে দুই নাতির কাছে বসে বসে রডস্ এণ্ড কোং মহীদাসের গল্প করছিলেন।

রাজীব সঞ্জীব বলে ওঠে, চল দাদু আমরা ঐখান থেকেই এবারে জুতো তৈরি করাব—

বেশ তো—যাবো।

তাই এসেছিলেন রাজনারায়ণ চৌধুরী দুই নাতিকে নিয়ে রডস্ এণ্ড কোং-তে।

মদন দাস আবার প্রশ্ন করে, কি বললেন চৌধুরী মশাই রে ?

দুই নাতির জুতোর অর্ডার দিয়ে গেলেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বাবা—

খুব ভাল করে জুতো তৈরি করে দিস বাবা।

রতন কোন সাড়া দেয় না। তার মাথার মধ্যে তখন সম্পূর্ণ অন্য একটা চিন্তা ঘুরপাক করছে।

জুতো তৈরি করে দেব বলে তো সে অর্ডার নিয়ে নিল—কিন্তু ঘরে চামড়া কোথায়—হাতেও একটা পয়সা নেই।

মহাজন বদিরুদ্দীন আজকাল আর ধারে মাল দেয় না। অথচ এক সময় রডস্ এণ্ড কোং-কে হাজার টাকারও বেশী মাল ধারে দিয়েছে। কিন্তু এখন দশটাকার মাল ধারে দেবে না।

উনুন ধরিয়ে রান্নাটা চাপিয়ে দিয়ে রতন দোকানঘরে এসে বসে।

ছোট একটা দেয়াল ল্যাম্প—সেটা জ্বালাল রতন।

দু'বছরেরও বেশী হলো ইলেকট্রিক সাপ্লাই কনেকশন কেটে দিয়ে গিয়েছে ওরা বিলের টাকা দিতে পারেনি বলে।

অত বড় একটা ঘরে সামান্য ঐ আলো—আবছা আবছা একটা আলো আঁধারে ঘরটা যেন ছমছম করছে।

চামড়া—দুটো জুতোর চামড়া চাই—ঐ জুতোটা অবিশ্যি শেষ হয়ে এসেছে—

দোকানে বিক্রি করে এখন কিছু টাকা পাওয়া যাবে কিন্তু সে কটা টাকাই বা—তাতে করে দুটো জুতোর চামড়াও কেনা যাবে না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে রতন ঐ কথাই ভাবছিল—টাকা বা চামড়া কোনটাই নেই।

হঠাৎ মনে পড়লো—গলায় যে তার সোনার মাদুলিটা আছে—হাত দিয়ে দেখলো, হ্যাঁ আছে।

ঐ মাদুলিটা যদি রতন বিক্রি করে দেয়—তাহলেই তো কিছু টাকা পেয়ে যাবে হাতে, চামড়া কিনতে পারবে।

মনটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে রতনের।

ঘুমিয়ে পড়ল রতন।

পরের দিন সকালেই বৌবাজারে গিয়ে এক সেকরার দোকানে মাদুলিটা গলা থেকে খুলে বিক্রি করে দিল রতন ভিতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো একটা শিকড় বের করে নিয়ে।

মাদুলিটা বেশ বড়ই ছিল।

পঁচিশটা টাকা পাওয়া গেল।

চামড়া কিনে হাতে যা রইলো তা দিয়ে চাল ডাল কিনতে হলো কারণ ঘরে সব ফুরিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন বিকেলের দিকে বসে বসে কাজ করছিল রতন একমনে মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে।

কখন বিরাট সেই সাদা গাড়িটা রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে—ফুলের মত দুটি ভাই রাজীব সঞ্জীব গলিপথ দিয়ে হেঁটে ওর দোকানে ঢুকেছে জানতেও পারেনি।

হঠাৎ চমকে ওঠে রাজীবের গলার স্বরে, আমাদের জুতো তৈরি করছো বুঝি?

তোমরা—

হ্যাঁ—দেখতে এলাম—দু ভাই এক সঙ্গে বলে ওঠে—দাদু—আজ বের হয়নি—শরীরটা তার ভাল না, আমাদের নিয়ে সর্দারজী বেড়াতে বের হয়েছে—

আহা এ যেন গল্পে শোনা সেই দুটি পক্ষিরাজের সওয়ার রাজার কুমার।

ঘুঁটেকুড়নীর ছেলে সে তার কুড়ের সামনে এসে রথ থামিয়ে নেমেছে।

রাজীব জিজ্ঞাসা করে, কোন্ জুতোটা তৈরি করছো? হীরা না মোতি?

রতন বলে, এটা হীরা—

সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করে, আমার জুতোটা হীরা না মোতি—

তোমার মোতি—আর ওর হীরা—

দুটি ভাই দেড় বছরের ছোট বড়, কিন্তু লম্বায় দুটি ভাই যেন এক।

ড্রাইভার এসে ঐ সময় তাগিদ দেয় দু'ভাইকে—

ওরা চলে যায়।

৪

পরের দিনও আবার আসে—দুই ভাই।

তার পরের দিনও—

রতন একটু একটু করে জুতো জোড়া তৈরি করছে—দুই ভাইয়ের কি অদ্ভুত আগ্রহ—কুতূহল।

রতনের সঙ্গে দু'ভাইয়ের ভারী ভাব হয়ে গিয়েছে।

সঞ্জীব একদিন বলে, আমাকে জুতো তৈরি করা শিখিয়ে দেবে?

জুতো তৈরি—সেকি?

হ্যাঁ—

তুমি কেন জুতো তৈরি করা শিখতে যাবে—

কেন তোমার মত জুতো তৈরি করবো বসে বসে—দোকান করব একটা—

রাজীব বলে, খুব ভাল কথা বলেছিস সঞ্জীব—দাদুকে একটা দোকান করে দিতে বলব আমরা—

ওদের যেন আর সত্যিই দেরি সহ্য হচ্ছে না।

কবে জুতো শেষ হবে—

কবে জুতো ওরা পায়ে দিতে পারবে।

রতন বলে, কাল না হলেও পরশুর মধ্যে ঠিক শেষ করে দেবো—

সঞ্জীব হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, তবে তো খুব মজাই হলো—সিমলা যাবার কত আগেই পেয়ে যাবো।

অথচ ঘরে ওদের দু'ভাইয়ের তো জুতোর অভাব নেই।

জোড়ায় জোড়ায় জুতো সাজান রয়েছে।

কিন্তু সে জুতোগুলোর 'পরে যেন আর কোন আকর্ষণ নেই দু'ভাইয়ের।

ওদের সমস্ত মন পড়ে আছে রতনের হাতের তৈরী জুতো কবে ওরা পরতে পারবে।

দাদুর কাছে গল্প শোনা অবধি—ওরা দু'ভাইয়ে যেন ক্ষেপে উঠছে।

দাদু বলেছিল, জান দাদুভাই—বাবা আমাকে নিয়ে জুতোর দোকানে গেলেন—জুতো আর পছন্দ হয় না আমার—তারপর ঘুরতে ঘুরতে এক. জোড়া জুতো একটা দোকানে পছন্দ হলো কিন্তু পায়ে দিয়ে দেখি পায়ে ছোট হচ্ছে—

জিজ্ঞাসা করলাম, আর এরকম জুতো নেই—এক সাইজ বড়।

দোকানী বলে, আজ্ঞে না—ও জুতোও বেশী আসে না—তিন জোড়া আজই এনেছিলাম। দু জোড়া বিক্রি হয়ে গেছে ঐ এক জোড়া পড়ে আছে—

এখানকার তৈরী জুতো—

হ্যাঁ—রুইদাসের ছেলে মহীদাসের তৈরী জুতো—

কোথায় তার দোকান?

দোকানী ঠিকানা বলে দিল।

চলে গেলাম সেখানে।

মহীদাসেরও তখন বয়স হয়েছে—ষাট পেরিয়ে গিয়েছে—

সেই মহীদাসকে প্রথম দেখি—চোখে পুরু কাচের চশমা—এক মাথা সাদা চুল, হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ঝুঁকে পড়ে দুহাতে একটা জুতো সেলাই করছিল—

সব কথা শুনে মহীদাস অর্ডার নিল।

বার দিনের দিন জুতো দিল—

তারপর আরো কুড়ি বছর ওর কাছেই জুতো তৈরি করিয়েছি। ভীষণ থুরথুরে বুড়ো হয়ে গিয়েছিল—

চোখে ছানি পড়েছে—হাত কাঁপে।

তবু জুতো তৈরি করত। আট দশ বছর যাই না—বেঁচে হয় তো নেই লোকটা—

তবু রাজনারায়ণ চৌধুরী নাতিদের নিয়ে রডস্-এ গিয়েছিলেন।

জুতোর অর্ডার দিয়ে এলেন বটে—তবে নেহাত অনিচ্ছার সঙ্গেই।

রতন বলেছে যে কাল না হয় পরশু জুতো পেয়ে যাবেই ওরা।

পরের দিন বেরুন হলো না—

সর্দারজীটার আবার অসুখ করেছে—

গাড়ি না হলে বেরুবে কি করে ওরা। সমস্ত দিন ও সন্ধ্যাটা ছটফট করে। রাত গিয়ে সকাল হয়। জুতো নিশ্চয়ই তৈরী হয়ে গিয়েছে—

অথচ সেদিনও বেরুন হবে না। সর্দারজীর জ্বর।

দাদুরও জ্বরটা ছাড়েনি এখনো।

দু'ভাইয়ে পরামর্শ করে—হেঁটেই ওরা চলে যাবে রতনের দোকানে।

কত দিন তো রতনের দোকানে ওরা গিয়েছে—ঠিক ওরা চিনে চলে যেতে পারবে, উড্‌বার্ণ স্ট্রীট থেকে কত টুকুই বা পথ।

গাড়িতে চেপে তো হুস করে ওরা চলে যায়।

দুই ভাই চুপি চুপি দ্বিপ্রহরে বের হয়ে পড়ল। ফুটপাত ধরেই ওরা চলে—অনেকটা আসবার পর পার্ক স্ট্রীটটা এবারে হেঁটে পার হতে হবে—বড় রাস্তাটা। অনবরত গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে—এক মুহূর্ত যেন গাড়ি চলার থামা নেই।

ঝাঁ ঝাঁ করছে প্রচণ্ড রোদ।

দু'ভাই হাত ধরাধরি করে রাস্তায় নামল—

প্রায় পার হয়ে এসেছিলও রাস্তাটা হঠাৎ বাঁ পাশ থেকে টার্ন নিয়ে এলো একটা বড় ট্রাক। রাজীব পার হয়ে গেল বটে রাস্তাটা কিন্তু সঞ্জীব চলমান গাড়ির বাম্পারে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে একেবারে দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

হইহই করে উঠলো সবাই—

চলমান গাড়ির স্রোত হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়াল। একজন পথচারী ছুটে এসে রক্তাক্ত অচেতন সঞ্জীবকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এলো পাশের একটা দোকানের মধ্যে।

ভিড় জমে গেল।

কিন্তু বুঝতে কষ্ট হলো না কারো সঞ্জীবের প্রাণটা বের হয়ে গিয়েছে তখন।

রাজীব ছুটে এসে ভাইয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সঞ্জী—সঞ্জী—
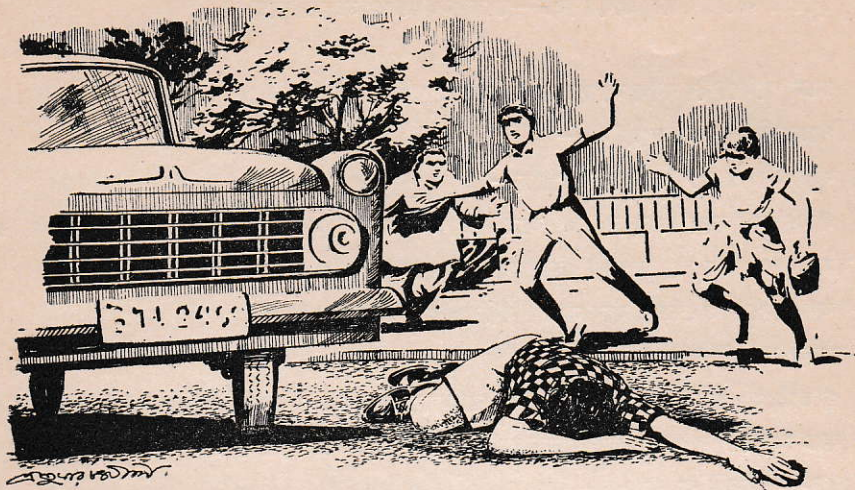
প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। [পৃঃ ১৯৭

রাজীবের কাছেই ওদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করে এক ভদ্রলোক ছুটে গেলেন ট্যাক্সিতে করে রাজীবকে নিয়ে।

বেচারী রতন।

কিছুই জানে না।

সেদিন যে রাজীব বা সঞ্জীব এলো না সে কথাটা একবার তার মনেও হলো না।

সে একমনে সেলাই করে চলেছে জুতো জোড়া।

সামান্যই কাজ আর বাকী আছে।

রাতটা জাগতে পারলে হয়ত কাজটা ও শেষ করে ফেলতে পারবে।

সারাটা রাত জেগে রতন সেলাই করে।

ভোর হয়ে আসে এক সময়—জুতো দুটো শেষ হয়েছে।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে জুতো জোড়া রতন। বাঃ ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে।

রাজকুমারদের নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

আনন্দে তার চোখের তারা দুটো চকচক করতে থাকে।

তার পরিশ্রম সফল হয়েছে।

চৌধুরীমশাই নিশ্চয়ই দু জোড়া জুতোর জন্য তাকে খুশী হয়ে অনেক টাকা দেবেন।

কত দিতে পারেন—বিশ—পঁচিশ—পঞ্চাশ—একশ—একশও তো খুশী হয়ে দিতে পারেন।

রাজা মানুষ—ওদের টাকার অভাব কি।

একশোটা টাকা তো ওদের কাছে কিছুই না।

কিন্তু একটা দুটো করে দশটা দিন কেটে গেল—কেউ জুতো নিতে এলো না।

না চৌধুরীমশাই—না সেই রাজকুমাররা—না সেই বিরাট সাদা রঙের গাড়িটা।

রোজ সকালে বিকালে—পরনের ছেঁড়া ধুতিটা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে জুতো জোড়া রতন।

কিন্তু কেউ আসে না।

রতন রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে।

জুতো নিতে ওরা আসছে না কেন! বলেছিল পুজোর ছুটির আগে ওরা সিমলা যাবে।

জুতোর কথা কি ভুলে গেল!

জুতো না নিয়েই সিমলা চলে গেল!

ঠিকানাও তো ওদের জানে না—

কোথায় ওদের বাড়ি কিছুই জানে না রতন। জুতো জোড়া নিয়ে যে নিজেই যাবে তারও উপায় নেই।

কোন কাজ করতেও ভাল লাগে না।

জুতো জোড়া সামনে রেখে চুপটি করে বসে থাকে আর ক্ষণে ক্ষণে রাস্তার দিকে তাকায়। যদি সেই বিরাট সাদা গাড়িটা দেখা যায়—যদি সেই সৌম্যদর্শন চৌধুরীমশাই বা রাজকুমারদের দেখা যায়।

কিন্তু মিথ্যা আশা।

কেউ আসে না।

রাজীব বলেছিল—বিরাট লাল বাড়ি তাদের—

মস্ত বড় লোহার গেট।

গেটের গায়ে কালো পাথরের বুকে সোনালী অক্ষরে লেখা স্বপ্ন মঞ্জিল।

খুঁজে কি বের করতে পারবে না রতন। খুব পারবে।

রতন একদিন নেকড়ায় বেশ করে জড়িয়ে জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে স্বপ্ন মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে বের হলো।

মস্ত বড় লাল বাড়ি।

লোহার গেট।

কালো পাথরে সোনার অক্ষরে লেখা স্বপ্ন মঞ্জিল।

৫

এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা সারাটা দুপুর ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় রতন।

মস্ত বড় লাল বাড়ি।

লোহার ফটক।

কালো পাথরের উপরে লেখা সোনার জলে স্বপ্ন মঞ্জিল।

কিন্তু খুঁজে পায় না রতন শহরে সে বাড়ি।

ফিরে আসে—আবার পরের দিন জুতো নিয়ে বের হয়।

দিনের পর দিন ঐ এক কাজ।

বাপ জিজ্ঞাসা করে সারা দুপুর কোথায় থাকিস রে রতন।

রতন আগেই বাপকে জিজ্ঞাসা করেছিল চৌধুরীমশাইয়ের বাড়ি সে চেনে কিনা—কিন্তু মদন দাস জবাব দিয়েছিল সে জানে না।

রতন তাই বাপের কথার কোন জবাব দেয় না।

চুপ করে থাকে।

এদিকে অর্থের অভাবে সংসারে নিদারুণ দৈন্য দেখা দেয়।

হাতে একটা পয়সা নেই—

মার্কেটের এক দোকানদার মধ্যে মধ্যে এসে রতনের হাতের তৈরী জুতো কিনে নিয়ে যেত—সে একদিন দুপুরে এসে হাজির হয়।

তার চোখে পড়ে ঐ জুতো জোড়া।

বাঃ বেশ হয়েছে তো জুতো জোড়া—দে ও দুটো—

রতন বলে, না—

কেন রে! বিক্রি করবি না?

না।

বেশ তো কত চাস বল না।

বললাম তো বিক্রি করবো না—বিক্রির জন্য ও জুতো নয়।

তবে—

ও একজনদের অর্ডার আছে—

ওঃ তাই বল—

দোকানদার চলে গেল।

রতন বসে থাকে।

এক মাস হয়ে গেল—এখনো তারা এলো না, কিন্তু তবু রতনের বিশ্বাস তারা আসবে—একদিন নিশ্চয়ই আসবে—সেই ফুলের মত ছেলে দুটি।

এসে বলবে, কই দাও জুতো—

আনন্দে খুশিতে নিশ্চয়ই চোখের মণি দুটো তাদের উজ্জল হয়ে উঠবে।

রুইদাস দোকানঘরটা একদিন কিনে নিয়েছিল।

অনন্যোপায় মদন দাস অবশেষে একদিন স্থির করে দোকানঘরটা বিক্রি করে দেবে।

রতন বলে, না বাবা দোকান বিক্রি করো না।

করবো না তো খাবো কি! দিনের পর দিন উপোস করে থাকবো—

মদন দাস ছেলের কথা শুনল না—দোকান বিক্রি করে দিল।

যেদিন নতুন মালিক দোকানঘরের দখল নিতে এলো—সেদিন সকাল থেকেই আর রতনকে দেখা গেল না।

তারপর আরো অনেক বছর গড়িয়ে গিয়েছে।

এক তরুণ মুচি তার ঝোলা নিয়ে পথে পথে শহরে ঘুরে বেড়ায়—জুতো সেলাই—জুতো সেলাই—

বাড়ি বাড়ি জুতো সেলাই করে বেড়ায় সে।

তার ঝোলার মধ্যে সে জুতো জোড়া এখনো আছে।

শখ করে যে জুতোর নাম দিয়েছিল সে হীরা মোতি।

আর খুঁজে বেড়ায় সেই লাল বাড়ি, লোহার গেট—গেটের গায়ে কালো পাথরে নাম লেখা সোনার অক্ষরে স্বপ্ন মঞ্জিল!

———

পিণ্টুর চশমা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পিণ্টু তাড়াতাড়ি এসে বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো, মাকে জানিয়ে দিল যে তার পেট কামড়াচ্ছে, আজ সে ইস্কুলে যাবে না। অনেক রকম রোগের পরীক্ষা করে সে আবিষ্কার করেছে যে ইস্কুলের হাত থেকে বাঁচতে হলে ঐ রোগটার আশ্রয় নেওয়াই সবচেয়ে সুবিধা, ধরা পড়বার ভয় নেই। আগে দু'একবার জ্বর বলে ইস্কুলে যাওয়া থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করেছিল, ধরা পড়ে গিয়েছে। মা এসে গায়ে হাত দিয়ে বলেছিলেন কই গা যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দেখছি। দাদা এসে বগলে থার্মোমিটার লাগিয়ে বললেন, কোথায় জ্বর, দিব্বি নরম্যাল, নাও ওঠো, এই বলে কান মলে টেনে তুলে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবারে তাই তার পেট কামড়াচ্ছে। ও রোগ তো থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না। সে ভাবলো দিক না দাদা থার্মোমিটার। মনে মনে খুব এক চোট হেসে নিল।

দাদা বললেন, ওর দুপুরে খাওয়া বন্ধ।

মা বললেন, একেবারে বন্ধ হবে কেন? দই দিয়ে ভাত খাবে এখন।

দাদা বললেন, না, এ বেলা উপোস করুক, ও বেলা যা হয় খাবে।

পিণ্টু জানতো যে খাওয়া বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে তবে ভরসার মধ্যে এই যে নীচের তলায় ঘরের মধ্যে অনেকগুলো আম আছে। দাদারা ইস্কুল কলেজে গেলে, মা দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়লে তারই গোটাকতক কাজে লাগবে। কাজেই সে আপত্তি করলো না, যেমন ছিল শুয়ে রইলো। তারপরে দুপুরবেলা বাড়ি নিঝুম হয়ে গেলে আস্তে আস্তে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলমারিতে বইয়ের থাকের পিছন থেকে কাগজে মোড়া একটা বস্তু বের করে আনলো। এটার জন্যেই এত আয়োজন, এত ষড়যন্ত্র, এত পেটের কামড় আর উপবাসের আশঙ্কা।

জানলার কাছে বসে পিণ্টু অতিশয় সন্তর্পণে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলতেই বের হয়ে এলো পুরু কাচের পরকলা-ওলা একটা পুরাতন চশমা। সে দেখলো চশমার কাচ দু'খানা যেমন পুরু, ফ্রেম আর ডাণ্ডি দু'খানা তেমনি জীর্ণ, ভয় হয় কখন বা ভেঙ্গে যায়, খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে।

পিণ্টুদের বাড়ির নীচের তলায় একটা বন্ধ ঘর ছিল। ঘরটা বরাবর বন্ধ থাকে, দু'একবার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছে সে অন্ধকারের মধ্যে ; অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু দেখা যায়, যত রাজ্যের ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল, আয়না আলমারি, যত রাজ্যের সব বাজে জিনিস স্তূপীকৃত। ঐ ঘরটাতে ঢুকে তার রহস্য আবিষ্কার করতে তার বড় লোভ। কিন্তু একেবারেই নিরুপায়। তার চাবিটা যে কোথায় বোধ করি কেউ জানে না। দু'একবার মাকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছে ও ঘরে ঢুকে কি করবি, সাপ বিছে কত কি আছে তার ঠিক নেই।

সে ভেবেছে বাড়িতে নাকি সাপ থাকে! আর বিছে যদি দু'একটা থাকে তো কি হয়েছে, হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকলেই হবে। কত বিছে সে মেরেছে! কিন্তু চাবিটা পাওয়ার উপায় কি, চাবিটা আগে খুঁজে বের করা দরকার। সকলের অগোচরে আনাচে-কানাচে খুঁজেছে, চাবি পায়নি। অবশেষে একদিন মায়ের শোবার ঘরের আলমারির উপরে এক গোছা চাবি দেখতে পেলো। এ সব চাবি কেউ যে কখনো

ব্যবহার করেছে মনে হয় না। সংখ্যায় যেমন অনেক তেমনি পুরানো, অনেক-গুলোতে মরচে পড়ে গিয়েছে। নিশ্চয় এর মধ্যেই আছে ঐ ঘরটার চাবি। চাবির গোছাটা সরিয়ে নিয়ে সে লুকিয়ে রাখলো, সুযোগমতো পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সংসারে সুযোগ জিনিসটা সুলভ নয়। পিন্টুর আর সুযোগ মেলে না। অবশেষে আজ সকালবেলা সেই দুর্লভ সুযোগ মিলে গেল।

দাদাকে নিয়ে মা কালীঘাটে গেলেন সকালে। বাবা দোতলায় খবরের কাগজ পাঠে মগ্ন। তাঁর অভ্যাস জানা আছে পিন্টুর, তিনি দশটার এক মিনিট আগে উঠবেন না। কাজেই তার অখণ্ড অবসর, চাবির গোছা নিয়ে সে নেমে এল। যেমন মরচে পড়া চাবি, তেমনি মরচে পড়া তালা। কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা যদি বা ঢোকে কিন্তু পাক খায় না। এদিকে সময় সংকীর্ণ। শেষে অনেক চেষ্টার পরে একটা চাবি লাগসই মতো লেগে গেল এবং খট খট খটাস করে তালা খুলে দরজা অবারিত হল।

পিন্টু ঘরে ঢুকে একটা জানলা খুলে দিল, এবারে বেশ আলো হয়েছে। প্রথমটা কিছুক্ষণ সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপরে ঘরের ক্ষীণ আলোয় আর চোখের তেজে আপোস হয়ে গেলে সমস্তটা তার চোখে পড়লো। বাস্‌রে, একে কি গেরস্তবাড়ির ঘর বলে, এ যে পুরানো জিনিসপত্রের গোরস্থান। সেই আলো-আঁধারি ঘর, সেই পুরানো আমলের জিনিসপত্র, সেই গভীর নিস্তব্ধতা, সবসুদ্ধ মিলে গা-ছমছম করা আবহাওয়া। ভয় তাকে টানছে পিছনের দিকে, কৌতূহল রেখেছে দাঁড় করিয়ে, সে স্থির করতে পারে না, পালাবে না থাকবে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হল, না সে পালাবে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও তো আসেনি। তাই অনুসন্ধান কার্যে লেগে গেল, দেখাই যাক না কোথায় কী আছে।

একদিকে বড় বড় তিন চারটে বাক্স, একটা কাঠের, আর গোটা তিনেক স্টীলের। না, ওগুলো খুলতে গেলে সময়ে কুলোবে না। সামনেই দেখতে পেলো একটা টেবিল, তার দেরাজটা একটুখানি ফাঁক। বেশ হয়েছে, চাবি খুঁজে বের করবার দরকার নাই। টান দিতেই দেরাজটা খুলে এলো আর সেই সঙ্গে

বেরিয়ে পড়লো একরাশ আরসলা আর গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর। প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল। আরও খানিকটা ফাঁক করে দেখতে চেষ্টা করলো কী আছে ভিতরে। একরাশ তাড়া-বাঁধা কাগজ, কতক ছাপা, কতক হাতে লেখা। যত সব বাজে জিনিস। আর কিছুই চোখে পড়লো না। যখন দেরাজ বন্ধ করতে যাবে, চোখে পড়লো এক কোণে কী একটা বস্তু। টেনে বের করে নিয়ে এসে দেখলো পুরু পরকলা-ওলা এক জোড়া চশমা।

বেরিয়ে পড়লো একরাশ আরসলা আর গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর।

চশমার উপরে পিণ্টুর অনেক দিনের লোভ। একবার বাবার চশমা চোখে দিয়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল বাঃ এ-ও তো মন্দ মজা নয়, সব এক মুহূর্তে কেমন ঝাপসা হয়ে এলো, যেন মেঘলা দিনের আকাশ, মনের মধ্যে Rainy day-র স্মৃতি জেগে ওঠায় ভারী আনন্দ লাভ করলো। সে স্থির করে ফেললো বড় হওয়া মাত্র এক জোড়া চশমা কিনে চোখে দেবে আর চিরন্তন Rainy day-র ছুটির আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতে থাকবে। দেখলো বাবার চশমার কাচের তুলনায় এর কাচ দুটো অনেক মোটা, না জানি এ দিয়ে দেখলে পৃথিবী আরও কত সুন্দর মনে হবে। খুব সম্ভব সে পৃথিবীতে ইস্কুল নেই, ডাক্তারের ওষুধ নেই, কান মলে-দেওয়া দাদা নেই। চমৎকার! চমৎকার! সে তাড়াতাড়ি

চশমা জোড়া কাগজে জড়িয়ে পকেটে ফেললো, আর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজায় দাদার গলার আওয়াজ শুনতে পেলো, দাদা আর মা কালীঘাট থেকে ফিরেছেন! আর কিছুক্ষণ দেরি হলেই ধরা পড়েছিল আর কি।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাগজের মোড়ক খুলে বার করলো চশমা জোড়া, তারপরে চোখে লাগালো। অমনি মেঘলা ছায়ার বদলে সমস্ত ঝাপসা হয়ে গেল, যেন কুয়াশার মধ্যে পড়েছে পিণ্টু। একি হল, কিচ্ছু যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। চশমা জোড়া যখন খুলবে ভাবছে তখন ধীরে ধীরে কুয়াশা ফিকে হয়ে এলো। ক্রমে ঘরের জিনিসপত্র আবছা ভাবে দেখা দিতে লাগলো। ঐ যে টেবিলটা, ঐ যে জানলা দুটো, সমস্তই ঠিক আছে তবে যেন কতদূরে গিয়ে পড়েছে। দূরত্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্যে উঠে জানলার কাছে গিয়ে হাত বাড়ালো, না, সেটা ঠিক জায়গাতেই আছে অথচ মনে হয় কতদূরে। এ তো ভারী মজা। সে আবার এসে শুয়ে পড়ে ছাদের দিকে তাকালো, ইস্, ছাদটা কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। মশারির ডাণ্ডি খুলে ছাদে ঠেকালো, না, ছাদটা ঠিক জায়গাতেই আছে। আগেও এ ভাবে পরীক্ষা করেছে তবু কত উঁচুতে। সে যখন আর একবার ঘরের চারদিকটা দেখবার আশায় তাকালো, দেখলো, একি এ বুড়ো লোকটা কোথা থেকে এলো। এক মুখ পাকা দাড়ি, গায়ে বালাপোশ, হাতে একখানা রুপো-বাঁধানো লাঠি। এ কে? কোথা থেকে এলো লোকটা, চেনা-চেনা তবু অজানা। ব্যাপার কি? সে তাড়াতাড়ি চশমা খুলে ফেললো। কোথাও কিছু নেই, না কুয়াশা, না সেই বুড়োটা। নিশ্চয় ভুল দেখছিল ভেবে আবার চশমা পরলো পিণ্টু, অমনি দেখা দিল কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে সেই বুড়োটা—এ ভারী মজা তো।

বলা বাহুল্য তার আদৌ ভয় করছিল না। সে ভাবলো বুড়োর সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু বুড়োটাই আগে কথা বলল।

খোকা আমার চশমা জোড়া দাও।

বারে, এ যে আমার চশমা।

তোমার কি চোখ খারাপ যে তোমার চশমা হবে! ছেলেমানুষের কি চশমা লাগে?

কেন, আমাদের জগন্নুর চোখে ইয়া মোটা চশমা।

জগন্নুকে আমি চিনিনে।

সে তো ঐ পাশের বাড়িতে থাকে, আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে।

তা পড়ুক। চশমা জোড়া আমার।

সে কথা পরে হবে। আগে বলো তুমি কে? কোথা থেকে এলে?

বুড়ো বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? ভালো করে দেখো দেখি।

পিণ্টু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, একি তোমাকে তো বাবার ঘরের সেই মস্ত ছবিখানার বুড়ো বলে মনে হচ্ছে।

তাহলে এবারে চিনতে পারছ।

পিণ্টু বলল, তা তুমি ছবি থেকে নেমে এলে কেন?

ঐ চশমা জোড়ার খোঁজে।

কিন্তু ছবি থেকে নেমে এলে কি করে?

কেন? তুমি কি ছাদ থেকে নামো না, সেই যে সেদিন আলমারির মাথায় উঠেছিলে নামলে কি করে?

পা দিয়ে।

আমারও পা আছে।

এ তো কখনো শুনিনি যে ছবি থেকে মানুষ নেমে আসে।

গরজ থাকলেই নেমে আসে।

তোমার আবার কি গরজ?

গরজ ঐ চশমা জোড়ার। দেখছ না খালি চোখ।

পিণ্টু বলল, না আমি দেব না। এ আমি খুঁজে পেয়েছি।

খুঁজে পেয়েছ ভালই, এবারে যার চশমা তাকে দিয়ে দাও।

তার আগে বলো তুমি কে?

● শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কেন, তোমার বাবার কাছে কখনো শোননি, আমি তোমার ঠাকুরদাদা।

শুনেছি বটে, কিন্তু ছবি থেকে মানুষ নেমে এসে কথা বলে, চশমা দাবি করে এমন তো কখনো শুনিনি।

শোনবার দরকার কি? চোখে তো দেখলে, লক্ষী দাদু, এবারে চশমা জোড়া দাও। চশমার অভাবে তোমাদের ভালো করে দেখতে পাই না।

তুমি আবার দেখবে কি?

কেন দেখবো না। আমি ছবিতে আছি বলেই কি ঘরে নেই? আমি সব শুনি, সব দেখবার চেষ্টা করি, তবে চশমা না থাকায় ভালো করে দেখতে পাই না।

পিন্টু ভাবে লোকটা বলে কি?

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? সেই যে সেদিন বাবার ঘরে বসে গান করছিলে, আর লুকিয়ে ছবির বইখানা নিতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

তবে তো বেশ দেখতে পাও।

দেখতে পাইনি, তোমার কান্না শুনে বুঝতে পেরেছিলাম।

তা তোমার চশমা গেল কোথায়?

তা জানো না বুঝি। যে লোকটা ছবিতে আমাকে এঁকেছে চশমা দিতে সে ভুলে গিয়েছে।

ভুলল কেন?

সে কথা আমি জানবো কি করে? যাই হোক আর সবুর করতে পারি না, এখন চশমা পেলে ফিরে যাই।

কোথায় যাবে?

ঐ ছবির মধ্যে।

এখন সেখানে কি আছে?

কিচ্ছু না, শুধু ফ্রেমখানা আছে, এখনি গিয়ে আবার বসতে হবে।

তুমি ওখানে একলা চুপ করে বসে থাকো কি করে?

একলা থাকবো কেন? এই তো তোমরা চারদিকে আছ। আর চুপ করে? বুড়ো মানুষ কি ছটফট করে ঘুরে বেড়াবে?
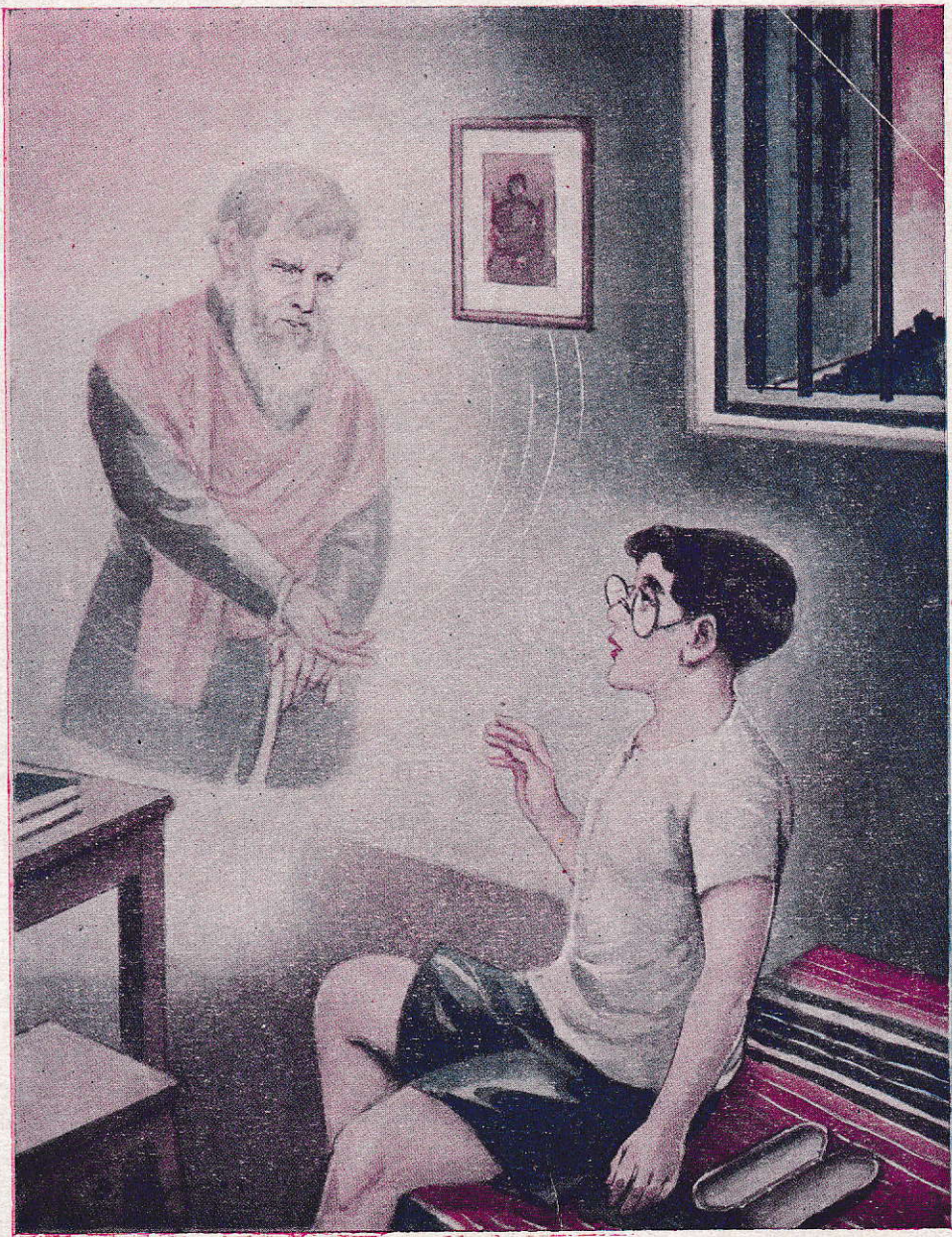
খোকা আমার চশমা জোড়া দাও

(পিন্টুর চশমা···পৃঃ ২০৬)

বাবার কাছে শুনেছি তুমি অনেক কাল আগে মরে গিয়েছ।

ঠিক শুনেছ, মরে গিয়েছি বই কি, তা বছর পঞ্চাশেক হবে।

তা আবার এলে কি করে?

কেন আসবো না? মরে গেলেই কি সব ফুরোয়? সমস্তই তেমনি থাকে, কেবল তোমরা চোখে দেখতে পাও না।

আর তুমি?

আমিও দেখতে পাই না, ঐ চশমার অভাবে। দাও, দাদু, শীগ্‌গির দাও, এখনি ছবিতে ফিরে যেতে হবে। নইলে তোমার বাবা আফিস থেকে ফিরে এসে খালি ফ্রেম দেখে অবাক্ হয়ে যাবেন।

ভালো করে দেখবার আশায় পিণ্টু চশমা জোড়া খুলতেই দেখলো, কোথাও কেউ নেই, শূন্য ঘরে সে একা শুয়ে আছে। ভাবলো জেগে জেগে কি স্বপ্ন দেখছিল নাকি? তার মনে হল একবার গিয়ে দেখে আসলে মন্দ হয় না, ছবিখানায় কি আছে মানুষ না খালি ফ্রেম। সে এক দৌড়ে বাবার ঘরে গিয়ে দেখলো খাটের উপরে মা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন আর ছবিখানা দিব্বি মানুষসুদ্ধ আগের মতোই বিরাজ করছে। তার ধারণা হল আজ সারাদিন উপোসের ফলে মাথা ঘুরে গিয়ে কত কি দেখছে, কত কি শুনছে। ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নাকে চশমা লাগালো।

কি দেখে এলে ছবিতে আমি বসে আছি। আরে আমিও যে তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ছবিতে অধিষ্ঠান হয়েছিলাম। দেখলে তো ছবিতে চশমা নেই।

না সেটা লক্ষ্য করিনি।

করবে কি করে নেই যে! দাও বুড়ো মানুষের চশমা দাও, আর রাগিও না বলছি।

না দিলে কি তুমি কেড়ে নেবে নাকি?

যখন দিচ্ছ না কেড়ে নিতে হবে বই কি।

এই বলে বুড়ো পিণ্টুর চোখ থেকে একটানে চশমাটা খুলে নিল।

চশমা যাওয়ামাত্র পিণ্টু দেখলো যেমন ঘর তেমনি আছে, কোথাও কেউ নেই।

● শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হাঁ করে কি দেখছিস ?

বুড়োটা গেল কোথায় ভেবে পিণ্টু ঘরের আনাচে-কানাচে তক্তপোশের তলে, টেবিলের পিছনে খুঁজলো, না কেউ কোথাও নেই, দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি আছে, তবে গেল কোথায় দিয়ে !
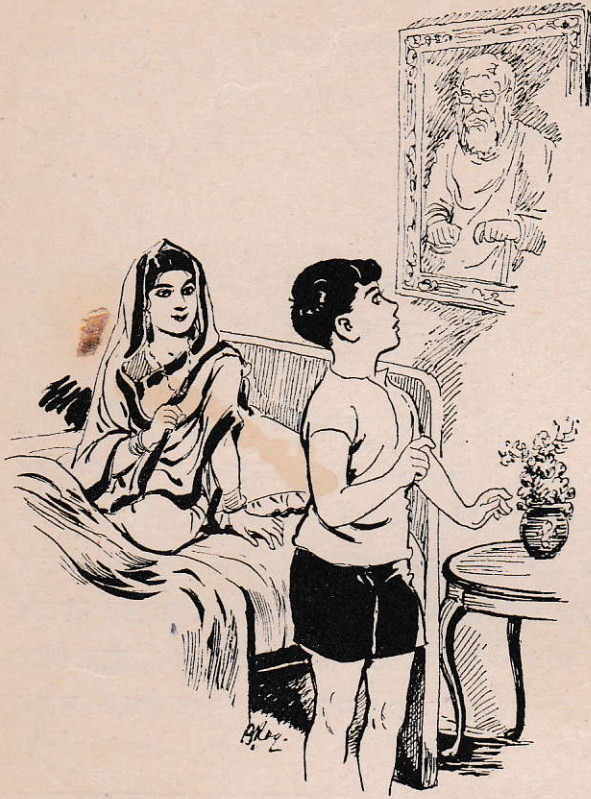
তখন তার মনে হল একবার দেখে আসলে হয় ছবির চোখে চশমা আছে কিনা। এক দৌড়ে সে বাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ছবির দিকে তাকালো। কি আশ্চর্য, ছবির চোখে দিব্বি চশমা, অথচ এই কিছুক্ষণ আগে দেখে গিয়েছে চশমা ছিল না। সে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময়ে মা জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ করে কি দেখছিস ?

দেখেছ মা ছবির চোখে চশমা।

ও আর দেখব কি, চশমা তো বরাবর আছে।

না মা আগে ছিল না।

এমন সময়ে কলেজ থেকে ফিরে পিণ্টুর দাদা ঘরে প্রবেশ করলেন, বললেন, ব্যাপার কি ?

শোন না ছেলের কথা ; বলছে কি না, ছবির চোখে- আগে চশমা ছিল না, এখন নাকি নতুন হয়েছে।

দাদা বললেন, তবে ওর পেট খারাপ হয়নি, চোখ খারাপ হয়েছে দেখছি।

পিণ্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, না কখ্খনো চোখ খারাপ হয়নি।

তবে মাথা খারাপ হয়েছে, সে তো আরও বিপদের কথা দেখছি।

মা বললেন, সারা দিন না খেয়ে মাথাটা ঘুরছে। চল্, দই দিয়ে ভাত খাবি। এই বলে তিনি পিণ্টুকে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

দই দিয়ে ভাত খেয়ে পিণ্টু সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু চশমার রহস্যের কিছুতেই সমাধান হল না। কাউকে সব খুলে বলতে পারে না, বলতে গেলে নিজের অনেক কীর্তি বলতে হয়, তাতে দাদার কাছে মার খাওয়ার আশঙ্কা। তা ছাড়া বিশ্বাসই বা করবে কে ? সকলেই বলছে বরাবর চশমা আছে, সে একা উলটো বললে চলবে কেন! তারপরে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, আজও তার মনে সে রহস্যের কিনারা মেলেনি। এখনো সে একা হলেই বসে ভাবে যে চশমা ছিল না তা হঠাৎ এলো কি করে ?

● **বাঁদর বন্ধু**

হাড়গোড়ের বিভীষিকা
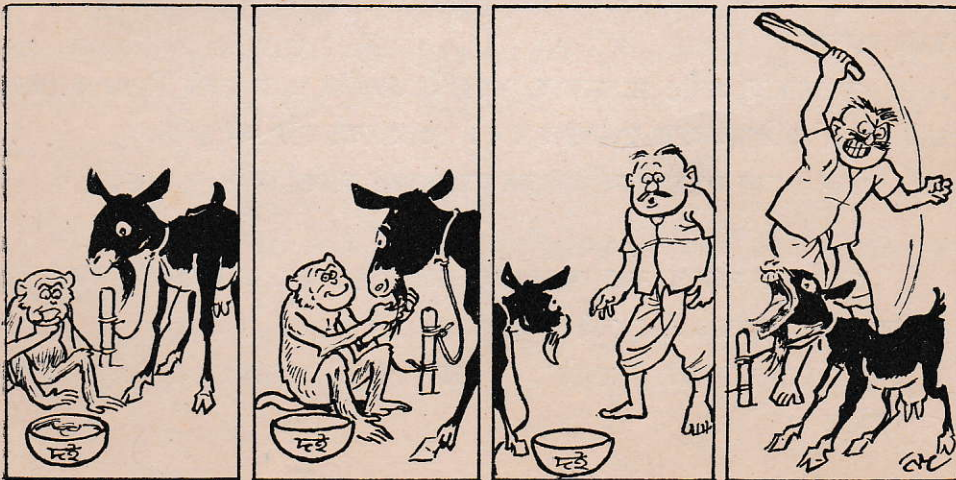
বীরু চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাটা ঘটেছিল বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভা বা যবদ্বীপে।

কাহিনীটি একদিকে যেমন অসাধারণ, অপর দিকে তেমনি চরম রোমাঞ্চকর।

যবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ব্যাণ্টাম নামে একটি প্রদেশ আছে। তারই গভীর অরণ্যাঞ্চলে, বহুকাল পূর্বে, এক রবার বাগানে ঘটেছিল এই নিম্নোক্ত কাহিনীটি।

একজন তরুণ ইংরেজ, একদা সহকারী ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিল সেই রবার বাগানে।

সেখানকার প্রবীণ ম্যানেজার, সহকারী তরুণটির ওপর একটি বিশেষ কাজের ভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে স্থানান্তরে যান। তারপরেই ঘটে সেই দুর্ঘটনা।

উক্ত ইংরেজ সহকারী অফিসারের জবানিতেই কাহিনীটি শোনা যাক ঃ

যে অদ্ভুত ঘটনার কথা আজ বলব তা কিন্তু নির্জলা সত্য ঘটনা। কল্পনা বা অতিরঞ্জনের লেশমাত্রও এতে নেই।

ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটেছিল, বলতে গেলে, আমারই একগুঁয়েমি এবং বোকামিতে।

সবে তখন আমি এদেশে এসেছি। রক্ত গরম। নেটিভদের সম্বন্ধে তখনও ভদ্র বা ভালো কোন ধারণা জন্মায়নি। দেশে থাকতে বিশ্বাস ছিল যে এতদ্দেশীয় মানুষ জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে কিছু উঁচু পর্যায়ের জীব মাত্র। সেই ভ্রান্ত ধারণার রেশ তখনও মনের মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করে ছিল।

পরে অবশ্য এই পীতাভ মানুষদের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের ধারণা পুরোপুরিই পালটে গিয়েছে।

সে যাই হোক, আমি যখন শহর বন্দর থেকে বহুদূরে অবস্থিত, গভীর অরণ্য-প্রদেশের মধ্যে রবার বাগানে এসে কার্যে যোগদান করলাম সে সময় আমার 'বস্' (উপরওয়ালা) কিছুদিনের জন্যে রাজধানীতে ছুটি উপভোগ করতে যাবার মুখে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে যান।

কাজটি হল, এই রবার বাগান সংলগ্ন অরণ্যের বিশেষ কয়েক বিঘা জমি, নতুন রবার বাগান করবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল-সাফ করিয়ে রাখতে হবে।

অবিলম্বেই কুলী নিয়ে জঙ্গল সাফ করবার কাজ শুরু হয়ে গেল। আমি নিজে অকুস্থলে উপস্থিত থেকে কার্য তদারক করছিলাম।

কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। জঙ্গল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছপালা সাফ হয়ে পরিষ্কার প্রান্তর ফুটে উঠছিল।

কিন্তু সহসা একদিন আমি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।

ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় যখন সাফ করতে করতে এগিয়ে যাওয়া হয়েছে, এমন সময় অকস্মাৎ দেখলাম, বলা নেই কওয়া নেই কুলীরা কাজে ভীষণভাবে ঢিলে দিয়েছে। অলস হয়ে কাজ ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। রোল-কলের সময়েও অনেক কুলী বে-পাত্তা হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারখানা কি!

প্রথমটা মনে হল আমি নতুন আর অনভিজ্ঞ মানুষ ভেবে কুলীরা ইচ্ছে করেই ফাঁকি শুরু করেছে।

একথা মনে হতে ভীষণ রাগ হল। আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। ক্রুদ্ধভাবে প্রায় জোর করে, কখনো মিষ্টি কথায়, কখনো তর্জনগর্জনে ভয় দেখিয়ে ওদের পুরোমাত্রায়

● বীরু চট্টোপাধ্যায়

কাজ করে যেতে বাধ্য করলাম। অবশ্য আমি নিজে যতক্ষণ কার্যস্থলে উপস্থিত থাকতাম, ততক্ষণই কুলীরা কাজ করত কিন্তু আমি অন্য কাজে অন্যত্র গেলেই যথারীতি কাজ বন্ধ হয়ে যেত।

কয়েকদিন এ ধরনের ফাঁকিবাজি কোনমতে সহ্য করে অবশেষে একদিন 'ম্যাণ্ডুর'কে (ওভারসিয়ার-সর্দার) ডেকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারখানা কি বল তো ?

সঙ্গে সঙ্গে একথার কোন জবাব দিল না ম্যাণ্ডুর। বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে বিরস বদনে তাকিয়ে রইল, হয়ত উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না।

পরে সহসা সাহস সঞ্চয় করে মুখ তুলে চাইল এবং নিম্নোক্ত কাহিনীটি কারণ হিসেবে বিবৃত করল।

যে পাহাড়ে আমাদের কাজ হচ্ছে ওটার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ ধারণা রয়েছে এখানকার মানুষদের। কেন ? এ পাহাড়ে-জঙ্গল নাকি ভুতুড়ে। রাতদুপুরে এ জঙ্গলে স্থানীয় লোকেরা অদ্ভুত ধরনের আলো-আগুন জ্বলতে নিবতে দেখেছে।

ভুলে-চলে-যাওয়া শিশুর দল ঐ জঙ্গলে আজব চেহারার ছোট ছোট মানুষ দেখেছে। গায়ে লোমে ভরতি বাঁদরের মত মানুষ। বাদামী রঙের ক্ষুদ্রকায় মানুষ। এ দেশে ঐ চেহারার মানুষ আছে বলে কেউ দেখেনি বা শোনেনি, প্রাচীনেরাও না। এরা তবে কোত্থেকে এল ?

এদেশের বৃদ্ধেরা বলে তাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদাদের আমলে নাকি ঐ পাহাড়ের ওপর একজন অলৌকিক গুণসম্পন্ন "যাদুকর" বাস করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে ঐ বনের বিশালকায় এক গাছের তলায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। অত বড় গাছ এখনও নাকি দশ বিশ মাইলের মধ্যে নেই।

শোনা যায় কয়েকজন দুঃসাহসী যুবক কৌতূহলী হয়ে ঐ গাছটাকে একদা দেখতে যায়, তাদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে এসেছিল প্রাণ নিয়ে। তা-ও এমন হতভম্ব গোছের হয়ে গিয়েছিল যে প্রথমটা সে কোন কথাই বলতে পারেনি। পরে বিড়বিড় করে জানিয়েছিল যে যাদুকরের সমাধি পাহারা দিচ্ছে সেই ক্ষুদ্রকায় লোমশ বাদামী রঙের অদ্ভুত মানুষগুলি। তারাই……।

এ পর্যন্ত বলে সেই ম্যাণ্ডুর বিনীতভাবে বার বার আমায় অনুরোধ করতে লাগল আমি যেন ঐ ভয়ংকর স্থানকে পরিষ্কার করার কাজ থেকে বিরত থাকি। আশপাশের গ্রাম্য মানুষরা সশঙ্কিত ভাবে লক্ষ্য করছে কি ভাবে আপনি ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করাতে করাতে তথাকথিত "পবিত্র বৃক্ষটির" দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। গাঁয়ের প্রাচীনেরা এ ভয়ও দেখাচ্ছেন যে যদি এভাবে জঙ্গল সাফ হতে থাকে তাহলে ঐ যাদুকরের আত্মা বা প্রেতাত্মা অনিবার্য প্রতিশোধ নেবে এই সব কুলী কামিন ও সাহেবের ওপর। তখন কিন্তু রক্ষা নাই। নিস্তার নাই।

যত দিন যেতে লাগল তত কুলী-কামাই বাড়তে থাকল।

আমি একবার ভাবলাম সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে অনুসন্ধান করে নাহয় কাজ বন্ধই করে দিই। এত লোক যখন ভয় পাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই কোন একটা ন্যায্য কারণ আছে এ শঙ্কার।

কিন্তু আবার আমার অহমিকায় লাগল। আমি এই সব নেটিভদের একটা কুসংস্কারে ভয় পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেব, একথা শুনে জাভাস্থিত অপরাপর শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় হেসে উঠবে না ? আমি সাংঘাতিক লজ্জা পাব।

তাই আমি শক্ত হাতে আদেশ দিলাম কাল থেকে সমস্ত কুলীকে অবশ্যই কাজে হাজিরা দিতে হবে। নচেৎ পরিণাম কিন্তু আমার হাতে সাংঘাতিক হবে...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরদিন গিয়ে দেখলাম একটি প্রাণীও কাজে আসেনি, না কুলীরা, না কোন ম্যাণ্ডুর। খবর নিয়ে শুনলাম কোন লোকই আর এ জঘন্য ভয়াবহ কাজ করতে আসবে না, প্রত্যেকেরই ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে রয়েছে।

আমার গোঁ চেপে গেল। আমি হারবো না কিছুতেই। অন্য জেলা থেকে বেশী টাকার কড়ারে লোক নিয়ে এলাম কাজ করাতে। আমি অহোরাত্র সর্বক্ষণ স্বয়ং তদারক করে জঙ্গল সাফ করাতে লাগলাম।

খন্তা কুড়ুল কোদাল কাস্তের আঘাতে জঙ্গল ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল!

একদিন সহসা দেখি আমার পূর্বতন ম্যাণ্ডুররা ও কিছু কুলী এসে হাজির।

● বীরু চট্টোপাধ্যায়

—কী ব্যাপার? আমি সগর্বে বললাম, দেখছ তো আমি তোমাদের ঐ প্রেতাত্মাদের চেয়েও শক্তিশালী। এটা দেখে বুঝি ফের তোমরা কাজে যোগদান করতে এসেছ? কিন্তু আমার আর প্রয়োজন নেই তোমাদের।

ওরা এসে দল বেঁধে বসেছিল। আমার কথা শুনে প্রথমটা ওরা তেমন কিছু জবাব দিল না। তারপর ওদের মধ্যে জনৈক বয়স্ক ম্যাণ্ডুর জোড় হাত করে এগিয়ে এল, বললে, টুয়ান (হুজুর), আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি। আমাদের চেয়ে বেশী জানেন শোনেন আপনি। আপনি জঙ্গল সাফ করে যাচ্ছেন কিন্তু প্রেতাত্মারা আপনার কোন ক্ষতি করেনি, অতএব সম্ভবতঃ আপনি ওদের চেয়ে বেশী শক্তিমান্। কিন্তু টুয়ান, আপনি কখনোই যাতুকরের প্রেতাত্মার চেয়ে শক্তিধর নন। আপনি অনুগ্রহ করে সেই বিশাল বৃক্ষটিকে রেহাই দিন। সে বৃক্ষ এই বনভূমিকে শত শত বছর ধরে শাসন করে আসছে। আপনার স্ত্রীপুত্র পরিজনদের দিকে তাকিয়ে এখনও সাবধান হয়ে যান হুজুর।

স্বীকার করতে বাধা নেই, একথা শুনে প্রথমটা আমি কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ওরা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছে। তা নয় উলটো ভয় দেখিয়ে দিল।

—কিসের গাছ সেটা? যদিও জানতাম, তবু কিছু একটা বলতে হয় তাই বলে উঠলাম।

—সেই বিশাল পবিত্র বৃক্ষ। যাতুকরের মহান্ বৃক্ষ, বলে ম্যাণ্ডুর আঙুল তুলে একদিকে দেখালো।

সেদিকে তাকালাম। দেখলাম জঙ্গল সাফ হয়ে যে পর্যন্ত গেছে, পাহাড়ের ওপরে সেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিপুল কলেবরের এক বৃক্ষ তার অসংখ্য ডালপালা চতুর্দিকে ছড়িয়ে। গাছটার মনে হয় বয়সের গাছ পাথর নেই।

—ঐ, ঐ, মহান্ বৃক্ষকে রেহাই দিন হুজুর। সাবধান ওর গায়ে যেন হাত দেবেন না। না দিলে আপনি অবশ্যই পুরস্কৃত হবেন। নয়ত……

পুনরায় আমি সংশয়ে পড়লাম। একটা গাছ না কাটলে এমন কিছু ক্ষতি নেই কারুর। কিন্তু পরক্ষণে মনের মধ্যে পুরনো সেই মিথ্যা অহংকার মাথা চাড়া

দিয়ে উঠল। হেরে যাব নেটিভদের কুসংস্কারের কাছে। মাথা নেড়ে ওদের প্রার্থনা নস্যাৎ করে দিলাম। উঁহু গাছ আমি কাটবই। কোন কথা শুনব না।

প্রথমটা অন্য জেলা থেকে আনা কুলীরা একটু পিছিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আরও বেশী বকশিশ, আরও বেশী ঘুষ দেওয়াতে তারা রাজী হল। সে টাকা থেকে ভূতেদের তারা কিছু পূজা দিল, তারপর কাজে লেগে গেল।

আশ্চর্য! যতটা ভাবা গিয়েছিল তত সহজে কাজ এগোল না। কোথায় অদৃশ্যে অজ্ঞাতে যেন নিঃসীম বাধা আসতে লাগলো। জঙ্গলদানব সেই গাছ, ভূলুণ্ঠিত হতে যেন প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। আশপাশের শত সহস্র লতা শেকড় বাকড়ও যেন বাঁচাতে চায় গাছটাকে।

যেটা ভাবা গিয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল একদিনের কাজ, সেটা লাগলো পুরোপুরি সাতটি দিন।

অবশেষে বিকট শব্দ সহকারে সেই বৃক্ষদানব একদা ভূমিসাৎ হল।

এ কয়দিন কিছুটা দূরে বসে ম্যাণ্ডুররা, গ্রামের প্রাচীনেরা, কিছু কুলী, নারী ও শিশু গাছ কাটাকালীন বিড়বিড় করে কি সব প্রার্থনা করতে লাগলো, পূজা দিতে লাগলো, নাক কান মলে অনুশোচনা প্রকাশ বা পাপমুক্তির অভিব্যক্তি করতে লাগলো। গাছটি ভূমিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমবেত হাহাকার ও আর্তনাদ উঠল তাদের সবার কণ্ঠে। সেই ভয়ানক আওয়াজ শুনে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

যাই হোক। কাজ শেষ। আমি এখনও মরিনি। একে একে পুরনো কুলীরা কাজে যোগদান করল। ম্যাণ্ডুররা কিন্তু আমায় সবসময় এক বিচিত্র দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। প্রতিদিন সকালে আমায় সুস্থ সমর্থ দেখে ওরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। অবশ্য ওদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠত স্বস্তি ও বিস্ময়ের একটা সংমিশ্রণ।

এরপর···গাছটি ভূপাতিত হবার দিন পনের বাদে একদা সারাদিনের ক্লান্তিকর পরিশ্রমের পর, রাত্রে বিছানায় শুতে না শুতে অঘোর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলাম।

সহসা এক সময় ঘুম ভেঙে গেল।

থাগ্—থাগ্—থাগ্—এ ধরনের একটা নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজে আমি জেগে গেলাম।

● বীরু চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে সেই বৃক্ষদানব একদা ভূমিসাৎ হল। [পৃঃ ২১৭

এ এক ধরনের পাখি যারা রাত্রিবেলা এইভাবে ডাকে তাদের সঙ্গী সাথীদের। শুধু এ শব্দ নয় এর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল জঙ্গলের রাত্রিকালীন আরও অজস্র অদ্ভুত সব আওয়াজ।

কিন্তু এ শব্দটা যেন একটু অন্য রকম।

আমি উঠে বসলাম, একবার ভাবলাম বাইরে গিয়ে অনুসন্ধান করি কিসের শব্দ এটা। কিন্তু অপর দিকে ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আসছিল। এ শব্দ বোধহয় টিনের চালের ওপর বড় বড় গিরগিটি লাফিয়ে পড়বার শব্দ হবে। চোর-ছ্যাঁচড় কি? না, মনে হয় না। এ দেশের মানুষ চোর নয় বেশী। হাতের কাছে টিপয়ের ওপর রিভলবার রয়েছে, ভয় কি। অতএব পুনরায় বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ এইভাবে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম বলতে পারব না কিন্তু দ্বিতীয় বার জেগে উঠে বুঝলাম, কিছু একটা অস্বাভাবিক ও নির্দিষ্ট কোন কারণে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কি একটা ব্যাপার যেন আমায় ঘুমোতে দিচ্ছে না।

হাত বাড়িয়ে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমি আমার বাহুদ্বয় নাড়াতে পারছি না। ভয় পেয়ে গিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে

দেখলাম বালিশ থেকে মাথা তুলতেই সমর্থ হচ্ছি না। সহসা নাকে ভেসে এল একটি অতি সুন্দর গন্ধ। সে গন্ধ যেন ক্রমশঃই বাড়ছে। ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করতে গেলাম। কিন্তু গলা দিয়ে এতটুকু স্বর বের হল না। বিহ্বল হয়ে অনুভব করলাম যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে গিয়েছে আর আমি পরিপূর্ণ বোবা হয়ে গেছি।

জানি না নিজ শক্তি ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় কতক্ষণ কেটেছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারছিলাম যে আমি ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি, এরপর এক সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব সে বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। যখন মনে হল আর বুঝি আমি সজ্ঞানে থাকতে পারব না, এমন সময় ঘরের মধ্যে এক টুকরো আলোর ছটা নজরে পড়ল। আলোটা আসছে দরজার দিক্ থেকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে ধীরে ধীরে ঘরের দরজা ফাঁক হতে লাগলো। সেই ফাঁকে দেখা গেল প্রথমে একটি লোমশ আঙুলওয়ালা থাবা, পরে একটি লোমশ বাহু।

দরজা খোলার চমকে বুঝি আমার দেহের অসাড়ত্ব কিছু কমল, কেননা আমি বালিশের উপরেই আমার মাথা কাত করে দরজার পানে চাইতে পারলাম।

দেখলাম একটি লোমশ বামনবীর ক্ষুদ্রকায় মূর্তি হাতে ছোট্ট একটা মশাল নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে।

প্রথমটা ভেবেছিলাম একটা বানর হবে। পরে ভালভাবে দেখে বুঝলাম, ওটা জন্তু নয়, মানুষই বটে। হাত পা দেহ মুখ মানুষের মতই।

সেই ক্ষুদ্র বীভৎস মানব ঘরের বাইরে দরজার দিকে কাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমি পুনরায় নড়তে চড়তে এবং চিৎকার করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেই সাংঘাতিক ভীতিবিহ্বলতার মধ্যে কিছুই করা সম্ভব হল না। শরীরও নাড়তে পারলাম না, গলা দিয়েও কোন আওয়াজ বের হল না।

সেই ক্ষুদ্রকায় বাদামী রঙের মানুষটি ইতিমধ্যে আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার পানে অপার্থিব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হাতের

মশালের কম্পিত আলো পড়ে তার মুখটা যেন আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। মুখে যেন ভীষণ প্রতিহিংসার হিংস্র এক অভিব্যক্তি প্রকটিত হয়ে উঠছিল। অতি নিষ্ঠুর সে চাউনি।

সময় যেন থেমে গিয়েছে আমার ঘরে।

এক সময় দেখলাম আরও পায়ের শব্দ। চেয়ে দেখি প্রথমে একজন, পরে আরেকজন, সব মিলে ক্ষুদ্রকায় লোমশ বাদামী রঙের মানুষ তিনজন ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমায় তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ চাউনিতে দেখছে। ভাবটা যেন আমাকেই তারা খুঁজছিল, এতদিনে পেয়েছে।

সহসা তারা তিনজনেই বিছানা থেকে কিছু দূরে সরে গেল। আমার অবস্থা তেমনি অসাড় ও বাক্‌শক্তিহীন। ওরা নিজেদের মধ্যে অদ্ভুত আচরণে ও অবোধ্য শব্দে কি যেন আলাপ আলোচনা করতে লাগলো।

···সহসা আমার মনে হল কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি ফের আমার হৃতশক্তি ফিরে পাব, আর টেবিলের ওপর থেকে রিভলবার নিয়ে ভয় দেখাব···তারপর বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হব। আমার চেতনা যেন স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

কিন্তু দেখলাম সেই ক্ষুদ্রকায় মানবের একজন হঠাৎ বাইরে চলে গেল আর তন্মুহূর্তে সারা ঘরে ভেসে এল সেই পূর্বেকার মত বিচিত্র এক সুগন্ধ। আর তক্ষুণি আমার হাত পা দেহ পুনরায় অসাড় হয়ে গেল।

বাকী দুজন তখনও আমার পানে ভয়ানক উগ্র-নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে আমার চোখের পাতা ভীষণ ভারী হয়ে বুজে এল। আমি জোর করে একবার চেয়ে সভয়ে দেখলাম, একজন ক্ষুদ্রকায় মানব আমার পোশাকের আলমারিটা খুলে তাতে মশাল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সর্বনাশ! আমার কিছু করবার শক্তি নেই। শুধু অসহায়ের মত চেয়ে দেখলাম বাঁশের তৈরী দেয়াল ধরে অগ্নিশিখা চাল অবধি গিয়ে স্পর্শ করেছে।

আমি সর্বশক্তি দিয়ে নড়বার এবং চিৎকার করবার চেষ্টা করলাম! কিন্তু নিস্ফল সে প্রচেষ্টা। না পারলাম নড়তে, না চিৎকার করতে। অতঃপর আমার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল···

● যাদুগাছের বিভীষিকা

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম বাড়ির অদূরে ঘাসের ওপর শুয়ে আছি আমি। ভীষণ মাথা ধরায় কাবু হয়ে পড়েছি।

মাথা কাত করে চাইতে দেখলাম পাশে বসে আছে আমার ভৃত্যটি। বড় শান্তি পেলাম ওকে দেখে। এতক্ষণের সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মত ভয়াবহ ঘটনার পর ওকে দেখে যেন বুক জুড়িয়ে গেল।

দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কি ঘটেছিল আমার?

ভৃত্য যা বললে তার মর্মার্থ হল:

রাত তিনটের সময় তার কোয়ার্টারে সহসা ভৃত্যটির ঘুম ভেঙে যায় এবং নাকে আসে পোড়া গন্ধ। ছুটে বাইরে এসে দেখে আমার ঘর থেকে ধোঁয়া ও আগুন বের হচ্ছে। সে মাথা ঠিক রেখে দ্রুত আগুন নিবিয়ে ফেলে। পরে সে কাঁধে করে অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে বাইরে নিয়ে আসে।

ভৃত্যটি কাঁধে করে অচৈতন্য অবস্থায় আমাকে বাইরে নিয়ে আসে।

—কিন্তু হুজুর, ওরা আপনার টাকা পয়সা কিছু নিতে পারেনি, ভৃত্যটি প্রবোধের সুরে বললে, আমি সেগুলো খুব ভাল জায়গায় সামলে রেখেছিলাম।

—কারা পায়নি বলছ? আমি প্রশ্ন করি। কারা এসেছিল?

—কেন ঐ লোকগুলো যারা 'কাচুবাং লিলি' দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আপনার ঘরে ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়েছিল।

—কী ফুঁ দিয়ে ঢুকিয়েছিল? কিছু না বুঝে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

—গুঁড়ো করা 'কাচুবাং' ফুল, পদ্মপাতা গুঁড়িয়ে। সেই গুঁড়ো ঘরে প্রবেশ

● বীরু চট্টোপাধ্যায়

করালে, তার গন্ধে ঘুমন্ত লোক অসাড় হয়ে যায়। তখন চোরদের স্থবিধে হয় চুরি করতে। যখন দেখলাম হুজুর অজ্ঞানের মত পড়ে আছেন তখনই বুঝলাম কি ঘটনা ঘটেছে। বেটারা বোধহয় অসাবধানে আগুন ধরিয়ে ফেলেছিল। আমার আসার শব্দ পেয়ে পালিয়েছে। আরেকটুকু দেরি হলেই হুজুরকে বাঁচানো যেত না।

—একটু কফি করে খাওয়া তো। আমি আদেশ করি, এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

কফি খাওয়ার পর যেন কিছুটা চাঙ্গা হলাম। বললাম, হ্যাঁরে, আচ্ছা যে চোরেরা ঐ বিষাক্ত ফুলের গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে ঘরে ঢোকে, তারা কি বিশেষ কোন জাতের বা অঞ্চলের মানুষ ?

—না টুয়ান (হুজুর)। তবে সব চোর ডাকাতরাই এটা ব্যবহার করে না। অনেকেই করে, কেননা এতে করে লোক মরে কম, কাজও হাসিল হয়। অবশ্য অধিকাংশ জাভার চোরেরাই এ প্রক্রিয়া জানে।

—কিন্তু কাল রাতে আমার ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ জাভার মানুষ নয়। অন্ততঃ এ জেলার লোক তো নয়ই। তারা অতি ক্ষুদ্রকায়, ছোট ছেলেদের মত আকারের মানুষ, আর বানরদের মত লোমশ।

ভৃত্যটি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে বারেক তাকালো। ভাবটা যেন হুজুর কি পাগল হয়ে গেল নাকি! পরে মাথা নেড়ে বললে, এ ধরনের কোন মানুষ জাভাতে নেই হুজুর।

তারপর সহসা ভয় পাওয়া মুখ নিয়ে সে উঠে চলে গেল। তাহলে কি, দুঃস্বপ্ন এটা ? না, এটা আদৌ স্বপ্ন নয়। কঠোর ও নিষ্ঠুর বাস্তব।

আমিও বুঝেছি এবং স্থানীয় প্রতিনিধি নেটিভও বুঝেছে যে ঐ ক্ষুদ্রকায় বাদামী রঙের লোমশ মানুষগুলি, যাদের নাকি কেউ চেনে না, কেউ জানে না, জাভায়ই নাকি তারা বাস করে না, সেই অলৌকিক মানুষগুলি তাদের পবিত্র গাছটিকে ভূপাতিত করবার প্রতিহিংসায় আমাকে হত্যা করে ফেলবে একদিন। ওরা মানুষ নয়, ওরা প্রেতাত্মা।

বাঘ নয় বাঘিনী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শীতের সকাল। কলকাতার বাড়িতে দোতলার পুব দিকের খোলা বারান্দায় সোনালী কাঁচা রোদে বসে শরীরটাকে একটু তাতিয়ে নিচ্ছি—ভোরের ডাকে আসা একটি বিদেশী পত্রিকার পাতায় চোখ রেখেছি—এমন সময়···

—কৈ, ধীরেনদা কোথায়?

সাড়া দিলাম

—এই যে, এসো ভাই এসো—আমার বক্ষে এসো—

তুষার তড়বড় করে বলে গেল—পদ্মায় পাখি শিকারের কথা মনে আছে?

—খুব-খুব মনে আছে—সেদিন তোমার কাছে ফেল মেরেছিলাম···সে কী আর কোনদিন ভুলব?

—কিন্তু এবার আর পদ্মায় নয়।

—তবে প্রকাশিয়া কহ কিবা অভিলাষ তব?

—একটা বড় গোছের জন্তু জানোয়ার।

—ওরে বাপ! তার জন্যে এত? জন্তুজানোয়ার কী সব উধাও? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি?

—না দাদা, জঙ্গলমার্কা সালসার বিজ্ঞাপন যা কাল রাত্রে ছেড়ে দিয়ে এলে—শুয়ে শুয়ে বেশ খানিকটা চিন্তার খোরাক পেয়ে গেলাম। শেষটায় করিলাম পণ—একটি ব্যাঘ্র বিনা বৃথা এ জীবন—তুমি বাঘ শিকারের আয়োজন কর।

—একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। রাস্তায় বেরোলেই কী বাঘ পাওয়া যায়? তুমিই বরং একটা প্রস্তাব দাও—

—তবেই তো মুশকিলে ফেললে—আমরা মানুষের খবর নিয়েই কারবার করি, জন্তুজানোয়ারের কারবারী তো নই। তবে, একটা নাম খুব লাগসই—হাজারীবাগ—হাজার না হোক, দু একটা বাঘ নিশ্চয়ই মিলতে পারে।

—কেয়াবাৎ—আমার কাছেও একটা খবর আছে। ওদিকে অনেকবার গিয়েছি বলে অন্য কিছুর অপেক্ষায় ছিলাম।

—আর অপেক্ষায় দরকার নেই, হাজারীবাগেই চল।

আমাদের দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে স্থির হয়ে গেল—তুষারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাত্রার দিন ঠিক হবে। ইতিমধ্যে নিয়মমাফিক শিকারের অনুমতিপত্র ইত্যাদিও সংগ্রহ করার হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলতে অসুবিধে হবে না।

তুষারের সঙ্গে সংযোগ করতেই সে বললে—খোঁজ-খবর আমিও নিয়েছি—হাজারীবাগে সত্যি বাঘ পাওয়া যায়—তবে জঙ্গলে যেতে হবে।

—তা তো বটেই—নইলে বাঘ কী তোমার প্রশস্ত রাজপথে বুক চিতিয়ে চলবে?

তুষার বলল—অনুমতিপত্র এসে গেছে?

—হ্যাঁ ভাই, সে সব কম্‌প্লিট—এখন বল, এখান থেকেই সোজা মোটরে যাবে—না ট্রেনে হাজারীবাগ রোড স্টেশনে নেমে তারপর—

তুষার উত্তর দেয়—না—না—এখান থেকেই সোজা মোটরে।

—বেশ—হাজারীবাগে আমার বন্ধু প্রলয়ের বাড়ি, তার ওখানেই উঠব। এই দেখ চিঠি।

তুষার বলল—কিন্তু তোমার বন্ধুর বাড়িতে—আমার পক্ষে সেটা উচিত হবে কী?

—নিশ্চয়, অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবটা মনে নেই? আমার বন্ধু, তোমার বন্ধু—

—তা যা বলেছ!

—তা হলে, আমার হুড্ খোলা শেভ্রোলে গাড়িতে আমরা কালই রওনা হই, কী বল?

তুষার বারংবার শুনিয়ে দিলে—আমি খাবারদাবার সব সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে ঠিক

সময়মত তোমার গাড়িতে উঠিয়ে নেব—তুমি তোমার হাতিয়ারটা নিয়ে প্রস্তুত থেক। আমিও আমার বার বোরের বন্দুকটা নিতে চাই।

হেসে উঠলাম—বাঘ মারতে বার বোরের "শট্‌গান্" ? অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কিনা—অমৃতং বালভাষিতং।

—ঠাট্টা নয় ধীরেনদা, এটা আমার খুব "লাকি" হাতিয়ার—রোটাক্স বুলেটে কয়েকটা দাঁতাল শুয়োর খতম করেছি।

তুষারকে কথাটা বললাম বটে—কিন্তু প্রথম জীবনে বার বোরের বন্দুকে 'লিথল্' বুলেট দিয়ে দু একটা বাঘ শিকার করতে আমারও অসুবিধা হয় নি।

তুষারের প্রশ্ন—হ্যাঁ, ভাল কথা—তোমার সেই বিশ্বস্ত অনুচর—কী যেন তার নাম ?

—সেই কুন্তীরাম তো ? যাকে তুমি কুম্ভকর্ণ টাইটেল দিয়েছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বাপ্—যা ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তবে, যখন জেগে থাকে তখন সে এক অন্য মানুষ। যেমন চটপটে, তেমনি কাজের। গায়ে শক্তিও রাখে খুব।

পরদিন যথাসময়ে তুষার খাবার জিনিসপত্র নিয়ে হাজির। তার হাতে বন্দুক—অবশ্য তখন খাপের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। প্রচুর গুলিও এনেছে। আমি আমার 'মসার' রাইফেলটা কুন্তীরামের হাতে দিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গুলির ব্যাগ, আমার সুটকেশ, জলের ফ্লাস্ক, কেরোসিন স্টোভ ইত্যাদি নিয়ে সে সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে আসন নিলে।

তুষার আর আমি পেছনের সিটে। আসানসোল পার হয়ে সোজা রাস্তা ধরে আমরা চলেছি। চুটকি গল্পে তুষার যেন কথা সরিৎসাগর। কখনো মোটা, কখনো মিহি কখনো মাজা সুরে এক একটা গল্প চড়ুই পাখির মত ফুড়ুত করে উড়িয়ে দেয়—দিব্যি সময়টা কেটে গেল।

পরেশনাথ হয়ে বগোদর পৌঁছতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। সেখানে একটা পুল ভেঙে যাওয়ায় মেরামতের কাজ হচ্ছিল। কাজেই রাস্তাটা ঘুরিয়ে একটা মরা নদীর খাতের ভেতর দিয়ে নেওয়া হয়েছে—চলতে গিয়ে মোটরের চাকা ফেটে গাড়ি অচল। ভোর হবার আগে কিছু করার উপায় নেই। এদিকে ইঞ্জিনও তেতে পুড়ে আগুন—রাগে ফোঁস-ফোঁস করছে।

তুষারকে বলি—ওহে, তোমার মালগুদাম থেকে আরো দুচারটে হাই পোটেন্সির মাল ছাড়ো—রাতটা তো কাবার করতে হবে। এমনি নিরামিষ থাকতে রাজী নই।

তুষার একটার পর একটা গল্প ছাড়তে থাকে, আর হাসির চোটে আমার পেটে খিল ধরে যায়।

হাসির গল্পে তুষার খুব মজবুত। স্টকও রাখে খুব। নানান দেশের নানারকম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আছে—আর আছে সুযোগমত হাস্যরস আমদানী করার অদ্ভুত ক্ষমতা। কথায় কথায় এত 'উইট্', এত 'হিউমার'! নিজে গম্ভীর থেকে এক একবার একটা করে লাফিং গ্যাসের বোমা ফাটায় আর আমি দম আটকে মারা যাই আর কি! আমিও ফাঁকে ফাঁকে মার্জিত কৌতুক আর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের বাণ চালিয়ে যাই।

একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে তুষার তার গল্পে ছেদ টানলে। তার বড় বড় চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে।

বললাম—একটু ঘুমিয়ে নাও না।

—চোখ বুজবার জো কী? কুম্ভকর্ণের কাণ্ডকারখানা দেখছ না? নাসিকার বিরামবিহীন করোনেট বাদ্যে কী আর ঘুম হয়?

কুম্ভীরামের মাথায় একটা টোকা দিতেই সে ধড়মড়িয়ে সোজা বসেই প্রশ্ন—ক্যা হুয়া? শের?

—আরে নেহি নেহি—এখনো বাঘের আড্ডায় যেতে দেরি আছে। কিন্তু, এত ঘুমোস কেন?

—কী করবে হুজুর—নিদ্ তো হামারা নোকর নেহি—আনা যানা উস্‌কো মর্জি—

তুষারের সহাস্য উত্তর—ভ্যালারে আমার—ঘুম ওর চাকর নয় কিনা—তাই ও নিজেই ঘুমের চাকর বনে গিয়েছে।

এদিকে রাতও শেষ! ভোরের কুয়াশা ভেদ করে গাড়ি ছুটে চলে। এক সময় আমরা হাজারীবাগে পৌঁছলাম। বন্ধুবর প্রলয়চন্দ্র ঘটক বাংলোর সামনেই আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। তুষারের চোখেমুখে সংকোচ আর আড়ষ্টভাব লক্ষ্য করে প্রলয় সোজা তার কাছে এসেই হাতদুটি ধরে বললে—আপনাকে আজ প্রথম চাক্ষুষ করলেও আপনি আমার বহুপরিচিত—আপনার নাম কত যে শুনেছি—আর কেই বা না জানে! কাগজে আপনার ছবি কে না দেখেছে? আপনি আমার সম্মানিত অতিথিই শুধু নন, আমারও বন্ধু। অতি সহজেই তুষার তাকে মাইডিয়ার করে নেয়। 'আপনির' আড়াল থেকে তারা দুজনেই 'তুমির' ভূমিকায় এসে গেল।

অতঃপর সেখানেই বিশ্রাম—তারপর রাত্রের ভূরিভোজন ও সুনিদ্রা। কথা হল, পরদিনই বেলা দশটা নাগাদ আমরা রওনা হব।

বগোদর থেকে যে রাস্তাটা হাজারীবাগ এসেছে সেই রাস্তা ধরেই সিমারিয়া এবং সেখান থেকে সোজা ড্যালটনগঞ্জ—পালামৌ জেলার প্রধান শহরে মোটরপথে যাওয়া যায়।

আমাদের গন্তব্যস্থল—সিমারিয়া হয়ে যে রাস্তা বালুমঠের দিকে গিয়েছে—সেই রাস্তার ওপরেই জাত্রা নামে একটি ছোট্ট গ্রাম—শিকারের পারমিট সেখানকার জঙ্গলেই। রাস্তার দুধারে ঘন জঙ্গল এবং সেখানে বাঘের দেখা পাওয়া খুবই সম্ভব—কিন্তু, এভাবে বাঘ দেখা গেলেও না কি শিকার করা আইন-বিরুদ্ধ।

প্রলয় নিজেও শিকারী—মাঝে মাঝেই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নৈশ আহারের পর বিদায় নেবার আগে সে আশ্বাস দিয়ে যায়।

—যেখানে তোমরা শিকারের অনুমতি পেয়েছো—সেটা সত্যি শিকারের 'দি প্লেস'। তবে আগে থেকে খবর নিতে হবে। সিমারিয়াতেই সে সব করা যাবে এখন। আমার নিজের লোকই সেখানে মোতায়েন।

পরদিন আমার পুরনো বন্ধু সেকেলে শেভ্রোলেখানাকে তেল জল খাইয়ে তাজা করে নেওয়া হল। আমরা 'হেভী ব্রেকফাস্ট' করে 'লাঞ্চের' উপকরণ সঙ্গে নিয়ে বেলা দশটায় রওনা দিলাম। রাস্তা ভালই—তবে কলকাতার 'রেড্ রোড' তো নয়, তাই ছুটে যেতে গাড়ি কিছুটা টালবাহানা করে।

প্রলয়ও যে আমাদের সাথী, এটা না বললেও চলে।

সিমারিয়ায় পৌঁছে প্রলয় তার নিজের লোকের কাছে খোঁজখবর নিলে। আমরা লাঞ্চ সেরে আবার রওনা দিলাম। বালুমঠের রাস্তার ওপরে জাত্রা গ্রামেই অস্থায়ী ক্যাম্প করা হবে এবং সেখান থেকেই জঙ্গলে শিকারের ব্যবস্থা। সেখানে পৌঁছতেই, প্রলয়ের সুবিজ্ঞ বাণী—গ্রামের মোড়লকে আগেই খবর পাঠিয়েছি। সে কী বলে, দেখি। তারপর লোকজন যোগাড়, বেট বাঁধা, জঙ্গলখেদা—শিকারের আনুষঙ্গিক অনেক কিছু—

আমরা মোড়লের বাড়িতেই হাজির হলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। তার বাইরের ঘরখানা খড়ের ছাউনি, ভেতরে মাটির মেঝে। একপাশে একটা বাঁশের মাচা—কাঠের খুঁটির ওপর বসানো। তার ওপরে চ্যাটাই দিয়ে ঢাকা। পরীক্ষা করে দেখি—গোটা বাঁশের টুকরোগুলো সাজিয়ে মাচা বাঁধা হয়েছে। তার ওপর তক্তা বিছিয়ে ওপরে মজবুত চ্যাটাই দেওয়া। কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত হলেও বসেই বুঝলাম—কি আন্দাজ আরামদায়ক।

মোড়লের অনুরোধে আমরা সেখানেই আশ্রয় নিলাম। কুন্তীরাম মাচার ওপরে কম্বল চাদর বিছিয়ে বিছানা করে দিলে—আমরা তার ওপরেই জাঁকিয়ে বসি।

মোড়ল এসে সামনে দাঁড়াল। হাত জোড় করে ভাঙা হিন্দীতে যা বললে, তার মর্মার্থ—

—বাবুদের কোনও কাজে লাগলে তার জীবন কৃতকৃতার্থ হবে।

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রলয় তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল—বাঘের খবর কী? হালে কিছু বেরিয়েছে কিনা? এর আগে কোনও শিকার পার্টি এসেছিল কী? তোমার গরু মোষ ছাগল ভেড়া সব বহাল তবিয়তে আছে তো? একদিনও হামলা হয়নি বাঘের?

এক একটা প্রশ্ন করা হয় আর সেই বৃদ্ধ মোড়লের মুখে ভাব পরিবর্তন—কুঁচকানো মুখের চামড়ার ওপরে আঁকা বলিরেখাগুলি কখনো সংকুচিত, কখনো বা প্রসারিত হয়।

প্রলয় ছেদ টানতেই বৃদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে বলে যায়।—জন্তু জানোয়ার মেলাই আছে—বাঘও হামেশাই দেখা যায়। এই তো পরশুদিনই একটা বাঘ হামলা করেছিল। ওই যে জঙ্গল ঘেঁষে মাঠখানা—ওরই মধ্যে কিষাণরা কাজ করছিল—হঠাৎ বাঘ একটা কিষাণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই আর সবাই হইহই করে ওঠে! পালিয়ে যাওয়ার আগে বাঘ লোকটার মাথায় বিরাশি ওজনের থাবড়া মারতেই তার মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেল—তবে মরদের বাচ্চা—মরেনি।

তুষারের বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে গেল, চিৎকার করে ওঠে—মাথার ঘিলু বেরিয়ে গেল—এখনও বেঁচে আছে? কী সর্বনাশ!

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম—সর্বনাশটা কোনখানে হয়েছিল, তাহলে শোনো—একবার আমার বৈঠকখানায় নানান জাতের হাসির ফোয়ারা চলছে—সেদিন একজন আচমকা ঘরে ঢুকে বললে

—জানো ভাই, স্যর বি এল মিত্র, আর স্যর বি এন মিত্র দুজনের মধ্যে স্যর বি এন মিত্রের মারা যাওয়ার সংবাদ পেয়ে এক ভদ্রলোক আচমকা রিসিভার তুলে স্যর বি এল মিত্রের বাড়িতে ফোন করলেন—শুনলাম স্যর বি এল মারা গিয়েছেন—তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—আমার অনেক উপকার করেছেন—তাঁর কাছে আমি বিশেষ ঋণী—আমার কনডোলেন্স জানাচ্ছি—লেডী মিত্রকে জানিয়ে দেবেন—আমার নাম শ্রী—

ওধার থেকে উত্তর এল—কী বলছেন? আমিই স্যর বি এল মিত্র কথা বলছি—এখনো সশরীরে বর্তমান।

চিড়খাওয়া কণ্ঠে আঁতকে ওঠা আর্তনাদ—কী আশ্চর্য! অ্যাঁ—এখনো বেঁচে আছেন?—কী সর্বনাশ!

হাত থেকে ফোন খসে গেল। মাথায় হাত দিয়ে তিনি ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লেন।

তুষার ও প্রলয় দুজনেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বাঘের কথাতেও আমাদের হাসিমস্করার বহর দেখে বৃদ্ধ মোড়ল অবাক্। কিছুই বোধগম্য

না হলেও ফাঁকতালে সোম ঠুকে দিলে—বাবুরা সাবধানে থাকবেন—এটা হাসির কথা নয়—বাঘের মহড়া নিতে জঙ্গলে এসে হাসিমস্করা করতে নেই—ওরাই তো জঙ্গলের স্থাবতা !

তুষারের তড়িঘড়ি উত্তর—বরং বল অপদেবতা—তা কাল সকালে কী তোমার দর্শন পাওয়া যাবে ? কিছু লোকজন—

প্রলয় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—চিন্তার কোনও কারণ নেই—বন্দোবস্ত সব আগেই করে রেখেছি।

—বেশ ভাল কথা—এখন আমাদের নৈশ আহারের কী বন্দোবস্ত করতে চাও ?

তুষার বললে—তার জন্যে ভাবনা কী ? স্টোভ জ্বালিয়ে চালে ডালে ফুটিয়ে নাও প্রলয়—দুচারটে আলুসিদ্ধ আর গাওয়া ঘি। বাঃ—আজকের মত সেই আমাদের রাজভোগ !

এবার আমার প্রেসক্রিপশন—রাজভোগ কী দুর্ভোগ, কে জানে! তার চাইতে দু চার গ্লাস জল খেয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায় না ?

—খুব যায়। তবে কাল সকালেই তো আবার শিকারের ধকল শুরু হবে। রাত-উপোসে দুর্বল হয়ে পড়তে হয়, তা জানো ? তার চাইতে, প্রলয়, তুমি জল চড়িয়ে দাও—টগ্‌বগ্‌ করে খিচুড়ি ফুটতে থাকুক—তালে তালে আমিও দুচারখানা ধ্রুপদ ভেঁজে নিই। ধীরেনদা, তুমি হেসোনা—এ সবে আমার দস্তুরমত তালিম আছে।

—সে আমি জানি ভাই। শুধু এতে কেন—তোমার সরস গল্পগুলিই কী কম! তবে আমি সেজন্য হাসিনি—দেখলাম, আমার তুষার ভায়া সত্যিকার রসিক—জঙ্গলে এসে ভুনি-খিচুড়ি যদি খাওয়া না হয়, তবে আর হল কী ?

শ্রীশ্রীকুম্ভকর্ণ স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুড়ি বসিয়ে দিলে। তুষারও পদ্মাসনে বসে চোখ বুজে গলায় সা রে গা মা'র মাঞ্জা বুলিয়ে নেয় তারপর পাখোয়াজের অভাবে হাঁটুতে তালি মেরে সুর ভাঁজে। আমিও মাঝে মাঝেই হাঁ কেয়াবাৎ বলে তাকে বাহবা দিয়ে চলি। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে ধ্রুবপদের ধ্রুবত্ব প্রতিপন্ন করে তুষার থামলে।

হ্যাঁ, গাইলে বটে—যেমন সুরেলা কণ্ঠ, তেমনি ঘরোয়ানা !

প্রলয়ের চোখে মুখে বিস্ময়—এই বয়সেও গলায় বেশ জোর আছে তো !

—কী আর বয়স ? He is young by fifty one.

অর্থাৎ Parker 51—হবে না ? কলম-দুরন্ত্‌ মানুষ যে—

—শুধু ক-বর্গের কালি-কলমে নয়, বুঝলে প্রলয়, গ-বর্গেও triple honours—যথা Gun, গান আর গৌরাঙ্গপ্রেম !

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীমান প্রলয় প্রলয়নৃত্য জুড়ে দিয়েছে—

তুষার হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবল আপত্তি জানালে—পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—আমাকে আর young বোলো না ধীরেন দা!

—একশবার বলব—হাজারবার বলব—জানো? যদি কেউ বলে সে fifty one years old—তাহলে old old করে সে মনেও বুড়ো হয়ে যায়। বরং আশি বছর বয়সেও বলবে—আমি young by eighty years—বুঝলে?

তুষার তার সুন্দর পুষ্টাই-করা গোঁফজোড়া চুমড়ে নিয়ে উত্তর দিলে—বাঁচালে ভাই—আর বুড়ো হব না। আজ থেকে তোমার শিষ্যত্ব নিলাম।

ওদিকে খিচুড়িও তৈরী—হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলেই হয়।

আহারাদির পর শয়ন পর্ব। আমরাও শয্যায় লুটিয়ে পড়ি। একপাশে প্রলয়, মাঝে তুষার আর একপাশে আমি। এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখা হল।

হয় তো তন্দ্রা এসেছিল—হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসি। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় দেখি শ্রীমান প্রলয় প্রলয়নৃত্য জুড়ে দিয়েছে—আর কুম্ভীরাম একটা লাঠি হাতে বন্ধ দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে।

—কী, হল কী?

—ঐ যে এক জোড়া নীল চোখ! ওরে ব্বাবাঃ!

—তা, হয়েছেটা কী?

—সবে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছি—

—বেরোলে কেন ? নিয়ম মেনে চলতে কী হয় ?

—কী করব, বল ? তাগাদা ছিল যে !

তুষারও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে—চোখ কচলে বলে ওঠে—এ কী, ঘরের মধ্যেই বাঘের নাচ ?

—বাঘের নাচ নয়,—ঘটকের ঘোটক নর্তন—

সুর দিয়ে গান ধরি—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে ঘটরাজ
ঘটরাজ,

কটির বাঁধন পড়ল খুলে—

রাত শেষ হতে আর দেরি নেই—তবু যেটুকু হয় আরাম করে নেওয়া যাক।

প্রত্যুষেই দেখি কুম্ভকর্ণ দরজার গোড়ায় দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছে—কিন্তু তার হাতে লাঠিগাছটা তখনও ধরা ছিল। ডাক দিতে, ধড়মড়িয়ে উঠেই মাপ চাইলে—এখুনি ঘুমিয়ে পড়েছি হুজুর !

দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেলাম ! সামনের মাঠের মধ্যে দস্তুরমত ভিড়। প্রায় ষাট সত্তর জন লোক মোড়লকে ঘিরে বচসা চালিয়েছে।

আমরা তিনজনেই সেদিকে এগিয়ে যাই।

মোড়ল তার দুহাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছিল, আমাদের দেখে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেই বললে—বাঘ হামলা করে কাল রাত্রে একটা বাছুর ধরে নিয়ে গেছে।

—সে কী ? এই যে বললে দুদিন আগে বাঘ একটা মানুষকে ঘায়েল করেছিল ?

মোড়ল হেসে ফেললে—সে ভাবনা আমাদের নয়, বাবু। এ জঙ্গলে বাঘ কী একটা ? হরদম আনাগোনা করেন স্থাবতারা—যখন যাঁর পালা পড়ে, তিনিই পুজো খেতে আসেন।

নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে পাই—সেটা কী মার্কামারা ? বলবেই বা কে যে সেইটেই এসেছে না আর একটা।

মোড়লের প্রবচন—লোকজন নিয়ে আগে তো দেখি বাছুরটাকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে—তারপর তো আপনারা আছেনই।

—উত্তম—আমরা তবে সকালের কাজকর্ম সেরে তৈরী হয়ে নিই। সেরখানেক খাঁটী দুধ পাওয়া যাবে কী ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জরুর—আমি এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমরা ফিরে এলাম। মোড়লের কুটিরে বসে তিনজনের বৈঠক। বিকেল গোটা তিনেকের মধ্যেই যদি আমরা জঙ্গলে গিয়ে জায়গামত গাছের ডালে বাসা বাঁধি তাহলে আর মাচানের দরকার

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

হবে না। যে বাঘটা বাছুর নিয়ে গিয়েছে, খেদা করে তাকে বের করা চাই। কাজেই মারির কাছাকাছি গাছ বেছে নিতে হবে।

আপাততঃ আলোচনায় ইতি—এখন শুধু সংবাদের প্রতীক্ষা।

কুন্তীরামকে তাগাদা দিয়ে আমাদের আহারের যোগাড় করতে বলে দি। মোড়ল একজোড়া মুরগী উপহার দিতেই তুষার উল্লসিত হয়ে উঠল—ব্যস ভাত আর মাংস—আর কিচ্ছু চাই না—

সকালের খাঁটী দুধটুকু পেয়ে আমার মনও প্রসন্ন। কুন্তীরামকে হুকুম করি—জল্দি জল্দি খানা তৈরি কর।

কুন্তীরাম একটা ঢোঁক গিলেই বাংলা ভাষার শ্রাদ্ধ শুরু করে—বাবুরা আসিয়েছেন—মান্ছ খুব ঝালমসালা হবি তো?

আঁতকে উঠি—খবরদার—একদম লঙ্কা দিবেক নি—জানিস তো—আমি ওসব কিছু খাই না—

—কিন্তু এনারা?

তুষারও আমার কথায় সায় দেয়—না, না সিম্প্‌ল্ হোক—তাতেই শরীর ভাল থাকে—গুচ্ছের ঝালমসলা দিলেই গুরুপাক—তথা বদহজম!

বেলা এগারোটার মধ্যেই খাবার তৈরী। স্নানাহার সেরে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি—এমন সময় মোড়ল এসে সংবাদ দিলে—বাছুরটাকে পাওয়া গিয়েছে মাইলখানেক দূরে একটা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া ঝরনার ধারে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সেখানে যাওয়া দরকার—কারণ শীতকাল। বেলা চারটের সময়ই জঙ্গলে আঁধার নেমে আসে।

—তথাস্তু, আমরা তো তৈরী হয়েই আছি।

মোড়ল চলে যেতেই জন ত্রিশেক লোক লাঠি সড়কি, ক্যানেস্ত্রা টিন নিয়ে হাজির। তাদের সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়ি। মোড়ল তার জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে দিলে! সেই হল আমাদের গাইড।

তুষারের খাকি পোশাক সবাইকে টেক্কা দেয়। আনকোরা নতুন—শিকারের কথা উঠতেই কিনে ফেলেছে। হাতে তার নিজস্ব বন্দুক—গলায় গুলির বেল্ট। আমারও হাতে রাইফেল—কিন্তু গুলির বেল্ট সঙ্গে নিইনি—কুন্তীরামের জিম্মায় রেখেছি। প্রলয়ের পোশাক কিছু খাপছাড়া—পরনে ধুতি, মালকোঁচা দিয়ে পরা, গায়ে বুশ কোট।

জঙ্গলে ঢুকেই একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখি। মাঝে মাঝেই বড় বড় গাছ—এদিকে ওদিকে ঝোপঝাড়ও প্রচুর। ঘটনাস্থলের কাছে যেতেই গাটা ছমছম করে ওঠে। যেন সেই জানোয়ারের গোপন উপস্থিতি অজানা ইঙ্গিত দেয়।

ইন্দ্রনীল—

হঠাৎ বাঘ একটা কিষাণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই

(বাঘ নয় বাঘিনী···পৃঃ ২২৮)

মরা বাছুরটার কাছে যেতেই লক্ষ্য করি—বাঘ তার গলায় কামড় দিয়ে গভীর ক্ষত করেছে এবং সমস্ত রক্ত শুষে নিশ্চয় কোনো ঝোপে বসে পাহারা দিচ্ছে—সন্ধ্যার দিকে ভূরিভোজনে বসবে।

আমরাও সেই মারির আশপাশের গাছগুলো লক্ষ্য করে দেখি।

সুবিধামত কাছেই একটা গাছে তুষারকে তুলে দেওয়া হল। কুম্ভীরামও সেই গাছেই উঠে তুষারকে ছুতিনটে ডালের সংযোগস্থলে বসিয়ে বেল্ট দিয়ে ডালের সঙ্গে এঁটে বেঁধে দিলে, যাতে বেশী উত্তেজনায় পড়ে না যায়। প্রলয়ও সেই গাছেই উঠতে যাচ্ছিলো—বাধা দিলাম।

—তুমি ওটায় নয়—পাশের গাছটায় উঠে পড়। আমি এধারে, এই গাছে।

লোকজন যারা জড়ো হয়েছিল, তাদের সর্দারকে নির্দেশ দিলাম—জঙ্গলটাকে ঘেরাও করে খেদা শুরু করে দাও।

সেই চিরন্তন হইহই আওয়াজ আর ক্যানেস্তা টিনের বাদ্যে কান ঝালাপালা। হঠাৎ কিছুদূরের একটা ঝোপ নড়ে উঠল—আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ফোঁটা কাটা লেপার্ড। সঙ্গে সঙ্গেই প্রলয়ের প্রলয় বিষাণ—বাঘ—বাঘ।

জানোয়ারটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে ছুটে যেতেই ওদিক থেকে বিটারদের হই-হট্টগোলে বোধ হয় হতবুদ্ধি হয়েই সোজা তুষারের গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।

বেগতিক অবস্থা। তুষার যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তাহলেই সর্বনাশ!

আমার অজ্ঞাতসারেই বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল বসে যায়—কিন্তু তুষার এসেছে সঙ্গে—কাজেই চিৎকার করে উঠি।—তুষার—fire at once.

হঠাৎ এই চিৎকারে বাঘটা যেই ঘাড় ঘুরিয়েছে তৎক্ষণাৎ বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল আর একটা 'ঘ্যাক্' আওয়াজ তুলে বাঘটা নীচে লাফিয়ে পড়তেই আমারও এক গুলি।

বাঘটা ছিটকে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েই সামনের ঝোপে ঢুকে পড়ল।

পর পর ছুটো গুলির আওয়াজ পেয়ে বিটাররা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় করলে। আমরাও গাছ থেকে নেমে পড়ি।

সামনের ঝোপের মধ্য থেকে খাবি-খাওয়া আওয়াজ পেলাম।

—এই কুম্ভীরাম—ছুচারটে ঢেলা মারতো—

সেও বড় বড় কয়েকটা পাথর নুড়ি ঝোপের দিকে ছুড়ে দিলে। বিটারদের মধ্যে ছু-এক জন লাঠি দিয়েও ঝোপের ওপর আঘাত করে—কিন্তু মশায়ের আর কোনও সাড়া শব্দ নেই।

● শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাঘটা সোজা তুষারের গাছ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে।
[পৃঃ ২৩৩

তুষারের দুর্দান্ত সাহস—ঝোপটাকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে একটা ফাঁকে উঁকি দিয়েই দেখতে পায় বাঘটা চার হাত পা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে।

তুষারের তূর্য্য-নিনাদ—ধীরেনদা, শীগগির এসো, মার দিয়া কেল্লা।

সবাই ছুটে গেলাম সেদিকে।

মাত্রাধিক আনন্দে তুষারের মুখে অপূর্ব হিন্দীবাত—এই—তুমলোক আভি উঁস্‌কো হিঁচড়ায়কে বাইরে লে আও—বহুৎ বখশিশ মিলবে।

তারাও বেদম উৎসাহে চিতে বাঘটাকে টানতে টানতে আমাদের সামনে হাজির করে।

বাঘটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর জিজ্ঞেস করি—ভাই তুষার, কোথায় গুলি করেছিলে, বল তো ঠিক।

—ওপর থেকে খাড়া ওর মুণ্ডুতেই তাক করেছিলাম।

—খুব কঠিন অ্যাঙ্গল—তার ওপর পেছন থেকে। সেই জন্যেই তোমার গুলি বাঘের কান কেটে নিয়েছে—আর আমি পজিশন পেয়েছিলাম বলেই আমারটা লেগেছে ওর বুকে।

নিয়ম অনুযায়ী—যার গুলিতে বাঘ প্রথম ঘায়েল হয়—শিকার তারই প্রাপ্য। তুষারকে জড়িয়ে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলি—সাবাস! তোমার গুলিই প্রথম লেগেছে। এ বাঘ তোমারই।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তুষার লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির। তারপরই বনেদী এডিটার আমার ব্যাকরণ ভুল সংশোধন করে দেয়

—বাঘ নয় বাঘিনী।

অলৌকিক

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তানহারা চলেছে সে-এক কেদার বদরী পথে।
কাহারো বারণ মানিবে না সে যে কিছুতেই কোন মতে।
বুক ধুকধুক হার্টের অসুখ কাণ্ডীর নাই কড়ি।
তবু ধীরে ধীরে পাহাড়ী পথেতে চলিয়াছে লাঠি ধরি।
একটি পুত্র, তাও ছেড়ে গেছে, বাঁচিবার সাধ নাই।
জীবন পণেতে দেব দর্শনে চলেছে প্রৌঢ়া তাই।
এলো যশী মঠ, এখনও তো পথ, সমুখে রয়েছে মেলা।
এখনও হাঁটিতে জোর কদমেতে হইবে কয়েক বেলা।
অথচ তৃতীয়া তিথি হবে কাল, মন্দির হবে খোলা।
বেদনায় পদ মন্থর যত, মনে লাগে তত দোলা।
চলেছে ডাণ্ডী, কাণ্ডী চলেছে, পালকি চলেছে ছুটে।
'বদরী বিশাল লালকী' লাগিয়া জয়, জয়ধ্বনি উঠে।
পয়সায় আজ সব পাওয়া যায়, পয়সা যাহার নাই
সেই কেঁদে হাঁটে পাহাড়িয়া পথে, করে শুধু হাঁইফাঁই।

ভ্রমণের নেশা পেয়েছে ধনীরা, ধরেছে তীর্থপথ।
হুংকার দিয়ে হইহই ছুটে তাদের বাষ্পরথ।
গোপালে স্মরিয়া, নারায়ণে ডাকি, প্রৌঢ়া ত্বরায় চলে।
নয়নের জলে কম্প্রকণ্ঠে 'বদরী বিশাল' বলে।
হঠাৎ একটা ধ্বস নেমে গিয়ে পথ হয়ে যায় হারা।
নারীর হৃদয় হায় হায় করে, বেগে বহে আঁখিধারা।
হয়ত এখুনি চাপা পড়ে যেত, সব হয়ে যেত শেষ।
লাঠিটাই গেছে, সে বেঁচে গিয়েছে, 'জয় প্রভু পরমেশ।

তোমার কৃপায় পঙ্গু জনাও লঙ্ঘন করে গিরি।
মূক যে, সে জনও, বাচাল হইয়া কত দেশ আসে ফিরি।'
সম্মুখে পড়ে পাষাণের স্তূপ, কেমনে হবে সে পার ?
তৃতীয় চরণ লাঠিটা তাহার, তাও হাতে নাই আর।
আলো নিভে আসে, লোক নাই পথে, আকাশ ছেয়েছে মেঘে।
দামালের মত মত্ত বাতাস হুহু ছুটে আসে বেগে।
চকিতে ধরণী টানি নিল শিরে গোধূলি রঙীন বাস।
প্রৌঢ়ার বুক কেঁপে উঠে, পড়ে নিরাশ দীর্ঘশ্বাস।

● শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

এ-পাশ ও-পাশ একটু হলেই
ছ' হাজার ফুট নীচে
পড়িবে প্রৌঢ়া, তাই বলে উঠে,
নারায়ণ তুমি মিছে।
ধনীর ঠাকুর তুমি হয়ে গেছ,
গরিবের কেউ নও।
বিপদ বারণ, এ দুখ-সময়ে
কোথায় লুকায়ে রও ?
হঠাৎ একটা আলো এসে পড়ে
পাষাণস্তূপের বুকে।
হঠাৎ কে যেন পথ বেয়ে আসে
জোরে লাঠি ঠুকে ঠুকে।

"খাড়া রহ, মৎ যানা মাজী", স্বর ভেসে উঠে দূরে।
ক্রমশঃ সে স্বর, কাছে, আরো কাছে, আসে যেন ঘুরে ঘুরে।
ঝুঁকে চলা এক পাহাড়ী যুবক, হাতে নিয়ে বড় আলো।
মাথায় মস্ত পাগড়ি একটা, পোশাক সে জমকালো।
প্রৌঢ়ার কাছে এসে বলে, "মাজী ডর মৎ, কাঁধে চড়।
আমিও বদরীনারাণ চলেছি, কেন মনে দ্বিধা কর ?
মর্মের রং রাঙা হলে মা গো ধর্ম হয় না ফিকে।
ভক্তের ভালে জয়ের তিলক নারায়ণ দেন লিখে।"
প্রৌঢ়ারে কাঁধে তুলে নিয়ে সে যে হাওয়ার গতিতে চলে।
'আঁখ বন্ধ্ কর ভয় হতে পারে', এ কথা বারেক বলে।
বন্ধ নয়ন, তবু দেখে নারী, চলেছে দু'জন ঋষি।
তাদের স্তোত্রে আকাশ, বাতাস, মুখরিত দশ দিশি।
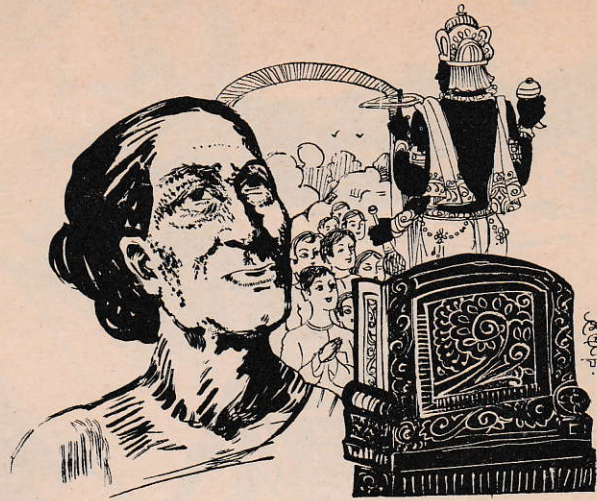
নরে নারায়ণে মিলন হইলে তবে সার্থক লীলা।
সেই কথাটাই যেন ডেকে বলে পাহাড়ের প্রতি শিলা।
হঠাৎ কে যেন বলে উঠে জোরে, 'হিঁয়া খাড়া রহ মাজী'
প্রৌঢ়া নয়ন মেলিয়া দেখিল, এ যেন রে ভোজবাজি।
মন্দির মাঝে যাত্রীর সাথে দাঁড়াইয়া আছে সে যে।
দেব আরতির কাঁসর ঘণ্টা সরবে চলেছে বেজে।
যাত্রীর সারি হাঁক দিয়ে বলে, 'বদরী বিশাল জয়।
তুমি নারায়ণ, বিপদবারণ, তুমি ত্রাতা, দয়াময়।'
সমুখে বদরীনারায়ণ হাসে, ভুবন ভুলানো হাসি।
মনের কর্ণে শুনে যেন নারী, 'ভালবাসি, ভালবাসি।
চিরদিন আমি ভালবাসি তাকে, যে নেয় আমার নাম।'
নয়নের জলে লুটায়ে প্রৌঢ়া ঠাকুরে করে প্রণাম।
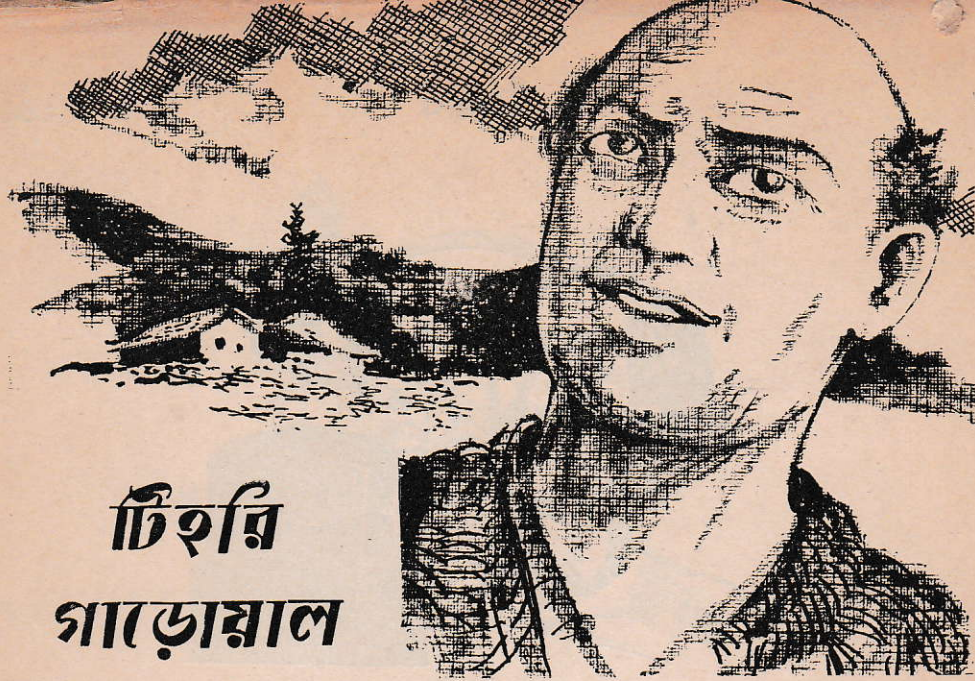
টিহরি গাড়োয়াল

প্রবোধকুমার সান্যাল

হৃষিকেশে আমাদের বসবাসের কাল ফুরিয়ে এসেছিল।—

এখন আর সেই আগেকার পুরনো হৃষিকেশ নেই।

সেই প্রাচীন যুগের পাহাড়তলীর ছোট্ট গ্রামটি আজ কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কেউ খোঁজ করে না। তখন এখানে ওখানে টিমটিম করত তেলের আলো, চন্দ্রভাগা আর নীল গঙ্গাধারার কোলে কোলে ধুনি জ্বলত, সংসারবিরাগী সাধুসন্ন্যাসীরা চোখ বুজে জপে বসত অশ্বত্থের ছায়ার নীচে, ওঙ্কারধ্বনি শোনা যেত যখন তখন, যেখানে সেখানে। সরু পাথর বসানো গলিটির গঙ্গামুখী পথের আশেপাশে পাওয়া যেত রুটি-পুরি বা ভাতের দোকান,—ওতেই দিন গুজরান হয়ে যেত। ভোজনপর্বে না ছিল সমারোহ এবং না ছিল তার চাহিদা। মনোহারী দোকান বলতে কিছু ছিল না সেদিন। বড় জোর পাওয়া যেত ছোট ছোট শিবলিঙ্গ আর গৌরপট্ট, পৈতা, পিতলের এক আধটা বাসন, কেড্‌স্ জুতো আর লাঠি, কম্বল বা চাদর, গিরিমাটি বা এক আধটা বেনিয়ান। সামগ্রী বা উপকরণের প্রয়োজন মানুষের কাছে ছিল সীমাবদ্ধ। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে আসতে হত পনেরো মাইলেরও বেশী। বেলাবেলি না এসে

পৌঁছতে পারলে তরাই অঞ্চলে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল। যাদের আর্থিক সংগতি থাকত, তারা শেয়ারে ভাড়া নিত একখানা টাঙ্গা—যার মাথাপিছু খরচ লাগত তৎকালীন বহুমূল্য একটাকার মধ্যে।

সেদিনকার সেই হৃষিকেশ যেন ছিল একখানি সন্ন্যাসীর নিভৃত যোগাসন। সেখানে বসে কবে কোন্ যুগে মহাকবি বেদব্যাস কেদারখণ্ড বা শিবপুরাণ রচনা করেছিলেন। এখন আর সে-কথা ভাববার সময় কারও নেই।

সেই হৃষিকেশের মৃত্যু ঘটে গেছে।

এখন চারিদিকে আধুনিক কালের হইচই লেগেছে। বড় বড় পিচ-বাঁধানো রাজপথ, পাঞ্জাবী এবং উত্তরপ্রদেশীদের বড় বড় কাজ কারবার, ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত মস্ত এক নগর, অগণিত সংখ্যক দোকান আর ব্যবসা বাণিজ্য, অসংখ্য আধুনিক রেস্তঁরা, থইথই করছে ফলপাকড়ের বাজার, এন্টি-বায়টিক কারখানাকে ঘিরে মস্ত এক কলোনি, জনবহুল পথঘাট আকীর্ণ করে রয়েছে মোটর ট্রাক আর যাত্রীদের বাস। ট্যাক্সি ছুটছে সর্বত্র। এখন শিয়ালদহ-বৌবাজারের সঙ্গে হৃষিকেশের পার্থক্য সামান্যই।

কিন্তু কারণটা সেই একই। মোটর গাড়ি যতদূর গিয়েছে, আধুনিক যুগও তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পৌঁছেছে ততদূর অবধি। বণিকরা সর্বপ্রকার সামগ্রীসম্ভার পৌঁছিয়ে দিচ্ছে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে,—যেখানে সভ্যতার উপকরণগুলি অপরিচিত ছিল। একদা হৃষিকেশের যেখানে-সেখানে পথের ধারে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা যেত পরম নিশ্চিন্তে। আজ সেকথা ভাবাও কঠিন। এখন মানুষে-মানুষে ধাক্কা লাগে, হোঁচট খেতে হয় যখন-তখন, আশ্রয় পেতে গেলে হোটেল খুঁজতে হয়, আর নয়ত দরখাস্ত পেশ করতে হয় কালীকম্বলীবাবার ছত্রে,—যেটা নিয়েছে এখন এক বিশাল আধুনিক চেহারা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় কোট-প্যাণ্ট পরা একালের নাগরিক এবং রং পাউডার মাখা ঝলমলিয়া স্ত্রীলোক।

যাই হোক, হৃষিকেশ থেকে বেরিয়ে নরেন্দ্রনগরের দিকে যাচ্ছিলুম। সামন্ত যুগে এই অরণ্যময় হাঁটাপথটি ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু টিহরির রাজা নরেন্দ্র শাহর আমলে নিতান্তই তাঁর নিজের সুবিধার জন্য একটি দশ মাইল দীর্ঘ মোটরপথ নির্মাণ

করা হয়। রাজা নরেন্দ্র শাহর প্রাসাদটি নীচের তলাকার হৃষিকেশ থেকে সকলেরই চোখে পড়ে।

এখন এই নরেন্দ্রনগরের বাসরুটটি নানাকারণে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই পথ পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে এক সময় ভাগীরথীর মূল ধারার তটে গিয়ে যখন পৌঁছয়, তখন অপর পারে থাকে টিহরি নগর, এবং এপারের পথ উত্তরে চলে যায় ধরাসু, উত্তরকাশী, ভাটোয়ারী হয়ে হরশিলের দিকে। ইদানীং দৈব দুর্বিপাক থেকে যাত্রীবাহী মোটর বাসগুলিকে নিরাপদ করার জন্য একমুখী যান-বাহনের ব্যবস্থা হয়েছে। এটির নাম 'গেট্-সিসটেম্'।

দেরাদুনের তরাই অঞ্চলের যে বিশাল অরণ্য, তারই সামান্য একটি অংশের ভিতর দিয়ে একটি সুন্দর চড়াইপথ ধরে নরেন্দ্রনগরে উঠে আসতে হয়। এখন চৈত্রমাসের শেষপ্রান্ত, সুতরাং অরণ্যমর্মরের সঙ্গে যাযাবর পাখিদের কলরবমুখরতা শোনা যায়। হঠাৎ এখানে এসে যেন হারিয়ে গেছে হৃষিকেশের হাট-বাজারের সেই হট্টগোল। এখান দিয়ে যাবার কালে যেন হিমালয়ের প্রথম শান্ত নিবিড় নিভৃতির আস্বাদ মেলে। এককালে মনে হত, হিমালয়ের দুস্তর অঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, যানবাহন এবং সামগ্রীসম্ভার এসে পৌঁছনো একান্তই দরকার, কিন্তু যখন একে একে প্রচুর পরিমাণে তারা সত্যিই এসে পৌঁছলো, তখন আবার ভাবতে বসেছি—এই সাংঘাতিক বর্তমান কালের হইচই হট্টগোলের থেকে ছুটে পালাই কোনও নির্জন ও নিঃসঙ্গ গিরিলোকে, যেখানে আধুনিক বলতে কিছু নেই! বোধ হয় এই ধরনের কথাই ভেবেচিন্তে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—।"

এ নিয়ে বলবার কিছু নেই। কেননা কালের গতি বড় কুটিল। সে চিরকাল ধরে আপন রথের চাকায় গুঁড়িয়ে দিয়ে চলেছে পুরনো জীবনের সঞ্চয় আর অভ্যাসকে। যা চলে এসেছে তাই আঁকড়িয়ে ধরে থাকায় চলতিকালের মানুষ আনন্দ পায় না।

এ যাত্রায় মিঠু ছিল আমার সঙ্গে। সে একালের ছেলে। তার সঙ্গে চলেছে আধুনিক মন। তার দুই চোখে নব্য যুগের তারুণ্য। সে অবিশ্বাসবাদী, সংশয়াচ্ছন্ন, অনুসন্ধিৎসু এবং বাস্তবদর্শী। তার উৎসুক চক্ষু নতুন এক জগতে ঘোরাফেরা

করছিল। দেশ, সমাজ, পরিচ্ছদ, লোকযাত্রা, টপোগ্রাফি ইত্যাদি তার পক্ষে ছিল প্রধান আকর্ষণ।

পাহাড়ের উপর সন্ধ্যা ঘনায় বিলম্বে। নরেন্দ্রনগরে যখন এসে পৌঁছলুম, সমতল ক্ষেত্রে তখন সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে হিমালয়ের তরাইলোকে দিগন্তজোড়া অরণ্যের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যদেব তখন সবেমাত্র পাটে বসেছেন।

জনবিরল নরেন্দ্রনগর এখনও 'নগর' হয়ে ওঠেনি, এইটি লক্ষ্য করে প্রথম আনন্দ পেলুম। ক্ষতি নেই, যদি কেউ একে বলে উন্নত এক পার্বত্য গ্রাম। দক্ষিণে অরণ্য, কিন্তু উত্তরে ও পূর্বে পাহাড়ের গায়ে আগেকার কালের বস্তি-বাসিন্দারা সামন্তরাজের প্রাচীন আমল থেকেই বাসা বেঁধে রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই আনকোরা প্রশস্ত পথটি নির্মিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনে,—এটি এখন মূলতঃ রসদসম্ভার সরবরাহের পথ,—যাত্রিগাড়ি যায় তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে।

চারিদিক শান্ত, অনেকটা যেন শব্দশূন্য। বাতাসে হিমেল স্নিগ্ধতা পেয়ে আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। রাস্তা থেকে কিছুদূর উপরে উঠে গিয়ে পাওয়া গেল একটি ফুলবাগান ঘেরা ছোট দোতলা বাড়ি। এ বাড়িটি হল রাজমাতা কমলেন্দুমতি শাহ ধর্মশালা। আগে শুনেছিলুম, এ বাড়িটি তৈরী হয়েছিল নিরামিষাশী মহিলা তীর্থযাত্রীদের জন্য। কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি নীচের তলায় থাকে একদল বিদ্যার্থী যুবক, এবং দোতলায় আমাদের ঘরটি বাদ দিয়ে অন্য দুটি দখল করেছেন একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং অপর জন দুই পুরুষযাত্রী। সন্ধ্যার ঝোঁকে উপরে উঠে এসে জায়গা নিল জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি,—যার একটি ছেলে যেন কোথায় চাকরিতে বদলি হয়ে এখানে এসেছে। অর্থাৎ এ বাড়ির ত্রিসীমানায় এক ঝাড়ুদারপত্নী ছাড়া অন্য কোনও স্ত্রীলোকের নামগন্ধও নেই। আমাদের ঘরটির মধ্যে কিছু আসবাবপত্র থাকায় সুবিধা হয়েছিল। স্নানাগার পাশেই ছিল।

এই জনবিরল সুশ্রী পার্বত্য জনপদ একদিকে যেমন উপভোগ্য, অন্যদিকে তেমনি একটু অসতর্ক হলেই ভোজ্যসামগ্রী বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ফলে, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় মিঠু যখন শুনল যে, ঘণ্টা দুই আগে দোকানের খাবার শেষ হয়ে গেছে, তখন হা হতোস্মি ছাড়া আর কিছু রইল না। শেষ পর্যন্ত এই দুর্মূল্যের যুগে কি প্রকার অবস্থায় উদরপূর্তি করতে হয়েছিল, মিঠুর পক্ষে সেই অভিজ্ঞতা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এখন এখানে 'আঠোয়ারা'র পার্বণ চলছে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এবং বস্তি-গুলির সর্বত্র "আঠোয়ারা" নিয়ে সকলেই ব্যস্ত। শেষ হয়ে আসছে চৈত্রমাস। এখন অরণ্যে, পর্বতে, কন্দরে ও গুহাগহ্বরের আশেপাশে মধুর বসন্তের পুষ্প-শোভা সর্বক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত। বনে-বনান্তরে রঙ্গিন পাখিরা নেমে এসেছে কূজন গুঞ্জন সঙ্গে নিয়ে। সেই কারণে "আঠোয়ারা" উৎসবের প্রথম পর্ব পুষ্পলীলা! অর্থাৎ সর্বত্র ফুল পাঠানো, ফুল বিতরণ, ফুল নিয়ে ছোড়াছুড়ি ও মাতামাতি, ফুল কেনাবেচা, ফুল ভিক্ষা এবং ফুলসজ্জা। কার বাগানে কত ফুল, ফুল সংগ্রহ কার কত বেশী, ফুলের সজ্জা ও অলংকরণে কার কতখানি যোগ্যতা, এবং ফুল কেনাবেচার ব্যাপারে কোন্ গৃহস্থকন্যা কি প্রকার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে,—এই হুজুগটির জন্য শেষ চৈত্রের আটটি দিন 'আঠোয়ারা' নিয়ে মাতোয়ারা। ছোট ছোট বালিকারা যখন আমাদের কাছে ফুল বিক্রি করে গেল তখন খুবই আনন্দ পেলুম। এই উৎসবের শেষ দিনটি হবে চৈত্রসংক্রান্তি—যেদিন এই জনপদটি ফুলের বিছানায় পরিণত হবে!

প্রতিদিন বার চারেক নরেন্দ্রনগরের 'গেট' খোলা হয়। মোটর ট্রাক, মোটর বাস, প্রাইভেট কার,—এগুলি যথাসময়ে এখানকার প্রশস্ত পথের পূর্বপ্রান্তে এসে সারবন্দিভাবে জমা হয় এবং ঘড়ি দেখে লোহার শিকলটি চৌকিদার সরিয়ে নিলে এগুলি একে একে ছাড়তে থাকে। এইটিই নির্দিষ্ট বিধি এবং এদিকে কর্তৃপক্ষের কড়া নজর থাকে।

'গেট' বাঁদিকে রেখে চললুম ডানদিকে—যে-অঞ্চলটিকে বলা চলে 'নগর'। এখানে সেই সামন্তযুগের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলিই দেখতে পাওয়া যায়। পুলিস লাইনটিই প্রধান ছিল সেই কালে, কিন্তু একালে সামন্তযুগীয় পুলিসি ব্যবস্থা আর চলেনি, তাই তার স্বভাব প্রকৃতি বদলিয়ে গেছে। প্রজারা এখন হয়ে উঠেছে

ভারতীয় নাগরিক, তারা পুরনো যুগের বীভৎস অনাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাদের দুর্দশা বা দারিদ্র্য হয়ত এখনও সম্পূর্ণ ঘোচেনি, কিন্তু তাদের জীবনে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের অবসান ঘটেছে। পুলিস লাইনের আশেপাশে উপত্যকাভূমি এবং সেখানে চোখে পড়ছে ছোটখাটো কোর্ট কাছারি এবং পাঠশালা। ওরই মধ্যে একটি বা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। সেবা প্রতিষ্ঠান দুই একটি যে নেই তা নয়। কিন্তু ইংরেজ আমলে এগুলির উন্নতি করার গরজ ছিলনা কারও। যা কিছু করতেন স্বয়ং টিহরি গাড়োয়ালের রাজা। এঁরা তিন পুরুষ ধরে প্রত্যেকে এক একটি নগর নির্মাণ করেন। যেমন প্রতাপ শাহর নামে প্রতাপ নগর, কীর্তি শাহর নামে কীর্তি-নগর—যেটি শ্রীনগরের অপর পারে অলকানন্দার তীরে

ছোট ছোট বালিকারা আমাদের কাছে ফুল বিক্রি করে গেল [২৪৪

অবস্থিত। এটি নরেন্দ্রনগর,—নরেন্দ্র শাহর নামে নবনির্মিত। এরই একমাত্র পুত্র মানবেন্দ্র শাহ বর্তমানে লোকসভার জনৈক সদস্য। আমরা চড়াই পথ ধরে যাচ্ছিলুম এই পাহাড়েরই উচ্চতম মালভূমির দিকে।

● প্রবোধকুমার সান্যাল

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দূরে একটি পাহাড়ের উপরে রাজমাতা কমলেন্দুমতির নিজস্ব একটি প্রাসাদ,—তিনিই মানবেন্দ্রর জননী, এবং রাজা নরেন্দ্র শাহর স্ত্রী। টিহরি-গাড়োয়াল এককালে এঁদের শাসনাধীন ছিল, এবং তখন ব্রিটিশ-গাড়োয়াল ছিল পৃথক্। টিহরির প্রজাসাধারণ ব্রিটিশ গাড়োয়ালে তখন প্রবেশাধিকার পেত না। অর্থাৎ উত্তর পার্বত্যলোক ছিল টিহরির অধীনে, এবং দক্ষিণ পূর্বে মেহল চৌরি অবধি ছিল তাদের সীমানা,—এটি রামগঙ্গার তীরভূমি। টিহরি রাজের এক্তিয়ারে থাকত হিমালয়ের তীর্থপথগুলি, এবং গাড়োয়ালি কুলীরা হৃষিকেশের বাইরে আর যেতে পারত না। শুধু তাই নয়, সমতলবাসীদের সঙ্গে মেলামেশাও তাদের পক্ষে অনেকটা নিষিদ্ধ ছিল। এর ফলে যুগযুগান্তকালেও তাদের দারিদ্র্য ঘোচেনি এবং অভাব মোচন হয়নি।

নরেন্দ্র শাহ সর্বশেষ সামন্ত নরপতি ছিলেন। বিগত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে টিহরির পার্বত্যপথে তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর পুত্র মানবেন্দ্র চুপ করে থাকেননি। তিনি সম্প্রতি একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেছেন পাহাড়ের ধারে—সেটি মস্ত সুন্দর একটি বাগানবাড়ি। এ বাড়ির সমস্ত ব্যবস্থাপনাই ইওরোপীয় ছাঁচে প্রস্তুত। উপরতলার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে থাকলে সুইট্জারল্যাণ্ডের দৃশ্য মনে করিয়ে দিতে পারে। হাসি পেল সুইট্জারল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে। কলকাতার জনৈক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক একবার কথাচ্ছলে বলেছিলেন, হৃষিকেশ ছাড়িয়ে লছমনঝুলার পুলের উপর গিয়ে দাঁড়ালে অথবা কালিম্পঙের রাস্তায় করোনেশন্ ব্রীজে দাঁড়ালে শুধু সুইট্জারল্যাণ্ডের কথাই মনে পড়ে। তাঁকে একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলুম যে, হিমালয়ের গহনলোকে প্রবেশ করলে হাজার-হাজার সুইট্জারল্যাণ্ড দেখতে পাবেন। তিনি থমকিয়ে গিয়েছিলেন।

পথটি নিরিবিলি। কিন্তু চড়াইয়ের উপর থেকে নীচের দিকে চোখে পড়ছে মালভূমিটিকে ঘিরে রাজকীয় উদ্যানসজ্জা। রাজা এখন অনেকটা জমিদারে পরিণত, এবং খাসের বাইরে তাঁদের অধিকার লোপ পেয়েছে। তবু, কথায় আছে মরা হাতি লাখ টাকা! সেই লাখ টাকা হয়ত এখন কোটি-কোটি টাকায় পরিণত! এঁদের হাতে রয়েছে এখনও অনেকগুলি পার্বত্য অঞ্চল, এবং টিহরি, উত্তরকাশী ও চামোলি,

—তোমার রাইফেলে গুলিভরা আছে?

—এই তিনটি নবনিয়ন্ত্রিত জেলায় এঁদের ঠিক কতগুলি প্রাসাদ বা অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন জমিজায়গা আছে, তার হিসাব সাধারণের কাছে নেই।

মিঠুর সঙ্গে এক সময় উঠে এলুম নরেন্দ্র শাহর প্রাসাদের তোরণদ্বারে। এটি সর্বোচ্চ মালভূমি, এবং সমুদ্রসমতা থেকে এর উচ্চতা হল ৩,৮৮০ ফুট। রাজবাড়ির প্রবেশপথে প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে, সেটি হল তোরণের বিশালতা এবং সামনে সশস্ত্র প্রহরী! যাই হোক, এতক্ষণ পরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। আমরা খুশী হয়ে এদিক ওদিক যখন তাকাচ্ছি তখন আমার মুখে একটি অমায়িক ও নিরীহ-ভাবটি ধরে রেখেছিলুম। কি জানি যদি ফস করে সেপাইটে রেগে ওঠে? প্রহরী ছাড়াও আরও জন দুই চৌকিদার বেরিয়ে এল।

প্রশ্ন করলুম প্রহরীকে,—তোমার রাইফেলে গুলিভরা আছে?

পোশাকপরা লোকটা থমকিয়ে দাঁড়াল,—ক্যা?

তুমি এ-মুখ থেকে ও-মুখে যাচ্ছ-আসছ কেন?

সে জবাব দিল, ডিউটিপর হ্যায়!

● প্রবোধকুমার সান্যাল

আমাদের সন্দেহ হয়েছিল, লোকটা বন্দুকটা সরিয়ে রেখে এতক্ষণ অবধি চৌকিদারের সঙ্গে মজলিস করছিল, কিন্তু বাইরের লোককে দেখামাত্রই হঠাৎ সে টান-টান হয়ে কর্তব্যরত হয়ে উঠল!

প্রশ্ন করলুম, রাজদর্শনের ঘণ্টা পড়বে কখন?

অপর দুটি লোক জানাল, রাজাসাহেব এখন দিল্লীতে। রাজবাড়ি এখন বন্ধ, এবং এখানে এখন কেউ নেই।

অতএব আমাদের কপাল মন্দ। এ যাত্রায় রাজদর্শন ভাগ্যে নেই। সুতরাং একটি চৌকিদারের সাহায্যে আমরা সেই সুপ্রশস্ত উদ্যান ও পুষ্পবীথির পাশে পাশে সমগ্র প্রাসাদের বহির্দৃশ্যগুলি দেখে বেড়াতে লাগলুম। এ অঞ্চলে এরা বলে 'রাজকোঠি'। এটি শ্বেতবর্ণের প্রাসাদ, এবং হৃষিকেশে দাঁড়িয়ে নীলকান্ত আকাশের নীচে এই শুভ্রকায় প্রাসাদটিকে একটি শ্বেতপক্ষ রাজহংসের মতো মনে হয়। নীচের থেকে উপর দিকে তাকিয়ে এটিকে কতবার যক্ষপুরীর কল্পলোক বলে ভাবতুম। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই মস্ত রাজকোঠির প্রথম প্রস্তরপত্তন ঘটে। বহুদূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই এর রং সাদা।

পাহাড়ের চূড়ায় প্রাসাদ নির্মাণ এক জিনিস, কিন্তু তার জীবনরক্ষা একটি সমস্যা। নরেন্দ্রনগরের চতুঃসীমার মধ্যে জলের চিহ্নমাত্র নেই। উপর থেকে বহুদূর নীচের দিকে নীলবর্ণা গঙ্গার নীলধারাটি চোখে পড়ছে। তারই জল বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা পাম্প করে তুলে আনতে হয়েছে প্রায় ৪ হাজার ফুট উপরে। সেই জল সরবরাহ করতে হয় রাজকোঠিতে এবং সমগ্র জনপদে। এই কারণেই পানীয় জল নরেন্দ্রনগরে নিয়ন্ত্রিত।

শুধু এখানে নয়, অনুচ্চ পাহাড়ের প্রত্যেক জনপদে পানীয় জলের চিরকালীন সমস্যা এই,—কেননা এসব পাহাড়ে বর্ষার পরে ঝরনাগুলি একে একে শুকিয়ে যায়, এবং জলের জন্য অগাধ নীচে নদীতটে নেমে যেতে হয়। প্রতাপনগরের পাহাড়ের চূড়ায় এই একই সমস্যা।

প্রাসাদ উদ্যানের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় বহুদূর-দূরান্তর। নীলধারা যেন হারিয়ে যায় কোন্ দিকে।

● টিহরি গাড়োয়াল

নীচের দিকে হৃষিকেশের নগর-জটলা। দূরে চিকচিক করে হরিদ্বার। ঠাহর করে দেখলে পাওয়া যায় চণ্ডীর পাহাড়। তারপরে দ্রোণভূমির অনন্ত অরণ্যানী, তার একান্তে মনসুর দানবের রাজধানী মুসৌরি,—সে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে নগরাজ উত্তর হিমালয়ের তোরণদ্বারে বিশালকায় কাল-প্রহরীর মতো।

এই রাজকীয় প্রাঙ্গণের মাঝখানে অপর একটি অট্টালিকা রয়েছে,—এটি হল নরেন্দ্র শাহর আমলের মস্ত গেস্ট হাউস।

রাজপ্রাসাদের মতো এটিও ইন্দিছিন্দি বন্ধ।

আমরা স্বল্পবিত্ত সাধারণ মানুষ। ধনীর ধনগৌরবের পরিচয় পাবার জন্য অনেক সময়ে আমরা লালায়িত হই।

কিন্তু মিঠুর ঔৎসুক্য, কী আছে ওর মধ্যে!

সে জানলার ফুটো আর খড়খড়ির ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাচ্ছিল, কী আছে ভিতরে! অতি উচ্চমূল্য আসবাবসজ্জা দেখেই বা লাভ কি? সম্পদ্ স্তূপাকার হয়ে আছে ভিতরে। এ আজকের নয়, বহুকাল ধরে জমেছে। কীর্তি শাহর আমল থেকে নরেন্দ্র শাহর আমল মানে ইংরেজ পলিটিক্যাল্ এজেন্টের শাসন কাল। তারা যখন তখন সামন্তরাজদের আতিথেয়তা ও উপঢৌকন লাভ করতে না পারলে কুচক্র রচনা করত। তাদের জন্য রাজকোষের স্বর্ণসম্ভার থাকত অবারিত। সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী মদের সেলার রক্ষা করতে হত। চন্দ্রালোকিত চূড়াভূমির এই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষ সালংকারা পার্বতী নর্তকীর নূপুরনিক্কন ঝংকারে বিবশ-বিহ্বল হয়ে উঠত কথায় কথায়। দেরাদুন থেকে সোজা চলে আসতো তাদের সেই বিদেশী রুচির আহার্য সম্ভার। যাবার সময় এখান থেকেই তারা নিয়ে যেত সোনা, জড়োয়া-জহরত, স্মারকচিহ্নস্বরূপ নর্তকীর সজ্জা, সর্বশ্রেষ্ঠ মখমলের রক্তনীল গালিচা, দেরাদুন অরণ্যের বড় বড় হাতির দাঁত, প্রাচীন গাড়োয়ালের সংগৃহীত কিউরিয়ো,—কিন্তু থাক্, তালিকা বাড়িয়ে গাত্রদাহ সৃষ্টির আর দরকার নেই।

ইংরেজ চলে যাবার পর থেকে ওদের অন্দরমহলের খবর আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু ওদের রাজ্যের পরিমাপ ধরে এবং খরচপত্র হিসাব করে একটা বাৎসরিক 'প্রিভিপার্স' দেওয়া হয়ে থাকে।

● প্রবোধকুমার সান্যাল

রাজমাতা ধর্মশালায় আমাদের বসবাসকাল দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল। সড়কের বাঁ দিকে প্রথম হোটেলটি এক বৃদ্ধ শিখ সর্দারের। ওখানে সকালে প্রাতরাশ, সন্ধ্যায় ভোজনাদি। ভোজ্যসামগ্রীর দাম অনেক বেশী, তার চেয়েও বেশী সর্দারজির সৌজন্য। সড়কের নীচের দিকে জেলাশাসকের বাংলো। সময়-মতো তাঁর ওখানে গিয়ে আলাপ করা গেল। তাঁর সঙ্গেই ছিলেন তাঁর সহকারী শাসক। কথায় কথায় তিনি এক সময়ে উৎসাহ প্রকাশ করলেন,—আমার নামটি তাঁর নিকট পরিচিত। যাই হোক, এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে টিহরি এবং উত্তর-কাশীতে খান দুই চিঠি চলে গেল,—পরে যার সুবিধালাভ করেছিলুম।

মাতাজির ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে পড়লুম পরদিন মধ্যাহ্নকালে। 'গেটের' সামনে অপেক্ষা করছিল জেলাশাসকের চৌকিদার। সে ব্যক্তি সযত্নে আমাদেরকে মোটরবাসে তুলে দিয়ে গেল। রাজধানী হল টিহরি শহরে, কিন্তু জেলাশাসক নরেন্দ্রনগরের শান্ত পরিবেশটি বেশী পছন্দ করেন। টিহরি অপেক্ষা এখানকার জলবায়ু স্নিগ্ধ-শীতল।

গাড়ি চলেছে পাহাড়ের পথ দিয়ে বস্তির পর বস্তি ছাড়িয়ে। 'আঠোয়ারা' উৎসব লেগে রয়েছে ঘরে ঘরে।

পাহাড়তলীর গ্রামে কোথাও হাট বসেছে, কোথাও চলেছে রবিশস্যের বেচাকেনার জটলা।

পথের আশেপাশে বুনো বেগুনি বকফুল, দেশী গাঁদা বা লতানে গোলাপ অথবা আকন্দের জঙ্গলে আকীর্ণ। কোথাও কোথাও পথ বনময়—সেখানকার গাছে গাছে বসন্ত সমীরণের মর্মরদোলায় কেমন যেন তন্দ্রা জড়িয়ে রয়েছে।

কখনও পথ চড়াই, কখনও বাঁক, কখনও বা উতরাই।

এমনি করে একে একে পেরিয়ে গেল 'অগ্রখাল, ফাকোট, সজল এবং খাড়ি'। এক সময়ে গাড়ি এসে পৌঁছল নাগ্‌নি বা নাগিনী জনপদে। কাছেই পার্বত্য নদী —নাম নাগিনা। এ নদী গঙ্গারই এক শাখা। নদী দেখলে আনন্দ পাই। পার্বত্যলোকে নদীই হল পাহাড়ের প্রাণ। এই উপলমুখরা গিরিনদী সর্পাকারে

এঁকেবেঁকে ছুটেছে বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নাগিনী'। অবশেষে পুনরায় গাড়িতে এসে উঠলুম এবং নাগ্‌নি ছাড়িয়ে আবার গাড়ি ছুটল। এক সময় এসে পৌঁছলুম 'চাম্বা' বা 'চম্পা' জনপদে। হিমালয়ে 'চম্পা' আছে অনেকগুলি। এই নামকরণের মধ্যে এই শব্দটির প্রতি পাহাড়ীদের একটি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। চম্পা ছোটখাটো একটি পাহাড়ী শহর, এবং জনসংখ্যা এখানে বেশী। এটি প্রধান একটি কাজকারবারের কেন্দ্র। এখানে কম্বল, সূতীবস্ত্র, পশুপালন, কাঠের কাজ ও ফসলের চাষের দরুন পাহাড়ীদের অর্থনীতির কিছু উন্নতি দেখা যায়।

মিঠু সহসা সচকিত হয়ে উঠল, যখন এই পাহাড়গুলীরই উত্তর-প্রান্তে দিগন্তের দ্বার হঠাৎ এক সময়ে খুলে গেল। যেন আরেকবার প্রথম দেখলুম হিমালয়কে! জন্মের থেকে জন্মান্তরে যতবার দর্শন করা যায় দেবাদিদেবকে, যেন প্রতিবারই সেই দর্শন প্রথম! রৌদ্রের দীপ্তি ঝলমল করছে হিমালয়ের দুগ্ধবর্ণ চূড়ায় চূড়ায়। তুষার-মণ্ডিত এক একটি চূড়া,—যা চিরদিনই বরফে আবৃত থাকে। বেশী দূর নয়, একটি পাখি যদি আকাশপথে উড়ে যায়, তবে মাইল ত্রিশের মধ্যেই। এই ধবল-তুষারলোকের ভিতরে-ভিতরে রয়ে গেছে গোমুখ আর কালিন্দি খাল, চতুরঙ্গী আর কেদারনাথ, ভৃগুপন্থ আর বাসুকি, চন্দ্রপর্বত আর শতোপন্থ। ওদেরই মধ্যে কোথায় যেন আসন পেতে বসে রয়েছেন দেবাদিদেব, যিনি আপন ধ্যানমন্ত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন। মিঠু ওদেরই সামগ্রিক বিশালতার দিকে চেয়ে রইল।

এক সময়ে কখন পিছন দিকে মিলিয়ে গেল সেই তুষার-শুভ্রতা। আমাদের গাড়ি একটির পর একটি পথে বাঁক নিচ্ছিল, এবং এক সময় সুদূর দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল ভাগীরথীর উপত্যকালোক। তারই শেষপ্রান্তে টিহরি শহরটি দূর থেকে চিকচিক করছিল। আমরা নামছিলুম উতরাইপথে।

নেমে এলুম এক সময় নীচের দিকে ভাগীরথীর তটের কাছাকাছি। এখানে পথ দ্বিধাবিভক্ত। উপর দিক থেকে একটি পথে আমরা এসেছি, নীচের দিকে অন্য পথটি উত্তরে চলে গেছে ধরাসুর দিকে। এইটিই প্রধান পথ। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই পথই গিয়েছে গঙ্গোত্রির দিকে।

লোমহর্ষক

আশাপূর্ণা দেবী

জলে ঘটি ডোবে না, তবু নাম তালপুকুর। জমিদারি নেই তবু বড় তরফ, ছোট তরফ। তরফ আছে, অতএব তড়পানিও আছে। দু'পক্ষের কর্তাতে কর্তাতে, গিন্নীতে গিন্নীতে দাসদাসী চাকর রাখাল আমলা গোমস্তাতে তড়পানির লড়াই চলে আসছে আজ সাতপুরুষ ধরে।

ছুতো একটা পেলেই হলো।

তা আজ পাওয়া গেছে এক জব্বর ছুতো। তড়পাচ্ছেন বড় তরফের সরকার মশাই। তারস্বরে প্রতিবাদ আর দাবি করছেন, আওয়াজটা আগে শুনেছে ওদের রাখলা ছোঁড়া? বললেই হলো? প্রথম শুনেছি এই আমি। বুঝলেন! এই আমি শ্রীগুণাকর শর্মা। কাকপক্ষী তখনো বাসা ছাড়েনি, সূয্যিমামা লেপের নীচে,

আমি হতভাগা লেপ কাঁথা ছেড়ে ছুটেছি মাঠে! গত রাত্তিরে ভোজনটা একটু গুরু হয়ে গিয়েছিল, তার খেসারত দিতেই—সে যাক বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে ঘরে ফিরছি, হঠাৎ ওই বাজখাঁই আওয়াজ! বুকের রক্ত বরফ হয়ে গেল! এ তো গরু ঘোড়া ছাগল গাধার ডাক নয়, তবে কোন্ প্রাণীর হুংকার? দুর্গানাম জপ করতে করতে ছুটে আসছি, আবার সেই! কে যেন গরুর হাম্বা, ঘোড়ার চিঁহি, ছাগলের ব্যা—এ্যা—, গাধার ঘ্যাকোর ঘ্যাক্, সব কিছু মিশিয়ে হামানদিস্তেয় ছেঁচে পাঁচন বানিয়ে কানে ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে!...শুনেছি গণ্ডারের আওয়াজ নাকি ভয়ানক, কলকাতায় সেবার 'সূর্যচূড়া যোগে'—গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে, চিড়িয়াখানাটাও দেখে এসেছিলুম, তা চোখেই দেখলাম গণ্ডার, হাঁক শুনিনি। ভাবলাম ছিটকে ছাটকে বুঝি তাই এসে পড়েছে কোথাও থেকে। উঠি তো পড়ি, পড়ি তো মরি, করে ফিরছি, দেখি বাড়ি আর খুঁজে পাইনে! অচেনা অচেনা সব উঠোন, ধানগোলা, ভাঙা কোঠাবাড়ি, এ কী বিপদ রে বাবা! বুঝতে পারলুম বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছি অন্য দিকে—।

'বেভ্যান্ত! দেক্‌ভ্যান্ত! হি হি হি!'

ছোট তরফের রাখাল ভজ মুলো মুলো দাঁত বার করে হেসে লুটোপুটি খায়, 'ছরকার মোসায়ের যে বাক্যি! উঃ! বেভ্যান্ত, দেক্‌ভ্যান্ত!'

'খবরদার ভজা, মুলোর বাজার বসিয়ে হাসবি না—'। সরকার মশাই খিঁচিয়ে ওঠেন, 'পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেবো।'

সরকার মশাইয়ের পরনে প্রায় শুকিয়ে ওঠা ভিজে গামছা, হাতে চকচকে করে মাজা পেতলের গাড়ু, পায়ে এক পা কাদা। আর চাম শুকনো দড়া পাকানো বুকে দোদুল্যমান সাত গিঁঠ দেওয়া ময়লা তেলচিটে ব্রহ্মণ্যের পরিচয়টি। যখন তখন পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেওয়ার ফলে, সরকার মশাইয়ের পৈতেয় এত গিঁঠ!

আর তেলচিটে!

সেটা হচ্ছে শ্রীগুণাকর শর্মার ঐতিহ্য। তাঁর মতে, 'পৈতে সাদা, বামুন গাধা!' চারটে পয়সা খরচ করে বাজার থেকে পৈতে কিনে যে গলায় ঝোলাবে, তার পৈতে

ফরসা হবে। আমার এই যজ্ঞোপবীত হচ্ছে তিন সাততে একুশ পুরুষের মহিমার সাক্ষী! এর রং বনেদী হবে না?

কিন্তু ভজা ছোঁড়া ওই 'বনেদী'র মহিমার ধার ধারে না! পৈতেটার দিকে তাকিয়ে হি হি করে বলে, 'আর—ক' বার ছিঁড়বে গো ছরকার মোসাই? গিঁঠে গিঁঠে যে ছয়লাপ! বলি 'বোম্ভতেজ' দেখিয়ে ওই চাঁদ সূয্যির দেশের পেরাণীটাকে ভস্ম করে দাও না? হ্যাঁ তবে বুঝি—।'

'তবে বোঝো! কেমন?' সরকার মশাই গাড়ু নামিয়ে তেড়ে আসেন, 'বলি লক্ষ্মীছাড়া বদমাশ ছোঁড়া, ওই পেরাণীটাকে ভস্ম করলে পুলিসে আমায় রাখবে? ওকে এখন পুলিসে নিয়ে গিয়ে বিলেতে চালান দেবে বুঝলি? সেখানে হিসেব নিকেশ হবে প্রাণীটা চাঁদের না মঙ্গল গ্রহের। তারপর ওষুধে আরকে ভিজিয়ে ইয়া মোটা জারে ভরে চিড়িয়াখানায় কি 'সুসাইটিতে' রেখে দেবে। কত তার মান্য খাতির। সে জায়গায় তাকে আমি ভস্ম করে রেখে দেব? অর্বাচিন আর কাকে বলে?···সে যাক—বড়বাবু, পুলিস এলে আমার নামটি আজ্ঞে বলে দেবেন। প্রথম দেখা প্রথম ডাক শোনা তার একটা মহিমা আছে তো? বিলেত পর্যন্ত দৌড়বে সে নাম।'

'দৌড়ুবে! ওনার নাম বিলেত পর্যন্ত দৌড়ুবে।' ভজ তেড়ে আসে, 'আমি অগ্রে হাঁক শুনন্নু, আমি অগ্রে দেখনু—'

'তুই আগে দেখেছিস?'

সরকার মশাই গামছার খুঁট ছুটো পেটের ওপর চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠেন, 'বললেই হলো? একি মামদোবাজি নাকি? আমি আওয়াজ শুনে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে যেতে গিয়ে—পড়বি তো পড় একেবারে ওটার সামনে! আর তুই কিনা—'

'থামো তো ছরকার মোসাই। বুড়ো হয়ে মরতে চললে, এখনো মিছে কথা রোগ গেল না। তোমার দেখার আগে আমি দেখে ছোটবাবুকে ডাকতে যাইনি? ছোটবাবু ত্যাক্ষুণি এসে গেল না?'

● লোমহর্ষক

'নিশ্চয় !' ছোট তরফ ভরাটি গলায় বলে ওঠেন, 'আলবাৎ ! ভজা যা বলছে, তার একবর্ণ ভুল নয়। ভজা আগে হাঁক শুনেছে, আগে দেখেছে, তারপর আপনার সরকার ফরকার।'

সরকার ফরকার ! বড় তরফের সরকারের প্রতি এই অবজ্ঞা ! বড় তরফ এত অপমান সহ্য করবেন ? তিনি তেড়ে উঠে বলেন, 'খবরদার ছোট ! ছোট মুখে বড় কথা কইবি না বলে দিচ্ছি।'

ছোট তরফও সমান তেজে বলে ওঠেন, 'আপনি যখন বড় মুখে ছোট কথা কইছেন দাদা, তখন আমাকেই ছোট মুখে বড় কথাটা কইতে হবে। ওই অজানা প্রাণীটাকে আগে দেখার গৌরব আমার রাখাল ভজহরি ঘোষের ! ও বেটা পেটের দাদ সারাবে বলে ঘাসের ডগা থেকে শিশির আনতে, শেষ রাত্তিরে মাঠে বেরিয়েছে, শোনে ওই হাঁক ! ভয়ডর তো নেই ছোঁড়ার প্রাণে, তাই এদিক ওদিক খুঁজে—।'

'হ্যাঁ কর্তা, ইদিক ওদিক খুঁজে দেখি উই ঝোপের আড়ালে পেরকাণ্ড পেরকাণ্ড দু'খানা ডানা ঝাপটে ঝাপটে পেরাণীটা আওয়াজ ছাড়ছে। কাছে গিয়ে বলেছি, 'কে ! কে ! আবার সেই—হাঁক। হবেই তো—মানুষের ভাষা তো আর প্রেচার হয়নি এখনো অন্য গেরোয় ?'

অন্য গ্রহে মানুষের ভাষা প্রচার না হলেও, এই 'কুমড়োহাটা'র মত ক্ষুদ্দুর গণ্ডগ্রামেও চন্দ্র গ্রহ মঙ্গল গ্রহের বার্তা প্রচার হতে ত্রুটি হয়নি।

প্রচার বাতাসেই হয়।

ওই অতি প্রাকৃত আওয়াজসম্পন্ন ভয়ংকর দেহী এবং বিরাট দুখানা ডানা সংবলিত প্রাণীটা যে কোনো ভিন্ন গ্রহের, সে বিষয়ে বড় তরফ ছোট তরফ বড় তরফের প্রজাবৃন্দ এবং ছোট তরফের প্রজাবৃন্দ সবাই নিঃসন্দেহ।

পড়েছে সেটা একটা ডোবার ধারে ঝোপের আড়ালে, সেইখান থেকেই ওই রামশিঙের মত প্রচণ্ড আওয়াজ করছে, আর বড় বড় দু'খানা ডানা ঝটপটাচ্ছে। কিন্তু এগোচ্ছে না একচুল !

'পা আছে বলে মনে হয় না—' ছোট তরফ একটু লেখাপড়া জানা, তাই তিনি বলেন, মঙ্গল গ্রহের খবর তো বৈজ্ঞানিকরা সব জেনেই ফেলেছেন। মঙ্গল গ্রহের নয়। মনে হচ্ছে শুক্র গ্রহের। শুক্র গ্রহেই এই রকম—'

বড় তরফ অবশ্য কথা শেষ করতে দেন না, তীব্র গলায় বলে ওঠেন, 'এই রকম! কেমন? শুক্র গ্রহে বেড়িয়ে এসেছিলি বুঝি? আমি বলছি,—এটা চাঁদের জীব। কোনো অতিকায় পাখি!'

'পাখির ওই ডাক?'

ছোট তরফ হেসে ওঠেন।

বড় তরফ আরো চটেন, 'আমি তো বলিনি ছোটো; কোকিল পাখি, কি ময়না পাখি। এ হচ্ছে অতিকায় পক্ষী। এই পৃথিবীতে যেমন আগের কালে অতিকায় হাতি ছিল, অতিকায় কুমির ছিল, তেমনি।'

ভজা সেই শেষ রাত্তিরে সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো আবছা অন্ধকার, ঠিক ঠাহর হয়নি। তবু যেন মনে হয়েছিল তার পাখির মত ছুঁচলো কিন্তু হাত দেড়েক লম্বা একটা ঠোঁট থাকলেও, আর তা'তে একরাশ রক্ত মত কী সব মাখা থাকলেও, কালো ফেট্টি জড়ানো এক জোড়া পাও ওর ছিল মানুষের মত। পুলিস কি বড় সাহেবের আরদালীদের যেমন ফেট্টি জড়ানো থাকে। কিন্তু ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি।

এখন সবাই এসে পড়ার পর প্রাণীটা থেকে সবাই শতহস্ত দূরে আছে, বড় তরফের বাঁশঝাড়ের একখানা বাঁশ এবং ছোট তরফের বাঁশঝাড়ের একখানা বাঁশ লম্বালম্বি শুইয়ে রাখা হয়েছে, ওই শতহস্তের ব্যবধানে যাতে গণ্ডিটা না ডিঙিয়ে ফেলে কেউ। ভজা অবিশ্যি অনেকবার বলেছিল, 'সোম মঙ্গল বুধ বেস্পতি শুক্কুর শনি, কোনো বেটা 'গেরোর সাধ্যি নেই ভজার কিছু' করে। কিন্তু ওকে সবাই আটকেছে। তবু এখন সেই আবছা দেখার অভিজ্ঞতা নিয়েই বলে ওঠে ভজা, 'পা নেই তা নয় আজ্ঞে। পা আছে এক জোড়া। পেরায় মানুষেরই মতন। তবে মনে হলো—যেন ফেট্টি বাঁধা।'

ভজা ছোট তরফের লোক, আর ছোট তরফই ঘোষণা করেছেন পা

নেই, তাই ভজার এই মুখ্যুমীতে জ্বলে গিয়ে ছোট গিন্নী ওপাশ থেকে ঘোমটার আড়াল ভেদ করে ডাকেন, 'ভজা।'

ভজা প্রমাদ গনলো।

গুটি গুটি এগিয়ে গেল। ছোট গিন্নী কড়া গলায় বললেন, 'আবোল তাবোল বকছিস কেন? ছোটবাবু বলছেন পা নেই আর তুই বলবি পা আছে?'

'আজ্ঞে, আছে, এমন কথা তো নিয্যস করে বলি নাই ছোট মা! বলছি পায়ের মতন আছে। তাছাড়া—ফেট্টি মেট্টি জড়ানো। কে অত বোঝে?'

'হ্যাঁ, সেই হচ্ছে কথা।

ছোট গিন্নী বললেন 'আবোল তাবোল বকছিস কেন···

কেউ অত বোঝে না যখন, তখন ছোটবাবু যা বলবেন তাই বলবি।'

'আজ্ঞে তাই বলবো'—বলে ভজা সরে এসে বলে, 'পা আছে একথা আবার কে কখন বলেছে? আছে শুধু পেল্লায় দুটো ডানা।'

ডানা যে আছে তা বোঝা যাচ্ছে। প্রাণীটা যেন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ডানা দুখানা ঝটপট করছে।

আর থেকে থেকে সেই—পাঁচন!

সেই ভয়ংকর ধ্বনি!

শুনে—

একশো হাত দূর থেকে দুশো হাতে ছিটকে যাচ্ছে সবাই। অথচ একেবারে জায়গাটা ছেড়ে যাবার চিন্তামাত্র নেই কারুর।

যে সব গিন্নীরা ভোরবেলা উঠে পূজোপাঠ করেন, তাঁরা থেকে শুরু করে, যে গিন্নী বড়ির ডাল ভিজিয়ে রেখেছেন, কি পিঠেপুলির চাল ভিজিয়ে রেখেছেন, তিনিরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন। বউ ঝি ছোটোমোটোদের তো কথাই নেই।

একটা হেস্তনেস্ত হোক ওর, তবে একপা-ও নড়বে সবাই।

এখন হেস্তনেস্তটি হবে পুলিস এলে। পুলিস ডাকতে যাওয়া হয়েছে! দু' তরফের লোকই গেছে। বড় তরফের লোক গেছে গরুর গাড়িতে, ছোট তরফের লোক সাইকেলে।

দু' জনের দু' ভরসা।

ছোট তরফের ধারণা—তাঁর খবরটা আগে পৌঁছবে, অতএব মুখোজ্জ্বলটা তাঁর।

বড় তরফের ধারণা, ওদের কাছে খবরই পাবে দারোগা, বাইসিকেলের পেছনে ব'সে তো আর আসবে না। এ বাবা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি! শুনবে, আর চড়ে বসবে। হুঁ বাব্বা!

ওদিকে ছোট তরফের দাসী মানদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হ্যাচোং হ্যাচোং গো গাড়িতে চেপে সাত মাইল পথ আসতে দারোগার দায় পড়েছে! ছাইকেলের পিছুতে চড়বে, আর বোঁ করে এসে যাবে।'

বড় তরফের দাসী মোক্ষদা গলা তুলে বলে ওঠে, 'ছাইকেলের পিছেয় চড়তে দারোগার দায় পড়েছে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে ছিগ্রেট্ টানতে টানতে আরামসে আসবে।'

'তুই থামবি মোক্ষদা?'

'তুই চুপ করবি মানদা?'

'আকাশ থেকে জন্তু পড়েছে তোদের মাঠে না আমাদের মাঠে?'

মোক্ষদা খরখরিয়ে ওঠে, 'শোনো কথা, ডোব্বার ধার পর্যন্ত আমাদের না?'

দু'জনে তুমুল ঝগড়া বেধে যায়।

ঝিয়েদের ঝগড়ায় কত্তাদের টনক নড়ে। তাই তো!

কে আগে দেখেছে সেইটা নিয়েই মাথা ঘামানো হচ্ছে, কার জমিতে পড়েছে সেটা তো খেয়ালে আসেনি।

ছোট তরফ সতেজে বলেন, 'ডোবার পশ্চিম ধারটা অবধি আমার!'

বড় তরফ চেঁচিয়ে বলেন, 'ছোট মুখে পাকা কথা কসনে ছোটো। ডোবার নৈর্ঋত কোণটা আমার তা মনে রাখিস। আজন্মকাল ওইখানে আমার তরফের বাসন মাজা হয়।'

'বলি ঝোপে তো আর বাসন মাজা হয় না গো দাদা? ঝোপটা কার? বলি ঝোপটা কার?'

ঝোপটা কার তাই নিয়েও ঝগড়া বাধছিল। হঠাৎ আবার সেই চিৎকার! গরুর হাম্বা, ঘোড়ার চিঁহি, ছাগলের ব্যা—আর গাধার ঘ্যাঁকোর ঘ্যা মিশ্রিত ধ্বনি।

'জানোয়ারটার খিদে লেগেছে'—

ভজহরি কথাটা আবিষ্কার করে। 'কোনকালে কখন উড়ো জাহাজ ভেঙে পড়েছে না কি হয়েছে কে জানে, খিদে লাগতে পারে। রক্তমাংসর শরীল তো বটে।'

গুণাকর শর্মা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে এখন গাড়ুটার ওপরই চেপে বসে পড়েছিলেন, প্রতিপক্ষ ভজহরির মন্তব্যে তেড়ে ওঠেন, 'রক্ত-মাংসর শরীর! বলেছে তোকে! আকাশের জানোয়ারের রক্তমাংস থাকে?'

ভজাও সতেজে জবাব দেয়, 'না থাকুক রক্তমাংস, কাঠ পাথরই থাকুক, দেহ থাকলেই খিদে থাকবে, এই হচ্ছে সারকথা।'

'তবে খাওয়া!' সরকার বিদ্রূপের গলায় বলেন, 'গাই দুইয়ে দুধ জ্বাল দিয়ে খাওয়া। এত যখন দয়ার প্রাণ!'

'দয়া নির্দয়া বুঝি না ছরকার মশাই, আমি আগে দেখেছি, কোত্তব্য আমার। পেরাণীটা খিদেয় ধড়ফড়াচ্ছে, ওকে খাওয়ানোর চিন্তা আমাকেই করতে হবে।'

'ফের বলছিস ভজা, তুই আগে দেখেছিস?'

'একশো বার বলবো! হাজার বার বলবো।'

'পৈতে ছিঁড়ে ব্রহ্মশাপ দেবো ভজা।'

'গামছা-পরা বামুনের বোম্ভশাপ লাগে না হে ছরকার!'

'ভজা তোর মরণ পাখা উঠেছে!'

'তা আজ্ঞে উঠেছে বোধহয়। তবে মরণই যদি হয়, তো ভয়টা ঘোচে। বড্ড ইচ্ছে মরণকালে তোমায় একবার কামড়ে মরি।'

ছোট তরফ একটু মিষ্টি বকুনি ঝাড়েন, 'কী ফাজলেমি হচ্ছে ভজা? বরং ওকে যে কিছু খাওয়াবার কথা বলছিলি—'

'আপনারা যে কাছেই যেতে দিচ্ছেন না। নইলে এতক্ষণে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলতুম।'

'ভাব জমিয়ে ফেলতুম!'

সরকার মশাই খিঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই ওর ভাষা জানিস, না?'

'ভাষা ফাসা বুঝিনে ছরকার মোসাই। পেরাণটা বাড়িয়ে দিলেই ভাব জমে যায় এই হচ্ছে সাদা বাংলা। বলি বুধি মুংলি লক্ষী ভগবতী, এদের ভাষাই কি জানি আমি? না ওরাই জানে আমার ভাষা? তবু গপ্পোটা জমে না ওদের সঙ্গে? মনের পেরাণের সুখদুক্ষুর কথা হয় না?'

'বুধি মুংলির সঙ্গে তোর সুখদুক্ষুর কথা হয়? হা হা হা! পাগলটা কি বলে গো ছোটবাবু?'

ছোটবাবু কি বলতেন কে জানে, ইত্যবসরে দারোগা এসে পড়লেন জিপে চড়ে। গরুর গাড়ি পৌঁছয়নি, চলে এসেছেন সাইকেলে খবর পেয়েই! সাইকেল ছোট তরফের।

ভজ তাই সগৌরবে বলে ওঠে, 'যার কম্মো তারে সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে। ছাইকেলের কাছে গরুর গাড়ি! এখন দারোগাটি আমাদের ভাগে পড়েছেন এই আহ্লাদ।'

সরকার মশাই দারোগা দেখে গামছা বদলে ধুতি পরতে ছুটেছেন, তাই আহ্লাদের জবাব দিয়ে যেতে পারেন না। শুধু পৈতেটা একবার ছিঁড়ে অভি-শাপের মন্তর ছুড়ে, আবার তা'তে গিঁট দিতে দিতে ছোটেন।

কিন্তু ওসব এখন দেখছে কে ?

দারোগা এসে গেছে এইবার রহস্য ভঞ্জন হবে। অতএব মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সবাই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসে।

দারোগা তাঁর সহকারীকে বলেন, 'দূরবীনটা এনেছ ?'

'হ্যাঁ স্যর !'

'ঠিক আছে। হ্যাঁ বলুন আপনাদের বিবরণ ! প্রথমে কখন কি ভাবে— ও কি ? অ্যাঁ।'

দারোগা লাফ দিয়ে ভিড়ের পেছনে চলে আসেন।

'ওই তো স্যর—' ছোট তরফের দাবি অগ্রে, তাই তিনি সগর্বে এগিয়ে এসে বলেন, 'ওই তো। অনবরত ডানা ঝট্‌পটাচ্ছে, ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর থেকে থেকে ওই আওয়াজ ছাড়ছে।'

হঠাৎ ছুটে পালিয়ে লজ্জায় পড়ে গেছেন দারোগাবাবু, তাই হঠাৎই ডাঁট দেখিয়ে বলে ওঠেন, 'তারপর ? বিবরণটা কী ? কখন কি ভাবে কে দেখলো ?'

'আজ্ঞে কত্তা—আমি আগে দেখেছি !' ভজ একগাল হেসে বলে, 'ওই নিয়ে ছরকার মোসায়ের সঙ্গে খুনোখুনি !···বলে কিনা আমি অগ্রে। আমি বলি বললেই হলো ?'

'থামো বকবক কোরো না। প্রথম কেমন দেখলে ? উড়োজাহাজ ভেঙে পড়লো ?'

'কও কত্তা। উড়োজাহাজ আবার ভাঙলো কখন ?'

'তবে ?'

'তবে আবার কি ? আপনি যা দেখছো আমিও তাই দেখছি। এতাবৎ কাল ভোরবেলা থেকে সকল লোক একই দেখছে। চেঁচাচ্ছে আর ডানা ঝটপটাচ্ছে।

'তার মানে ছিটকে এসে পড়েছে। গণপতি, কালকের খবরের কাগজে একটা প্লেন ক্র্যাশের খবর বেরিয়েছিল না ?'

গণপতি দারোগার সহকারী।

চটপটে ছোকরা।

তাড়াতাড়ি বলে, 'সে তো স্যার—মস্কোয়।'

'তাতে কি?' দারোগা ধমক দিয়ে বলেন, 'প্লেন ক্র্যাশ করলে কোথাকার মাল কোথায় ছিটকে যেতে পারে, জানা আছে তোমার? মস্কোতেই তো হবে? অন্য গ্রহে রকেট পাঠাচ্ছে কারা? এই যে গ্যাগারিন বেচারা মারা পড়লো, কাদের দেশের?···ওরাই দিয়েছে রকেট ছুড়ে, রকেট বেটা কোন না কোন গ্রহে গিয়ে একটা প্রাণীকে লটকে নিয়ে এসেছে। এ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী একটা তোলপাড় কাণ্ড হবে বুঝলে গণপতি?'

গণপতি চটপট জবাব দেয়, 'আজ্ঞে স্যর তা' আর বলতে? এই অখ্যাত কুমড়োগাছা গ্রাম পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে যাবে। আর আমাদেরও একটা বড় রকমের উন্নতি টুন্নতি হয়ে যাবে মনে হয়। এখন কথা হচ্ছে ওটার কাছাকাছি এগোনো হবে কি না।···হেড অফিসে একটা ভালমত 'ডেসক্রিপশান' পাঠাতে হবে তো? তাছাড়া কাগজের অফিসে অফিসে—'

ভজা ছোট তরফের কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, 'যা শুনছি বাবু, মনে হচ্ছে এই কুমড়োগাছায় এখন মেলাই র‍্যালা চলবে, দেশদেশান্ত থেকে লোক আসবে, তাঁবু গাড়বে, এলাহী কাণ্ড চলবে। মেলার মাঠে একটা তেলে-ভাজার দোকান দিলে কেমন হয় বাবু?'

ছোট তরফ ভজার দূরদর্শিতায় চমৎকৃত হয়ে লাফিয়ে উঠে বলেন, 'ভজারে তুই মরে গেলে তোর মগজের ঘিলুটা বোতলে ভরে বিলেত পাঠিয়ে দেব। কথার মতন কথা বলেছিস একটা। শুধু তেলেভাজা নয়, ওই সঙ্গে চা-ও। সাহেব সুবোরাও আসবে তো?'

মনে মনে ভাঁজতে থাকেন ছোট তরফ দোকানটাকে।

ইত্যবসরে সরকার মশাই বড় তরফকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, 'এই বেলা গবরমেণ্টকে একটা জানান দিন বাবু, ওই ঝোপটা আপনার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওই বেমক্কা

তাঁর মুখ দিয়ে শুধু আঁ আঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

জানোয়ারটার জন্যে একটা দাম খাড়া করে ফেলুন। বলবেন, আমার জমি, আমার দাবিদাওয়া, দাম না ছাড়লে মাল ছাড়ছি না।'

এখানে এইসব চলছে, ওদিকে দারোগা সাহেব দূরবীন চোখে লাগিয়েই সপাটে মূর্ছা! তাঁর মুখ দিয়ে শুধু আঁ আঁ শব্দ বেরোচ্ছে।

গণপতিই অগত্যা দূরবীনটা বাগিয়ে ধরেছে। সকলেরই হাত নিশপিশ করছিল ওই যন্ত্রটার জন্যে, কিন্তু গণপতি এমন ছেলে নয় যে হাতছাড়া করবে।

গণপতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সামনে এগিয়ে পেছনে হটে, অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ পর্ব শেষ করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'লেখাপড়া জানা লোক কে আছেন এখানে?'

● আশাপূর্ণা দেবী

লেখাপড়া জানা!

ছোট তরফ বড় তরফ মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

হঠাৎ 'লেখাপড়া জানা'র প্রশ্ন কেন?

কতদূর 'জানা' চায়?

'আমরা আছি' বলে অপদস্থ হতে হবে না তো?

তা ইতিমধ্যে ভজা জবাব দিয়ে বসে আছে, 'আবার কে আছে ছোটবাবু মোসাই ছাড়া? আর সবাইর তো পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না।'

'বোমার কথা কী হচ্ছে?'

দারোগা সাহেব গেঙিয়ে চেঁচান।

'কিছু না'—গণপতি বলে, 'তাহলে ছোটবাবুই একটা কাগজ পেনসিল ধরুন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে ফেলুন।...বিবরণটা নিখুঁত হওয়া দরকার, হেড অফিসে পাঠানো হবে। তারপর আপনার গিয়ে ফটোগ্রাফার আসবে—'

ভজা 'হায় হায়' করে বলে ওঠে, 'আজ্ঞে ছোট দারোগাবাবু এত কাণ্ড করবেন, আর পেরাণীটাকে কিছু খাওয়াবেন না? আপনার ফটোগেরাপ কোম্পানি আসতে তো অক্কা পেয়ে পচে গলে যাবে ও।'

গণপতি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, 'আপনাদের এই গ্রামে কথার চাষটা বড় বেশী দেখছি মশাই। ওকে একটু থামতে বলুন তো। মর্ত্যলোকের মানুষেরই মরদেহ। অর্থাৎ মানুষ মরণশীল, মানুষ পচনশীল। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের ব্যাপার আলাদা। দেখছেন তো মহাশূন্যের কোন কোণের থেকে ছিটকে এসে পড়েও মরেনি, গাঁক গাঁকানির চোটে কানেতালা ধরিয়ে দিচ্ছে।'

কথাটা সত্যি।

বাস্তবিকই পাখি অথবা জানোয়ারটা এখন নন্‌স্টপ চেঁচিয়ে যাচ্ছে। যেন কিছু একটা বলতে চায়, কিছু একটা বোঝাতে চায়।

আহা ওর ভাষাটা যদি বোঝা যেত! সবকিছু জলের মত সোজা হয়ে যেত। কিন্তু ভাষা নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। একা এই ভারতবর্ষেই উত্তর

ইন্দ্রনীল—

…লম্বা ঠোঁটটা ফট্ করে টেনে খুলে দিতেই… (লোমহর্ষক…পৃঃ ২৬৯)

দক্ষিণ পুব পশ্চিম ঈশান অগ্নি নৈঋ‌র্ত বায়ু ঊর্ধ্বঃ অধঃ এই দশদিকের ছাড়াও দিকে দিকে আরও কত ভাষা। কেউ কারোটা বোঝে না। আর এ তো ভিন্ন গ্রহের ব্যাপার মানুষ কি পাখি, পাখি কি জন্তু, বোঝবার উপায় নেই।

উপায় নেই, তবু বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। তাই গণপতি প্রবলকণ্ঠে ঘোষণা করে চলে, 'লিখে নিন বৃহদাকার প্রাণী। পাখির ধরনের কিন্তু বীভৎস মুখ। চার পাঁচ ফুট লম্বা ঠোঁট, লিখছেন?'

ছোট তরফ ব্যতিব্যস্ত গলায় বলেন, 'ঝড় বইয়ে বললে চলবে কেন স্যার? একে একে বলুন—'

'একে একে? ওঃ!'

গণপতি মুচকি হেসে বলে, 'তা একে একেই বলছি, যাতে বানান করে নেবার সময় পান।

এক নম্বর হচ্ছে—বৃহদাকার প্রাণী। 'হাতিমি', বা 'বকছপ' জাতীয় কিছু। বীভৎস দেখতে।

দুই—মুখের গড়ন অনেকটা পাখির মত।'

ছোট তরফ তখন 'বকছপ' টুকু বাগিয়ে আনছেন, বলেন, 'মুখের গড়ন কি বললেন?'

'মুখের গড়ন পাখির মতন।'

'এই লিখলাম—মুখের গড়ন—'

'তিন—প্রায় চার ফুট লম্বা শক্ত ঠোঁট। অনেকটা গরুড়ের মত। মনে হয় গরুড়ের জ্ঞাতি ট্যাতির বংশধর।'

'এই লিখলাম গরুড়ের বংশধর।'

'আহাহা খোদ গরুড়ের কেন? গরুড়ের জ্ঞাতির—'

'ওই জ্ঞাতি কথাটা বাদ দিন স্যর। লিখতে সময় লাগবে। আর জ্ঞাতি জিনিসটাও বদখত গোলমেলে।'

'ওঃ তাই নাকি?' গণপতি হেসে উঠে বলে, 'আচ্ছা সট্‌কাট করছি—চার নম্বর হচ্ছে ঠোঁটে রক্তমাখা।'

● আশাপূর্ণা দেবী

'ঠোঁটে রক্তমাখা।'

'পাঁচ—বৃহৎ দুখানা ডানা—'

'লিখলাম বৃহৎ দুখানা ডানা।'

'ছয়—হাত নেই।'

'হাত নেই।'

'সাত—পা আছে।'

'পা আছে।'

'পায়ে কালো কাপড়ের ফেট্টি জড়ানো।'

'পায়ে কালো ফেট্টি।'

'আট—গায়ে বহু বর্ণের পালক। অনেকটা—'

'দাঁড়ান মশাই—' ছোট তরফ প্রায় বকে ওঠেন, 'বহু বর্ণটা লিখে নিতে দিন আগে। হ্যাঁ, হয়েছে। বলুন এখন অনেকটা কি?'

'অনেকটা ওই যে ঘরঝাড়া পালকের ঝাড়ু থাকে? গায়ে তার মত লম্বা লম্বা গোছা গোছা পালক।'

'লিখলাম গোছা গোছা লম্বা লম্বা—'

'নয়—অবিরত শরীরের ওপর দিকটা মাটিতে ঘষটে উলটে পালটে ছটফট করছে—'

'করছে—'

'দশ—বিভীষণ আওয়াজ ছাড়ছে।'

'আওয়াজ ছাড়ছে।'

'এগারো—এখন কিং কর্তব্য?'

'এখন কিং কর্তব্য!'

'ঠিক আছে এখন সই করুন।'

'ঠিক আছে এখন—'

'আহা হা কী আশ্চয্যি।' গণপতি বলে, 'ওটা আবার লিখছেন কেন? কাগজটায় সই করতে হবে, সেই কথাই হচ্ছে।'

● লোমহর্ষক

'আচ্ছা।'

ছোট তরফ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

সইটা করে ফেলেন।

এরপর দূরবীনটার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সকলেই একবার করে কাকুতি মিনতি করতে থাকে।

তবে গণপতি লোক বুঝে দু' একজনকে দেয়। দারোগা এবার ওঠেন, কড়া গলায় বলেন, 'সরকারি যন্তরটা খেলা করবার নয় গণপতি। দাও আমাকে।'

'আপনাকে! আপনি যদি স্বর আবার—'

'থামো!' দারোগা জিনিসটা পকেটে পুরে ফেলে গম্ভীর গলায় বলেন, 'আমি যাচ্ছি কাগজের অপিসে সংবাদটা দিতে। যতদূর মনে হচ্ছে ওটা ওই গরুড় পক্ষীরই জাত। তার মানে চন্দ্রলোক শুক্রলোক নয়, স্রেফ গোলোকের ব্যাপার। বোঝাই যাচ্ছে অমর। নচেৎ মহাশূন্য থেকে আছড়ে পড়েও—কিন্তু অনবরত অমন ছটফট করছে কেন?'

গণপতি বলে, 'ওটাই বোধহয় ওদের নেচার স্বর। ওটাও বরং লিখে দিন। ওই থেকেই বৈজ্ঞানিকরা—ওঃ কী আওয়াজরে বাপ!'

হ্যাঁ এবার যেন মাত্রাছাড়া আওয়াজ ছাড়ছে।

'ঘ্যাকো ঘ্যা…চিঁহি হিঁ, হাম্বা হাম্বা ব্যা—এ্যা ছাড়াও যেন হুক্কাহুয়া, কোঁকোর কোঁ…ঘোঁ ঘোঁ সব কিছু এসে মিশেছে।'

'ইস! যদি একটা টেপরেকর্ডার থাকতো!' গণপতি আপসোস করে।

বড় তরফ বলে ওঠেন, 'আমার বড় শ্যালার মেয়ের ভাগ্নের বাড়িতে আছে ও বস্তু।'

'আছে না কি? কোথায়? কোথায়?'

'আজ্ঞে দিল্লীতে।'

'দিল্লীতে!'

গণপতি একটি অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে। আর ঠিক সেই সময় ওই ভয়ংকর আওয়াজ ছাপিয়ে একটি মনুষ্যকণ্ঠ উদ্দণ্ড নৃত্য করতে করতে ছুটে আসে। কোথায় সে?

কোথায় সেই লক্ষ্মীছাড়া পাজী গোভূত মামদো। দেখে নেব তাকে আমি। আমাকে রাম ফাঁসানো ফাঁসিয়ে, উনি এখানে গোলক বৈকুণ্ঠের স্বর্গপক্ষী সেজে মস্করা করছেন। বেটা তামাক সাজা চাকর, বহু ভাগ্যে একদিন জটায়ু সাজতে পেয়েছিলি, সাতপুরুষে তরে যা। তা নয় উনি মেজাজ দেখাতে এলেন। রাবণের লাথি খাবেন না। আয় তোকে আমি ছাল ছাড়িয়ে ছাড়ি—।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসেন নন্দন নবনাট্যের প্রোপ্রাইটার জগন্নাথ বাগ। হাতে একখানি বেত। এগোতে থাকেন বাঁশটাঁশ ডিঙিয়ে ঝোপের দিকে।

'আরে আরে ওকী করছেন! ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না—' বলে হই হই করে ওঠে সমগ্র কুমড়োগাছাবাসী।

কিন্তু জগন্নাথের দৃক্‌পাত মাত্র নেই। তিনি বেত নাচাতে নাচাতে এগিয়েই চলেন। মুখে সেই বুলি, "বেটা হরিপদ, তামাক সেজে হাতে কড়া-পড়া, স্টেজে উঠে তোমার অহংকার বেড়ে গেল না? 'রাবণের হাতের মার খাবোনা! রাবণটা আমার জ্ঞাতি ভাইপো!' বেশ খা তবে আমার হাতের মার।"

সমগ্র কুমড়োগাছাবাসী হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যায় জগন্নাথ বাগের পিছু পিছু। একজন যখন সামনে আছে ভয় কি। ডানার ঝাপটা লাগে তার লাগবে।

তবে নিঃশব্দে এগোচ্ছে না কেউ।

সকলের মুখে এক কথা, 'ব্যাপারটা কি মশাই? ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার?' জগন্নাথ বাগ ঘুরে দাঁড়ান।

"'ব্যাপার' একেবারে যাচ্ছেতাই। ওই বেটা হরিপদবহুভাগ্যে জীবনে একদিন একটা পার্ট পেয়েছিল। 'জাটায়ু বধ' পালায় জটায়ুর পার্ট! আসল জটায়ুর হঠাৎ জ্বর হওয়ায়—সে যাক, সাজানোর লোক সাজিয়ে টাজিয়ে তো দিল বেটাকে, টিনের ডানা টিনের ঠোঁট, পালকের কোট মুখোসটুখোস সব কিছু দিয়ে, পা দুটো পর্যন্ত ন্যাকড়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঠিক পাখি পক্ষীর মত করে দিল, মুখের সামনে—ঠোঁটের মধ্যে যন্তর বসিয়ে আওয়াজ দিল, বাবু দয়া করে 'বধ' হতে স্টেজে উঠলেন। দেখে মশাই বেশ

বিশ্বাস এল। মিথ্যে বলব না রাবণের সঙ্গে যুদ্ধটাও মন্দ করল না, তারপরই ঘটে গেল ঘটনা।…রাবণ যখন ওর মুখে তীর মেরে তার সঙ্গে আলতার শিশি ঢেলে দিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করে, মাটিতে ফেলে দিয়েছে, একখানি নাগরার গুঁতো, গোভূত কিনা তেড়ে গা ঝেড়ে উঠে ধাঁই ধাঁই করে রাবণকে গোটাকতক লাথি ঝেড়ে গাঁক্ গাঁক্ করে ছুট! বলুন! বলুন মশাই কী অবস্থা তখন আমার! পূরো নাটকটাই মাটি। লোকের হাসির দাপটে—উঃ! এতখানি জীবনে এমন মাথাকাটা ঘটনা ঘটেনি আমার! হইচই লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড! সেই ফাঁকে বেটা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল! এখন দেখছি একেবারে ভেন্ন গাঁয়ে!…পরে 'সীতার' মুখে শুনি বেটা নাকি আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছিল, ভাইপো ব্যাটা যে রাবণ সেজে আমায় পিটোবে, সেটি সহ্য করবো না। যুদ্ধু করে করুক, কিন্তু 'আসল' জটায়ুকে যেমন নাগরার গুঁতো দেয় তেমনটি দিতে এলেই বাছাধনকে বাবার বিয়ে দেখিয়ে দেব।…আমি কি মশাই জানি তা? তাহলে ওকে স্টেজে তুলি?…যাক আয় আজ তুই বেটা হরিপদ, তুই যেমন আমার নাটকের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিস, তেমনি তোর বারোটা বাজাই।"

জগন্নাথ বাগ তেড়ে গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে গরুড়ের জ্ঞাতির বংশধরকে টেনে বার করে তার সেই ফুট চারেক লম্বা ঠোঁটটা ফট্ করে টেনে খুলে দিতেই—স্বর্গপক্ষী মানুষের গলায় হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে, 'টানবেন না কর্তা টানবেন না। দুখানা হাঁটুই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। উঠতে পারছি না খালি কাতরাচ্ছি।'

ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। কাতরাচ্ছি।

তার মানে!

মানেটি জলের মত। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে ছুটতে রাতের অন্ধকারে বেঘোরে কাঁটা ঝোপে আছাড় খেয়ে হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে পড়ে আছেন বাবাজীবন। এদিকে হাত পিছমোড়া করে ডানার সঙ্গে বাঁধা। হাত নাড়তে গেলে শুধু ডানাই নড়ছে। অতএব মুখের চোঙা ঠোঁটটিও নড়াবার সামর্থ্য নেই। কথা কইলেই রামশিঙে ফিট্ করা চোঙের মধ্যে থেকে শুধু আওয়াজ বেরিয়ে আসছে বিকট বীভৎস, কিম্ভূত।

তুলে ধরে দাঁড় করানো গেল না হরিপদকে, পিঠের ডানা, গায়ের পালকের

আলখেল্লা ছাড়িয়ে নিয়ে জগন্নাথ বাগ তাকে গরুর গাড়িতে তুললেন। বললেন, 'দাঁড়া হাসপাতাল থেকে তোর পা আগে সারাই তারপর আবার ওই পা যদি বাঁশ পিটিয়ে না ভাঙ্গি তো আমি জগন্নাথ বাগ নই।'

এতবড় একটা লোমহর্ষক কাণ্ডের কিনা এই পরিসমাপ্তি !

দারোগা সাহেব জিপে উঠে বলে যান, 'অকারণ পুলিসকে হ্যারাস করবার জন্যে আপনাদের নামে 'কেস' হবে বুঝলেন ?'

জগন্নাথ বাগ জিপের ধুলো থেকে নাক·বাঁচাতে কোঁচার খুঁট তুলে নাকে চেপে বলেন, 'আপনাদেরও মশাই বলিহারি ! এরা না হয় মেঠো মানুষ, বলি আপনারা তো রাজা জমিদার ? এখনো শুনতে পাই দু' তরফের রেষারেষির কামাই নেই ! আপনারা কিনা ওই টিনের ঠোঁট আর পালকের কোট দেখেই ভয়ে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন ?'

জ্ঞানশূন্য !

রেষারেষি !

হঠাৎ ছোট তরফ বড় তরফের গলা ধরে ঝুলে পড়ে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'ও দাদা, এ বলে কি ? তোমায়-আমায় রেষারেষি ? হা হা হা !

বড় তরফও ছোটর গলা ধরে হেসে ওঠেন, 'ভয়ে জ্ঞানশূন্য ? হা হা হা ! ভয়ে জ্ঞানশূন্য ! আমরা তো একটু বরং তামাশা দেখছিলাম মশাই ! কী বলিস ছোট ?'

'তা আর বলতে দাদা ! হা হা হা।'

তখন সরকার মশাই আর ভজার মধ্যে হাসির প্রতিযোগিতা চলে, হা হা হা ! এটাও বুঝলেন না আজ্ঞে অধিকারী মশাই ? কে না বুঝেছে এটা স্রেফ রং তামাশা !'

বড় গিন্নী আর ছোট গিন্নীও হেসে কুটি কুটি।

'সত্যি দিব্যি রং তামাশা দেখা গেল সক্কাল বেলা ! বিনি পয়সায় জটায়ু বধ !'

আশা দেবী

ঘুটঘুটে রাতে
বসে লাঠি হাতে
মনে মনে ভাবে পালোয়ান পাঁড়ে,
আসে যদি চোর—
মাপ নেই ওর
এই রাম লাঠি ঝেড়ে দেব ঘাড়ে।

রাত ঝিম্ ঝিম্
তারা টিম্ টিম্
ঝিঁঝি ঝিন্ ঝিন্ চারদিকে ডাকে—
হাওয়া শন্ শন্
ছট্‌ফট্ মন—
ঘুম নামে চোখে—সাড়া ওঠে নাকে।

খুটখুটে পায়—
ও কে চলে যায়।
ধড়মড় জাগে পালোয়ান পাঁড়ে—
কোথা কেউ নাই
তবু কেন ছাই—
জুতোর আওয়াজ তার চার ধারে।
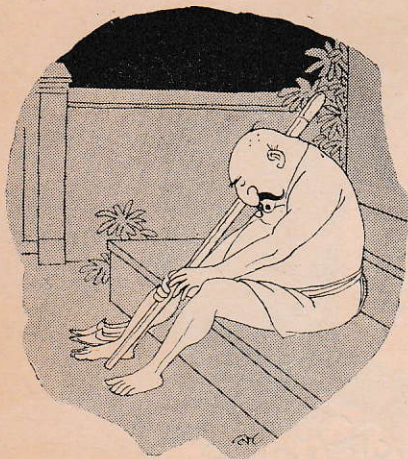
দেখে চমকিয়ে
গেল থমকিয়ে—
তারি খুলে রাখা জুতো একপাটি—
করে খট্‌খট্‌
যায় চট্‌পট্‌—
নেই কারো ঠ্যাং—তবু যায় হাঁটি।

জিন্‌— ; রাম—রাম
বাপরে গেলাম— ;
হলো চিৎপাত পালোয়ান পাঁড়ে—
শুনে সেই স্বর
মস্ত ইঁদুর
জুতো থেকে নেমে—পালালো আঁধারে।

———
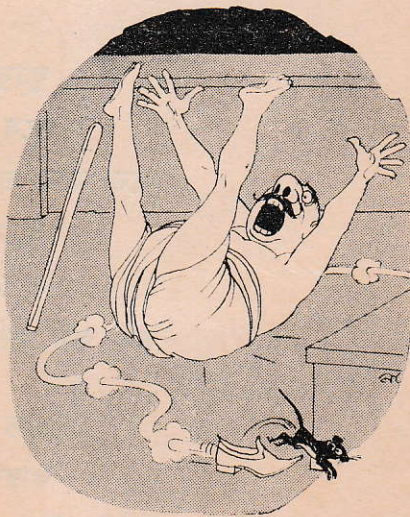
ছদ্মবেশী

ময়ূখ চৌধুরী

খৃঃ পূঃ ৩২৭ সাল… ভারতবর্ষ তখন ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সেই বিভিন্ন ভূখন্ডের উপর রাজত্ব করতেন বিভিন্ন নরপতি। আচম্বিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে হানা দিল দুর্ধর্ষ গ্রীক বাহিনী — তাদের নেতৃত্ব করছিলেন মহাবীর আলেকজান্দার!

খৃঃ পূঃ ৩২৭ সাল … ভারতের বুকের উপর সর্বনাশের ছায়া মেলে এগিয়ে এল আলেকজান্দারের বিপুল বাহিনী … দুরন্ত যবনের তরবারির নীচে লুটিয়ে পড়ল একাধিক ভারতীয় রাজ্য … রক্ত আর আগুনের সেই ভয়ংকর পটভূমিকায় আর্যাবর্তের এক অরণ্যপথে আবির্ভূত হ'ল — আমাদের কাহিনীর নায়ক …
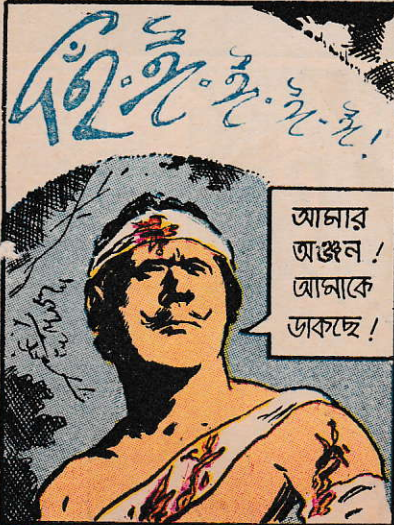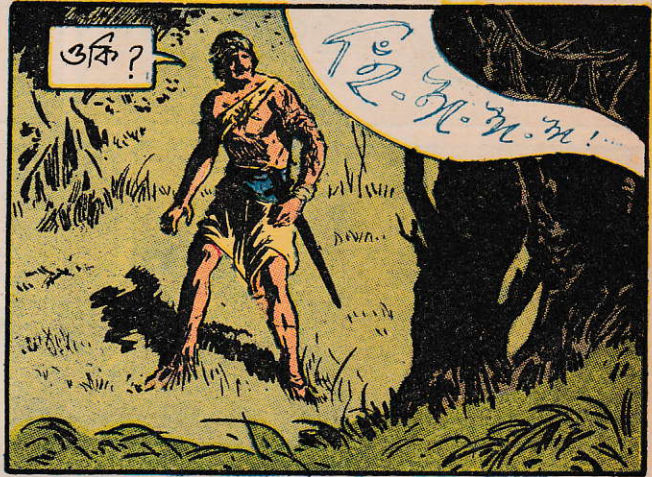
ফেলে দিল !... পারডিকাস পাকা সওয়ার – তাকে ঘোড়াটা ফেলে দিল !..

চিঁ-হিঁ-হিঁ!
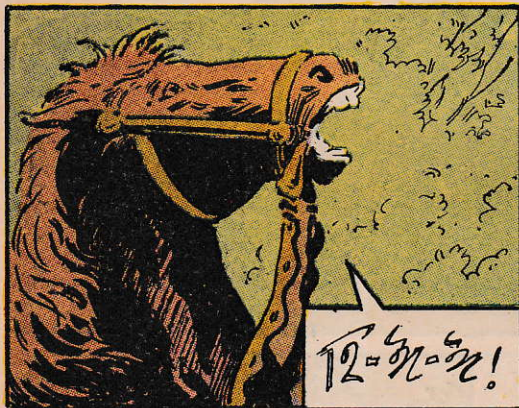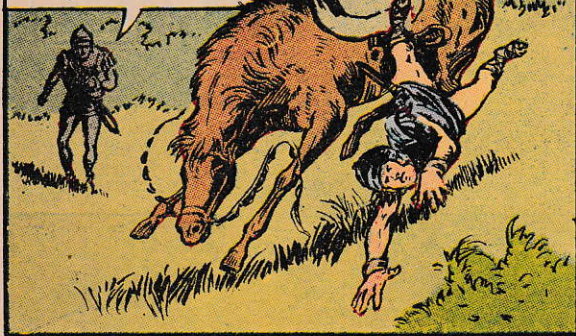
হা! হা! হা!
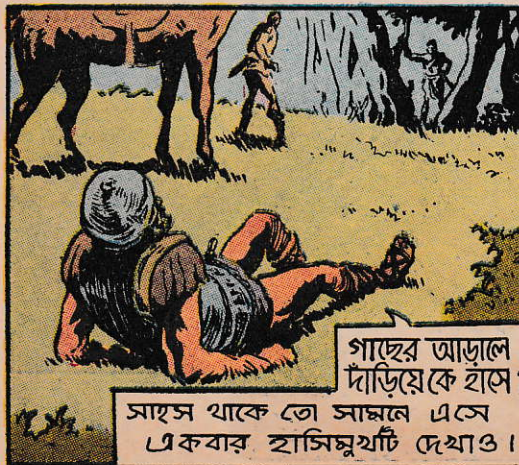
গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কে হাসে?
সাহস থাকে তো সামনে এসে একবার হাসিমুখটি দেখাও।

এই তো এসেছি – হা! হা! হা! ঘোড়াটা বিশেষ শান্ত নয় – কি বলো? হা! হা! হা!

আমার ঘোড়া চুরি করা সহজ নয় — হাঃ! হাঃ!
উদ্ধত হিন্দু! আমাকে তুমি বিদ্রূপ করছো!.. তোমার মৃত্যু নিশ্চিত!

ওহে গ্রীক চোর! আমিও তলোয়ার চালাতে জানি — বুঝেছ?
পারডিকাস! দাঁড়াও! লোকটি আহত! ...

লোকটি আহত — ওর মাথা এবং দেহের বাঁধনগুলি থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে! ওর সঙ্গে লড়াই করা উচিত নয়।

আহত মানুষ বিদ্রূপ করতে পারে কিন্তু নিহত মানুষ কথা কয় না; আমি ওকে হত্যা করব।

ওহে গ্রীক! অত সহজ নয়!..
অনেক যুদ্ধ করেছ — এখন একটু ঘুমাও!
আঃ!

আয় অঞ্জন ! এইবার আমরা চলে যাব…

দাঁড়াও হিন্দু !

দাঁড়াও হিন্দু !
তুমি এখনও—

তলোয়ার ধরতে জানো না।

হঠাৎ অকুস্থলে আত্মপ্রকাশ করল কয়েকটি গ্রীক সেনা !
হেরেস ! এখানে কি হচ্ছে ?

পারডিকাস ! অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে !
এ আবার কে ?
ইনি গ্রীক সেনাপতি সেলুকস।

··· কাল রাত্রে বনের পথে বিশ্রাম করছি, এমন সময়ে একটি ব্যাঘ্র আমাকে আক্রমণ করল। আমি খাপ থেকে তরবারি টেনে নিতে পারলাম না — হিংস্র শ্বাপদ মুহূর্তের মধ্যে আমাকে দন্ত ও নখরের কঠিন আলিঙ্গনে বন্দী করে ফেলল··· অতিকষ্টে কটিবন্ধে আবদ্ধ ছুরিকা টেনে নিয়ে ব্যাঘ্রকে বধ করলাম।

ইতিমধ্যে আমার অশ্ব অঞ্জন ভীত হয়ে পলায়ন করে ··· আজ প্রভাতে বনপথে অশ্বের অনুসন্ধান করছি, অকস্মাৎ হ্রেষাধ্বনি শুনে চমকিত হ'লাম — আমার অশ্বের কণ্ঠস্বর ! এখানে এসে দেখি এই দু'জন গ্রীক সৈনিক আমার ঘোড়া চুরি করার চেষ্টা করছে – পরবর্তী ঘটনা আপনি জানেন।

হেরস! এই যুবকের অভিযোগ সত্য?
সেলুকস! সমস্ত ঘটনা শুনে বিচার করুন…

বনের পথে ঘোড়াটাকে যখন দেখি তখন ওর মালিক সেখানে ছিল না। আমরা যখন ঘোড়া ধরার চেষ্টা করছি তখন এই যুবক হঠাৎ এসে আমাদের চোর বলে বিদ্রূপ করে। তখনই কলহ শুরু হয় এবং —
এবং পারডিকাস যুবকের তরবারির আঘাতে জ্ঞান হারায় আর ——
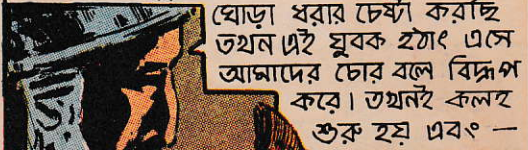
আর হেরেসের অসি করচ্যুত হয়ে ভূমিতে ছিটকে পড়ে… এই ঘটনা তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি … হুঁ … মালিকবিহীন ঘোড়া ধরার জন্য তোমাদের চোর বলা যায় না — তবে এই যুবক বীর বটে…
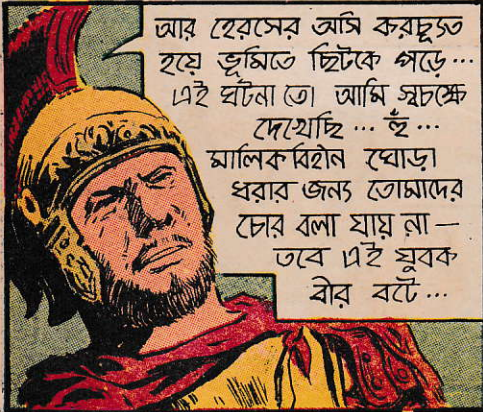
যুবক! তুমি সম্রাট আলেকজান্দারের সেনাদলে যোগ দেবে?
সুদূর মগধ থেকে আমি আসছি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য — পথে এই বিপত্তি…
আমি সম্রাটের সঙ্গে কথা বলতে চাই!

সেলুকস! আপনি ওর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছেন — আমি হইনি! হেরেস আর পারডিকাস লড়াই করতে জানেনা, আর বাঘটা নিশ্চয় রুগ্ন ছিল… হাঃ! হাঃ!

য়াজাক্ষ! এই যুবকের সঙ্গে কলহ করলে আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব.. যাও, একে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাও…
যথা আজ্ঞা!
আমি বনপথ পরিদর্শন করে শিবিরে ফিরব — যাও!
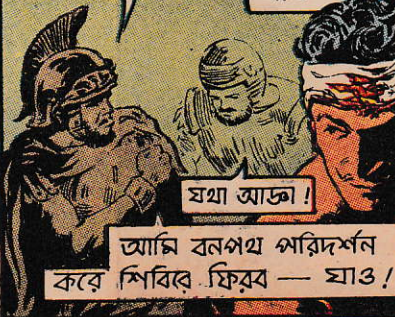
যুবক! সেলুকস বাধা না দিলে আমি তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতাম!
তাই নাকি?… এখন পথ দেখাও!

আলেকজান্দারের শিবির…
এসো যুবক! য়াজাক্সের কাছে সব শুনলাম — তুমি আমার সেনাদলে যোগ দেবে? … তোমার পরিচয় দাও।
সম্রাট! মগধ-শাসিত পিপ্পলীবনের আমি এক নাগরিক, — যুদ্ধ ও রথচালনা আমার পেশা·· আমার নাম —

আমার নাম "চন্দ্রগুপ্ত"। আমি আপনাকে মগধের পথ দেখাব — অবশ্য যদি আপনি আমার শর্তে রাজী থাকেন।

মগধের পথ তোমার পরিচিত·· হুঁ ··· তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে·· কিন্তু কি তোমার শর্ত?
লুণ্ঠিত ধন নিয়ে আপনাকে মগধ ত্যাগ করতে হবে — এই আমার শর্ত!

গ্রীক সম্রাটের গতিবিধির উপর কোনও শর্ত আরোপিত হতে পারে না — আমি এই শর্তে রাজী নই।
আমার শর্তে রাজী না হলে মগধ জয়ের আশা ত্যাগ করুন সম্রাট! সে বড় কঠিন ঠাঁই!
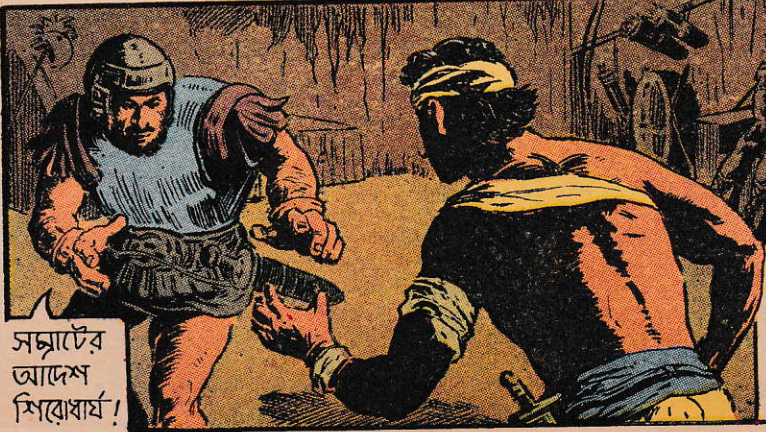
য়াজাক্স! এই উদ্ধত যুবকের জিভ ছিঁড়ে ফেলে ওকে শিখিয়ে দাও কেমন করে সম্রাটের সঙ্গে কথা কইতে হয়!
সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য!

এইবার তোকে পেয়েছি।
যত সহজ ভাবছো —

তত সহজ নয়।

যাজাক্ষ এখন উঠবে না সম্রাট!
যদি তোমাকে বন্দী করি?

আমাকে বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না — সম্রাট!
আলেকজান্দার বীরের সম্মান দিতে জানে··· যুবক, তুমি মুক্ত, যাও!

শিক্ষিত অশ্ব শিবিরের বাইরে অপেক্ষা করছিল···

সেদিনের সেই অখ্যাত যুবক পরবর্তী জীবনে মগধের সিংহাসন অধিকার করে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নামধারণ করেছিলেন এবং তাঁর বাহুবলে জন্ম নিয়েছিল মৌর্য-সাম্রাজ্য —
কিন্তু সে হ'ল ইতিহাসের কথা
আমাদের কাহিনী এখানেই শেষ!

ভূত-পুরান
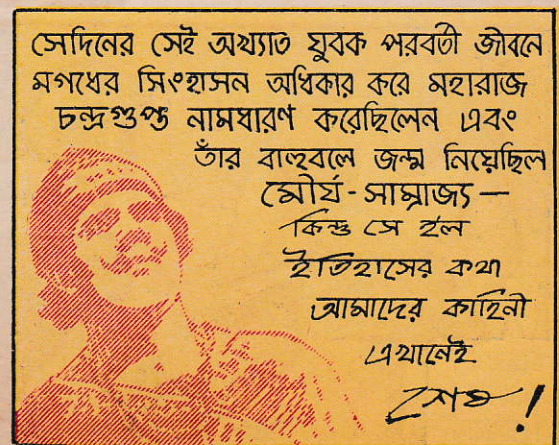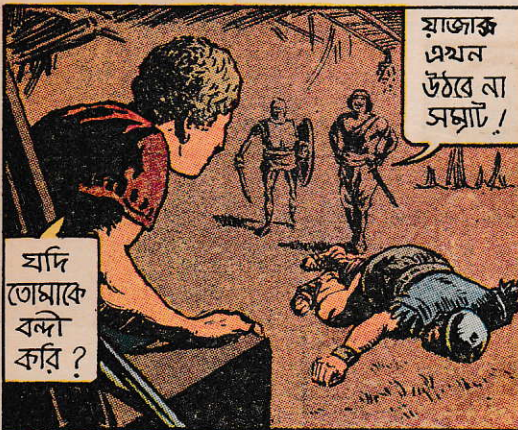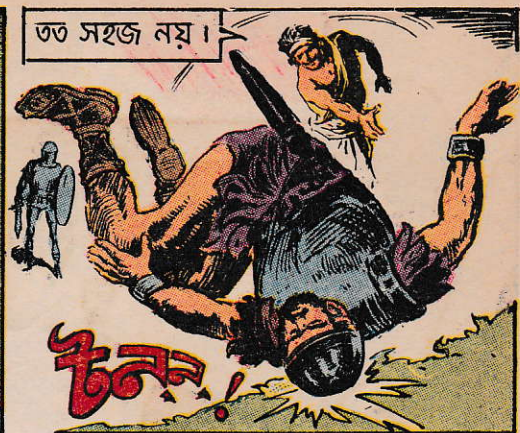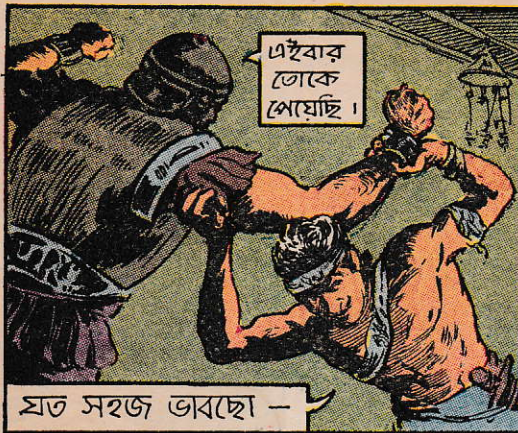
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এ এক যুগান্তরকারী গবেষণা। বলতে গেলে—ধর্ম এবং বিজ্ঞান—ইহকাল এবং পরকাল—জন্ম এবং জন্মান্তর—অদৃষ্টবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ—স্পিরিচুয়ালিজিম এবং কম্যুনিজিম এক কথায় আলো অন্ধকার দিন রাত্রি সমস্ত কিছুর দ্বন্দ্বের বা বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে এতে।

যম দত্ত আমাকে বললেন—এটা যদি তুমি করতে পারহে তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যত সব রাবিশ নভেল আর গল্প লিখে কেন পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়াচ্ছ বল তো? কাগজ কালি পরিশ্রম নষ্ট, পড়তে মানুষের সময় নষ্ট। পড়ে মানুষের মেজাজ নষ্ট। কষ্টের কথা নাই বললাম। ওর তো আর অবধি নাই। ওসব ছেড়ে দিয়ে এই গবেষণাটা কর। বয়স হয়েছে পরকালের কাজ তো কিছু হল না—তা এটা যদি কর তাহলে বাল্মিকীর মরা মরা মরা মরা বলতে বলতে রাম নাম করা হয়ে যাবে।

কথাটা মনে লাগল। উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলে মনে হল। এবং যম দত্তের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাতে আর সন্দেহ রইল না। ভূততত্ত্ব বা ভূতবাদ ও তার সঙ্গে ভূতলোক—

ভূত থাকলে জন্মের মধ্যে জন্মান্তর, নাস্তিক্যবাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ, ইহকালের মধ্যেই পরকাল, বিজ্ঞানের মধ্যেই ধর্ম—এক কথায় নাথিংয়ের মধ্যে এভরিথিং ভূত থেকে ভগবান সব প্রমাণ হয়ে যাবে। কম্যুনিজিম এবং স্পিরিচুয়ালিজিমে পর্যন্ত বিরোধ মিটে যাবে।

যম দত্ত বললেন—কিন্তু রিসার্চ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। একেবারে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে সাদা চোখে যা দেখবে তাই। এর বাইরের কিচ্ছুটির স্থান নেই ওর মধ্যে। একেবারে স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর দাঁড়াতে হবে। সোজাসুজি অঙ্কের মত কাণ্ড।

তা তো হবে। কিন্তু তার পথ কি ?

পথ দত্তই বাতলে দিলেন।—দেখ ভূতেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যা শুনি তাতে মানুষ ভাল নয়। শুনি মানুষ মরলে প্রেত হয়। প্রেতেরা ভূতলোকে এসে সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে বাস করে। তখন তারা মানুষেদের রাজ্যে আসে—ঘোরে ফেরে গাছে কিংবা ঘরে বাসা গাড়ে। সুযোগ পেলে মানুষের সামনেও এসে দাঁড়ায়।—দেখা যায় কারুর দাঁতগুলো মুলোর মত, কানগুলো কুলোর মত, রঙ পোড়া কাঠের মত কালো, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে আগুনের ভাঁটার মত। মানুষের পিছু থেকে বা আশপাশ থেকে বলে—তোঁর ঘাঁড় ভেঙে রঁক্ত খাঁব। কেউ বা ঘরের চালের সাঙার ওপর বসে গোদ হয়ে ফোলা পায়ের মত পা-খানা নামিয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর। কিন্তু সহজে মারতে পারে না। মারতে গেলে ভগবানের স্যাংসন চাই। মানুষের রাজ্যে ফিরে আসতে ভয়ানক ইচ্ছে। কিন্তু মানুষেরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে বাস করতে চায় না, এইজন্যে ওদের ভীষণ রাগ মানুষদের ওপর। ভূতেরা বিচ্ছিরি রকমের বোকা এইজন্যে মানুষেরা তাদের ঠকিয়ে বন্দী করে গোলামির খত লিখে নেয় এবং যা খুশী করিয়ে নেয়। সেই এক নাপিতকে এক ভূত পথে একলা পেয়ে তার ঘাড় ভাঙবে বলে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ফিঁচেল নাপিত চট করে তার কামাবার সরঞ্জাম থেকে আয়না বের করে ভূতের সামনে ধরে বলেছিল—আগে আমার এই চাকর ভূতের সঙ্গে লড়াই কর তারপর আরও আটানব্বুইটা ভূত আছে তাদের সঙ্গে লড়াই কর তবে আমার সঙ্গে হবে। নিরেনব্বুইটা ভূত আমি বন্দী করেছি। আর একটা চাই—

হলেই একশোটা হবে। তখন এই একশোটা ভূতকে আমি রামচন্দ্রের কাছে বলি দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের মত ভূতসিদ্ধ হব। তখন আমি ভগবানকে তাড়িয়ে নিজে ভগবান হয়ে বসব। বোকা ভূতটা আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভাবলে সত্যিই লোকটা ওই ভাঁড়ের মধ্যে আটানব্বুইটা ভূত বন্দী করে রেখেছে। আর ভয়ে—

আমি বললাম—সে সকলেই জানে আমিও জানি। ভূতটার লেজ ছিল। নাপিতের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে হেরে গিয়ে লেজটি কাটা যায়। নাপিতই কেটে নিয়েছিল ক্ষুর দিয়ে। তারপর বেঁড়ে ভূতটার লাঞ্ছনার আর শেষ থাকে নি। "সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর তো রে!"—কথাটা সবাই জানে।

যম দত্ত বললে—তুমি এই বেঁড়ে ভূতটাকে আগে খুঁজে বের কর। বুঝলে! আমি জানি এই বেঁড়ে ভূতটা ওই নাপিতের হাতে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত ভূতেদের সপ্ততীর্থের টোলে শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছিল—সাহেবদের ইউনিভারসিটিতে এম. এস-সি. পাস করেছিল এবং 'ভূতেদের মুক্তির পথ' বলে মস্ত একখানা বই লিখেছে। সম্ভবতঃ সে এখন ভূতাত্ত্বিক পরমাণু শক্তির যানে ঘোস্ট এটমিক এনার্জির বলে নরক থেকে স্বর্গ রসাতল থেকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত স্পেসে ঘোস্ট স্পেস সিপ পাঠাচ্ছে। তার সন্ধান পেলেই বাস—কার্যসিদ্ধি। তুমি সব খবর পেয়ে যাবে। আর ভূতে মানুষে মিলে একেবারে দেবদানবদের দফারফা করে দেওয়া যাবে। এ একেবারে জ—লে—র মত পরিষ্কা—র। বুঝলে তো!

ঘাড় নাড়লাম।—হ্যাঁ বুঝেছি।

যম দত্ত বললেন—তা হলে লেগে যাও। কাল থেকেই। বুঝেছ? পাঁজিতে রয়েছে কাল হল ভাদ্রমাস তর্পণের কৃষ্ণপক্ষ, তিথিতে ত্রয়োদশী পরদিন চতুর্দশী তারপর দিন অমাবস্যা একেবারে যাকে বলে ভৌতিক ব্যাপারে মহেন্দ্রযোগ অমৃতযোগ কম্বাইণ্ড্ টুগেদার। ভূতেদের মধ্যে মহাভূত তাল বেতালের নাম নিয়ে লেগে যাও!

* * *

শুধু তাল বেতাল নয় তার সঙ্গে বেঁড়ে ভূত মহাশয়ের নাম স্মরণ করে পরের দিনই রওনা হয়ে গেলাম ভোরবেলা; এসে ধরলাম ৭টা ৩৫ মিনিটে আমাদের লুপ লাইনের ট্রেন। মতলব লাভপুরে এসে আমাদের বাড়ির গলিপথটার ঠিক উত্তর-দিকে এককালের 'রামাই ভূত' মহাশয়াশ্রিত ভটচার্য বাড়িতে এসে রামাই ভূতের সন্ধান করা।

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সে আজকের কথা নয়—আমার ঠাকুরদাদারা তখন ছেলেপুলে মানুষ। সে ধরুন গিয়ে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। সে-সময় রামাই ভটচাজ; ভটচাজবাড়ির একটি জোয়ান ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল 'নিশিতে'। নিশিও একরকম ভূত। তারা রাত্রে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় চেনা মানুষের গলায় ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে ডাকে। ঘুমন্ত মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় একটু দূরে তার একজন চেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে চলতে থাকে এ লোকটিও চলে। অনেক দূর এসে কোন খালে বা বিলে ডুবে কিংবা শক্ত মাটিতে কি পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে এবং ভূত হয়। রামাইয়ের নিশি ভয়ানক নিশি—সে থাকত গোয়াল ঘরে, রামাই তার ডাকে বেরিয়ে এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে গরুর দড়ি গোয়ালের সাঙায় বেঁধে তাইতে গলায় ফাঁস পরে মরেছিল। রামাইকে নাকি দিনে রাত্রে যখন তখন দেখা যেত। রাত্রে সে গরুদের খেতে দিত। ঘর দোর ঝাঁট দিত। বাড়ির দোরে একটা কলকে ফুলের গাছ ছিল সেটায় চড়ে টাটকা কলকে ফুল তুলে চুষে চুষে মধু খেত। বড় একটা নিমগাছ ছিল উঠোনে, সেই গাছটার নীচের একটা ডালে দাঁড়িয়ে সেই ডগার একটা ডাল ধরে হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো মারি বলে দোল খেত।

বড়দাদা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর কোলে তখন খোকা হয়েছে। বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে নবকৃষ্ণের স্ত্রী মানদা আর বিধবা বোন চণ্ডীদাসী; একজন রান্না করত অন্যজন ঘরে শালগ্রাম সেবার কাজ থেকে অন্য সব পাটকাম করত। ছেলেটি ঘরে কি দাওয়ায় বিছানায় শুয়ে ঘুমুতো। হঠাৎ ঘুম তার ভাঙত হয় তো গায়ে দুধের বা তেলের গন্ধ পেয়ে খুদে পিঁপড়ে এসে কামড়াতো নয় তো ছোট মাদুর বা বিছানায় উঠে থাকা কোন কাঠির খোঁচা লাগত নয় তো দেয়ালা করার মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠত। মায়ের আসতে দেরি লাগত কারণ ভটচাজ বাড়িতে লোকের কাজ থেকে দেবতার কাজ বেশী। তারপর গরুবাছুর আছে। মায়ের ছুটে আসা সম্ভবপর হত না। তখন রামাই নিম গাছের ডাল বা ঘরের সাঙা বা কলকে ফুলের গাছ বা গোয়াল ঘর যেখানেই থাকত সেখান থেকে দুই হাত ল—ম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে (সাঁতারুরা যেমন ভাবে ডাইভ করে তেমনি ভাবে আর কি) সাঁ করে এসে হাজির হত ছেলেটির কাছে এবং উপরের সাঙায় বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে তুলে নিতো। বাচ্চা কচি ছেলে তার ভূতের ভয় ছিল না। ভূত আর মানুষে ঠিক তফাত করতে পারত না—সে কোল পেয়ে চুপ করত। রামাই তাকে দোলা দিতে দিতে আদর করে ফিসফিস খোনা

আওয়াজে বলত—আ হা রে জিঁভে আমার জল সঁরছে কঁচি কঁচি মাংস তাঁজা-তাঁজা রক্ত, ইঁচ্ছে কঁরে ঘাড় মটকে চুষে খেঁয়ে নি। কিন্তু দাঁদার ছেঁলে বংশধর পিণ্ডি দিবি আমাকে, তোঁর ঘাড় কিঁ কঁরে ভাঙি।

ছেলেটা এর মানে বুঝত না ফিকফিক করে হাসত।

বউদি এসে দেখত বিছানায় ছেলে নেই—ছেলে সাঙার কাছে শূন্যে দোল খাচ্ছে। রামাইকে সে দেখতে পেতো না। অনুমানে বুঝত রামাই দোলাচ্ছে। তখন বলত—ঠাকুরপো খোকাকে নামিয়ে দাও ভাই। ওর খিদে পেয়েছে দুধ খাওয়াব।

রামাই সুড়সুড় করে নামিয়ে দিত ছেলেটিকে।

রামাই একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিল বউদিকে। শর্ত করিয়ে নিয়েছিল এই ছেলে যেন বড় হয়ে কখনও গয়া না যায়।

বউদি জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ঠাকুরপো ?

খোনা আওয়াজে রামাই বলেছিল—ন্যাঁকা আমার। জাঁনো না বুঝি ?

—কি জানি না ?

—জানো না গয়ায় পিণ্ডি দিলে ভূত জন্ম থেকে মুক্তি হয় ?

—তা তো ভাল গো !

—ভালো ? তাহলে তো মানুষের মরণও ভালো ! মুক্তি হয় ! দোঁব নাকি তোমার ঘাড়টা ভেঙে ?

ভয় পেয়ে বউদি বলত—দোহাই ভাই তোমার পায়ে পড়ি।

—পায়ে পড়ি ! কেন—মানুষ জন্মে কত হাঙ্গামা বল তো ? খাওয়া দাওয়া, বিষয় সম্পত্তি করা, চাষবাস, পূজো আর্চা, ঝগড়াঝাঁটি—

—না ভাই। তবু মনুষ্যজন্ম সুখের—

রামাই ধমক দিয়ে উঠত—চুঁ—প—বঁলছি। ভূঁত জন্ম আঁরও সুঁখের ! স্বঁর্গেও এত সুঁখ নাই। হুঁ—হুঁ !

বলেই না কি রামপ্রসাদী সুরে গান ধরে দিত—

মন তুমি আঁসল খঁবর জাঁনো না—
ভূঁত জন্ম সুঁখ জন্ম বিনি আঁবাদে ফলে সোনা !

গানটাই শোনা যেত, রামাইকে দেখা যেতো না, দেখা যেতো ভটচাজবাড়ি থেকে খাড়া পশ্চিম দিকে প্রায় শ পাঁচেক হাত দূরে শা পুকুরের পাড়ের উপর যে শ খানেক

হাত উঁচু শিমুল গাছটা আছে সেই গাছটার মগডালটা বিনা বাতাসে একেবারে ভেঙে পড়বার মত ঝাপটা খেলে কিছুর। সে কালের লোকে এর মানে বুঝত। তারা বলত—রাম রাম রাম রাম। কেবল রামাইয়ের বউদি জানত এ হল রামাই। মনের আনন্দে এখান থেকে একলাফে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গাছটার উপর। গাছটা হল গ্রামটার মধ্যে ভূতদের একটা পার্ক বা বেড়াবার হাওয়া খাবার জায়গা!

বউদির সঙ্গে বনত রামাইয়ের কিন্তু বোনের সঙ্গে বনত না। বোন চণ্ডীদাসী বালবিধবা। ভূতকে সে অপবিত্র ভাবত—ঘেন্না করত—বলত মহাপাপী ছিলি ছোড়দা তুই। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চণ্ডীদাসীর কথা বলবার অবকাশ হত। চণ্ডী থাকত মেঝেতে শুয়ে, রামাই থাকত সাঙায়—অবশ্য তাকে দেখা যেত না।

রামাই ধমক দিত—চুঁ—প!

—কেন? চুপ করব কেন? পাপ না করলে ভূত হলি কেন তুই?

—সেঁ গঁলায় দঁড়ি দেঁওয়ার জন্যে।

—তাই বা দিলি কেন?

—নিঁশি ভূঁতে দেঁওয়ালে যেঁ!

—তুই দিলি কেন?

—বঁললে যেঁ খুঁব মজা হঁবে।

—মজা হবে! দেখছিস মজা?

—দেঁখছি না? তুঁই দেঁখছিস না?

—কি দেখব? দেখবার কি আছে?

—তঁবে দেঁখ।

—কি?

—দেঁখ না ওঁপরের দিঁকে চেঁয়ে!

চণ্ডীদাসী দেখত—সাঙার উপর থেকে থামের মত একখানা পা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার বুক বরাবর। কিন্তু চণ্ডীদাসী ভয় পায় না সে দিব্যি সেই থামের মত পা-খানাকে বলে—নাম্ নাম্—নাম্ দেখি! এই পা!

পা কিন্তু নামতে পারে না। থেমে যায়।

সাঙার উপর থেকে কথা ভেসে আসত—তোঁর মত বঁদমাস আঁমি দেঁখিনি। মঁনে মঁনে সেই দঁশরথ রাঁজার বেঁটার নাম কঁরছিস!

হাঁ করে দাঁত মেলে চণ্ডীদাসী বিছানায় উঠে বসত এবং বলত—কামড়াব তোর পায়ে।

আঁ—।

পা-খানা সড়াৎ করে গুটিয়ে যেতো ফুটো-হয়ে-যাওয়া লম্বা বেলুনের মত। চণ্ডীদাসী খিলখিল করে হাসত। তবে মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে ছরছর শব্দে বালি ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা কখনও পিঠের ওপর গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে—অথবা চণ্ডীর মাথায় গোবরের তাল ফেলে দিয়ে তাকে জব্দ করত রামাই।

রামাই ভয় করত আর খাতির করত দাদাকে। দাদা যজমান বাড়ি যেতো—চাল কলা মিষ্টি মণ্ডা ফলমূল বেঁধে নিয়ে আসত পিছন পিছন রামাই পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত বাড়ি। তবে দাদার সামনে কখনও যেতো না। দাদা তাকে ব্যাকরণ কৌমুদী পড়াবার সময় বাখারি দিয়ে পিটত। এবং বরাবর পিছন থেকে হঠাৎ কান চেপে ধরত। ওই ভয়ে সামনে আসত না রামাই।

দাদা একলা মানুষ চাষের সময় বলত—রামাই মাঠের খোঁজ একটু রাখিস। একলা মানুষ। এবার টানের বছর দেখিস যেন চুরি করে জল কেটে না নেয়।

রামাই সারারাত্রি জমির চারিধারে ঘুরে বেড়াতো। একবার চাষী সদ্‌গোপদের ভীমের মত জোয়ান বহুবল্লভ ভটচাজদের জমির জল চুরি করে কেটে নিতে এসে দেখেছিল—সেখানে একটা আচমকা তালগাছ দাঁড়িয়ে। আচমকা মানে অচেনা অর্থাৎ তালগাছ সেখানে ছিল না; আচমকা অচেনা তালগাছটাকে দেখে বহুবল্লভ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ তালগাছ এল কোত্থেকে ?

তালগাছটাই উত্তর দিয়েছিল—আঁয় নে, জঁল কাঁট !

বহুবল্লভ সাহসী এবং বলবান—সে বলেছিল—কে রে তুই ?

—আমি রামাই !

এবার বহুবল্লভ চোঁচা দৌড় দিয়েছিল। রামাই তার বাড়ি পর্যন্ত ধঁর ধঁর—ধঁর—বলে ছুটে এসেছিল পিছন পিছন।

লোকে বলে সে রামাই নয়। এটা ছিল ওর ওই দাদা নবকৃষ্ণের কাজ। রামাই ভূত হয়েছে এই কথা রটনা যখন হল তখন সে মধ্যে মধ্যে তেলকালি মেখে ভূত সেজে এইভাবে মাঠে নিজের জল রক্ষাও করত আবার পরের জল চুরি করেও নিত।

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তা বলুক লোকে। সে লোকেরা নিন্দুক লোক। নাস্তিক লোক। ও কাজ রামাইয়ের! রামাই ছিল অসাধারণ ভূত। বাড়ির হিতৈষী ভূত। তার প্রমাণ আছে। রামাই একবার—বউদি আর বোন চণ্ডীদাসীর অনুরোধে রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে একঝুড়ি মালপো একঝুড়ি মেঠাই একঝুড়ি রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মিষ্টি এনে খাইয়েছিল। ব্যাপারটা বলতে হয়—নইলে পরিষ্কার হবে না। সে বছর রাসের দিন দুই ননদ ভাজে গল্প করছিল কান্দীর রাজবাড়ির রাসের খাওয়ার সমারোহের।

কান্দী রাজবাড়িতে রাধাবল্লভ ঠাকুরের নিত্যভোগেই এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একান্ন পদের ব্যবস্থা; সেই অবস্থার উপর বিশেষ ব্যবস্থা রাসযাত্রা পর্বে। দীয়তাম ভুজ্যতাম ব্যাপার। লোকেরা খেতে বসে পদের পর পদ খেতে খেতে পেট ভরে উঠে এমন চড় চড় করে যে হেউ ঢেউ শব্দে চারিদিক ভরে যায়। দু দশ জন ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি মাম পুণ্ডরীকাক্ষ বলে গড়াগড়ি খায়।

বউটির বাপের বাড়ি কান্দীর কাছে, সেই গল্প বলছিল। বলছিল—এমন মালপো মনোহরা আর রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মেঠাই কখনও খাইনি ভাই ঠাকুরঝি।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—আমি কখনও খাই নাই।

বউ বলেছিল—আমি খেয়েছি, কিন্তু আরও খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কে খাওয়াবে বল? তোমাকে কি বলব—মনে পড়ে নোলা সপসপ করছে।

ঘরে সাঙার উপরে চালের নীচে এক টুকরো খোনা হাসি বেজে উঠেছিল—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

চণ্ডী বলেছিল—এই কি হাসছিস তুই ছোড়দা। ভারী তো ভূত হয়েছিস! শুধু ঝুঁটি ধরে টানতেই পারিস! কই খাওয়া না দেখি! মনোহরা মালপো ফেষ্টফসন্ন—টসন্ন না কি বলছে বউ—সেই মিষ্টি।

কেষ্ট নাম করতে পেতো না চণ্ডী; কেষ্টদাসী নাম ছিল চণ্ডীর শাশুড়ীর। তাই বলেছিল ফেষ্টফসন্ন। হ্যাঁ প্রসন্নকুমার নাম ছিল স্বামীর! যাক সে কথা। এখন যা হয়েছিল তাই বলি। ঘরের ভিতরে যেন একটা দমকা বাতাস উঠল এবং ঘরের দরজা দড়াম শব্দে ঠেলে খুলে বেরিয়ে গেল; হাওয়াটা পাকাতে পাকাতে নিমগাছটার গোড়ায় গিয়ে গাছটার কাণ্ডটাকে ঘিরে পাক দিয়ে ডালপালায় ঝড়ের মত ঝটপটানি জাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সেই মগডালে উঠে সেখান থেকে

আজকালকার জেট প্লেনের মত একটা গোঙানী শব্দ তুলে ঝপাং শব্দে গিয়ে পড়ল শিমুলগাছের মগডালে—সেখান থেকে আর একটা শব্দ।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—মরণ! রকম দেখ। ভূতের কি সবই বিটকেল। যাচ্ছে তারই বিটকেলেমি দেখ তো!

এ বিটকেলেমি তো—যেমন তেমন। এরপর যে বিটকেলেমি করলে রামাই তা শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আধঘণ্টা হবে, তারপরই চালের উপর সে যেন চার চারটে বীর হনুমানের সমান ওজন নিয়ে দমাস শব্দে লাফ খেয়ে পড়ল। পড়ল পড়ল একেবারে আচমকা পড়ল। চণ্ডীদাসীদের গল্প তখন সন্থ শেষ হয়েছে। চুপ করেছে। এই শব্দে দুজনেই চমকে উঠে—বু বু বু বু শব্দে কেঁদে উঠেছিল।

চারটে ঝুড়ি মাথায় বয়ে ঘরে এসে ঢুকে······

চালের উপর তখন মচমচ শব্দ উঠছে—চাল যেন ভেঙে পড়বে। তারপরই তাদের চোখে পড়ল—চাল থেকে উঠোনে এসে নামছে একটি গোদা পা, তা পা-খানা প্রায় নিমগাছের ডালের মত বা তালগাছের মত তো হবেই। তারপরই আর একটা পা, ক্রমে গোটা একটা মূর্তি। মূর্তিটা একেবারে মিশকালো। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নায় সব ফট ফট করছে—তারই মধ্যে কালো মূর্তিটা উঠোনে দাঁড়াল তার মাথার উপর ঝুড়ির গন্ধমাদন—চার চারটে ঝুড়ি থাকবন্দী সাজানো। আর তার থেকে কি সুবাসই না উঠছে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। মূর্তিটা ক্রমে খাটিয়ে গুটিয়ে মানুষের মত হল এবং চারটে ঝুড়ি মাথায় বয়ে ঘরে এসে ঢুকে নামিয়ে দিলে। —নেঁ—খাঁ। এঁকে-

বাঁরে টাটকা। উঁনোন থেঁকে নেঁমেছে আর তুঁলে এনেছি। খাঁ। বলেই চণ্ডীদাসীর ঝুটি ধরে নাড়া দিয়ে দুম শব্দে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লাফ মেরে ঘরের সাঙার উপর পা ঝুলিয়ে বসে খোনা গলায় গান ধরে দিয়েছিল।

মা—গোঁ আঁমায় বাঁচিয়ে রাঁখো।
এই ভূঁত জন্মে মা—জঁন্মে জন্মেঁ. চিঁ-রো জন্ম বাঁচিয়ে রাঁখো।
ইন্দ্র-চন্দ্র-দেবতা থেকে মানুষ দেখলাম লাখো লাখো—
সব ফেলে মা ভূতভাবনের বুকেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো—
মা গো আমায় বাঁচিয়ে রাখো—এই ভূতজন্ম!
ভূতের কত সুখ বলো মা—দুখ নাইকো তিন সীমানায়
অমাবস্যার ভূতের নাচন—নাচছি দেখো মা আজকে রাস পূর্ণিমায়
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং—নাচ—ছি দেখো পূর্ণিমায়।

সে গান সে দিন সকলে শুনেছিল এ গ্রামের। এমন খোনা মিষ্টি গলা আর কেউ কখনও শোনে নি। শুনেছিল আর দেখেছিল নিমগাছটার ডালে পাতায় জোনাকি পোকাগুলো ছুটে গিয়ে নিভিয়ে যাচ্ছে। তার মানে রামাই জোনাকি পোকাগুলো ধরে ধরে খাচ্ছিল।

চণ্ডীদাসী জিজ্ঞাসা করেছিল—ও গুলো খাচ্ছিস কেন? মা গোঃ!

রামাই বলেছিল—জোনাকি পোকা ভূতের জিভে ভারী মিষ্টি আর জোনাকি পোকা খেলে ভূতের রং ফরসা হয়।

* * * *

রামাইয়ের নামে একটা অপবাদ ছিল। লোকে বলত রামাই তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে অবস্থাপন্ন কালীবাবুর বাড়ির দরজায় রোজ ময়লা লেপে দিত। রামাইয়ের সঙ্গে কালীবাবুর ঝগড়া ছিল। রামাই বলত—না। ধেৎ। ওই আমার কাজ হয়? আমি বামুনের ছেলে—আমি ভূত। ও হল পেরেতের কাজ। এক বেটা পেরেত থাকে কালীবাবুর পায়খানায়। সেই বেটা ময়লা মাখায় কালীবাবুর দরজায়। কালীবাবুর শিউলি গাছে আছেন ব্রহ্মচারী পেরেতটা তারই চাকর। ভূত, প্রেত, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্য, জলভূত, গোদানা প্রভৃতি ভূত অনেক। আমাদের গ্রামে বলতে গেলে পদে পদেই ভূত ছিল। রামাইয়ের গল্পই শুনেছি। তার পাত্তাটাত্তা পাই নি। রামাই ভূত মরেছে না মুক্তি পেয়েছে তা জানি না। ভূতেরও মৃত্যু আছে। মরণ হলে ভূত মানুষ হয়ে ফের জন্মায়। আর মুক্তি হলে—কি হয় তা জানি না। সম্ভবতঃ স্বর্গে টর্গে যায়।

রামাইয়ের কাজকর্ম দেখিনি। কিন্তু আমার এক আত্মীয়া মরে ভূত হয়েছিলেন—তাঁর ইট পাটকেল ধুলো কাঁকড়ের মুঠো মুঠো বর্ষণ দেখেছি। আমার আমলেই তিনি মারা গেলেন। এমন ভালমানুষ আমি কখনও দেখিনি। যেমন অফুরন্ত স্নেহময় হৃদয় তেমনি সুন্দর ছিলেন দেখতে—তার উপর কাঞ্চনের সঙ্গে মণির যোগের মত ছিল তাঁর মিষ্ট কথা। আর ভারী মিষ্টি গান গাইতে পারতেন। সেকালের গান। আমার তখন বাচ্চা বয়েস; সে সময় শুধু গান নয়, গান গেয়ে একটুখানি নেচেও দেখিয়েছিলেন।

এই মানুষ মরে ভূত হলেন। আশপাশের বাড়িতে ঢেলা বালি ধুলো মুঠো মুঠো কাঁকড় যেন বৃষ্টি হতে লাগল। এখনই এ বাড়ি তারপরেই পাশের বাড়িতে তারপরই তার পাশের বাড়িতে। দশভুজা বললে যদি বা বেশী হয়, চতুর্ভুজা অনায়াসে বলা যায়। চারটে হাত না হলে এইভাবে ধুলা বালি বর্ষণ হয় না এবং শুধু ধুলা বালি নয়—ইটের টুকরো ইটের আধলা এমন কি গোটা থান ইট পর্যন্ত পড়তে লাগল।

কে ফেলছে ঢেলা? কে ভূত হল—সমস্যা দাঁড়াল। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন—আর কেউ যায়নি—কিন্তু তাঁর মত মানুষ কেন ভূত হবেন? এমন ভাল মানুষ! সকলের বাড়িতে ঢেলা পড়ে—তাঁর বাড়িতে পড়ে না। তাঁর বড় পুত্রবধূ একদিন রাত্রে খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে বললেন—ভূত হয়েছে তো পরের বাড়ি ঢেলা মার কেন? লোকে নিন্দে করে গাল দেয়। তার থেকে নিজের বাড়িতে ফেল। জানান দাও। তা হলে ছেলেরা পিণ্ডি দেবে গতি করবে।

সঙ্গে সঙ্গে দমাস করে সামনেই পড়ল থান ইট।

তারপরই খোনা স্বরে না কি বললে—পিণ্ডি দিলে যে দেবে তার ঘাড় মটকাবো। তারপরই দেখা গেল দুটো তালগাছের মত লম্বা পা,—একটা নিজেদের বাড়ির চালের উপর রেখে অন্যটা বাড়িয়ে দিয়েছে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ের বটগাছের দিকে। লালুকচাঁদা পুকুরটা মজা পুকুর ওখানে শব সৎকার হয় না মুখাগ্নি হয়। ওই বটগাছটা নাকি মর্ত্যলোক আর ভূতলোকের মধ্যে প্রথম হল্টিং স্টেশন। কিংবা খেয়া ঘাট।

লোকে বলে এই ঠাকরুনটি ভূত হয়েছিলেন সন্তানের মমতায়। তাঁর বড় ছেলে তাঁর ভারী প্রিয় ছিল এবং সে ছিল যেমন রোজগেরে তেমনি মাতাল। যেখানে সেখানে মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন। মা ভাত কোলে করে বসে থাকতেন দিনেও থাকতেন রাত্রেও থাকতেন। তারপর দিনের বেলা গ্রীষ্মকালে বেলা দুটো আড়াইটার রোদ্দুরের

মধ্যে গামছা মাথায় ছেলের খোঁজে বের হতেন। রাত্রে রাত্রি দেড়টা দুটো মানতেন না—লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর ছেলের বয়স তখন পঞ্চাশ মায়ের বয়স পঁয়ষট্টি। এই ছেলেকে রেখে মরে তাঁর স্বস্তি হয়নি। মরে ভূত হয়ে পাড়ার একটা গাছে বাসা নিয়েছিলেন। লোকজনদের বাড়িতে ঢেলা মেরে জ্বালাতন করতেন—গভীর রাত্রে তালগাছের মত লম্বা লম্বা দুখানা পা দুটো ঘরের চালের উপর রেখে দাঁড়িয়ে বলতেন—

"আয়রে খোকন ঘর আয়—
বাড়া ভাত তোর জুড়িয়ে যায়।

তাঁর খোঁজও আর পাইনে। বাড়ি ঘরে ঢেলা টেলা আর পড়ে না। তালগাছের মত পা নিয়ে চালের উপরও কেউ দাঁড়িয়ে থাকে না। লোকে বলে—ওই ওঁর বড় ছেলে মারা যাবার পরই তিনি নিখোঁজ।

খোঁজই বা মেলে কার কাছে? রামাইয়ের খোঁজ নেই, কালীবাবুর বাড়ির ব্রহ্মদৈত্যের আর সাড়াটাড়া মেলে না। যে শিউলি গাছটায় তিনি থাকতেন সেটা মরে গেছে। আগের কালে আমাদের কয়েক বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটবার হলে তিনি একটা সাড়া দিতেন। কিন্তু ইদানীং বছর তিরিশেকেরও বেশী কোন সাড়া মেলেনি। তাঁর সে প্রেত চাকরটা যেটা পায়খানায় থাকত—সেটাও নেই। পায়খানাটাই নেই। আজ-কাল স্যানিটারী পায়খানা হওয়ার জন্যই বোধ হয় সে অন্যত্র চলে গেছে।

ওপাড়া যাবার পথে সরকার পাড়ার ঠাকুরবাড়ির সামনে একটা অশ্বত্থ গাছ ছিল। ওখানে কেউ একজন ছিল সে অন্য কিছু করত না তার কাজ ছিল—রাত বিরেতে কেউ কোন খাবার নিয়ে গাছের পাশ দিয়ে গেলে তার পিছন নিত এবং খোনা আওয়াজে বলত—খেঁতে দে। লুচি থাকলে বলত—লুঁচি দে। রুটি থাকলে বলত—রুঁটি দে। মাছ থাকলে আর রক্ষে থাকত না—তিড়িং তিড়িং করে চারিপাশ ঘিরে আনন্দে লাফাতো (দেখা যেত না, কিন্তু শব্দে বোঝা যেত) আর বলত—দেঁরে মাঁছ দেঁরে! ওঁরে বাঁবারে! কঁত কাঁল মাঁছ খাঁই নাই রে। তোঁর পাঁয়ে পঁড়ি রে।

এমন বিনয়ী ভূত—এত সবিনয় নিবেদন যে ভূতের সে ভূতকে মানুষের ভয় খুব লাগত না তবে কেমন যেন গা শিরশির করত। বাপরে যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হাত দিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়?

এখন সে অশ্বত্থ গাছটাই নেই, মরে গেছে। এবং এই বিনয়ী ভূতটির আর কোন সাড়াশব্দ মেলে না। সে ইলিশ মাছের গন্ধেও না। আজ কাল ভাদ্র আশ্বিনে মধ্যে মধ্যে গ্রামেও ইলিশ আসে। কেউ কেউ কলকাতা থেকেও নিয়ে যায়। কিন্তু সেই বিনয়ী মিষ্ট স্বভাবের ভাল মানুষ ভূতটির আর কোন সাড়া মেলে না।

শ্যামাপদ মোদকের বাড়িতে ভূত হয়েছিল—ভূত যে কে হয়েছিল তা বলতে পারি নে—কারণ সে নাম বলত না; নাম বলা দূরের কথা কোন দিন কোন কথাই বলেনি; শুধু তার কাজকর্মটা দেখা যেত। কাজকর্মটা নোংরা কাজ; ওই কালীবাবুর বাড়ির পাইখানাবাসী পিশাচের মত কাজ; সারা বাড়িময় ময়লা নিয়ে যেন চালুনির উপর বড় বড় বড়ি বসিয়ে যেত। ঘরের দোরে মেঝেতে লেপে দিত। সব থেকে বেশী উপদ্রব উনোনে রান্না চাপানো থাকলে তার মধ্যেও ময়লা ফেলে দিত।

পুলিস পাহারা রেখেও কোন প্রতিকার হয়নি। আমরা পাহারা দিয়েও দেখেছি! ভূত ধরা যায়নি। অথচ ভৌতিক ওই কাণ্ড-কারখানা দিব্য চলেছে। শুধু তাই নয়—আমাদের চোখের সামনেই শ্যামাপদ মোদকের বিধবা মেয়েটার সর্বাঙ্গে ময়লা মাখিয়ে দিয়েছে। বিধবা মেয়েটা হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে কোনপ্রকার লজ্জা না করেই বলত—আতর মাখবে? আতর?

পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন আর শ্যামাপদর বউও নেই, তার সঙ্গে ময়লা-ঘাঁটা ভূতটাও যে কোথায় গেছে—কেউ বলতে পারে না। খোঁজ পেলাম না। শ্যামাপদ মোদকের বাড়ির ওধারেই মকবর ঢিপি; এস্থানটি একদা মামদো ভূতের জন্য বিখ্যাত ছিল। মকবর ঢিপি মুসলমানদের বহুকালের কবরস্থান; সেই কোন কালে রোমের বাদশা হারুন অল রশিদের সময় এক ফকির এসে এখানে পাড়ার পত্তন করেছিলেন—তাঁর দরগাকে ঘিরে কত হাজার কবর যে হয়েছে আজ পর্যন্ত তার হিসেব কে বলবে? কিন্তু এককালে সকলেই বলত অমাবস্যা, চতুর্দশী বিশেষ করে শুক্রবারে মামদো ভূতেরা উঠে চেল্লাচিল্লি করত। চেল্লাচেল্লি চরমে উঠলে—হজরত সাহেব আসতেন। এই মেহেদি রঙানো দাড়ি গোঁফ নখ, এই আলখাল্লা এই পাগড়ি পায়ে নাগরা—এসেই বলতেন—যাও সব কবরে ঢুকে যাও। অমনি সব কবরে ঢুকে যেতো। হজরত সাহেব কদমা খেতে ভাল বাসতেন। লোকে তাঁকে কদমার শিরনি দিত। কদমার শিরনি দিলে কোন মামদো তার কোন অনিষ্ট করত না। হজরত সাহেবের নামই হয়ে গিছল—'কদমা সাহেব'। এখন আর কদম সাহেবের পাত্তা পাওয়া যায়

না। মামদোদেরও দেখা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন—দেশ ভাগ হওয়ার সময় তারা দল বেঁধে পূর্বপাকিস্তান চলে গেছে। তার বদলে ঢাকা ময়মনসিং অঞ্চল থেকে এসেছে রেফুজী ভূত। তারা সব চব্বিশ পরগনা নদে মুর্শিদাবাদে একেবারে থিরথির করছে।

একজন ওঝার কাছে শুনেছি—তাদের ভয়ানক বিক্রম। তারা চব্বিশ পরগনা নদে জেলার সীমান্ত অঞ্চলের বনবাদাড় তালগাছের মাথা—বটগাছের ডাল—বেল শ্যাওড়া শিমুল গাছগুলোর ডালপালা চমৎকার ভাবে কাটাই ছাঁটাই করে একেবারে ভূতের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

যাক গে; ও কথা থাক। এখন আমার হাল রিসার্চের কথা বলি। গ্রামে এসে চার রাত্রি জেগে রইলাম। রামাইয়ের নিমগাছের তলায়; শিমুল গাছটা নেই—তার আশপাশটা আছে—সেখানে; লালুকচাঁদার পাড়ে বটগাছটার তলাতেও ঘুরলাম; লালুকচাঁদায় এখন মুখাগ্নি হয় না, এখন হয় নদীর ধারে; লালুকচাঁদার পাড়ে এখন শশী ডোমের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা বাস করে; কোথাও কোন ভূতের সন্ধান পেলাম না। কালীবাবুর বাড়ির কথাও বলেছি। শ্যামাপদ মোদকের বাড়িতেও কোন ভূতের কোন খোঁজ পেলাম না। মামদোদের কথা একটু আগেই বলেছি। গোটা গ্রামটা ঘুরে একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম নতুন কোন ভূতের খবর কেউ জানে কিনা—অথবা পুরনো ভূতগুলো কোথায় গেল তার কোন সন্ধান কেউ বলতে পারে কিনা! কিন্তু হতাশ হলাম। হতাশ হয়েই ভাবছিলাম—'ততঃ কিম্'? কি করব? যে সব কাগজপত্র ছাপিয়েছি—যার মধ্যে আছে একশো প্রশ্ন এবং যার মধ্যে আছে দুশো রকম বিশেষ তথ্যের হেডিং সেগুলো কি বের করে দেশলাইয়ের কাটি জ্বেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেব?

একখানা ফর্ম হাতে করেই ভাবছিলাম। প্রথম দিকটায় আছে তথ্য। এক নম্বর তথ্য হল—ভূতের নাম। অর্থাৎ মনুষ্যজীবনে কি নাম ছিল। দুই—তস্য পিতার নাম। তিন—বিবাহ হয়েছিল কিনা। চার—মনুষ্যজীবনে কোথায় বাসস্থান ছিল। বর্তমানে বাসস্থান কোথায়? এবং এখানে কি করে এল? বাসস্থানটির অল্প বর্ণনা……কোন পতিত বাড়ি বা কোন বৃক্ষ বা কোন জলা বা কোন শ্মশান? বৃক্ষ হলে কোন্ বৃক্ষ? তারপর ভূতটি দেখতে কেমন? পা কটি? হাত কটি? দাঁতগুলি কেমন! পায়ের পাতা সোজা পড়ে বা উলটো হয়ে পড়ে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে আছে দেবী চণ্ডী যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁর

সৈন্যবাহিনীতে অনেক ভূত ছিল। তাদের কারুর ছিল একটা পা, কারুর তিনটি পা বা আরও বেশী— কারুর একটা হাত, কারুর দুটো কারুর চারটে পাঁচটা, নখগুলো নরুনের মত, কারুর তিনটে চোখ, কারুর বা একটা কপালের ঠিক মাঝখানে। গল্পে আছে, দাঁত হয় মুলোর মতন কান হয় কুলোর মতন। এবং হাতি ঘোড়া উট চিবিয়ে খায় সে দাঁতে। আর ধিন তাক তাক করে নাচে। ধুম ধুম দড়াম দড়াম শব্দেও নাচে।

ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায় লিখেছেন—

"চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী। মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী। চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে। চলে শাঁকিনী পেতিনী মুক্ত কেশে।"

দেঁরে মাছ দেঁরে !……কঁত কাঁল মাঁছ খাঁই নাই রে। [পৃঃ ২৯২

দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে তারা যা করেছিল—সে তো ভয়ংকর কাণ্ড।

"মার মার ঘের ঘার হান-হান হাঁকিছে। হুপ হাপ দুপ দাপ—আশপাশ কাঁপিছে। অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে। হূম হাম খুম থাম—ভীমশব্দ ভাসিছে।"

এ তো না হয় যুদ্ধের ব্যাপার। বিয়ের ব্যাপারেও তারা—"ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ—লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে।" "করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া—হাসে হি-হি হি-হি হি-হি।"

সব একেবারে ফক্কিবাজি—ফাঁকি হয়ে গেল। আরব্য উপন্যাসে আছে দস্যুদের

গুহায় কতকালের সঞ্চয় করা ধন ঘড়ায় ঘড়ায় সিন্দুকে সিন্দুকে মজুত ছিল। ভূতের কথা ভূতেদের ব্যাপারও ঠিক যেন তাই। মানুষের মনের গুহায় নতুন নতুন ভূতের কথা মজুত হত। সেই রাজত্বে কোথা থেকে এল হাল আমলের কোন এক কাঠুরে আলিবাবা; এসে—চিচিংফাঁক মন্ত্রটি শিখে নিয়ে—বাস্ ছালায় ছালায় বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে সব ফাঁক করে দিলে! একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলাম না।

ভূত মিথ্যে হয়ে গেল—এ কি কম দুঃখের কথা? হায় হায় হায়!

যে বাড়িটায় বসেছিলাম সেই বাড়িটার পূর্বদিকে একটা বড় পুকুর; পুকুরটার ওপারে লেখাপড়া না-জানা খেটে-খাওয়া মানুষদের পাড়া; আগের কালে সে সব পাড়ায় ডাল পড়লে ঢেঁকি হতো, পাতা পড়লে কুলো হ'তো; মানুষদের বিশেষ করে প্রবীণা বুড়ীদের অহরহ মন যেন কাঁদি-কাঁদি করত। ছুতোয় নাতায় তারা কাঁদতে বসত। বেশ সুর করে উঁচু গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতো। কত কাল আগে মরা বাপ বা ভাই বা যে হোক কাউকে স্মরণ করে কাঁদত—ওরে বাবারে কি দাদারে কি ভাইরে কোথা গেলিরে! একবার আয় এসে আমার দশা দেখে যা রে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠানের কি রাস্তার ধারে গাছটার ডালপালা দুলে উঠত। বুড়ীও কান্না থামাতো, কারণ বুঝতে পারত—দাদা ভূত কি বাবা ভূত এসেছে। এবং বসে ডাল দুলিয়ে সাড়া দিচ্ছে।

আজও যেন কেউ কাঁদছে। সম্ভবতঃ মরা বাপ দাদাদের জন্যে কাঁদছে না। কাঁদছে ওই সব ভূতদের জন্য।

—ওরে ভূতেরা রে! ভাইরে দাদারে বাবারে মারে—তোরাও শেষে মরে গেলি রে? আঃ হায়! হায়! হায়! এমন সোনার ভূতরাজ্যি এমনই করে বোমা মেরে ছারখার খানখান করে দিলে রে! আঃ! সে সোনার রাজ্য বরবাদ হয়ে গেল। পরলোকের পথে—যেখানে পথটা দুমুখো হয়ে একমুখ চলে গেছে নরকে, অন্য মুখ চলে গেছে স্বর্গে—সেইখানে ছিল এই ভূত রাজ্যের হেড অফিস। হেড অফিস সমেত সেই রাজ্যটাই একেবারে নো-পাত্তা! সন্ধান নেই হদিস নেই; স্পেস রাজ্যে কোথায় কোন্ জাদুমন্ত্রে হারিয়ে গেল। এখন তাহলে মানুষদের কি হবে? মরার পর তারা আর স্বর্গেও যাবে না নরকেও যাবে না কিংবা ভূতও হবে না!—ফুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে যাবার মত প্রাণবায়ুটি বেরিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবে। হার্টটি ধুকধুক করতে করতে হঠাৎ ঠুক্ করে থেমে যাবে! তারপর আর কিচ্ছু না। একেবারে নাথিং।

আঃ হল কি? ওপাড়ায় যে কান্নাটা উঠছিল তার মধ্যে যেন এই কথাগুলিই বলছিল সে! শুনতে শুনতে আমার ওই দীর্ঘনিশ্বাসটা ঝরে পড়ল।

তারপর রাগ হয়ে গেল। রাগ হয়ে গেল নিজের উপর। যম দত্তের উপর। পৃথিবীতে যারাই ভূত বিশ্বাস করে বা করত তাদের উপর। এবং তার চেয়েও বেশী রাগ হল ওই ভূতদের অলীক অস্তিত্বের উপর। মনের ওই মিথ্যা বিশ্বাসটার উপর, ইচ্ছে হল—শব্দ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানিয়ে থুথু ফেলে বলি—থু-থু-থু। নিজের কুসংস্কারের উপর থু; মিথ্যে ভয়ের উপর থু। ভূতের কল্পনার উপর থু।—থু-থু-থু-থু।

চোখ বুঁজে চেয়ারে বসে থু-থু শব্দে থুথু ফেলতেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু কারুর গলা ঝাড়ার শব্দে থমকে গেলাম, এবং একটু চমকে উঠে চোখ খুলে দেখলাম কে একজন ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অপ্রস্তুত হলাম।

ভদ্রলোক বললেন—নমস্কার স্যার।

—নমস্কার। প্রতিনমস্কার করে একটু অপ্রস্তুত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম দিব্য ছিমছাম পোশাক, দস্তুর মত পুরনো-কালের ধরনধারণের মানুষ। মাঝখানে চেরা সিঁথি, তেল চুকচুকে চুল, পাকানো গোঁফ, গায়ে পাঞ্জাবি, হাতে আংটি, পায়ে পাম্‌শু। শৌখিন এবং সেকালের বাবু কালচারের আসামী। লম্বা কোঁচাটা ধুলোয় লুটোচ্ছে। কাঁধে একখানা পাটকরা চাদর।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে ভদ্রলোক বললেন—ওঃ অনেক ভাগ্যি আমার, যে আপনাকে ঠিক পাকড়াও করতে পেরেছি। আমাদের গিন্নীমায়ের হুকুম ছিল—যেখানে থাকবেন তিনি সেখানে গিয়ে ধরতে হবে আপনাকে!

—গিন্নীমা? কে গিন্নীমা?

—আজ্ঞে, ভুবন মহলের নাম শুনেছেন?

—ভুবন মহল? সে কোথায়—

—এই দেখুন! ভুবন মহল—জগৎপুর—জীবনগড় এ সবের নাম শোনেননি? আপনার মত ব্যক্তি—

একটু চমকে গেলাম নামগুলো খুবই চেনা। কিন্তু—।

লোকটি বললে—ভুবন মহলকে ত্রিভুবনপুরও বলে। তিন তিনটে বিরাট লাট নিয়ে তিন ভুবনপুর। ওপর ভুবনপুর—মাঝের ভুবনপুর নীচের ভুবনপুর; এদেরই ছিট জমি

নিয়ে হল আমাদের বাজে ভুবনপুর। ওপর মধ্যি নীচ—তিন নাম হয়ে গিয়েছে এখন বাজে ছাড়া আর কোন্ বিশেষণ আছে বলুন। ছিট ভুবনপুরও হতে পারে। কেউ কেউ ছিট ভুবনপুরও বলে। ওই বাজে শিবপুরের মতন। তবে মাহাত্ম্য খুব। গুপ্ত কাশী গুপ্ত বৃন্দাবন—যেমন নব বৃন্দাবনও বাজে হয়েছে আজকাল; তা আমাদের ভুবনপুরকে মাহাত্মিতে অনায়াসে নব কৈলেশ কি গুপ্ত কৈলেশ বলতে পারা যায়। বুয়েচেন না। সেই কোন বাদশাহী না তারও আগের সেই হিন্দু রাজা মান্ধাতার আমল থেকে নাকি এ ছিট ভুবনপুর কাশীর বাবা বিশ্বনাথের নামে দেবোত্তর চাকরান হয়ে আছে। বাবার নামে দেবোত্তর—ট্রাস্টি হলেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুন। এ মহল থেকে বাবা বিশ্বনাথের চ্যালা চামুণ্ডা চাকরবাকরদের খোরপোশ হয়। গিন্নীমা হলেন গিয়ে এই বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদার। শিব হলেন মালিক, অন্নপূর্ণা মা ট্রাস্টি তাঁর অধীনে গিন্নীমা গয়েশ্বরী চৌধুরানী হর্তাকর্তা বিধাতা বাজে ভুবনপুরের।

সেই নতুন মহল—ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী প্রবলপ্রতাপান্বিতা গয়েশ্বরী চৌধুরানী আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করেছেন। নির্দেশ আপনাকে একবার যেতে হবে বাজে ভুবনপুরে, অবিলম্বে। সুতরাং—। লোকটি হাসলে না কিন্তু দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। সেটা অবশ্যই আমাকে কৃতার্থ করবার জন্য তা বুঝতে আমার বাকী রইল না।

লোকটার রং যেমন কালো, দাঁতগুলো তেমনি সাদা। বিশ্রী লাগে। তার সঙ্গে এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটা বেশ পাড়াগেঁয়ে বা সেকালের সেই হুজুরী-হুজুরী হুমকি ফুটে উঠল।

"বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী—"; শুধু গয়েশ্বরী ঠাকরুন নয় মহামহিমার্ণবা। রাবিশ! যেন সেই বাদশাহী নবাবী আমলের খেতাবসুদ্ধ তুগজি লম্বা একখানি নাম। "আবুল মজফ্ফর মহীউদ্দিন মুহম্মদ ঔরংজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী"; বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। হিন্দু আমলে আবার এর থেকেও লম্বা নাম—শুরু "পরমভাট্টারক ত্রিভুবন বিক্রমে" এ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র শেষ ও পৃষ্ঠার অন্ততঃ মাঝামাঝি। উচ্চারণ করতে গেলে অন্ততঃ দুটো দম তো নিতেই হত। যদিই বা তিনটে না হয়।

একালে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে নতুন নাড়াবুনেরা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ হয়ে কীর্তনে হয়েছে যখন এবং যখন মনের খেদে সে কালের রায়বাহাদুর রায়সাহেব বা লেটার প্যাডে

নামের আগের খেতাবগুলো কেটে দিয়ে মুখ রক্ষা করছে তখন—এই লোকটা এমনই নির্লজ্জভাবে বলছে—ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনীদারনি মহামান্যা গিন্নী ঠাকুরানী—প্রবলপ্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী! এবং ওই কালো চেহারায় সাদা দাঁত মেলে হাসছে দেখ দিকি? যাত্রাদলের ক্লাউন বলে মনে হল। বিরক্তির আর সীমা রইল না আমার।

আমি তার দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। কারণ কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি—সঙ্গে সঙ্গে রাগও হচ্ছে। কিন্তু তা প্রকাশ করতেও পারছি না চক্ষুলজ্জায়। সেই কারণে অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে বললাম—মাফ করবেন আমার সময়ও নেই এবং সম্ভবপরও নয়।

লোকটি হাঁ-হাঁ করে উঠল—আরে মশাই, আরে মশাই—বলতে নেই, বলতে নেই। গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ।

লোকটার কথার ধরনধারণ যেমন বিশ্রী তেমনি যেন উদ্ধত। জমিদারি উঠে গেছে, কিন্তু জমিদারী ঢঙ—কেতা মরেও মরেনি। মরে ভূত হয়ে বেঁচে আছে। খুব খারাপ লাগল আমার। মেজাজ চটে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম—গয়েশ্বরী ঠাক্‌রুনের নেমন্তন্ন! গয়েশ্বরী ঠাকুরের নেমন্তন্ন! কিন্তু নেমন্তন্নটা কিসের? পিণ্ডি খাবার না ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের—

কথার মাঝখানেই লোকটা অসভ্যের মত অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল—হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—।

সে-হাসি গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর খেতাবসুদ্ধ নামের চেয়েও লম্বায় আধহাত বেশী তো হবেই। হাতখানেক হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তাই নয়—সে হাসি বিকট, উৎকট এবং অসভ্য। শরীরে রোমাঞ্চ হয়। পিলে চমকে যায়।

বললাম—থামুন মশায় এমন করে হাসবেন না।

হাসি খানিকটা কমিয়ে সে বললে—হাসি কি সাধে মশায়। হাসছি আপনার কথা শুনে। আশ্চর্য মশায় আশ্চর্য। আপনি যেন সর্বজ্ঞ। কথাটা যা বলেছেন, না, সে একেবারে মোক্ষম। একেবারে কাছাকাছি খুব কাছাকাছি গেছেন। প্রায় নির্ভুল। নেমন্তন্নটা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন—খোদ গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাপের শ্রাদ্ধের সভায় আপনার নেমন্তন্ন। পিণ্ডি বাপকে দেবেন। আপনাকে খাওয়াবেন না।

থমকে গেলাম—চমকেও উঠলাম। গয়েশ্বরী ঠাকুরানী কে তাই জানি নে, তা

তাঁর বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ? কেন? বললাম—তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। এবং তাঁর বাপ এমন একটা কোন মহাত্মা নন বা বিখ্যাত নন যে তাঁর গুণগান করতে যেতে হবে আমাকে! আর আমি বামুনের ছেলে হলেও, বামুন পণ্ডিতি করি না। পুরোহিতের কাজও করি না। সুতরাং গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি পারছি না, মাফ করবেন আমাকে।

ভদ্রলোক বললেন—শুনুন স্যর গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাবা কেউ-কেটা নন। মস্ত সম্পত্তিবান্ ব্যক্তি। গয়েশ্বরী তাঁর একমাত্র কন্যা। তিনি তো যাকে বলে মহা-মহিমার্ণবা। এই বয়সে প্রাইভেটে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ পাস করেছেন। আলট্রা মডার্ন মহিলা। স্বামী ছিলেন রাজা লোক। তাঁর রাজ্য তিনি শাসন করেন। তিনি রাজ্য থেকে পূজো-পার্বণ সব উঠিয়ে দিয়েছেন। ধর্মকর্ম সব বরবাদ করে দিয়েছেন। ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পীরোত্তর গড়োত্তর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু তবু তো মশায় দেশের আইন হল পিণ্ডি দিয়ে তবে ধনসম্পত্তি পেতে হয়। "পিণ্ডং দত্তা ধনং হরেৎ।" আপনাকে নেমন্তন্ন সেই জন্যে। আপনি তো ভূতযোনি, প্রেতযোনি, পরলোক স্বর্গ নরক সম্পর্কে রিসার্চ করছেন এবং আপনার একেবারে স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে—এসব হল বোগাস, সব রাবিশ, বাজে কথা। সেই আপনিই সাক্ষী থাকবেন যে গয়েশ্বরী দেবী আলট্রা মডার্ন হয়েও বাপকে পিণ্ড দিয়েছেন। বুঝলেন না—তা হলে আর বাপের সম্পত্তি পেতে ঠাকরুনের কোন কষ্টই হবে না। এই আর কি! আর হাজার হলেও গয়েশ্বরী ঠাকরুনের বাবা—তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটে ভাল কথা বলবেন আর কি!

আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আপনি দয়া করে আসুন। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি অক্ষম।

লোকটার সঙ্গে চোখ জুড়তেও ভাল লাগছিল না আমি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। তাকালাম গ্রামের পূর্বদিকের আকাশের দিকে। আকাশে আকাশ ভরা নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। ক'দিন আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। শূন্যলোকে এতটুকু মালিন্য নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হলেও নক্ষত্রের আলোয় একটা আলোর আভাস ভেসে রয়েছে আকাশের কোল থেকে মাটির বুক পর্যন্ত। গ্রামের গাছগুলোর মাথা আকাশের পটভূমিতে ঘন কালো মাথা জটেবুড়োর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—অনেকগুলো জটেবুড়ো যেন মাটির উপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জটাভরা মাথা নিয়ে কোন একটা জটলা পাকিয়ে

তুলতে চাচ্ছে। অল্প অল্প বাতাসের আন্দোলনে তালগাছের পাতার আন্দোলন ও শব্দের মধ্যে যেন ওরা মাথা নেড়ে নেড়ে ফিসফিস করে মন্ত্রণা করছে বলে মনে হল।

সামনের টেবিলে একটা ঠুক করে শব্দ হল এবং রাম বললে—চা।

ফিরে তাকালাম। চায়ের কাপটা রাম নামিয়ে দিয়েছে এবং অন্য একটা কাপ হাতে নিয়ে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজে, তাকে না পেয়ে আমাকে বললে—সি লোকটি ?

আমিও দেখলাম লোকটি নেই। বুঝলাম, লোকটি সম্ভবতঃ একটু রাগ করেই শেষ পর্যন্ত কোন কথা না-বলেই চলে গেছে। নমস্কার করতেও ভুলে গেছে। বড়লোকদের কর্মচারীদের রীতি চরিত্র এমনই বটে।

বললাম—তাহলে চলে গিয়ে থাকবে। তা যাক্ গে নে। ওরা এমনিই বটে। এখন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রাখ। কালই কলকাতা ফিরব।

রাম বিস্মিত হল একটু। সে বললে—কাল-অ ফিরিবে ?—বলেছিলে না—অনেক-অ দিন-অ থাকিবে !

বললাম—থেকে কি করব ? যার জন্যে এসেছিলাম—তাই হল না—তো মিছিমিছি বসে থাকব কেন ?

রাম করুণ কণ্ঠে বললে—ভূত-অ পাইলে না ? আসিথিলি তো ভূত-অ খুঁজিতে ?

—হ্যাঁ। তা দেখলাম ভূত নাই।

রাম প্রায় কেঁদে ফেললে আমার কথা শুনে। বললে—ভূত-অ নাই ?

—না।

রাম এবার কেঁদেই ফেললে সত্যিসত্যি। ফোঁসফোঁস শব্দ করে চোখ নাক মুছতে লাগল। আমি বললাম—তার জন্যে কাঁদছিস কেন ? ভূত নেই তার জন্যে কান্নার কি আছে ?

রাম এবার কান্না জড়িত কণ্ঠে বললে—তা হলি—মরি, কি হইব ? কোথা যিব ? হে জগবন্ধু !

এবার চমকে উঠলাম। রাম যে কথাটা বলেছে সে তো সোজা কথা নয় ; কথাটা শুনতে সোজা সহজ কিন্তু আসলে তো তা নয় ! হে ভগবান্ ! ভূত যদি নাই তবে মরণের পর মানুষদের হবেই বা কি—এবং তারা যাবেই বা কোথায় ?

রাম বললে—কিন্তু ভূত তো ছিল।

—হ্যাঁ। তা ছিল।

ভূতের ঢেলা খেয়েছি, ভূতের কীর্তির কথা শুনেছি। সুতরাং কি করে বলব ভূত ছিল না।

—ভূত ছিল তো কি হইল? কোথা গেল? মরি গেল?

—হ্যাঁ তাই। আগে ছিল যখন এবং এখন নেই যখন, তখন মরেছে বই কি?

হঠাৎ রাম প্রশ্ন করে বসল—মানুষ মরিলে তো ভূত হইছিল?

—হ্যাঁ।

—ভূত মরিলে কি হইল?

কথাটা গুরুতর। অতি গুরুতর প্রশ্ন।

মানুষ মরে ভূত হয়। তাহলে ভূত মরে কি হয়? রাম আবার প্রশ্ন করলে—ভূত-অ আগে না মানুষ-অ আগে!

কি? ভূত আগে না মানুষ আগে?

প্রশ্ন আরও গুরুতর হয়ে গেল।

মানুষ মরে ভূত হত। ভূত ছিল। এখন ভূতেরা নেই সুতরাং ধরে নেওয়া গেল ভূতেরা মরেছে। তা মরল মরল বেশ করল—কিন্তু মরে গেল কোথায়? মানুষ মরে ভূত হয়, ভূত মরে কি হয়? এবং ভূত আগে না মানুষ আগে?

গত কাল আগে—না আজ আগে? গত কাল গুলো ভূত। আজ হল মানুষ। আগামী কাল—কালকের মানুষ। আগামী কালকের মানুষের কাছে আজকের মানুষেরা ভূত হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে গত পরশুর ভূতগুলোর হল কি? হিসেব মত তো ভূত প্রতিদিনই সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ প্রতিদিনই লোক মরছে অজস্র। এবং প্রতিদিনের আজ অর্থাৎ বর্তমানকাল বিগত হয়ে গতকাল অর্থাৎ ভূত কাল হয়ে যাচ্ছে।

সব যেন জড়িয়ে পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভূতগুলো যাচ্ছে কোথায়? মাথা ঘুরতে লাগল।

এরপর আর সব কথা ভাল করে মনে পড়ছে না। এইটুকু মনে আছে; আমি সারারাত প্রায় দিশে হারিয়ে নানান রকম বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম এবং আমার রাম সারারাত ফোঁসফোঁস করে কাঁদলে।

সেই কান্নায় বিরক্ত হয়ে আমি তাকে গালাগালি করলাম এবং ভূতদের গালাগালি করলাম। এবং সকালে উঠেই চা কাপটিতে পর্যন্ত মুখ না দিয়েই ফাইল টেনে নিয়ে নতুন গবেষণা ফেঁদে বসলাম। "ভূত মুর্দাবাদ"!

"ভূত মিথ্যা; ভূত ছিল না; ভূত নাই; ভূত হইবে না।"

রাম এসে দাঁড়াল সামনে। সারারাত্রি ভূতেদের জন্য কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলো-ফুলো হয়ে উঠেছে। বললাম—কি রে?

সে বললে—আজ যাইবে তো?

—নিশ্চয়।

রাম বললে—রাত্তিরি হইবে তো হাবড়া পঁহুছিতে। গাড়ি লাগি টেলিফোন করি দিতি হবে তো!

রামকে এইজন্যেই ভালবাসি। তার ব্যবস্থা নিখুঁত। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে প্রাণান্ত হয়; সে কথা ভোলেনি সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে কলকাতার বাড়িতে চিঠি দেওয়া থাকে, সেই অনুসারে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে; ট্রেন থেকে নেমেই স্টেশনের মধ্যেই গাড়ি পাই। কোন ঝামেলা থাকে না। এবার যাওয়াটা হচ্ছে হঠাৎ। সেই কারণে রামের হুঁসিয়ারি।

আমাদের ওখানে টেলিফোন হয়েছে নতুন। পোস্টাপিসের পাবলিক কল অফিসে টেলিফোন করতে পাঠালাম ভাইকে। ভাই ফিরে এসে বললে টেলিফোন হল না; সম্ভবতঃ কলকাতার বাড়ির লাইন খারাপ। কোন মতেই সাড়া মিলল না।

অগত্যা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম করলাম রাত্রে হাওড়া পৌঁছুব—গাড়ির ব্যবস্থা কর। টেলিগ্রামখানা দিতে গিয়ে মাথার মধ্যে পোকা নড়ে উঠল—আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে আরও একটা টেলিগ্রাম লিখে বসলাম। যম দত্তকে টেলিগ্রাম করলাম।

"রীচিং টু নাইট। অ্যারেঞ্জ ভেরী বিগ মিটিং। শ্যাল প্রুভ নো একজিস্টেন্স অব ঘোস্টস। নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট! অল্ ঘোস্টস মুর্দাবাদ।"

মনে মনে ভারী তৃপ্তি পেলাম। মনে হল বিজয়া দশমীর দিন রামলীলা ময়দানে বারুদ এবং খড়ে ন্যাকড়ায় এবং কাগজে রঙে তৈরী মিথ্যে রাবণের বিরাট ভয়ংকর মূর্তিটা যেমন রাম বেশী কোন ছোকরার আগুন জ্বালানো তীরে বিদ্ধ হয়ে দাউদাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবেই আমার বক্তৃতার আগুনজ্বলা তীরের ঘায়ে এতকালের মিথ্যে ভয় ও সংস্কারের বারুদ ও দাহ্যপদার্থে তৈরী ভূতটা দাউদাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

পুড়ছে আর আর্তনাদ করছে—বাঁবারে মাঁরে, গেঁলাম রে! মঁলাম রে! পুঁড়ে

ছাঁই হলাম রে। রাঁজা পরীক্ষিৎ নাগযজ্ঞ কঁরেছিল আঁর এঁ করলে ভূঁত যঁজ্ঞ রে! নাগেদের আঁস্তিক মুনি ভাঁগনে ছিল ভূঁতেদের কেঁউ নাঁই রে।

দাউদাউ করে জ্বলছে ভূতেরা আর ছাই হয়ে যাচ্ছে। অথচ এতটুকু দুর্গন্ধ উঠছে না। কারণ ভূতেদের দেহে তো মাংস নেই হাড় নেই চর্বি নেই থাকবার মধ্যে আছে শুধু ছায়া। ছায়া পুড়ে ছাই! তার আর গন্ধ কিসের!

আর রামের মত লক্ষ লক্ষ রাম কেঁদে সারা হচ্ছে। ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। —হায় মরে কোথায় যাব আমরা!

ভূত মিথ্যে ভূত বোগাস ভূত বাজে। ভূত নেই। কিন্তু যম সত্যি। কারণ আজই ওপাড়ার গাঁজাখোর গবা বৈরাগী মরেছে শিবে বাউড়ী মরেছে পাশের গাঁয়ে ক্ষান্ত বুড়ী মরেছে এবং আমার কাছে খবর আসেনি আমি জানি না এমন অনেক লোক মরেছে। দৈনিক কত লোক গড়ে মরে তা পরিসংখ্যানে পাওয়া যাবে এটা স্বীকৃত সত্য।

ভূত মিথ্যে ভূত নেই। ভূত মুর্দাবাদ! কিন্তু যম সত্যি। যমকে জিন্দাবাদ বলি চাই, নাই বলি, যম ছিল যম আছে যম থাকবে। যম থাকলেও যমপুরী নাই। শুধু যমপুরী কেন তার সঙ্গে স্বর্গও নাই নরকও নাই।

* * *

বিকেল বেলা ট্রেন। স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ডাইনে বাঁয়ে পিছনে গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন। হঠাৎ চলে যাচ্ছি শুনে তাঁরা বেলা চারটে থেকেই এসে জিজ্ঞেস করছেন—কি ব্যাপার স্যর? এখানে থাকব বলে এলেন, আর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চলে যাচ্ছেন? কি দোষ হল আমাদের?

বললাম একটু রসিকতা করেই বললাম—কি করব? গ্রামে একটা ভূতও বেঁচে নেই সব মরে বসে আছে আজকের দিনের কেউও মরে ভূত হচ্ছে না যখন তখন কি করে থাকব বলুন? কি হবে থেকে?

তারা মাথা চুলকে বললে—আমরা যে স্যর বেঁচেই ভূত হয়ে আছি তা মরে আর ভূত হই কি করে। আর তার দরকারই বা কি বলুন। আমাদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন না।

বললাম—তা কি করে হবে বলুন? আপনার ছায়া পড়েছে মাটিতে ওই দেখুন—ভূতের তো ছায়া পড়ে না। তারপর আপনি ইচ্ছে করলেই তালগাছের মত লম্বা হতে

পারেন না। বাঁশের মত লম্বা হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে লেবু পেড়ে এনে অতিথ সৎকার করতে পারেন না। আপনার কুলোর মত কান নেই মুলোর মতন দাঁত নেই।

একজন অধ্যাপক বললেন —এ সমস্ত কথা কি আপনি সিরিয়াসলি বলছেন স্যর ?

—নি শ্চ য়। ভ য়া ন ক। সিরিয়াসলি ভী—ষ—ণ সিরিয়াসলি। এই দেখুন কলকাতায় টেলিগ্রাম করেছি মনুমেণ্টের তলায় মিটিং হবে তাতে আমি ঘোষণা করব— প্রমাণ করে ঘোষণা করব মানে ডেমনেস্ট্রেট করে ঘোষণা করব— ভূত নাই ভূত নাই ভূত নাই। ভূত বাজে। ভূত মিথ্যে! ভূতেরা সব মরে গিয়েছে।

—নিশ্চয়। ভয়ানক সিরিয়াসলি
ভী—ষ—ণ সিরিয়াসলি।

—কি করে প্রমাণ করবেন ?

—যে ভাবে ভূতেরা প্রমাণ দিয়েছে। ভূতদের ডেকে সাড়া পাইনি, খুঁজে দেখা পাইনি, ভুতুড়ে বাড়ির অন্ধকার কোণে কোণে লাঠি ঘুরিয়েছি কারুর গায়ে লেগেছে মনে হয়নি। গাছতলা দিয়ে যেতে কোন ভয় পাইনি, আবার কি প্রমাণ ? এই তো এই যেখানে স্টেশন হয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম ওই যে প্ল্যাটফর্মের ধারে বটগাছটা এখনও রয়েছে এই জায়গাটার নামই হল মড়া টাঙাবার ডাঙ্গা। এই সব বটগাছের ডালে আগে মড়া বেঁধে রাখা হত। আমরা বলতাম গাছিয়ে রাখা। ডাঙ্গাটায় রাত্তির কালে ভূতেরা চেল ডিগডিগ খেলত। শুনতাম নাকি অম্বুবাচীর সময় দিনে ওপাড়ায় হত মানুষের মুনিষে মুনিষে কুস্তি রাত্রে এখানে হত ভূত-মুনিষে মুনিষে কুস্তি। কই ? কোথায় ? আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
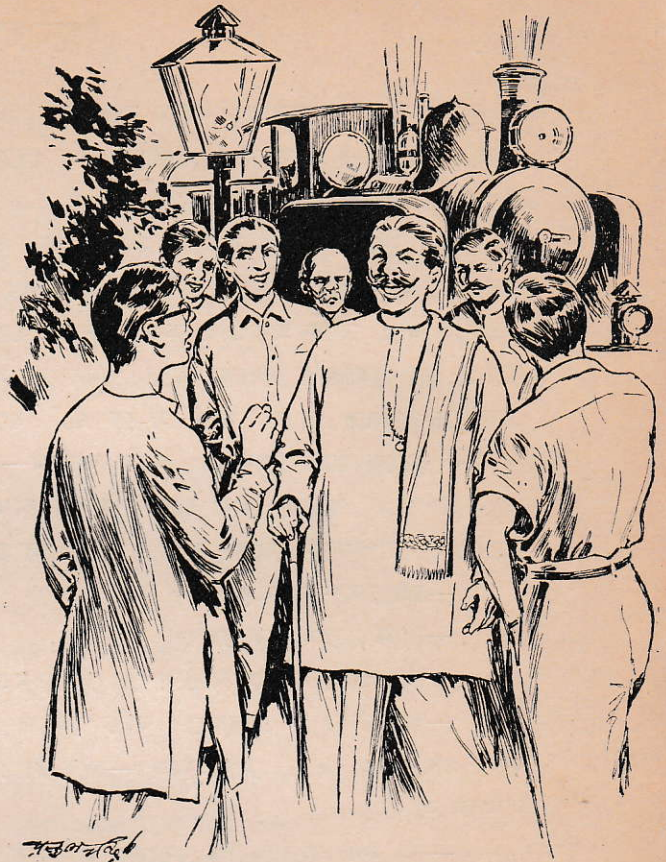
কথাটা শেষ করতে পেলাম না—ভিড় ঠেলে একজন এগিয়ে এসে বত্রিশটি দন্ত বিকাশ করে এই এত বড় একখানি হাসি হেসে বললেন—নমস্কার স্যর! এই ট্রেনেই চলছেন তাহলে?

যত বিরক্তি বোধ করলাম তত বিস্মিত হলাম; কারণ লোকটি আর কেউ নয় লোকটি কালকের সন্ধ্যের সেই মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী গিন্নীঠাকুরানীর দেওয়ান বা দূতটি। কাল যেমন অকস্মাৎ কখন অদৃশ্য হওয়ার মত চলে গিয়েছিল আজও তেমনি হঠাৎ যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ল বা মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল বর্ষার কোন এক ভোরবেলার রাত্রে মাটি ফুঁড়ে ওঠা ওলের বা কচুর ডাঁটির মত। ভুরু দুটি আপনি কুঁচকে উঠল আমার। আমি বললাম—কাল থেকে ছিলেন কোথায়? এ্যাঁ?

লোকটি বললে—কাল চলে গিছলাম আজ আবার এসেছি। আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে যেতেই হবে। না গেলে চলবে না!

—চলবে না—মানে?

—মানে যেতেই হবে স্যর।

—যেতেই হবে। কথাবার্তায় তো দেখছি নবাবী বাদশাহী মেজাজ! যেতেই হবে।

—আজ্ঞে না। এক্কেবারে অতি বিনীত অনুরোধ হাত জোড় করে অনুরোধ। বলে আবার সে দাঁত মেলে দিল।—তবে হ্যাঁ। না গেলে আপনার ভাল হবে না—বুয়েচেন না!

—কি মন্দ হবে? কি করবেন আপনারা?

—ঘেরাও করব।

—ঘেরাও?

—হ্যাঁ ঘেরাও করে আপনাকে আমরা নিয়ে যাব। আমরা পারি সব স্যর। বলিনি এতক্ষণ। এখন বলছি—পারি আমরা সব। বলে সে লোকটা কৌতুকবশে একেবারে হা-হা শব্দে হেসে যেন ফেটে পড়ল।

আমিও রাগে ফেটে পড়লাম—শাট আপ বলছি, শাট আপ!

লোকটা আরও জোরে হাসতে লাগল। আমি এবং আমার সঙ্গের বিশিষ্ট গ্রামবাসীরাও সকলে অবাক হয়ে গেলেন। লোকটা কি?

একজন বলেই বসলেন—কোথাকার অসভ্য হে তুমি?

লোকটা হাসির ডিগ্রী আরও চড়িয়ে দিলে। যার ফলে লোক জমে গেল

চারিদিকে। আমাদের গ্রামের ছেলেছোকরারা জমে গিয়ে তারাও চটে উঠল। ভয়ানক চটে উঠল। এবং সাড়া উঠে গেল লাগাও চাঁটি! চাঁদা করে মারো চাঁটি! জন দুই তিনের হাতও উঠল। আমি তো দস্তুরমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কারণ ছেলেগুলি আজকালকার ছেলে এদের হাত উঠলে সেকালের রানা মহারানাদের উদ্যত হাতের মত কারুর মাথা না নিয়ে নামে না। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত। চট করে বসে পড়েই হোক আর ঠেলাঠেলি করেই হোক কোন এক বিচিত্র উপায়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে চলে গেল স্টেশন প্ল্যাটফর্মের গায়ে যে প্রকাণ্ড বটগাছটা আছে সেই গাছটার দিকে। এবং গাছটার আড়ালে যেন লুকিয়ে পড়ল।

ছেলেগুলি ছুটে গেল তাড়া করে কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রায় ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে ইন করলে, যার জন্য আমিই বললাম—থাক—থাক—যেতে দাও যেতে দাও। ট্রেন এসে গেছে আর হাঙ্গামা করো না।

* * *

ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। আমাদের স্টেশন ছেড়ে কাটোয়া পর্যন্ত আর কোথাও দাঁড়াবে না। কাটোয়াতে নেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। সেই ট্রেনে কলকাতা। ট্রেন-খানা চলেছিল ফুল স্পীডে। আর গাড়িখানা সেই স্পীডের জন্য ভয়ানক জোরে দুলছিল। বারবার খোলা জুতো জোড়াটার এক পাটি এ-দিকে এক পাটি ও-দিকে যেন রাগারাগি করে চলে যেতে চাচ্ছিল। এবং আমার মাথাটা ক্রমাগত কামরার দেওয়ালে ঠকোঠকো ঠক্ ঠকোঠকো ঠক্ শব্দে যেন তবলায় ঠেকা দিচ্ছিল। ট্রেনের চাকায় এবং লাইনে আশ্চর্য এক যন্ত্রসংগীত বাজছিল। ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটাঘং ঘং ঘটা ঘং ঘটাঘং ঘটাঘং ঘং। শুধু ধরা যাচ্ছিল না রাগ বা রাগিণী যাই হোক সেটা কি?

আমি ওই যন্ত্রসংগীতের ঘটাঘঙের সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে গুনগুন করছিলাম ভূতো তাং ভূতোতাং ভূতোতাং তাং। মিথ্যাং মিথ্যাং মিথ্যাং থাং।

ভাবছিলাম একটা পুরো গান যদি বানিয়ে নিতে পারি তাহলে আগামী কালকের বা আগামী পরশুর মিটিংয়ে সেটাকে উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গাইয়ে দেওয়া যেতে পারবে।

প্রথম কলিটা এসেও গেল।

মিথ্যা — মিথ্যা — মিথ্যা — বিলকুল মিথ্যা —। আ——।
ভূত প্রেত ব্রহ্ম-দৈত্যি-একদম মিথ্যা —। আ——।

গাঞ্জা — গাঞ্জা — ষোল আনা গাঞ্জা—।
কষিবারে পাঞ্জা —। বাড়ালাম হস্তং।
ভূত হও প্রেত হও চলে আও — কস্তং —।
বাড়ায়েছি হস্তং—

ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটা ঘটা ঘং ঘং। ট্রেনটার চাকার শব্দ চমৎকার ভাবে হস্তং এবং কস্তং-এর সঙ্গে মিলে গেল। আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম সেই অন্ধকার হয়ে আসা সন্ধ্যার সময়, যাকে আগের কালে আমার পিসীমা বলতেন তিনি সন্ধ্যাবেলা। ঐ সময়টা না-দিন না-রাত্রি। অন্ধকারের মধ্যে দিনটা ডুবে যাবার ঠিক মুখটা। হয় কিনারা নয় সিংহদ্বার। দিন হারায় অন্ধকারে তার মানে দিন মরে। আগের কালে বলত দিন মরে রাত হয় যেমন মানুষ মরে ভূত হয়। রাত কালটা ভূতের কাল। ভূতেদের যত চোরফুট্টি এই রাত্রির অন্ধকারে।

পিসীমা বলতেন সন্ধ্যে হল সূয্যি ডুবল; পাখিরা কলকল কলকল করে ডেকে বাড়ি ফিরল। ওদিকে বেলগাছের ডালের উপর ঘুমন্ত ব্রহ্মদত্যির ঘুম ভাঙল; ন্যাড়া মাথা ব্রহ্মদত্যি উঠে বসে হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিয়ে আওড়াতে লাগল পুণ্যশ্লোক নাগাবাবা পুণ্যশ্লোক জটাধারী পুণ্যশ্লোক নন্দীভৃঙ্গী ভূতপ্রেতের অধিপতি।

ওদিকে গ্রামের ধারে নিমগাছটার ডালে বৈরাগী বাবাজী ভূত তখন উঠে বসে আওড়াচ্ছে "অনন্ত ভূতের লীলা অনন্ত মহিমা ত্রিসংসারে কেহ তার দিতে নারে সীমা। সংসারে আঁতুড় হতে শ্মশান পর্যন্ত। ভূতের অনন্ত লীলা, রূপ তার অনন্ত। আঁতুড়ে পাঁচুয়া রূপে করে অধিষ্ঠান, তার সঙ্গে পেত্নী লয় প্রসূতির প্রাণ। শ্মশানে পিশাচ রূপে করহ ভ্রমণ। বৈরাগীর সমাধিতে গোসাঁই সুজন। কবর আস্তানে তুমি মাম্‌দো জবরদস্ত। বিক্রমে রাজত্ব কর ফেলিয়া বেহেস্ত। কিরিস্তানী গোরস্তানে ফাদার ভূতের রাজ্য। সকলে স্মরণ করি শুরু রাতের কার্য।"

রাজা জমিদার ধনী ভূতেদের বাস ছিল বিরাট বিরাট ভাঙা বাড়িতে; সেখানে সন্ধ্যের মুখে শোরগোল উঠত লোকলশকরেরা সারাদিন ঘুমিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে কাজ শুরু করে দিত। দরওয়াজার মুখে অদৃশ্য ফটক খোলার শব্দ উঠত; সিপাহী দারোয়ানদের নালমারা জুতো পরে মাঠের শব্দ উঠত। ঘোড়াশালে ঘোড়াভূত ডেকে উঠত—হাতিশালে হাতিভূত, উটশালে উটেরা; সারাদিন বাছুর বাঁধা

থাকায় সন্ধ্যের মুখে গাইভূতগুলোর মোড় টাটিয়ে উঠত দুধের চাপে; কাতর হয়ে গাইভূত ডাকতো—হাম্বা।

বাছুরভূত ডাকত—ব্যা-ম-ব্যা!

শব্দ শুনে দেওয়ানজী ভূত ডাকতেন—ওরে বেটা রাখালে ভূত, গাই দুইয়ে ফেল! শুনছিস না অন্দর মহলে খোকাভূতেরা কাঁদতে শুরু করেছে। দুধ চাই।

পদী ঝি ভূত্‌নী খোনা গলায় বলে উঠত—মঁরণ। আঁক্কেল খেঁগো দেঁওয়ান কোঁথাকার ছোঁটবাবু চাঁহা চাঁহা করছে বঁড় কঁর্তা আঁফিং খাঁবে সে কঁথা এঁকবাঁর বলে না গো! বঁড় গিন্নী উঁঠে চাঁ না পেঁলে মাথা খাঁবে।

শুধু তাই নয়। বর্ণনা পিসীমা দিতেন নিখুঁত বর্ণনা। বলতেন—কাকভূত কোকিল-ভূত কলকল করছে ছেলেভূতেরা পড়তে বসেছে—পড়ছে।

সাঁরাদিঁন ঘুঁমাইয়া সঁন্ধ্যা বেঁলা উঁঠে, ভূঁতেদের পুঁত মোঁরা মঁন দিঁনু পাঁঠে।
ভূতের কঁর্তব্য শুঁন ভূঁত পুঁত সঁব সাঁরা রাঁত্রি ভূঁত নৃঁত্য ভূঁত উপদ্রব॥
দুপদাপ ঢেলা ফেল—ঝর ঝর ধুলা ধেই ধেই ধেই নাচে দুলুক গাছগুলা।
গাছতলা দিয়ে যখন মানুষেরা যাবে পা-খানি বাড়ায়ে দিয়ে মাথায় ঠেকাবে।
খোনা সুরে কথা বলে খিল খিল হেসে সুযোগ পেলেই বাছা ধরবে টেনে কেশে।

ভূতেদের পাঠ্যপুস্তকের কবিতাটি পর্যন্ত পিসীমা সেকালে বাপ-পিতামহের কাছে শুনে শিখেছিলেন। তাই বা কেন, হয় তো নিজেই কানে শুনে শিখেছিলেন। পিসীমা আফিং খেতেন, মোটা এক ডেলা আফিং। সন্ধ্যে আটটার পরই চা সহযোগে আফিং খেয়ে ঢুলতে বসতেন—তখন ওই আধো তন্দ্রা আধো জাগরণের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের কথা শুনতে পেতেন না। পৃথিবীর মানুষরা যা শুনতে পেতো না সেইসব কথা শুনতে পেতেন।

পেতেন, এই কথা বলতেন তিনি। তিনি কেন সেকালে সকল লোকই বলতেন। বলতেন কেন—সত্যই শুনতেন শুনতে পেতেন। দেখতেও পেতেন। শুধু আমাদের দেশে কেন সকল দেশের মানুষরাই শুনতেন—এবং দেখতে পেতেন। কিন্তু—।

আমার অন্তর তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের মেহের আলির মত চিৎকার করে উঠল সব ঝুট হ্যায়। ওঃ ভূতগুলোর কাউকে যদি এখন সামনে পেতাম তাহলে—নাকের কাছে ঘুঁষি ঝেড়ে দিয়ে বলে উঠতাম—তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকিতে সারা ট্রেনখানা ঝনঝন

ঝরঝর ধরনের একটা প্রচণ্ড শব্দ তুলে যেন উলটে যাচ্ছে বলে মনে হল। চমকে উঠতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। তার আগেই যেন কি হয়ে গেল। সম্ভবতঃ অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বা যাচ্ছিলাম। কিন্তু গেলাম না। অর্থাৎ অজ্ঞান হলাম না।

আশ্চর্যের কথা সেই লোকটা, সেই অবাঞ্ছিত কালকের এবং আজকের লোকটা বাজে বা ছিট ভুবনপুরের পত্তনিদারনী গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর সেই প্রগল্ভ দূতটি আমাকে রক্ষা করলে। ট্রেনখানা যখন হুড়মুড় ঘটমট ঝনঝন বা ঝরঝর করে উলটে পড়তে যাচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সেই লোকটা লাফিয়ে আমার কামরাখানায় জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে সেই দাঁত বের করেই বললে—বেরিয়ে আসুন স্যার জানালা দিয়ে। বেরিয়ে আসেন। নইলে গেলেন! মাথাটা গলিয়ে দিন জানালার ভিতরে।

তাই দিলাম। লোকটা আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার সেই বিচিত্র লম্বা হাতখানার উপর আমাকে শুইয়ে দিব্যি বের করে এনে লাইনের পাশে একটা গাছের ধারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মাথায় আঘাত লেগেছিল মাথাটা ঝিমঝিম বা টনটন এমনি কিছু করছিল। লোকটি হেসে বললে—ও ভালো হয়ে গেছে। দেখুন না। ভালো হয়নি?

সত্যিই ভালো বোধ করছিলাম ক্রমশঃ—বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু হল কি? ঘটলটা কি?

লোকটি বললে—দেখুন না! আপনার কামরাটারই চাকা লাইন থেকে সরে গেছে। খুব ভাগ্যি একদম উলটে যায়নি।

আকাশে চাঁদ ছিল। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদ। হালকা জ্যোৎস্নার মধ্যে খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে গেছে মাঠের মধ্যে। ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোঁ শোঁ শব্দে ডাক ছাড়ছে, লোকজনে সব গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দেখছে—কি হয়েছে। আমার কামরাখানা ছিল ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস কম্বাইণ্ড বগি। আমিই একলা যাত্রী ছিলাম তাতে। এই গাড়িখানার চাকা লাইন-চ্যুত হয়ে ডিরেল্‌ড হয়ে গেছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল—লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে যেন কালো কালো ছায়ার মত অসংখ্য লোক। অসংখ্য লোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কারা?

লোকটি বললে—মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর পাইক বরকন্দাজ এবং লেঠেল পালোয়ানের দল!

—তার মানে?

লোকটি বললে—ওই দেখুন।

—কি?

—এই এদিকে—মানে পিছন দিকে তাকান। হ্যাঁ। দেখছেন?

—দেখছি। কিন্তু কি ব্যাপার? আলো, লোক।

—হ্যাঁ। সব গয়েশ্বরী দেবীর লোক। আপনাকে নিতে এসেছে। আপনার কামরাটাকে তারাই—মানে ওই লাইনের ওপাশের ওরাই দলবল নিয়ে জুটে ঠেলে ডিরেলড্ করে দিয়েছে। আপনি তো ভালোয় ভালোয় গেলেন না! এখন ওই সব লোকজন আসছে আপনাকে রিসেপশন দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বলেছিলাম তো—আপনাকে স্যার যেতেই হবে!

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম—দূরের আলোর শোভাযাত্রার দিকে। কি আলো? ঠিক তো হেজাক পেট্রোম্যাক্স অর্থাৎ কেরোসিন গ্যাসের আলো নয়। কেরোসিনে ভিজানো পলতের মুখে জ্বলা শিখা অথবা মশালের আলোয় যে ধরনের লালচে আলো জ্বলে—মাথার উপরে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে তা তো নয়। এমন আলো তো কখনও দেখিনি!

আলোগুলি কাছে এনে দেখলাম—সত্যই আলোগুলি বিচিত্র—একেবারে নতুন ব্যাপার। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের জগতেও একরকম অভিনব। একটা লম্বা ডান্টির ডগায় জোনাকি পোকার বড় বড় তাল যেন জমিয়ে রাখা হয়েছে, সে পঞ্চাশ ষাট হাজার না লাখ লাখ না সে যে কত তা বলা খুব শক্ত। তবে হেজাক পেট্রোম্যাক্সের মতই উজ্জ্বল। অহরহ দীপ্ দীপ্ করছে। জোনাকিগুলো জ্বলে আর নেভে; সে হিসেবে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু লক্ষ্য করে দেখে বুঝলাম—জোনাকিগুলোর অর্ধেকগুলো যখন জ্বলছে তখন অন্য অর্ধেকগুলো নিভছে এবং জ্বলন্ত-গুলো যখন নিভছে তখন নিভন্ত জোনাকিগুলো জ্বলে উঠে আলোর মাপটা ঠিক বজায় রেখে যাচ্ছে।

মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না।

তেল লাগে না, পলতে লাগে না এক লাখ কি পঞ্চাশ হাজার জোনাকি পোকা

জমিয়ে খাসা আলো জ্বেলেছে। আর আলোও হয়েছে বাহারের। সাবাস দিয়ে উঠলাম মনে মনে। ঠিক সেই সময়টিতেই ঠক্ করে এমন একটা শব্দ উঠল যে চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। ইনভ্যালিড চেয়ার বা স্ট্রেচারের মত একখানা সেডান চেয়ার নামালে তারা ঘাড় থেকে। এবং মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের সেই দূতপ্রবর সেই রকম দন্ত প্রকাশ করে বললে—চড়ে বসুন!

—চড়ে বসব? কেন?

—যেতে হবে না? গাড়ি ডিরেল করে আপনাকে নামিয়েছে। এর পরও আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন? উঠুন উঠুন। বসুন চেয়ারে।

সেই জোনাকি জমানো মশালের আলোয় এবং আকাশের জ্যোৎস্নার আলোয় লোকটার দাঁতগুলোকে আশ্চর্যরকম সাদা দেখাচ্ছিল এবং গায়ের মুখের রঙ ভীষণ রকম কালো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—কালো রঙ-মাখানো কাগজে কেউ যেন সাদা কালি বা রং দিয়ে এমন হিজিবিজি কেটেছেন—যা দেখে সমস্ত শরীর কেমন যেন শিরশির করে।

ওদিকে তখন ট্রেনের প্যাসেঞ্জার এবং গার্ড ড্রাইভারেরা মিলে নানান জটলা শুরু করেছে, কি করবে এখন তারা? এই মাঠের মধ্যে এই রাত্রিকালে তারা আতান্তরে পড়েছে; কি করবে? কোথায় যাবে? যদি কোথাও না গিয়ে এইখানেই ট্রেনের কামরাতেই থাকে—তাহলে কি খাবার মিলবে? ইত্যাদি ইত্যাদি! হাজার রকম প্রশ্ন নিয়ে বেশ জোরালো তর্ক উঠেছে। তারই মধ্যে কানে এল—কানে যেন ঐকতানে প্রশ্ন করছে—এই ভদ্রলোক? এই ভদ্রলোকের কি হবে? উনি কি এই মাঠের মধ্যে বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

কে যেন উত্তর দিলে—কপাল মশাই কপাল! করবেন কি? আপনারই বা কি দোষ অন্যেরই বা কি দোষ? গার্ড ড্রাইভার তাদেরই বা কি দোষ? এত লম্বা গাড়িখানার মধ্যে উনি একা ওই গাড়িতে চেপেছিলেন—আর ওই গাড়িখানাই ডিরেল্ড্ হয়েছে। উনি জখম অজ্ঞান। আর আমাদের কর্মভোগ!

কথাগুলি আমার কি রকম যেন মনে হল। কারণ আমি একখানা বগিতে একা ছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাস বগিতে ছিলাম। আর সেই বগিখানাই তো উলটেছে—। তাহলে? অজ্ঞানটা কে হল? আমি গয়েশ্বরী দেবীর সেই প্রগল্‌ভ দূতটিকে বললাম—কি হল মশাই? ওরা কার কথা বলছে? কে অজ্ঞান হয়ে গেছে? আমি ছাড়া আর কে একখানা বগিতে একা ছিল?
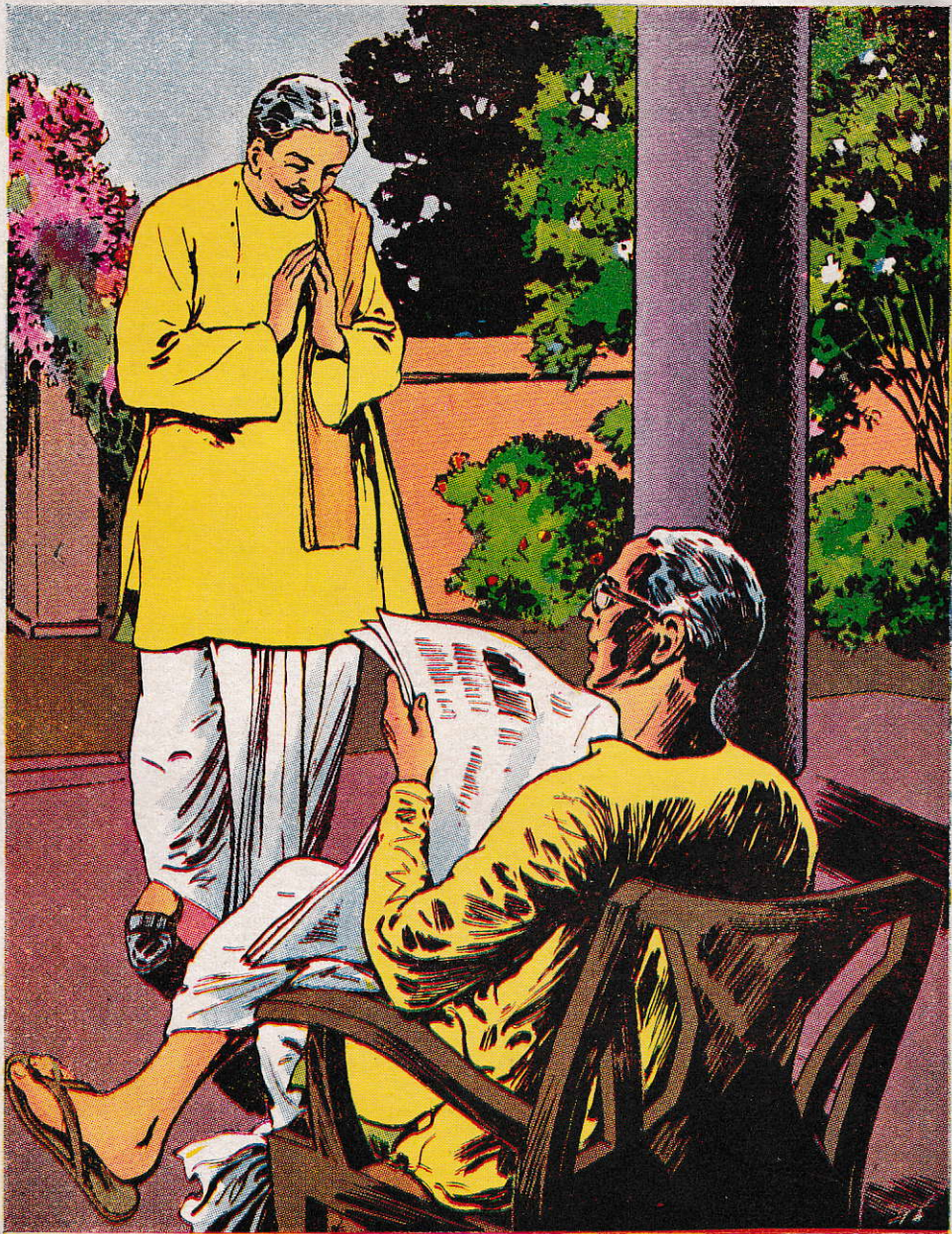
ভদ্রলোক বললেন—নমস্কার স্যার

(ভূত-পুরাণ···পৃঃ ২৯৭)
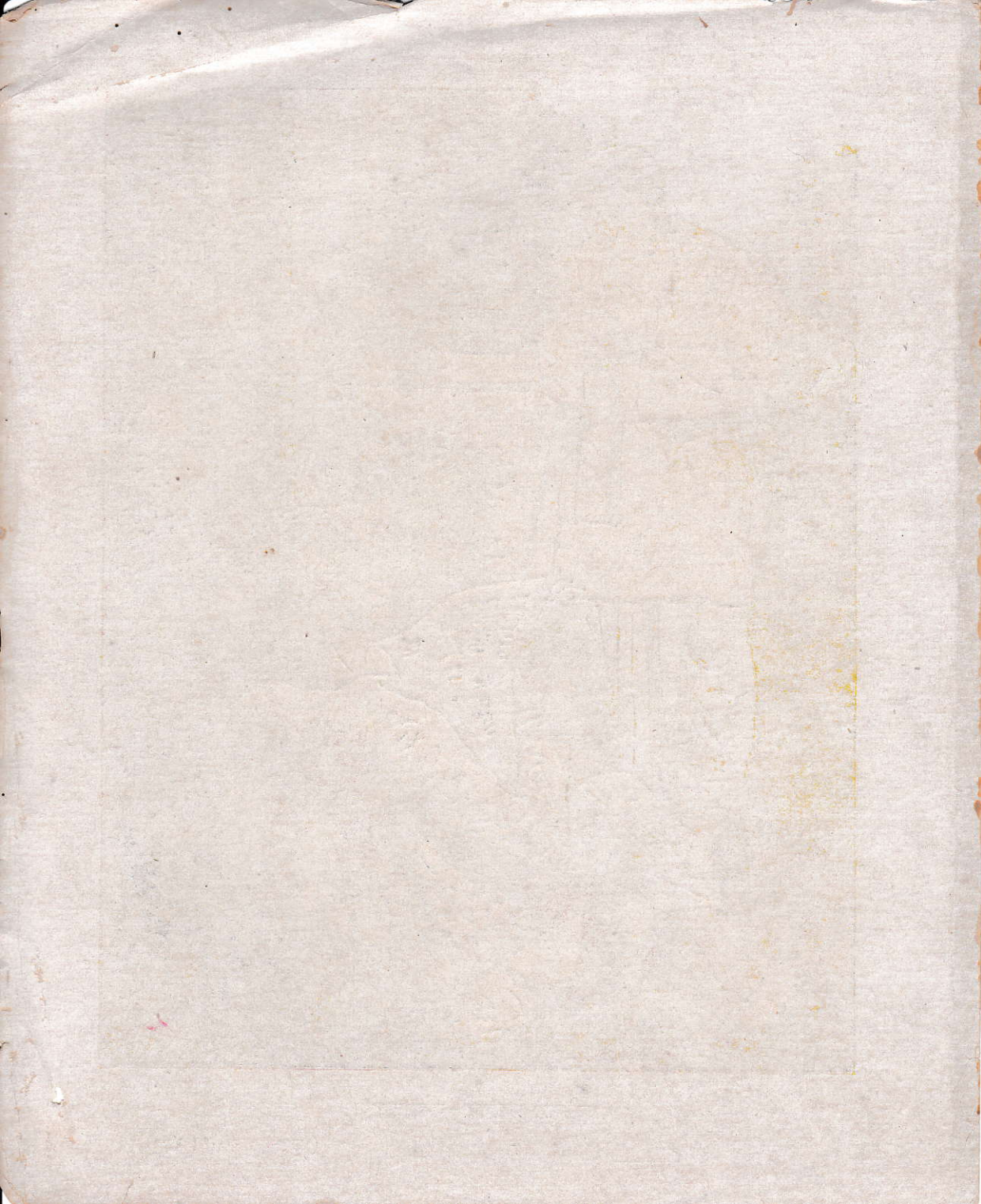
লোকটা বিচিত্র হেসে বললে—সে আর আপনাকে দেখতে হবে না। আর যা ভিড় করে ঘিরে রেখেছে, দেখছেন না। ও দেখা কি সহজ? আপনি ওই চেয়ারে উঠে বসুন।

—উঠে বসব? কোথায়? কিসে? কেন?

—বসবেন—ওই যে পালকি পাঠিয়েছেন আমাদের গিন্নীঠাকরুন—ওই পালকিতে!

—না মশায়, এই যুগে মানুষের কাঁধে চড়ে আর যেতে পারব না।

সে বললে—বেশী পাকামি করবেন না মশায়। এ অঞ্চল মানে ছিট ভুবনপুরের এই নিয়ম। এখানে মানুষের কাঁধেই যেতে হবে। বৈতরণী নদীর পলিমাটি, এখানে ঘোড়া চলে না—গাধা চলে না—এমন কি—গরু যে গরু যে গরুর ক্ষুর চেরা—সে গরু পর্যন্ত চলে না। মোটর ফোটরের ফটরফটরও এখানে চলে না। তা ছাড়া যস্মিন দেশে যদাচার। উঠুন।

ভারী খারাপ লাগছিল আমার। খানিকটা বেকায়দায় পড়েছি বলে কি লোকটা এইভাবে আমা হেন মানুষটার সঙ্গে এইভাবে কথা কইবে? আমি বিরক্ত হয়েই ডাকলাম—ও-রে-অ-। অ—রা—মরে!

কেমন যেন মনে হল যে, ঠিক ডাকা হচ্ছে না।

ওদিকে পাশের জনতা প্রায় কলরব করে উঠল—কি বলছে। কি বলছে। ঠোঁট নড়ছে। ওই দেখ।

এদিকে সেই উদ্ধত বেয়াদব গ্রাম্য অতি সেকেলে লোকটি—অর্থাৎ সেই মহিমার্ণবা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী নাম্নী ছিট ভুবনপুরের পত্তনীদারনি প্রেরিত সেই গোমস্তা বা নায়েব বা সরকার বা উকিল জাতীয় সেই লোকটি বলে উঠল—ওরে, সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না রে! কিন্তু তুই বেটারা কি করছিস? এ্যা? দেরি হচ্ছে না?

সেই পঙ্গপাল বা ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত সেই কালো কালো মূর্তির দঙ্গল থেকে একজন কে বললে—কি করব বলেন। হুকুম করেন!

—কি হুকুম করব? যা নিয়ম তাই করবি!

—যা নিয়ম?

—আলবৎ।

বাস, পরমুহূর্তেই আচমকা সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগুলির মধ্য থেকে, বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা দেখতে চার-চারজন লোক একসঙ্গে প্রায় ঝম্প প্রদান করে বেরিয়ে এসে আমায়

মুদ্গুর মৎস্য অর্থাৎ কিনা মাগুর মাছের মত খপখপ করে চেপে ধরে এক মুহূর্তে কাবু করে ওদের সেই বিচিত্র পালকিখানার উপরে বসিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গয়েশ্বরী প্রতিভূ বলে উঠল—সাবাস। উঠাও আব!

মুহূর্তে সেই বিচিত্র পালকিযানখানা প্রায় আটজন বেহারার কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলে। আমি হাত পা ছুড়ে প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত সময় পেলাম না। এবং সঙ্গে সঙ্গে কে একজন খুব কড়াগলায় মিলিটারী হুকুমের মতই হুকুম দিলে—আব চলো।

গয়েশ্বরী দেবীর সেই দূতটি হি-হি করে হেসে ভেড়া ছাগলের মত গলায় বোধ করি আমাকে ঠাট্টা করেই গেয়ে উঠল—চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠরি—বহুদূর যানা হৈ। দ্বিতীয় লাইন লোকটা গাইলে, না, গাইলে না তা বুঝতেই পারলাম না তার কারণ সেই ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত গয়েশ্বরী দেবীর পাঠানো কালো কালো সেই চ্যালা-চামুণ্ডার দল হালকালের নিয়ম বা ফ্যাসন অনুযায়ী ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে উঠল।

— গয়েশ্বরী দেবী কি—! — জয়!
— ভূতেশ্বর জিউ কি—! — জয়!
— ছিট ভুবনপুর! — জিন্দাবাদ!

সে আকাশস্পর্শকরা ধ্বনি প্রতিধ্বনি। আকাশে বাতাসে সে ধ্বনিতরঙ্গ যেন অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারের মত বিশ হাত উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দূরে দেখা যাচ্ছিল সেই রেললাইনটা; সেই অচল ট্রেনখানা; সেই লাইনের ধারে অন্য প্যাসেঞ্জারদের জটলা। তাদের জটলার কোলাহল কলরব এবং এঞ্জিনখানার স্টীমের শব্দ উঠছিল। এই এদের সেই বিরাট ধ্বনিতরঙ্গ গিয়ে বিশহাত উঁচু ঢেউয়ের মত সব কিছুকে যেন ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে দিলে। আর আমি কিছু দেখতে পেলাম না বা শুনতেও পেলাম না। এদিকে তখন স্লোগানের পর স্লোগান উঠছে। তখন স্লোগান উঠছিল—

—মধুর বদলে গুড়—।
—চলবে না।
—দুধ কমালে —
—চলবে না।
—বীচে কলা —
—চলবে না।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। বোধগম্য করবার ঠিক তাগিদও অনুভব

করলাম না। কারণ তখন সে এক বিচিত্র দৃশ্য আমার সম্মুখে। যতদূর মনে অনুমান সম্ভব—সেই অনুমানে মনে হল—সামনের দিকটা বোধহয় দক্ষিণদিক সেই দিকের সম্মুখে সে এক বিরাট মিছিল। একেবারে সামনে সারি সারি আলো নিয়ে যেন মশালচীর দল চলেছে। তাদের মশালগুলো বিচিত্র দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে।

তার পিছনে একদল চলছে—সেই জোনাকি পোকার পিণ্ডের মশাল নিয়ে। এগুলো দিপদিপ করছে বটে কিন্তু একেবারে নিভে যাচ্ছে না। কারণ এ নিভছে ও জ্বলছে। ও জ্বলছে এ নিভছে। তাতে মোটমাট আলোর পরিমাণ ঠিক এবং স্থির আছে। তাদের সেই আলোতেই একসময় মনে হল—সামনের নিভন্ত জ্বলন্ত আলোকধারী যারা তারা সকলেই মেয়েছেলে।

আরও মেয়ের দল রয়েছে—তারা জোনাকি মশালধারীদের ঠিক পিছনে রয়েছে। তাদের দেখে কিন্তু আমার শরীর শিউরে উঠল। ও বাপ! এরা কারা!

ঢলকো-করে সর্বাঙ্গ ঢেকে কাপড়পরা একদল লোক, বোধ হল তারা সকলেই মেয়ে। তাদের পিছনেই ছিল জোনাকি পোকায় তৈরী সেই আশ্চর্য মশাল—তার আলোয় তাদের স্পষ্ট দেখছিলাম। যা দেখলাম, তাতে আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে, তাদের সেই নিভন্ত জ্বলন্ত মশালগুলো তারা হাতে ধরে নেই। আলোগুলো যেন তারা মাথায় করে নিয়ে চলেছে। ভারী বিচিত্র মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপাদমস্তক ওয়াড়পরা একদল চলন্ত পাশবালিশ।

তাদের দলের পরেই তো বলেছি জোনাকিমশালধারীর দল। তাদেরও দেখে খুব বিচিত্র মনে হচ্ছিল, কারণ লোকগুলোর গায়ের রং অত্যন্ত বিশ্রী রকমের সাদা বা লালচে, দেখে যেন শরীর শিউরে ওঠে। গা গুলিয়ে যায়। ভয় করে। লক্ষ্য করলাম এদের কাপড়গুলো সব কালো। মেয়েপুরুষ দুই রয়েছে।

তাদের পিছনে যারা তারা পোড়া বাঁশের মত লম্বা এবং কালো। ও—মা! এযে সব মেয়েছেলে! এই লম্বা। আর আশ্চর্য কালো। তেমনি সরু শীর্ণ চেহারা। পরনের কাপড়েরও কি তেমনি বাহার! হাঁটুর বেশী ঢাকেনি। মনে হল ইচ্ছে করেই খাটো করে পরেছে। উপরের শরীরটাকে কিন্তু আচ্ছা টাইট করে ঘিরে কোমরে ফেরতা বন্ধনে বেঁধেছে। বাঁ কাঁখে একটা চ্যাঙারি বা ডালা বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ধরে রেখেছে। ডান হাতটা ওদের চলনের সঙ্গে বেশ তালে তালে দুলছে। মধ্যে মধ্যে

ফিরে তাকাচ্ছিল তারা। সঙ্গে সঙ্গে ফিক ফিক করে হাসছিল। ভারী বাহার খুলেছিল তাতে। সেই আশ্চর্য কালো কালো মুখে, সাদা সাদা চোখ এবং ঝকঝকে দু দুপাটি দাঁত ঝকমক ঝকমক করছিল। মনে হচ্ছিল কোন আলকাতরা মাখানো দেওয়ালে সাদা চুন ছিটিয়ে দিচ্ছে কেউ।

এই মেয়েরা মধ্যে মধ্যে ডানহাত দিয়ে বাঁ-কাখের ডালাটা থেকে মুঠো ভরে সাদা (খুব বেশী সাদা নয়) কিছু নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মনে হল শুকনো ফুলের পাপড়ি টাপড়ি হবে।

তারপরই ছায়ামূর্তির মত মানুষের সমুদ্র বললে বেশী বলা হবে না। ছায়ামূর্তির মানুষ মানুষ আর মানুষ। ও! সে যে কত তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। আর কত রকমের কত চেহারার কত পোশাকের। বেঁটে লম্বা মোটা সরু, চুলভরা মাথা, টাকভরা মাথা, দাড়ি গোঁফ ঢাকা মুখ, শুধু গোঁফওলা মুখ, দাড়ি গোঁফ চাঁচা অর্থাৎ কামানো মুখ সে যে কত রকমের সে কি বলব। আমি এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সবই প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। মোটমাট বেশ লাগছিল। এ রকম প্রসেসন করে কোন কাজে কেউ তো আমাকে নিয়ে যাবে না। সুতরাং বেশ লাগবে না তো কি!

ছায়ামূর্তির মত মানুষদের মিছিলের সেই বারোভাজা বা পাঁচমিশেলী চানাচুরের মত অংশটার পর যে অংশটা সেই অংশটার দিকে তাকালাম। এরা কারা?

ছোট ছোট নানান চেহারা এবং নানান পোশাক-পরা দল।

ভালোভাবে বেশ ঠাওর করে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে; অন্ধকার ঘন হয়েছে; ওদের হাতের জোনাকিমশালের আলোতেও সে অন্ধকারকে ফিকে করতে পারছিল না। বেশ ঠাওর করে দেখলে তবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন বজ্রগম্ভীর তবে কিছুটা অনুনাসিক কণ্ঠে হেঁকে উঠল—হু—কুম—দার! হল্‌ট্!

সম্মুখে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফটক। বিরাট বা বিশালকায়—ইয়া পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাতি পঞ্চান্ন ষাট ইঞ্চি ভুঁড়ি—বিশ বাইশ ইঞ্চি গর্দান—আর এই মালসার মত মাথা—ছ ফুট সাড়ে ছ ফুট লম্বা সশস্ত্র প্রহরীরা সে ফটক রক্ষা করছে। তারাই কেউ এমন পিলে চমকানো হাঁক মেরেছে। তাদের মুখের উপর প্রথম মাথায় আলোবহনকারীদের আলো পড়ছিল—সেই আলোয় দেখলাম ইয়া গোঁফ এই গালপাট্টা চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা জ্বলজ্বল করছে।

থেমে গেল মিছিল।

সঙ্গে সঙ্গে খনখনে গলায় সেই গয়েশ্বরী দূত ডেকে বলে উঠল—গিন্নী ঠাকরুনের বাবার শ্রাদ্ধে সভায় বক্তৃতা করবার লোক। ছোড়ো ফটক—ছোড়ো!

—ধীরে ধীরে কিন্তু জলদি জলদি যাও। বলে যাও কারা কারা যাতা হ্যায়। পাসপোর্ট দেখিয়ে দেখিয়ে যাও। বলো কোন লোক যাতা?

—আমরা যাচ্ছি 'পেত্‌তারা' মানে আলেয়ারা!

—আচ্ছা। মাইয়া লোক সব—। ঠিক হ্যায়। উসকে বাদ?

—আমরা জোনাকি মশালচী। ছিঁচকে পোড়া পেরেত।

—হাঁ হাঁ। তুম লোক আগুনে পুড়ে মরা প্রেত! সব সাদা তো?

—হাঁ।

—চলে যাও। উসকে বাদ?

—আমরা গো!

—কারা তোমরা—বাতাও!

—মরণ। মিন্‌সেদের ঢঙ দেখ। চেহারা দেখে চিনতে পারে না! পোড়া বাঁশের মত লম্বা—খাটো করে কাপড় পরেছি—কাঁখালে ডালা রয়েছে মুঠো মুঠো মাছের আঁশ ছিটুচ্ছি আমরা কারা জিজ্ঞেস করছে? পুকুরে পুকুরে শামুক গুগলি তুলি। বারোমাস তিরিশ দিন দেখছে তবু বলবে কারা তোমরা বাতাও।

—আরে এতনা বাত মাৎ বোল না। বলো কোন লোক তুমলোক!

—শাঁমুক তুলি—শাঁখচুন্নি—

—ঠিক হ্যায় ভিতরে যাও। আর কোন লোক? আলেয়া পেত্‌তা; ছিঁচকে পোড়া; শাঁকচুন্নী। তাহলে? তা হলে এরা? এরা?

এরা যা তা মনে-মনেও উচ্চারণ করতে পারলাম না। নিদারুণ ভয় হল। কিন্তু উচ্চারণ না করলেও তার উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। ঠিক যেন মনের কথা জানতে পেরেই ফটকের ওপাশ থেকে বেশ অভিজাত ভৌতিক অর্থাৎ খোনা খোনা গলায় কেউ সম্ভাষণ করলেন—সুস্বাগতম—হেঁ যঁম দত্ত-বঁদ্ধ-আঁমরতাঁ-প্রঁত্যাশী-মঁহাশয়; সুস্বাগতম এই ভূত প্রেত পিশাচাদিদিগের আশ্রয়ভূমি, এই বৈতরণী নদীতটস্থিত খেয়াঘাট কেন্দ্রিক বন্দর নগরে ও তৎসংলগ্ন চরভূমিতে। মহাশয় আপনি আমাদিগের সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের কাহারও সন্ধান আজ মর্ত্য ভুবনপুরের কুত্রাপি প্রাপ্ত হন নাই।

যাহার ফলে আপনি আমাদিগের সম্পর্কে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমরা মিথ্যা, আমরা ঝাড়ে বংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছি; এমন কি আমরা চিরকালই মিথ্যা অলীক, কোন কালেই আমাদের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ধারণা হইতেছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি মায়াবাদ তুল্য কোন নবীন বাদ সৃষ্টির কথাও চিন্তা করিতেছেন। এ সকল সংবাদই আমাদের এই ছিট ভুবনপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা আমাদিগকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান কাল ও মনুষ্যকুল এই দুই পক্ষ এক গোপন চুক্তিবদ্ধ হইয়া ভূতকাল ভূতলোক ও ভূত জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যাহার লক্ষ্যই হইল ভূতজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতে যেমন কতিপয় ডিক্টেটর এবং দল একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল চেষ্টা করিয়াছিল ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক। তাহারা ইহা যথাসাধ্য গোপনে করিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র মনুষ্যকুল আজ দল বাঁধিয়া জোট পাকাইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযান শুরু করিয়াছে। আজ আপনি আপনাদিগের অর্থাৎ বর্তমান মনুষ্যকুলের দোষত্রুটি দেখিলেন না; কোন ব্যাপক অনুসন্ধান করিলেন না; একেবারে নিজের খামখেয়ালী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিলেন—ভূত ছিল না ভূত নাই ভূত মিথ্যা। মহাশয় নিতান্তই বুদ্ধিতে গর্দভ তাহা বলিব না, বলিতেছি এ যুগের সংস্পর্শদোষে বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে নিরতিশয় প্রশংসা লোভে প্রায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতায় মিটিং ডাকিতে বলিয়াছেন। মতলব সেখানে ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনি দাঁড়াইয়া বুক বাজাইয়া চিৎকার করিবেন —ভূত নাই—ভূত মিথ্যা।

আপনার চেলারা হাঁকিবে—ভূত
লোকেরা বলিবে—মুর্দাবাদ। বরবাদ!
আপনি বলিবেন—মানুষ
তাহারা বলিবে—জিন্দাবাদ।

কিন্তু মহাশয় তাহা এত সহজ নহে। এত সোজাও নহে। শুধু ভূতেরা মরিবে আর মানুষেরা বাঁচিবে—তাহা হইতে পারে না। আমরা তাহা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। মনুষ্যলোকে ধ্বনি তরঙ্গবাহিত শব্দ বাক্য রেডিও নামক যন্ত্র দ্বারা ধরিতে হয়—ভূতলোকে তাহার প্রয়োজন হয় না। ভূতেরা সব আপনা আপনিই জানিতে পারে।

তাহারা আপনার এই সিদ্ধান্ত ও ভূত-বিরোধী অভিযান পরিকল্পনা আপনা আপনি জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে, আমাদের ছেলেপুলেদের দলতো বেশ চটিয়াছে। কিন্তু ভূত ভুবনপুর ও মর্ত্যভুবনপুর এখন বর্তমানকাল ও ভূতকালের বিবাদবশতঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং হালফিলের কয়েকটা বৈজ্ঞানিক খনি আবিষ্কারের দৌলতে রাতারাতি-ধনী মর্ত্যভুবনপুর একেবারে সর্পের পঞ্চপদ নিরীক্ষণ করিয়া নিজেকে অজেয় মনে করিয়াছে ও উভয় ভুবনপুরের সীমান্ত-বরাবর অত্যন্ত কড়া পাহারা বসাইয়াছে। ভূত ভুবনপুরের কোন লোককে ধরিতে পারিলেই বোতলে পুরিয়া মুখে ছিপি আঁটিয়া আলমারি কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিতেছে। অন্যথায় সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা ভূত ভুবনপুরের তিন্তিড়ীবৃক্ষ বা শাল্মলী বৃক্ষ বা শিংশপা বৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শীর্ষদেশ হইতে এক ঝম্পে বা লম্ফে তদীয় গ্রামের বৃক্ষশীর্ষে ঝড় তুলিয়া নামিত। এবং সেখান হইতে সড়াক করিয়া মাটিতে নামিয়া ভবদীয় গৃহকে ঘেরাও করিয়া নৃত্য করিত ও উপদ্রব করিত। গাছপালা নাড়া দিত, ধুলা ছিটাইত, ঢেলা মারিত, কেহ কেহ দুঃসাহসী হয় তো আপনার চুল ধরিয়া টানিত, কেহ বা আপনার সম্মুখে দাঁত বাহির করিয়া আপনাকে মুখ ভেঙাইত। হয় তো কেহ কেহ চাঁটিও মারিতে পারিত। হঠাৎ পা ধরিয়া টানিয়া উলটাইয়া ফেলিয়া দিতেও পারিত। খোনা গলায় চিৎকার করিয়া রাত্রির আকাশ জুড়িয়া হিজিবিজি কাটিয়া বিশ্রী করিয়া দিত।

শুধু পাসপোর্টের অনিয়মের জন্য তাহা হয় নাই। ভূতদিগকে কোনক্রমেই পাসপোর্ট দিতে মর্ত্যভুবনপুরের বর্তমান পরলোক অবিশ্বাসী ধর্মে আস্থাহীন বুদ্ধিনৈতিক ও বিদ্যানৈতিক কর্ণধারগণ একেবারেই নারাজ। ভূতদিগের দিক্ হইতেই তাহাদের বিপদাশঙ্কা। ভূতেরা একবার প্রবেশাধিকার পাইলে, তাহাদের আশঙ্কা, মর্ত্যভুবনপুরে তাহাদের পার্টি রাজত্বের দফা খতম হইয়া যাইবে। তাহারা একটা আশ্চর্য পদ্ধতি ও একটা আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহার বলে তাহারা ভূতদের ধরিয়া বোতলে পুরিয়া এক ফোঁটা ওষুধ প্রয়োগ করিলেই ভূতেরা গ্যাস হইয়া যায় এবং অসীম শূন্যের গ্যাসস্তরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আমরাও অনেক কিছু পারি—আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি—আপনাকে ঘিরিয়া আমরা ধেই ধেই করিয়া নাচিতে পারি; আপনাকেও নাচাইতে পারি; ভয় দেখাইতেও পারি!

মহাশয় আপনি এখন অশরীরী সত্তায় আমাদের সঙ্গে এখানে রহিয়াছেন আপনার সংজ্ঞাহীন দেহ রেললাইনের ধারে গাছতলায় নিথরভাবে পড়িয়া রহিয়াছে,

আমরা এখানে আপনাকে ভয় দেখাইলে যন্ত্রণা দিলে আপনার দেহখানা সেখানে গোঁ গোঁ করিবে হাত পা ছুড়িবে তাহা এখনি দেখাইতে পারি। দেখাইতে পারি কেন, এখনই দেখাইয়া দিতেছি। আর আপনি যদি মরিয়া যান তাহা হইলে আপনাকে আমরা এখনই বৈতরণী ঘাটে পাঠাইয়া দিব—আপনি সেখানকার কোন বৃক্ষরূপী হোটেলে থাকিবেন—আপনার জন্য সীট বা বার্থ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে স্টীমারে চড়িয়া বা নৌকায় চড়িয়া ওপারে যাইবেন। সে হইলে আপনাকে আমরা সহজে ছাড়িব না। হয় আপনাকে ওই মর্ত্যভুবনপুরে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিব আপনি ওই বিজ্ঞানী-নামক চরম অজ্ঞানীদের হাতে পড়িয়া ওই ঔষধের ফোঁটার গুণে গ্যাস হইয়া ফুস্ শব্দ করিয়া মিলাইয়া যাইবেন। অনন্তকাল ইথারের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিবেন। নয় তো আমরাই আপনাকে ধরিব এবং ভূতলোকে ভূত অস্তিত্বে অবিশ্বাসের অপরাধে সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটক করিয়া ব্রেন ওয়াশ করিতে থাকিব। এবম্প্রকার ঔদ্ধত্য আর আমরা কোনপ্রকারেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহি। ভূতগণ—"

উত্তরে সে বোধ হয় কয়েক হাজার তরুণ ভূত খোনা গলায় সাড়া দিয়ে উঠল।

—হুঁ। হুঁ- হুঁ-হুঁ হুঁ-হুঁ।

সে যেন শীতের গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একসঙ্গে কয়েক হাজার কুকুর কি শিয়ালের ছানা এক সঙ্গে কুঁই কুঁই করে উঠল।

সে খোনা কুঁই কুঁই শব্দে প্রতিধ্বনিতে আমারও যেন দারুণ ভয়ে কান্না পেয়ে গেল। ভাবলাম হাত জোড় করে আমিও খোনা আওয়াজে বলে উঠি—মাঁপ কঁরুন ভূঁত প্রঁভুরা আঁমাকে মাঁপ কঁরুন। আঁমার দোঁষ হঁয়েছে। কেঁ বঁললে আঁমি ভূঁতে অঁবিশ্বাস কঁরি? ওঁটা কেঁবল লোঁক দেঁখানো। আঁমার মঁস্তিষ্কের মধ্যে অঁশরীরী হঁয়ে তুঁমি লুঁকিয়ে আঁছ। আমার খাতার পাতায় আঁকা ছঁবির মঁধ্যে আঁছ। ঘঁরের অঁন্ধকার কোঁণেও মঁনের মধ্যে তুমি নঁড়ে ওঁঠো—।

বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে পারলাম না। ভয়ে কোন আওয়াজ আমার গলা থেকে বের হল না। শুধু হাজার হাজার তরুণ ভূতেদের খোনা আওয়াজের চন্দ্রবিন্দু-গুলো ঢোল করতাল বাজিয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

হঠাৎ তারই মাঝখানে কোন একজন ভারিক্কি মহিলার বাজখাঁই কণ্ঠধ্বনি সমস্ত

আওয়াজকে ছাপিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল—:
চুঁ—প্—! হ্যাঁ। সে এক চুপের মত চুপ বটে। চ এ একটা ঊ দিয়ে—এতটা লম্বা করা যায় না। বোধহয় তিন তিনটে দীর্ঘ ঊ লাগিয়ে কোন লাউডস্পিকার মুখে লাগিয়ে হাঁক হেঁকেছেন—হাঁকদায়িনী বা হাঁকিনী।

আচ্ছা হাঁক। সে যেন কানের কাছে সাইরেন বেজে গেল।

ওই সাইরেনের মত খোনা আওয়াজের 'চূ—প' শব্দে কয়েক হাজার ভূতের খোনা আওয়াজের বিশাল স্তূপটা বা পাহাড়টা একেবারে 'চিচিং ফাঁকের' মত মন্ত্রবলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল এবং চুপ নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। আবার সেই জাঁদরেল নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

সম্ভবতঃ ঝিয়ের পিছনে এক বিপুলা মহিলা।

—থাম, বঁলছি বঁজ্জাত ব্যাটারা। হাঁরামজাদা উঁল্লুকরা। থাঁম বঁলছি থাম। থেমে আগেই গিয়েছিল সকলে এখন সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম ছায়াছায়া মূর্তি-ধারী ভূতেদের ভূত জনতা দুপাশে ফাঁক হয়ে গেল এবং তার মধ্য দিয়ে জোনাকি-পোকার পিদিম হাতে একজন সম্ভবতঃ ঝিয়ের পিছনে এক বিপুলা মহিলা। এই মোটা এই মাথা, সে মাথায় চুলগুলো প্রায় সব উঠেই গিয়েছে যে কটা আছে সে কটা লম্বায় আধহাত আর গনতিতে একশো গাছাও হবে না—মনে হল নিরেনবব‌ুই গাছা তাতে একটা গিঁঠ বাঁধা গলায় পাটী হার হাতে তাগা হাত দুটো এই মোটা, হাতের বাঈ দুটোতে মাংস থলথল করছে; গালেও তাই; দাঁত ভেঙে পড়েছে; কপালে সিঁদুরের ফোঁটা; দুহাতে দুই হাঁটুর কাছ বরাবর কাপড় সামলে ধরে থপাস থপাস করে হেলতে দুলতে দুলতে হেলতে এসে হাজির হলেন এবং দাঁড়ালেন আমার সামনে। এবং পানজরদা খাওয়া দুপাটি তরমুজের বিচির মত দাঁত মেলে বললেন—এস

বাবা এস। এ বেটারা সব ছুঁচোর দল গো। হাল আমলের লোক। মানীর মান জানে না। তারপরে? রাস্তাতে কোন কষ্টটষ্ট হয়নি তো? সব ভূতের দল তো! জান বাবা ভূত হলেই কেমন একটা হালকা পালকা ফাজিল ফাজিল চেহারা হয় মনের। হায় হায় হায় বাবা তোমাকে একথা তো বলতে পারছি না যে, বাবা তুমি এবার ভূত হয়েছ এবার তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে! তুমি এখনও মরনি। অজ্ঞান হয়ে আছ। সেটা আমাদের চক্রান্তেই বটে। তা তার জন্যে দায় তোমার। বুঝেছ! তুমি তোমার গাঁ থেকে টেলিগিরাপ করলে মিটিং ডাক ভূত নাই ভূত মিথ্যে পেমান করে দেব; তারের 'টরে টক্কা' আমাদের এরা আজকাল ধরছে বাবা। ধরা আপনি পড়ে। আগে গেরাহ্যি করতাম না এখন গেরাহ্যি না করে উপায় নাই। মর্ত্যভুবনপুর আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিলকুল তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা করি কি? দেশ ভাগ করে বৈতরণীর ঘাটের কাছে এই খানিকটা দেশ দিয়েছে তাতেই আমরা গাদাগাদি করে বাস করছি। এখন দাঁড়াও বাবা দুটো পান খেয়ে নি। ওলো দামিনী! গেলি কোথায়? হারামজাদী পেত্নী কোথাকার! দে পান দে দোক্তা দে!

দামিনী পেত্নী ঝি সঙ্গে সঙ্গে পানের বাটা খুলে ধরলে এবং কৃতকৃতার্থ হয়েছে এই ধরনের আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে দুটো সাংঘাতিক দাঁত বের করে আমার দিকে তাকালে।

ঠাকরুনটি দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে বাঁ হাতে একটা ঠোনা দামিনীর গালে দিয়ে বললে—মরণ হারামজাদীর নোলা দেখ। জ্যান্ত মানুষের গন্ধ পেলে হয়! জিভ লকলক করে। ওই বাঁকা দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ে। জানো বাবা হারামজাদী রক্তচোষা বাদুড় হয়ে রাত্রে সে কালে মনিষ্যি রাজ্যে ঘুরত। ওই দাঁত দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের রক্ত চুষে খেতো। বেটীর পাখা কেটে দিয়ে তবে শায়েস্তা করেছি। বেটী বদমাশের একশেষ।

দামিনী মাথায় এই এতখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে—হেই মা গো! এই সব লজ্জার কথা নাকি ভিনদেশী লোকের কাছে বলতে হয় গিন্নীমা! কি নজ্জা! কি নজ্জা!

গিন্নীমা সেই বিপুলকায়া সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী বললে—চোঁপ হারামজাঁদী চোঁপ!

ঠিক এই সময় একজন ভীমকান্তি দিব্য চমৎকার প্রহরী পোশাক-পরা লোক

এসে দাঁড়াল—তার এক হাতে একটা লম্বা দড়ি অন্য হাতে একটা গদা! এবং এক নতুন রকম মিলিটারী স্যালুট করে বললে—মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী!

গয়েশ্বরী দেবী মুখ বেঁকিয়ে পচ করে একমুখ পানের পিচ ফেলে বললেন—কি বাওয়া জোমভূট! কি বলসো মানিক?

লোকটি বললে—মর্ত্য ভুবনপুরে এ লোকটির সংজ্ঞাহীন দেহে ইনজেকসন দিচ্ছে সেবা-শুশ্রূষা করছে তার ফলে একে ফিরে যেতে হবে সেখানে। অতএব একে নিয়ে আর কি কাজ আছে তা শেষ করে নিতে বলছি। আর বেশীক্ষণ ওকে রাখার আদেশ মিলবে না!

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা! তাহলে এই ভূতগুলোকে একটু ধমকে টমকে দাও। তা নইলে তো ওরা ছাড়বে না। বেশ বুঝতে পারছি ওরা একটা হাঙ্গামা বাধাবার তালে আছে বাবুটির সঙ্গে। দেখ না কেমন করে ভিড় করেছে দেখ না।

—রা—ম—জী কে নাম সে—হ—ট যাও—স—ব হট যাও। বলে হাঁক মেরে পাহারাওয়ালা হাতের দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিয়ে কটমট করে সকলের দিকে তাকালে। নাকটা ফুলে উঠল তার। গোঁফ দুটো নড়তে লাগল দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ির মত।

ভূতগুলো, হ্যাঁ গয়েশ্বরী দেবী আমাকে বলেছিলেন—তারা বিদ্রোহী ভূত মনুষ্যগণের উপর ক্রুদ্ধ ভূত এবং তারা গয়েশ্বরী দেবীর উপর ক্রুদ্ধও বটে তারা সঙ্গে সঙ্গেই "পাঁলারে, পাঁলারে, পাঁলারে" রব তুলে পালিয়ে গেল।

এবার আমার অবাক লাগল। বিদ্রোহীরা তারা শুধু বিদ্রোহী নয়, তারা ভূত বিদ্রোহী তারা ওই একটা পাহারাওলার ভয়ে এমনি করে পালিয়ে গেল! ভূতের এত ভয়! ও কে?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ও কে? ভূতেরা এত ভয় করে!

দুই হাতে দুই হাঁটুর পাশের কাপড় মুঠোয় ধরে একটু তুলে অনেক কষ্টে পা তুলে থপ করে ফেলে বললেন সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী যমদূত বাবা! ওই আছে বলে এখনও কাজটাজগুলি বিলিব্যবস্থামত এখনও চলছে। না হলে এত দিনে সব লণ্ডভণ্ড করে দিত। ভূতেরাও দিত—আর কিছু মনে করো না বাবা—মানুষেরাও দিত। কিছু কি রাখত। ভগবানকে মেরেছে মানুষেরা ভয়কে মেরেছে মানুষেরা কিন্তু মরণের মালিক যমকে তো মারতে পারেনি! তাকে ভয় না করলে চলে বাবা! ছিষ্টিকে তো এখনও ওই একজনাই রেখেছে।

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যমদূতটার দিকে তাকালাম। ওঃ লোকটা কি ভয়ানক রকমের ভয়ানক—বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল।

গয়েশ্বরী বললেন—এস বাবা এস। তোমার আর বেশী টাইম নাই। তোমাকে এর মধ্যে যতটা পারি দেখিয়ে দি।—এস।

* * *

ওগো গয়েশ্বরী দেবী গো, ভূত ভুবনপুরের পত্তনদারনী গো; তোমার পুণ্যবান পিতা প্রেতশিলার জবরদখলকার অপঘাতে মরা গুণ্ডা প্রেত দলের ডিক্‌টেটর মরিলেন গো—! শত শত বৎসর প্রেতনৃত্য—মহা দৌরাত্ম্য চালাইয়া অবশেষে মরিলেন গো! অশরীরী প্রেত দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মহাপুণ্যবান এবং মহাবিক্রমশালী গুণ্ডা পিতা পুণ্যসলিলা বৈতরণীর জলে স্নান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে জয় জয় জয় হোসেন, জয় শাহ, জয় জয় জয় গিন জয় তুষ—ইত্যাদি নাম অঙ্গে লিখিয়া ও মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে ওই তিনি মর্ত্যভুবনপুরের দিকে চলিয়াছেন গো! ওই তাঁহার জন্য বিধাতার দূত আসিল গো! কিন্তু পুণ্যবান তোমার পিতা বিধাতার দূতের সঙ্গে কথা কহিলেন না। তিনি স্বর্গে যাইবেন না। তিনি মর্ত্যে যাইবেন। মর্ত্যের তুল্য ধাম নাই। মানুষদের রাজাদের প্রেসিডেন্টদের বা নেতাদের তুল্য নাম নাই। হরিনাম দশরথ রাজার বেটার নাম ওসব নাম যে পুণ্য ফল দেয় তাহা সব ভুয়া তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। তাহা অপেক্ষা মর্ত্যধামের মাকাল ফলে অনেক উৎকৃষ্টতর স্বাদ এবং অনেক রকম ভিটামিন সমৃদ্ধ। মর্ত্যধামে তিনি চলিলেন তাহাতে ভূত প্রেতদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ওই শুন শুন মর্ত্যধামে টিন বাজিতেছে ক্যানেস্তারা বাজিতেছে ওই দেখ—মর্ত্যধামে তাঁহাকে আবাহনের জন্য হই-হুল্লোড় ধ্বনিত হইতেছে।

কয়েকজন লম্বা ধরনের ভূত ঘটির মধ্যে লোহার একটা চাবি বা ডাণ্টি বাজিয়ে ওই কথাগুলো একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গানের সুরে বলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম এরা এখানকার ঘটি বাজিয়ে তষ্ঠীরাম বামুনের দল। ওইভাবে মৃত ভূতের পারলৌকিক সদ্‌গতির কথা বর্ণনা করছে কেবল মাত্র পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্য। ঠিক মর্ত্যভুবন-পুরেও এমনই করে তষ্ঠীরাম বামুনেরা। টাকা দিলে ওরা মৃত জনকে ইন্দ্রলোকে পাঠায় ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুলোকে শিবলোকে কৈলাসে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেয়। আর না

পেলে নরকে পাঠায়। গালাগাল করে। ওই টাকা ওই টাকা বলে চিৎকারও করে। কিন্তু একটা খটকা লাগল। বলছে "মরিয়া তিনি সুখের মর্ত্যধামে যাইতেছেন। তিনি আম খাইবেন জাম খাইবেন শশা খাইবেন ভাত খাইবেন ডাল খাইবেন কাটলেট খাইবেন চপ খাইবেন মামলেট খাইবেন। আরও কত কি খাইবেন। তিনি চোঙা প্যান্ট পরিবেন ভূত প্রেত আঁকা জামা পরিবেন সিগারেট খাইবেন, বিড়ি খাইবেন, ধেই ধেই করিয়া নাচিবেন, ট্রাম পোড়াইবেন, বাস পোড়াইবেন, হিপি হইবেন হাংরি হইবেন—অ্যাংরি হইবেন আরও কত কি হইবেন!"

মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। বারবার নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা মরলেন! তারই বা মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা আগে মানুষ ছিলেন। মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষকে মরতে হয়—মানুষ অমর নয়। মরে মানুষ ক'দিনের জন্যে প্রেত থাকে—তারপর শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই সে চলে যায় যেখানে যাবার। স্বর্গের এ লোক ও লোক সে লোক—সে গোলক থেকে শিবলোক পর্যন্ত অনেক লোক আছে। এর উলটো দিকে আছে নরক, ভূতলোক, প্রেতলোক, শাঁকচুন্নী লোক—নানান লোক। সেই ভূতলোক ছড়ানো ছিল মানুষের সংসারে, সমাজের বসতির চারি দিকে। পিণ্ডি দিলে ক্রিয়াকর্ম করলে তা থেকে মুক্তি পেত। পাপ খণ্ডন হয়ে চলে যেত স্বর্গে। এখন এসব কি বলছে এরা? কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

গয়েশ্বরী দেবীর বাবা ভূত। গয়েশ্বরীও ভূত বা প্রেতিনী। বুঝতে পারি। বাবাও ভূত হয়েছিল—মেয়েও ভূত হয়েছিল। কিন্তু গয়েশ্বরীর বাবা মরল এ কি কথা।

ভূত মুক্তি পায়, তা বুঝি। কিন্তু ভূত মরবে কেন? যদি মরলই তবে মর্ত্য-লোকে জন্মাতে চলল কেন? এবং মরণ যদি তবে মরণ কিসে? ভূত কি বুড়ো হয়? না ভূতের রোগটোগও হয়?

—ভূত মরে বাবা। ভূত মরে। ভূতের বয়স হয় তবে বুড়ো হয় না। তবে তারা ইচ্ছে করলে ছোকরাও সাজতে পারে আবার বুড়োও সাজতে পারে। স্বপ্ন দেখে মানুষ শোননি। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই গয়েশ্বরী নিজে থেকেই বললেন—বুড়ীর বুড়ো মরলে পর স্বপ্ন দেখে বুড়ো সেই অল্পবয়সী ছোকরা সেজে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। রোগা মানুষ কঙ্কালসার হয়ে মরলে তার আপন জনেরা স্বপ্ন দেখে—দিব্যি সুন্দর সুস্থ শরীরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসছে। তবে

ইদানীং বাবা ভূতদের ডিস্‌পেপসিয়া হচ্ছে। সেও ওই তোমাদের জন্যে। পিণ্ডি দিচ্ছ—তার মধ্যে ভেজাল চালাচ্ছ দেদার। আর রেশনের আতব। মধু দিচ্ছে না—তার বদলে গুড় দিচ্ছে। তাতেও ভেজাল। ভূতদেরও দোষ আছে বাবা। আজ বছর কতক থেকে এই তোমাদের দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে এরা বড্ড বেশী মাছ খাচ্ছে বাবা। দেখছ না তোমাদের নদীতে মাছের অভাব। গোয়ালন্দে মাছগুলো পচছে আর সেই মাছ এরা আনছে। ওই যে শাঁকচুন্নীগুলোকে দেখলে,—ওরাই ধরে আনছে! আনছে আর চড়া দরে বেচছে। তবে রোগে ভোগে, রোগে মরে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তা হলে ভূত মরে বললেন যে?

—হ্যাঁ বাবা মরে। ভূত বুড়ো হয়ে মরে না—রোগে মরে না—ভূতেরা মরে অপঘাতে বাবা অপঘাতে। আর সে অপঘাত ঘটায় মানুষে।

—মানুষে? ভূতেই তো মানুষকে মারে শুনেছি। ঘাড়ে চাপে। ঘাড় মটকায়।

—সে সব আগের কালের কথা বাবা। এখনকার কথা নয়। এখন তোমরা বাবা খুব চেঁচাতে শিখেছ। তিল হলে চেঁচিয়ে তাকে তাল করে তোল। তাই মানুষের কথাই শোনা যায়, ভূতের কথা শোন না, শুনতে পাও না। ভূতেরা অনেক ভাল লোক বাবা। আর বেশ একটু বোকা। বুঝেছ। মানুষ যখন মরে তখন বুদ্ধিটুকু আনতে পারে না। তাই ভূতেরা বোকা হয়। ভূত কি রকম অপঘাতে মরে জান? মানুষেরা গাছ কাটে। কাটা গাছ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ভূতটি কিংবা ভূতগুলি চাপা পড়ে মরে। ঘরের সাঙায় বা ঘরের কোণে ভূত থাকে—ঘরটি ভাঙলেই ভূতটি ঘর চাপা পড়ে মরে। শুধু ঘর ভাঙা কেন বাবা, ঘরের কোণের অন্ধকারে থাকে ভূত—বেশ থাকে—একলা ঘর হলে নাচে হাসে দোল খায়। আবার একলা দোকলা মানুষকে পেলে বলে—, বলত বাবা—আর বলে বলে লাভ কি,—বলত—তোঁর ঘাঁড় ভাঙব। কিংবা অন্য কিছু বলে ভয় দেখাত। তা সেই ঘরে দেওয়াল কেটে জানালা বসালেই বাস ভূতকে পালাতে হত। বাবা, কুনো কুনী ভূত অন্ধকার ঘরের কোণে থাকে বুনো ভূত বুনী ভূত বনে থাকে। ঘর ভাঙলে কি জানালা বসিয়ে আলো ঢোকালেই কুনী ভূত কি কুনী পেত্নীকে পালাতে হয়। অনেক সময় বাবা ওই জানলা কাটার সময় গাঁইতি শাবলের খোঁচা খেয়ে মরে। ঠিক তেমনি বাবা বন কাটলে বুনী ভূত বুনী পেত্নী কাটারি দায়ের কোপ খেয়ে কাটা পড়ে নয় তো ডাল চাপা পড়ে নয় তো বন ছেড়ে পালাতে হয়। তা ছাড়া ভূতেরা সূয্যির আলো কি আগুনের আলো সইতে পারে না। তাপ লাগলে আলো লাগলে

ভূতের ছায়া শরীর গলে যায়। আমাদের বড় মজার শরীর বাবা। কাঁটার উপর বসতে পারি কিন্তু আলো সইতে পারি না। সেইজন্যে দিনের বেলায় আমরা ঘুমুই। রাত্রে আমাদের মাতন। সেইজন্যে আমাদের এই জোনাকি পোকা জমিয়ে মশালের ব্যবস্থা। ওরাই আমাদের মশালচী।

আমি অবাক হয়ে গয়েশ্বরীর কথা শুনছিলাম।

গয়েশ্বরী হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—বড় সুখের বিধিব্যবস্থা ছিল বাবা। মানুষ মরত, মরে প্রেত হয়ে—এই ভূতেশ্বর ভোলানাথের খাসমহলে আসত; দিনকতক থাকত; তারপর পিণ্ডিটিণ্ডি খেয়ে বৈতরণী পার হয়ে চলে যেত। স্বর্গে নরকে। যেখানে হোক। নরকে গেলে—নরক ভোগ শেষ করে স্বর্গে যেত। এখন সব উলটে গেল। তোমরা বললে আমরা একজাত নই। ভূত আলাদা মানুষ আলাদা। নিয়ে দেশ ভাগ করলে। শুধু তাই নয় ভূতদের তোমরা মর্ত্যভুবনপুর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। মেরে ফেলছ। মানুষে মানুষ খুন করলে তোমরা ফাঁসি দাও কিন্তু ভূত মারলে বাহবা দাও। গ্রাহ্যই কর না। এ গাছে ভূত আছে—কাট এই গাছটা। এ বাড়িতে ভূত আছে, বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি কর। তা ছাড়া তোমরা আকাশে প্লেন ওড়াচ্ছ। ভূতেদের আকাশপথে আনাগোনা—তারা অন্ধকার আকাশে দল বেঁধে বেড়াতে বের হয়। দেশ দেশান্তরে যায় আকাশপথে। সেই আকাশে তোমাদের প্লেন উড়ছে। প্লেনের ধাক্কায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভূত মরছে। বাবা ছিষ্টির আদিকাল থেকে কত মানুষ মরেছে ভাব। যত মরেছে তার লাখে একজন দেবতা হয়েছে বাকীরা সব ভূত হয়েছে। তাহলে পৃথিবীময় ছড়িয়ে কত ভূত ছিল হিসেব করে দেখ। মানুষ ভূত, জন্তু ভূত, পাখি ভূত, পোকামাকড় ভূত, ভূতের কি সংখ্যা ছিল বাবা! পিলপিল করত গিজগিজ করত। ওই যে দেখছ বাবা—একটা চাপ বেঁধে রয়েছে পিঁপড়ে পোকার মত দেখছ না?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই তো বিজবিজ করছে—নড়ছে—চাপ বেঁধে রয়েছে—

—হ্যাঁ। ওই সব হল জন্তু ভূত। ওর মধ্যে বাঘ মরে বাঘভূত হয়েছে সিংহভূত হয়েছে কুমিরভূত হয়েছে—ওরা সব হিংস্রজন্তু ভূত। ওদের সব খোঁয়াড়ে আটক করা আছে। আঃ কি ভাল ব্যবস্থা যে ছিল—তা কি বলব বাবা!

আমি হেঁট হয়ে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে দেখলাম, তাই বটে—বাঘ ভালুক সিংহ কুম্ভীর গণ্ডারগুলো সব ছোট্ট পিঁপড়ের মত চেহারা নিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে গাঁক-

গাঁক গর্জন করছে। দেখলাম দুটো পিঁপড়ের আকারের বাঘে লড়াই শুরু করেছে। গোটা চারেক ভালুক—তারাও ডেয়ো পিঁপড়ের মত। তারা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো উপরের দিকে তুলে চেঁচাচ্ছে।

গয়েশ্বরী বললেন—ওই শোন ভালুকরা বলছে—হে ভগবান আর আমরা হিংসা করব না। আমরা পোষ মেনে নেচে নেচে মানুষকে খুশী করব আমাদের মুক্তি দাও।

একটা সিংহ চেঁচাচ্ছে। তারও আকার একটা লাল কাঠ পিঁপড়ের মত। গয়েশ্বরী বললেন—ও বলছে আমি মকদ্দমা করব। আমি মা দুর্গার বাহনের জ্ঞাতি। আমাকে স্বর্গে পাঠানো হোক। অন্ততঃ স্পেশাল ডায়েট দেওয়া হোক।

দুটো গণ্ডারে খাঁড়ায় খাঁড়া আটকে—ঠেলাঠেলি করছিল। তারা এই বড় জোর দুটো বাচ্চা গুবরে পোকার মত আকারের। বুনো গুণ্ডা হাতিগুলোকে মনে হচ্ছিল বড় মানে জোয়ান গুবরে পোকার মত।

গয়েশ্বরী আর একটু দূরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন—ওই দেখ। সেখানে দেখলাম গরু মহিষ উট ঘোড়া হাতি রয়েছে। তাদের আকারও ছোট ছোট। গয়েশ্বরী বললেন—ওই হল গোদানা লোক—ওইটে হল অশ্বপ্রেত লোক ওইটে হল উটভূত লোক আর ওইটে হল গজভূত লোক মানে হাতি ছানা লোক। আর ও-ই-টে হল কুকুর প্রেত লোক।

একটু হেসে বললেন—বাবা তুমি যে কটা কুকুর পুষেছিলে তারা মরে ওখানেই রয়েছে। বেটী বলে তোমার সেই অ্যালসেসিয়ানটা সেটাও ওখানে আছে।

বললাম—একবার দেখাবেন তাকে!

গয়েশ্বরী বললেন—তুমি তো এখনও মরনি বাবা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ লাইনের ধারে গাছতলায়। সেই ফাঁকে তোমায় এনে সব দেখাচ্ছি, বোঝাচ্ছি। বেটীর কাছে গেলে সে যদি তোমার গা চেটে দেয় কি মুখ চেটে দেয় তো কি করব? আর কামড়ে দিলে তো কথা নেই। এখুনি এখানে আটকাতে হবে, ভৌতিক ট্রপিক্যালে চিকিৎসা করাবার জন্য। সে উপায় নেই।

কোথায় সেই সময় ঘণ্টা পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে খোনা খোনা আওয়াজে শেয়াল ভূতেরা ডাকতে লাগল হুঁকি হুঁয়া হুঁকি হুঁয়া—হুঁয়া হুঁয়া হুঁয়া—। পেঁচারা ডেকে গেল। সেও খোনা আওয়াজ। আকাশে চাঁদ ছিল না কিন্তু আওয়াজের কোরাসের মধ্যে মনে হল বিন্দু বিন্দু চন্দ্র—অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সরষে বাঁটা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গয়েশ্বরী বলে উঠলেন—ওঁরে, বাঁবারে। তিন পঁহর পাঁর হঁয়ে গেঁল। এঁখনও কঁথা বলা হঁল না। কি কঁরব রেঁ।

সেই দামিনী ঝি ভূত এবার বলে উঠল পান দোক্তা খাঁবে আর যঁত বাঁজে গঁপ্প কঁরবে। সোঁজাসুঁজি বঁল না বাঁপু যে, সাঁরা ভূতভুবনপুর খেঁপে রয়েছে—তারা বলতে চায়—আমাদের দাবি মানতে হবে। তা না যত সব ইয়ে। বাঁবা বাঁবা বাঁবা। এঁত বাঁবা বাঁবা কি সের গোঁ? অঁঃ—

—থাঁম বঁলছি হারামজাদী! এঁ্যাঃ। এ যেন মর্ত্যভুবনপুর পেঁয়েছিস। হু। কাঁউকে মানব না কিছু মানব না।

দামিনী মুখটা ফিরিয়ে জিভ কেটে ভেংচি কেটে দিলে গয়েশ্বরীর উদ্দেশে। গয়েশ্বরী তা দেখতে পেলেন না। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন—শোঁন বাঁবা। হ্যাঁ যাঁ বঁলছিলাম। দাঁমিনী মিঁছে বঁলে নি। আঁমাদের ভূঁতেরা বাঁবা মানুষদের উপর মর্ত্যভুঁবনপুরের উঁপর চঁটে গেঁছে। মঁস্ত মঁস্ত মিটিং হঁচ্ছে। তা অন্যায় তো বঁলতে পাঁরি না। তোমরা আমাদের ভূতদের মেরে মেরে প্রায় নির্ব্বংশ করতে চলেছ। প্লেনের ধাক্কায় ভূতেরা মরছে আকাশপথে চলবার সময়। ভূতদের বাবা চেহারা আছে দেহ নাই। ভূতেরা ইচ্ছেমত বড় হয়, ইচ্ছেমত ছোট হয়। তোমরা আমাদের সঙ্গে ভেন্ন হলে। ছোট দেশে এত ভূত। ওদিকে তোমরা সাহসী হলে ভয় ভুললে। কি করি ভূতরা আকারে ছোট হতে লাগল। মানুষে ভয় পেলে ভূতেরা বড় হয়। তালগাছের মত বাঁশ গাছের মত। আবার সাহস করে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে এলে এই এতটুকু ওই জন্তু-জানোয়ার যেমন পিঁপড়ের মত হয়েছে তেমনি হয়ে যায়। তা নইলে উপায় কি বল? মানুষ মরে ভূত হয়। আজ পর্যন্ত পিথিমীতে সেই আদ্যিকাল থেকে যত মানুষ জন্মেছে তারা সবাই মরেছে। ভূতও হয়েছে। ভূত হলে এত ভূত কোথায় ধরবে বল! তাই দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে ভূতরা। তবে ইচ্ছে করলে—আর মানুষের যখন বুক ঢিপ ঢিপ করে তখন তারা বড় হয়ে যায়। এরা সেই ছোট চেহারা নিয়ে চামচিকের মত বাদুড়ের মত আকাশে যখন ওড়ে—তখন প্লেনের ধোঁয়ায় ওরা উড়ে যায়। পাখায় কেটে যায়। তার উপর অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ফাটাচ্ছ তোমরা। তাতে মানুষের নিরাপত্তা দেখ। ভূতদের দেখ না। ভূতরা তার আঁচে পুড়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল। ছাই হয়ে গেল। এঁই-সঁব কাঁরণে বাঁবা ভূতেরা খেপেছে। তারা রব তুলেছে। তাই তোমাকে শোনাতে এনেছি এখানে। তারা রব তুলেছে—শোঁধ চাই! শোঁধ চাই! মাঁনুষের অঁত্যাচারের শোঁধ চাঁই।

দামিনী বঁললে—এঁকটি ভূঁতের প্রাণের জন্যে দঁশটি মাঁনুষের জান চাঁই। হুঁ—হু!

—হ্যাঁ বাঁবা।

আমার বেশ মজা লাগছিল। আমি বললাম—তা ভূতেরা পারবে না। কখনও না!

—পাঁরবে। পাঁরবে। নিশ্চয় পাঁরবে। একটি ভূঁত মরলে দশটি মানুষ মাঁরবে। বলে দামিনী দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। সে এমন দাঁত কিড়মিড় যে আমি আচমকা যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম।

গয়েশ্বরী বললেন—চমকাচ্ছ বাবা? বলতে আমারও ভঁয় কঁরছে বাঁবা। বুঁদ্ধি তাঁরা আঁচ্ছা ঠাঁউরেছে। মাঁনুষের সঁব চেঁষ্টা ভূঁতেরা ব্যর্থ কঁরে দেঁবে। ভূঁতেরা এঁবার কোঁমর বেঁধেছে।

বলতে বলতে গয়েশ্বরী খানিকটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নিজের আঁচলখানা টেনে কোমরে জড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। হাতের নখ দিয়ে দামিনীর পিঠে খামচি কেটে দিলেন। দাঁতে দাঁতে ঘষে কড়মড় শব্দ করলেন।

এবার আমার সত্যিসত্যিই ভয় হল। নার্ভাস হয়ে গেলাম। যদি দামিনী তার ওই বাঁকা শ্বাদন্ত দিয়ে কামড়ে দেয়। কি গয়েশ্বরী যদি হঠাৎ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে—ওই মোটা ফোলা হাতখানা বাড়িয়ে আমাকে টেনে—

চমকে উঠলাম। ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। মনে পড়ল কে একজন ভূতের ভয়ে গাছে উঠে আরও ভয় পেয়েছিল। কারণ গাছের ভূতটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি মজা এঁকেবারে হাঁতের কাঁছে পেঁলাম।

"ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে—ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।"

আমারও তাই হল নাকি?

সত্যিই তাই হল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে গয়েশ্বরী দেবী বিকট খিলখিল শব্দে হাসতে লাগলেন।

—হিঁ-হিঁ-হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ……।

আমার খাঁচাছাড়া আত্মাপুরুষের সেই অদৃশ্য দেহের অত্যন্ত মিহি রোমগুলি খুব চমৎকার ভয়ে একেবারে পেরেকের মত খাড়া হয়ে উঠল। তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম—একি একি আপনি এমন করে হাসছেন কেন?

গয়েশ্বরী দেবী শুনে থামবেন কোথায়—তিনি আরও জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম—বেশ বিনয় করেই বললাম—হাসবেন না। আমার ভয় করছে।

—কঁরছে! কঁরছে! তাঁই তোঁ কঁরবে। তাঁ হলে এঁইবার দেঁখ। ওঁরে ভূতের বিক্রমটা দেঁখ্। দেঁখ এঁবার কঁত বঁড় কঁত চঁমৎকার ভঁয়ানক হঁই দেঁখ্। নাঁস্তিক পাঁষণ্ড মাঁনুষ কোঁথাকার।

গয়েশ্বরী দেবী সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে লাগলেন। বাড়তে লাগলেন। লম্বা হতে আরম্ভ করলেন।

ফুটবলের ব্লাডারকে যেমন ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়, বেলুনকে যেমন ফোলানো যায় তেমনি ভাবে ফুলতে লাগলেন। মাথাটা বাড়তে লাগল। হাত-পাগুলি লম্বা পাকা বাঁশের মত লম্বা হতে লাগল।

শুধু তাঁরই নয় তাঁর সঙ্গে দামিনীরও।

তার দাঁত দুটো মুলোর মত লম্বা হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সেই দাঁত দুটি মেলে সে তার সেই বাঁশের মত লম্বা পায়ে নটরাজের নৃত্য ভঙ্গীতে এক পা তুলে, এবং হাত দুখানা দুপাশে বেশ মুদ্রা ভঙ্গীতে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—গান ধর!

হাত দুখানা দুপাশে বেশ মুদ্রা ভঙ্গীতে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—গান ধর!

সভয়ে বললাম — কোন্ গান?

সে বললে— প্রলয় নাচন।

বললাম—জানি না।

সে বললে—তবে ছি ছি এত্তা জঞ্জাল ধর।

বললাম—তাও জানি না। আমি গানই জানি না।

এরপর কি হত তা জানি না। রক্ষা করলেন গয়েশ্বরী ঠাকরুন। তিনি এক

ধমক দিলেন দামিনীকে। চুপ রহো হারামজাদী। হট যাও। মরণ নানুর ঘাটে আর মুখ ধুসনি। নাচবি। সরে যা বলছি।

যত বলছিলেন গয়েশ্বরী তত বাড়ছিলেন। ফুলছিলেন। তিনি ধাক্কা দিয়ে দামিনীকে সরিয়ে দিয়ে বললেন—শোঁন মূর্খ আঁমি যাঁ বঁলি তাঁই শোঁন। শুনে গিঁয়ে মানুষদের বঁলবি। শোন—মানুষ যেমন মানুষকে ভালোবেসে একসঙ্গে মিলে বাস করে, ভাঁলো না বাঁসলে যেমন মানুষে মানুষে ঝগড়া হয়, তেমনি ভূতে মানুষে একসঙ্গে বাস করে পরস্পরকে ভয় করে। মানুষ ভূতকে রাতে ভয় করে। ভূত মানুষকে দিনে ভয় করে। সম্পর্ক ভয়ের। ভঁয় কঁরে বলেই মানুষ চায় ভূত থাকুক। অন্ধকারে থাকুক লুকিয়ে থাকুক। ছেলেরা যখন দুধ খাবে না তখন ডাকলে সাড়া দেবার জন্য থাকুক। একলা ঘরে শুয়ে মনে মনে কথা বলবার জন্যে ঘরে থাকুক। ভূত দিনে মানুষকে ভয় করে রাত্রে তাদের ভালবাসে। ভূতেরা আজও মানুষকে ভয় করে ভালবাসে। কিন্তু মানুষেরা ভূতকে ভালও বাসে না ভয়ও করে না। লাখে লাখে তাদের খুন করছে। মারছে। তারই শোধ নেবার জন্যে ভূতেরা কোমর বেঁধেছে। প্রতিজ্ঞা করে তারা প্রতিদিন হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরছে। ইচ্ছে করে মরছে। জাপানীদের মত হারিকিরি করছে। কেন? জানিস?

সভয়ে বললাম—কেন?

উত্তরে হাসতে লাগলেন গয়েশ্বরী হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—।

সেই খিলখিল খোনা ভুতুড়ে হাসি।

আমি বললাম—বলতে গিয়ে তোতলা হয়ে গেলাম। তোতলামি করে কোনরকমে বললাম—ন-ন-না। না—। ঐ—এ—এমন করে হাসছেন ক্—ক্ কেন?

—কেন হাঁসছি? হাঁসছি কেন?

—হ্যাঁ।

—কেন—তাঁ বুঝতে পারছিস না। আজও বুঝতে পারিস নি?

—না।

—তবে শ্রবণ কঁর।

—বলুন।

গয়েশ্বরী দেবী অকস্মাৎ আসন করে বসে আচমন করে বললেন এবং সাধুভাষায় বললেন—নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর! অতঃপর ওরে অর্বাচীন তবে শ্রবণ

কর। মানুষ মরিয়া যেমন ভূত হয়। ভূতরা মরিয়াও তেমনি মানুষ হয়। ভাবিয়া দেখ—গত যুদ্ধে যুদ্ধের সময় মহামারীতে কত লোক মরিয়াছিল। সকল দেশে মানুষের অভাব ঘটিয়াছিল। আর আজ এই কুড়ি বাইশ বৎসরের মধ্যে কি হইয়াছে দেখ। দেখ মানুষ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? বাড়িয়াছে তো তাহারা আসিল কোথা হইতে? তোরা ভূতকে মারিয়াছিস, ভগবানকে মারিয়াছিস তাহার সঙ্গে দেবতাকেও মারিয়াছিস—একটি দেবতা ছাড়া। ব্রহ্মাকেও মারিয়াছিস, বিষ্ণুকেও মারিয়াছিস—পারিস নি শুধু শিবকে। ব্রহ্মা যদি মরিল তবে এত লোক আসিল কোথা হইতে? কে তৈয়ারি করিল?

হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ।

আবার সেই হাসি। একে সাধুভাষায় গম্ভীর গম্ভীর কথা, খোনা আওয়াজ তার সঙ্গে এই হাসি। ওঃ।

আবার আমি বললাম—আবার হাসছেন? দয়া করে যা বলছেন তাই বলে শেষ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে গয়েশ্বরী মাথায় হাত দুই লম্বা হলেন এবং প্রস্থেও খানিকটা ফুলে উঠলেন। এবং আরও জোরে হাসতে লাগলেন।

—হিঁ—হিঁ—হিঁ। এঁখনত শেষ কঁরতে হঁবে? ওঁরে মূর্খ! এঁখনও বুঁঝিলি না? ব্রহ্মাকে মারিয়াছিস—প্রাণী সৃষ্টি করিবার সৃষ্টিকর্তা নাই। সৃষ্টি হইতেছে কি করিয়া? ওরে—ওই ভূতগুলো গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে। ওই একালের চোঙা প্যাণ্ট কাকের বাসার মত চুল—ওই কিম্ভূতকিমাকার জামাপরা ওই লিকলিকে চেহারা আজব আবির্ভাব দেখিয়া বুঝচিস না! সব ভূত হারিকিরি করিয়া মানুষদের উপর শোধ নিবার জন্য ফিরিয়া গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে এবং বিশ্বব্যাপী ভূতের উপদ্রব শুরু করিয়াছে। মানুষেরা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে ভূত নাশ করিয়াছে ভূতের ভয় ঘুচাইয়াছে এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারি করিয়াছে এখন ভূতেরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া ওইসকল বোমা লইয়া প্লেন লইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া মানুষদের শেষ করিয়া ছাড়িবে। আমার বাবা সেই লড়াই বাধাইবার একজন মাতব্বর হইবার জন্য ভূত দেহ ত্যাগ করিয়া মর্ত্যলোকে জন্মিতে চলিলেন। যুদ্ধ বাধিবে এবং তখন অ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমায় সব মানুষ মরিয়া যাইবে। মানুষ মরিলে ভূত হয়। সুতরাং সব বিলকুল বেবাক আপাদমস্তক আবালবৃদ্ধবনিতা কাক কোকিল চিল শকুন পোকামাকড় জীবজন্তু গরু

ভেড়া বাঘ ভালুক বনমানুষ মানুষ সব মরিয়া গিয়া ভূত হইয়া এই অসুন্দর মানুষের পৃথিবীকে সুন্দর ভূতের পৃথিবীতে পরিণত করিবে।

আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। যেন নয়। সত্যি সত্যিই ঘুরতে লাগল।

সমস্ত ভূত ভুবনপুরটাই যেন পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই পাঁচশো লোকের পোলাও রান্না করার ডেকচিটার মত ফুলে বেড়ে ওঠা মাথাটা কখনও যেন লম্বা হয়ে প্রকাণ্ড খোলের মত হয়ে যেতে লাগল আবার পরক্ষণেই গুটিয়ে কুঁকড়ে খাটিয়ে যেতে লাগল। তার সেই বিরাট বেলুনের মত দেহটাকে দিয়ে কোন বেলুনওয়ালা যেন মুচড়ে তুমড়ে নানান রকমের চেহারা দিতে লাগল। ওদিকে কারা যেন দল বেঁধে কোরাসে গান ধরেছিল—

মরবে না মরবে না ভূত কখনও মরবে না। আশ্চর্য ওদের সুর। সে খোনা আওয়াজে আকাশছোঁয়া চিৎকারে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপিয়ে দিলে তারা। এবং তার বিচিত্র তালে যেন সকলেরই পা নাচতে চাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল—মনে হল কেন মনে পড়ছে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করে ঘুরে যাওয়া মাথাকে সোজা করে দেখলাম কেউ যেন ধেই ধেই করে বিস্ময়কর নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। এই মোটা এই লম্বা। এই মাথা এই পেট কিন্তু হাত এবং পাগুলি বাঁশের মত সরু আর বিস্ময়কর রূপে লম্বা। সেই সরু শক্ত পায়ে সে ঝমোঝমো করে নাচ এবং সরু লম্বা হাতে আশ্চর্য আশ্চর্য মুদ্রা।

সে আর কেউ নয়। আমাদের মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী।

ভূত কখন হারবে না। মানুষেরা পারবে না।
মরে যত ভূত হবে মানুষের পুত—

তখন বাবা তাড়িয়ে দিলেও ভূতেরা আর তাড়বে না। আশ্চর্য নাচ নাচছিলেন গয়েশ্বরী। আশ্চর্য, ভীষণ ভালো, ভয়ংকর চমৎকার। আমি প্রায় বিমোহিতই হয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। শুনলাম--রাম বাবু! রাম বাবু! রাম কা—লী বাবু—।

বাস্। মুহূর্তে কি হয়ে গেল। সব যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই বিরাট পেট এবং মাথা যেন ফুটে যাওয়া বেলুনের মত মুহূর্তে গুটিয়ে এই-টুকু একটুখানি রবারের মত হয়ে গেল। এবং সেই বাঁশের মত লম্বা হাত-পাগুলি শুকুতে লাগল খাটাতে লাগল; ক্রমে বাঁশ থেকে শুকিয়ে কঞ্চির মত তারপর

কঞ্চি থেকে শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গেল এবং খাটিয়ে এতটুকু হল। তারপর যেন মুড়মুড় করে গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। ভূতভুবনপুরের সেই জোনাকি আলোয় আলোকিত সুন্দর অন্ধকার তাও মিলিয়ে গিয়ে খানিকটা দিনের আলো আলো হয়ে এল।

—রামকালী বাবু!

বুঝলাম—আমাকেই কেউ ডাকছেন। আগেই বলা উচিত ছিল আমার, বলতে ভুলে গেছি রামকালী শর্মা আমার নাম।

চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম—অনেক লোক জমে আছে। আমার মাথার কাছে বসে একজন ডাক্তার আমাকে দেখছেন। ইনজেকসন দিয়েছেন। সিরিঞ্জ ধুচ্ছেন। পাশে বসে একজন রেলের কর্মচারী আমাকে ডাকছেন—রামকালীবাবু!

চোখ মেলতেই তাঁরা সকলে বললেন, জ্ঞান হয়েছে জ্ঞান হয়েছে।

আমি উঠে বসতে গেলাম। কিন্তু তাঁরা উঠে বসতে দিলেন না। ধরাধরি করে ট্রেনের কামরায় তুলে বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিলেন। আমার অনুচর হরি মহারানা সেও পাশে বসল। চোখ মুছতে মুছতে বললে—আমারও বড়ো ভয়ও লাগিথিলি। সারারাতও জ্ঞানও হইল না।

* * *

ট্রেন ডিরেল্ড হয়েছিল। আমার মাথায় ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ একেবারে বাস্তব সত্য। কিন্তু—।

কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় এসব কি হল?

জানি না। কি হল বা হয়েছিল—জানি না। বলতেও পারব না। অজ্ঞান অবস্থায় এমন স্বপ্ন কেউ কি দেখে?

দেখে। নইলে আমি দেখলাম কেন?

আমি দেখলাম যা তা স্বপ্ন হলেও সত্য। আজেবাজে স্বপ্নের মত মিথ্যেও নয়। মিথ্যে নয় এই কারণে বলছি যে এর পরও আমি গয়েশ্বরী দেবীকে স্বপ্নে দেখলাম। ঠিক দিন তিনেক পর, সেদিন ঘুমটি সবে এসেছে আর কে যেন বললে—

—ঘুঁমুলে নাঁকি?

—কে?

—আঁমি গঁয়েশ্বরী ঠাঁকরুন।

—কি ?

—দেখ সেদিন ওরা তোমার নাম ধরে ডাকলে, দশরথ রাজার বেটার নাম তার সঙ্গে আবার খেপা মায়ের নাম জোড়া! ও নাম হতেই আমরা ফুস্‌ধা হয়ে গেলাম। বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিলে। কথাগুলো সব বলা হল না।

—আর কি বলবে ? বলবার কি আছে ?

—আছে বাছা আছে। রাগ করছ কেন ? রাগ করলে আমরা বাগ পাইনে। বুঝেছ। ভয় না পেলে ভূতের সঙ্গে প্রেম হয় না। মানুষ ভূতকে ভয় করে ভূতও মানুষকে ভয় করে। সেইখানেই ভূতে মানুষে অজ্ঞাত প্রেম। সেই কারণেই মানুষ মরে ভূত হয় এবং ভূতেরা মরেও মানুষ হয়। শ্রবণ কর ভূত পুরাণের কথা। সেই আদ্যিকাল। জল নাই স্থল নাই শুধু বাতাস। মানুষ নাই ভূত নাই দেবতা নাই স্বর্গ নাই মর্ত্য নাই। সেই কাল। সেই আদ্যিকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনে বসে আছে কাজ নেই কর্ম নেই কি করে! কেউ পূজো করে না। কেউ লড়াই করে না। নিষ্কর্মার জীবন। দিন রাত্রিও নাই। কাল কাটে না। তখন তিনজনে বললে এস ভাই খেলা করি।

—কি খেলা ?

—না, এস একজন আমরা গড়ি; একজন সেইটেকে সাজাও; একজন সেটাকে ভাঙ।

—বেশ বলেছ।

ব্রহ্মা প্রথমে গড়লেন দিন। বিষ্ণু সূর্যকে পূব থেকে পশ্চিমে পৌঁছে দিলেন। শিব তাকে হাতে ধরে টেনে ডুবিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা তাকে ধরে নিয়ে আবার উঠিয়ে দিলেন। আবার বিষ্ণু তাকে পশ্চিমে হাজির করলেন। শিব সূর্যকে ডুবিয়ে দিলেন। এরপর ব্রহ্মা একটা রাজ্য গড়লেন। কি রাজ্য না স্বর্গ। তারপর সে রাজ্যে থাকবে কে ? তখন দেবতা গড়তে লাগলেন। বিষ্ণু তাদের পালন করতে লাগলেন। মানে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। এরপর সমুদ্র মন্থন করে সুধা তুলে—দেবতারা অমর হলেন। শিব তখন রাগ করে বললেন—দেবতারা অমর হল এখন আমি তাহলে ভাঙব কি মারব কাকে ? বলে রাগ করে তিনি ভূত তৈরি করলেন। শিব বলবান বটেন কিন্তু কারিগর ভাল নন। বুঝেছ! সেই কারণে ভূতেদের চেহারা ভাল নয়। তবে তারা যেমন ইচ্ছে তেমনি রূপ ধরতে পারে। এই তো ঝগড়া বাধে বাধে হল। তখন একটা সন্ধি হল।

ব্রহ্মা তৈরি করলেন মর্ত্যভুবন। এবং সেখানে তৈরি করে দিলেন মানুষ। শিব ভূত-গুলোকে পাঠালেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা তাদের মানুষ করে মর্ত্য ধামে পাঠালেন। আমি বললাম—তোমার মাথা! তুমি এক তাল বায়ু আমার মাথার মধ্যে এসে জমা হয়েছ। ভাগো বলছি, ভাগো! জানো আমার নাম—রা—ম কালী শর্মা—

বাস। ম্যাজিকের মত কাণ্ড। গয়েশ্বরী মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু একটা কথা কানে এল—আচ্ছা আমার বাবা তোমার বাড়িতে এসে জন্মাবেন। এবং প্রমাণ করে দেবেন যে যেসব ভূতকে তোমরা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে বধ করছ তারা সবাই এসে তোমাদের মধ্যে জন্মাচ্ছে। মানুষ মরে ভূত হোক আর না হোক ভূত মরে মানুষ হচ্ছে। এবং প্রমাণ করছে—

মরবে না মরবে না—ভূত কখনও মরবে না।
মানুষেরা পারবে না—ভূত কখনও হারবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে সমস্ত ব্যাপারটা লিখে রাখাই স্থির করলাম। সত্য না-হওয়াই উচিত।

তবে——।

মিথ্যে না-ও হতে পারে।

———

● **জুলুমবাজির ফল**
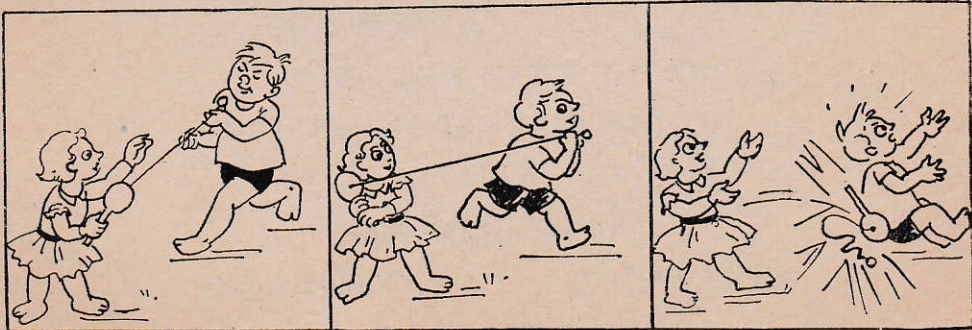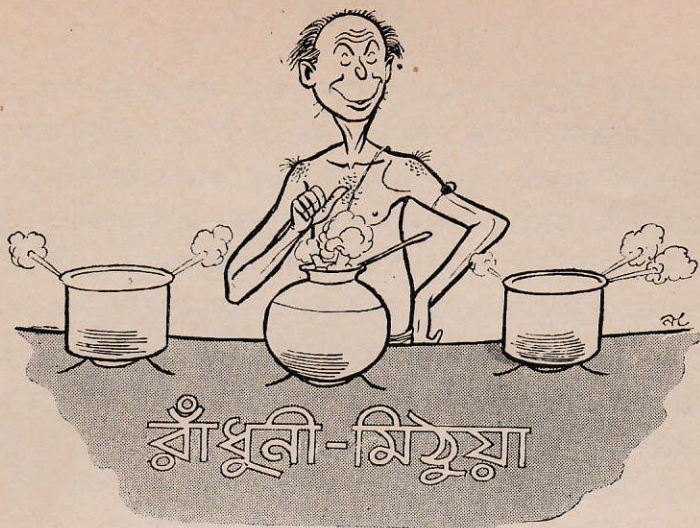
শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
জামাইকা গ্রীস গিয়ে কানাডা প্যারিস গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না।
হাতে নিয়ে ডেচ্‌কি
যেই তুলি হেঁচ্‌কি
বিরিয়ানী কোর্মা
পটলের দোরমা
মিলে মিশে হয়ে যায় উচ্ছের ছেঁচ্‌কি,
মুখে দিলে এই হাসি এই পাবে কান্না।

* * *

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
খাইবার পাস গিয়ে রোম সাইপ্রাস গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না!

চ্যাং-ব্যাং-খল্‌সে
রোদ্দুরে ঝল্‌সে
খুন্তিটা বাজিয়ে
দিই যেই সাজিয়ে
অমনি যে হয়ে যায়
'মাগুরের ঝোল' সে,
ভুঁড়ির ভাবনা
নেই যত খুশী খান না !

* * *

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
ম্যারিকা এডেন গিয়ে কোপেনহেগেন গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না !
'হরে কর কম'বা
'রাঙালুর দম্‌'বা
ট্যাঁড়সের কচুরি
খেজুরের খিচুড়ি
মোটা খেলে রোগা হবে বেঁটে হবে লম্বা
ককিয়ে বলতে হবে,—"কোবরেজ আন না !"

* * *

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
ইস্তাম্বুল গিয়ে জাপান কাবুল গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না !

● শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
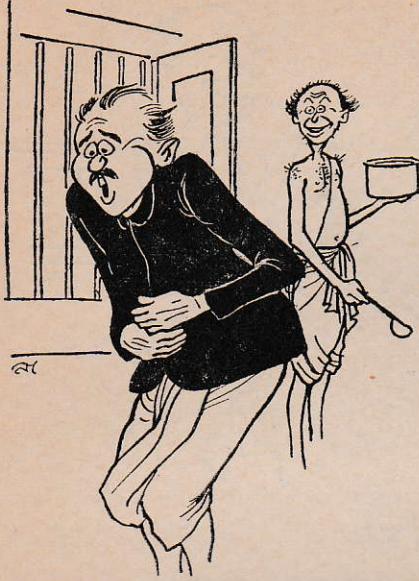
কচি খসখসেতে
গ্যাঁদালের রসেতে
কিছু বিট্ নুনকে
কিছুটা রসুনকে
কচুর সঙ্গে মাখি
টম্যাটোর সসেতে
চেখে দিন উপহার
দশ রতি পান্না !

*　　*　　*

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
ফিজি ব্যাবিলন গিয়ে　　তাহিতি সিলোন গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না !

দুধে আর আখেতে
পাকা পুঁইশাখেতে
কড়াইটা তাৎলে
যদি দিই সাঁৎলে
গোগ্রাসে খেতে হবে চোখে-মুখে-নাকেতে
ফুরোবে না এ-খাবার যত খুশী চান না !

*　　*　　*

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
ঘানা বিস্‌ব্রেন গিয়ে　　মরক্কো স্পেন গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না।

না কেটেই খাসিটা
'টাটকা' কি 'বাসি' তা
ঠিক পড়ে নজরে
বলে দিই সজোরে
মাংসটা ঝাল হবে
'মেটে' হবে আশিটা,
এমনটি পাবেন না
যেখানেই যান না !

* * *
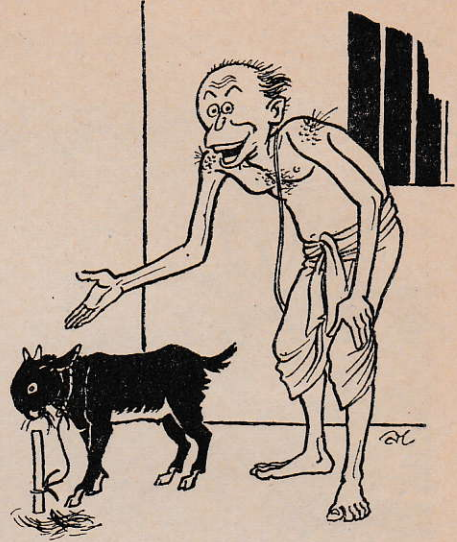
আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
সুইজারল্যাণ্ড গিয়ে ইজিপ্ট হল্যাণ্ড গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না !
আমি নই 'কেতাবী'
এ চ্যালেঞ্জ এ দাবি
ইহকাল কেটেছি
পরকাল বেটেছি
দলে দলে খেয়ে যান দম্ ভরে এ-'খাবি'
থাকবে না খাওয়া নিয়ে লক্ষ-বাহান্না !

আমি শ্রীশ্রী মিঠুরাম মান্না
পৃথিবীর ছাদে গিয়ে আসল ও-চাঁদে গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না !!

———

ফুলের মত সুন্দর শহর ফ্লোরেন্স

রেলিং-ঘেরা "পিয়াৎসা মাইকেল এঞ্জেলো" থেকে দেখা যায়
একদিকে স্বপ্নছবির মত ফ্লোরেন্স শহর।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রায় ন ঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণের পর দিনের শেষে রোম থেকে এসে ফ্লোরেন্স-এর মাটিতে যখন পা দিলাম, সন্ধ্যার ছায়া তখন নামছে ধীরে ধীরে।

রোম থেকে ১৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, ইটালির পশ্চিম উপকূল থেকে ৮০ মাইল অভ্যন্তরে ফ্লোরেন্স শহর।

রোম যেমন ইটালির 'ল্যাটিয়াম' অঞ্চলের অন্তর্গত, ফ্লোরেন্স-এর অবস্থান তেমনি যে অঞ্চলে, তার নাম 'টুসকানি'।

রোম যে ইটালির রাজধানী তা তোমরা নিশ্চয় ইতিহাসে পড়েছ। কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না যে সে গৌরব ফ্লোরেন্স-এরও ছিল এককালে—১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত।

রোমের জাঁকজমকের সঙ্গে ফ্লোরেন্স-এর তুলনা হয় না, সে কথা ঠিকই। কিন্তু তা হলেও আর্নো নদীর তীরবর্তী পাহাড়-ঘেরা এই ছিমছাম শহরটিকে এক কথায় বলা যায় চ-ম-ৎ-কা-র।

তাই এই শহরের নামও হয়েছে ফ্লোরেন্স।

ফ্লোরেন্স নামের উৎপত্তি ল্যাটিন কথা 'ফ্লোরেনসিয়া' (Florentia) ও ইটালিয় কথা 'ফিরেনৎসে' (Firenze) থেকে, যার অর্থ হল যথাক্রমে ফুলে ভরা ও ফুল। সত্যিই রূপেগুণে ইটালির চোখ জুড়ান মন ভরান অপরূপ ফুল যেন একটি ফ্লোরেন্স। গ্রীষ্ম, শরৎ আর বসন্তকালে ফ্লোরেন্স-এর যত ফুলবাগান সব ছেয়ে যায় রংবেরঙের ফুলে।

নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দুই তীরেই ছড়িয়ে আছে বটে শহর কিন্তু দক্ষিণে পর্বতশ্রেণী বাধা সৃষ্টি করার জন্য শহর অঙ্গবিস্তার করেছে নদীর উত্তরাংশের বিস্তৃত এলাকায়।

শুনেছিলাম একের পর এক তিন সারি প্রাচীর দিয়ে নাকি ঘেরা ছিল প্রাচীন শহর। কিন্তু নদীর উত্তরে কোন জায়গায় সে সব প্রাচীর এখন আর নেই। যেখানে প্রাচীর ছিল, এখন প্রশস্ত পথে আর চত্বরে ছয়লাপ সে সব জায়গা। আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে ওই এলাকারও বাইরে।

সাবেক কালের নগর-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু এখনও দেখা যায় নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থানে।

ফ্লোরেন্স পরিক্রমার শুরুতেই আমরা দুই বন্ধু প্রথম যাই শহরের শ্রেষ্ঠ চার্চ 'সাণ্টা মারিয়া দেল ফিওরে'তে (Santa Maria del Fiore), ও অঞ্চলে যাকে সংক্ষেপে বলে 'ডুয়োমো' অর্থাৎ আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ গির্জা। কিন্তু ওই চার্চ কেবল ফ্লোরেন্স-এর শ্রেষ্ঠ গির্জা নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম গির্জা— রোমের সেণ্ট পিটার্স চার্চের পরেই। একটি প্রশস্ত 'পিয়াৎসা' বা চত্বর ঘিরে এই বিরাট চার্চ, তার ঘণ্টাঘর (Campanile) আর দীক্ষামন্দির (Baptistery)।

যেমন বিরাট চার্চ তেমনি পেল্লায় তার মাথার ওপর লাল টালির অষ্টকোণী

সুদৃশ্য গম্বুজ। নানারূপ প্রাচীরচিত্র, প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি দিয়ে ভেতরটা অতি সুন্দর করে সাজিয়েছেন সুদক্ষ শিল্পীরা।

ঘণ্টাঘরের বৈশিষ্ট্যই কি কম! এমন সুদর্শন ঘণ্টাঘর খুব অল্পই আছে জগতে। চারশ' চোদ্দটা সিঁড়ি ভেঙে দুশ' বিরানব্বই ফুট উঁচু এই ঘণ্টাঘরের টঙে কষ্টেস্থষ্টে একবার উঠলেই সব কষ্ট জল ফ্লোরেন্স শহরের অনুপম দৃশ্য দেখে।

দীক্ষামন্দিরের বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্রঞ্জে তৈরী তার তিনদিকের তিনটি দরজা। শিল্পীরা এই তিনটি দরজার ওপর তাঁদের অসামান্য শিল্প-প্রতিভার যে অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন যে তা দেখবে সেই নিঃসন্দেহে হবে মুগ্ধ।

ডুয়োমো থেকে ভিয়া কালৎসাওলি (Via Calzaioli) নামে একটি রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় 'পিয়াৎসা দেল্লা সীনিয়রিয়া' (Piazza della Signoria) নামে আর এক সুবিস্তীর্ণ চত্বর। ফ্লোরেন্সে চত্বর আছে অনেক। তাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় এই চত্বর। চত্বরের মাঝখানে পাথরের যে একটা গোল পাটা (slab) পোঁতা আছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতীতের এক করুণ কাহিনী।

সেই কাহিনীর প্রসঙ্গক্রমে প্রথমেই তোমাদের সেকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একটু শুনিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগে ইওরোপে ঋষিবাক্য, গুরুবাক্য আর ধর্মযাজকদের অনুশাসন দেশের লোকের মনে এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাঁদের যে কোন নির্দেশকেই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ জ্ঞান করে তা নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় পালন করত তারা। তাঁদের নির্দেশে নরকযন্ত্রণা এড়িয়ে স্বর্গসুখ ভোগের প্রত্যাশায় পৃথিবীর সব আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে বৈরাগ্যসাধন করা সেকালে সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিল্পীদের শিল্পচর্চায় এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মান্ধ যাজকদের এই কড়া অনুশাসন।

কিন্তু তারপরেই এলো এর প্রতিক্রিয়া। প্রথমে ইটালিতে ও ক্রমশঃ সারা ইওরোপে এলো নবজাগরণ (Renaissance)। মরা নদীতে বান ডাকল যেন।

বৈরাগ্যবাদী সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি অন্ধবিশ্বাস শিথিল হয়ে স্ফুরণ হল মানুষের স্বাধীন চিন্তার। রূপে রসে ভরা এই ভুবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শিল্পীরা চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকলার মাধ্যমে তাঁদের মনের আনন্দকে রূপদান করতে আরম্ভ করলেন।

আত্মাভিমানী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তখন স্বভাবতঃই বিরোধ লাগল তাঁদের। এই সব প্রাচীনপন্থী সংস্কারবিরোধী সন্ন্যাসীদের একজন দলপতি ছিলেন সাভানারোলা। তিনি অগত্যা তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে সোৎসাহে প্রচারকার্য ও আন্দোলন শুরু করলেন উদারপন্থী নব্যতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে।

তিনি একদিন নব্যতন্ত্রী যুবকদের সম্বোধন করে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তোমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব সুখ ও সৌন্দর্যের মোহে অন্ধ হয়ে ভগবানকে অবহেলা করে পৌত্তলিকদের মত প্রতিমা গড়ছ, ছবি আঁকছ। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি এখনও যদি তোমরা তোমাদের ওই অপরাধের জন্য অনুতপ্ত না হও আর ওই সব শিল্পচর্চা যদি বর্জন না কর তাহলে ভগবানের অভিশাপে তোমাদের অনন্তকাল নরকবাস অবধারিত।

তাঁর সেই শাসানি শুনে তারা গেল রীতিমত ভড়কে। তাদের কাছে যত ভাল বই, ছবি আর প্রতিমূর্তি ছিল সব তড়িঘড়ি নিয়ে গিয়ে তারা স্তূপাকার করল যেখানে হাট বসে সেইখানে। তারপর সাভানারোলা নিজের হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে সেই স্তূপে যখন অগ্নিসংযোগ করলেন তারা যেন সম্মোহিত হয়ে পুলক-নৃত্য করতে লাগল, সেই জ্বলন্ত স্তূপ প্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু আগুন নিবে যাওয়ার পর যখন তারা দেখলে তাদের এত সাধের সেই সব শিল্প-সম্পদ ছাই হয়ে গেছে পুড়ে তখন তাদের মোহভঙ্গ হল আর সব রাগ গিয়ে পড়ল সেই ধর্মোন্মাদ সন্ন্যাসীর ওপর। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তারা করলে কি—প্রথমে তাঁকে কারারুদ্ধ করলে। তারপর তাঁর ওপর চলল অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু তবু তিনি না করলেন তাঁর মত পরিবর্তন, না হলেন বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত। তখন নির্দয়ভাবে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তারা তাঁকে নিক্ষেপ করলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। দেখতে দেখতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন সাভানারোলা।

● শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

পিয়াৎসা দেল্লা সীনিয়রিয়ার যেখানে তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল, সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করার জন্য ঠিক সেখানেই প্রোথিত করা হয়েছে পাথরের সেই গোল পাটা।

এতক্ষণ তোমরা অনেকে হয়তো ভাবছিলে "ধান ভানতে শিবের গীত"-এর মত ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসে ইতিহাসের অবতারণা করা অর্থহীন। আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক তা নয়। ফ্লোরেন্স-এর মত এমন অনেক দেশ আছে,—যেমন মনে কর আমাদের আগ্রা কিংবা দিল্লী—যাদের সঙ্গে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। সেই সব দেশের ভ্রমণকাহিনী লিখতে হলে সেই সঙ্গে লিখতেই হবে আর পাঠকদেরও পড়তেই হবে সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ। না হলে সেই সব দেশের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় হবে অসম্পূর্ণ।

সেকালে পিয়াৎসা দেল্লা সীনিয়রিয়ার মধ্যে যেখানে হাট বসত, এখনও তেমনি বসে প্রতি শুক্রবার। দেশবিদেশের পর্যটকদের ভিড় তো ওখানে আছেই বার মাস কিন্তু বিশেষ করে হাটের দিন ভিড় হয় দারুণ।

বছরের দুটি দিন—মে মাসের প্রথম রবিবার আর জুন মাসের চব্বিশ তারিখে শহরের লোক ভেঙে পড়ে ওখানে। মধ্যযুগীয় এক উৎসবের স্মারক হিসাবে ওই দুদিন সেকালের পোশাকে সেজে সসমারোহে ঘোড়সওয়ারদের যে মিছিল বার হয় আর কুচকাওয়াজ হয়, তার সমাপ্তি হয় ওই চত্বরে এসে। তারপর সেখানে শুরু হয় শহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর খেলোয়াড়দলের এক আজব ফুটবল খেলা—ঠিক যেমন খেলা হত মধ্যযুগে। তাদেরও গায়ে থাকে ঠিক সেকালের খেলোয়াড়দেরই মত বিচিত্র পরিচ্ছদ।

এই থেকেই বেশ বোঝা যায় ফ্লোরেন্স-এর অধিবাসীদের সামাজিক জীবনে কত গুরুত্ব ওই চত্বরের!

চত্বরের সামনেই এক বিরাট প্রাসাদ আর তার মাথায় এক সুশোভন টাওয়ার। ফ্লোরেন্সবাসীরা এই প্রাসাদকে বলে পালাৎসো ভেচ্চো (Palazzo Vecchio)
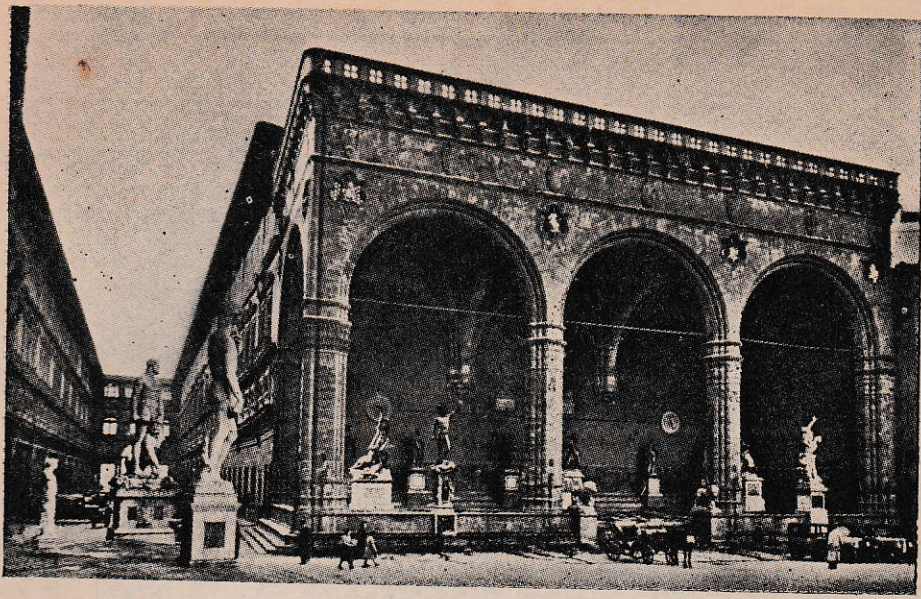
"লানৎসি প্রসাদের" ভেতর দু সারি মর্মরমূর্তি···ভ্রম হয় জীবন্ত বলে।

অর্থাৎ প্রাচীন প্রাসাদ। আর একটা নামও অবশ্য তার আছে—পালাৎসো দেল্লা সীনিয়রিয়া (Palazzo della Signoria)। প্রাসাদটির বহিরঙ্গ একেবারেই সাদা-মাটা চাঁচা-ছোলা। কারুকার্য এতটুকুও নেই সেখানে। অথচ ওর মত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ খুব কমই আছে ফ্লোরেন্সে। কেন তা বলছি।

প্রাচীনকালে দলাদলি বাদ-বিসংবাদ আর যুদ্ধবিগ্রহ ছিল ফ্লোরেন্সে নিত্যকার ঘটনা। এই টালমাটাল অবস্থার অবসান হল মেডিসি বংশের শাসনকালে। এই বংশের ডিউক বা ভূস্বামীরা কেবল যে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন তা নয়, তাঁদের উৎসাহে আর আনুকূল্যে শিল্প ও সাহিত্যের হল অভাবিত উন্নতি।

মেডিসি বংশীয় প্রথম কোসিমো থাকতেন পালাৎসো ভেচ্চোতে। পরবর্তী কালে ফ্লোরেন্সে যখন ইটালির রাজধানী স্থাপিত হয় তখন ওই প্রাসাদেই ছিল সরকারী দপ্তর। বর্তমানে এই ভবন ফ্লোরেন্সে-এর পৌরসংস্থার অধিকারে। এখানেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল সাভানারোলাকে। যেদিন তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয় তার আগের দিন তিনি যে ভজনালয়ে অন্তিম প্রার্থনা করেছিলেন, সেই ভজনালয়টিও এই প্রাসাদের অন্তর্গত।

● শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

একেই তো প্রাচীন প্রাসাদটির সঙ্গে অতীতের অনেক নৃশংসতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তার ওপর তার বাহিরের দেওয়ালে আকর্ষণীয় কোন শিল্পকাজই চোখে পড়ে না দর্শকের। কাজেই মনটা একটু বিরূপই হয়ে ওঠে যেন নিরাভরণ বাড়িটা দেখে। কিন্তু ওই বাড়িরই ভেতর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের যে সব ছবি, ভাস্কর্য, প্রাচীরচিত্র, প্রস্তরমূর্তি, সাবেককালের অদ্ভুত কারুকার্য-করা আসবাবপত্র প্রভৃতির অমূল্য সংগ্রহ সুবিন্যস্ত ভাবে সাজান আছে, মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় সে সব দেখলে। তখন আর বিরূপতার বাষ্পও থাকে না মনের মধ্যে।

পালাৎসো ভেচ্চোর প্রায় পাশেই আর একটা চত্বর ঘিরে আর এক পেল্লায় প্রাসাদ,—উফফিৎসি প্রাসাদ (Palazzo degli Uffizi)। উফফিৎসি কথাটার অর্থ অফিস অর্থাৎ দপ্তর। মেডিসি বংশের শাসনকালে প্রথম কোসিমোর নির্দেশে তৈরী ওই প্রাসাদে গোড়ার দিকে থাকতেন হোমরা-চোমরা রাজকর্মচারীরা। এখন কিন্তু ফ্লোরেন্স-এর তথা সারা ইটালির অন্যতম প্রধান শিল্প-প্রদর্শশালা বলেই খ্যাতি ওই প্রাসাদের।

বত্তিচেল্লি, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি বিশ্ববন্দিত দিক্‌পাল চিত্র-শিল্পীদের নাম সম্ভবতঃ অজানা নয় তোমাদের। উফফিৎসি প্রাসাদের মস্ত মস্ত উনত্রিশটি কক্ষের প্রত্যেকটি সুসমৃদ্ধ এঁদের এক এক জনের বহুবিখ্যাত চিত্রে। এক জায়গায় একত্রে এঁদের এত উৎকৃষ্ট চিত্র দেখার সুযোগলাভ যে বহু ভাগ্যের কথা, এ কথায় নিশ্চয় কেউ দ্বিরুক্তি করবে না। তা ছাড়াও ফ্লোরেন্স-এর যে সব নাগরিক প্রাচীনকালে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তাঁদের অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাঁদের প্রস্তরমূর্তি অথবা ব্রঞ্জমূর্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় সেখানে। মেডিসি বংশীয়া বিচিত্রবেশিনী অ্যানি মেরী লুইসির একটি ছবি দেখেছিলাম সেখানে। তিনি তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি ও শিল্পসংগ্রহ মুক্তহস্তে দান করেছিলেন ফ্লোরেন্স-এর অধিবাসীদের।

উফফিৎসি প্রাসাদের নিকটেই লানৎসি প্রাসাদ। এমন কিছু বড় নয়, কিন্তু তবু দর্শনীয় তার স্তম্ভ আর তিনটি অর্ধবৃত্তাকার সুদৃশ্য খিলান। ভেতরে যে দু সারি মর্মরমূর্তি আছে সেগুলি দেখলে ভ্রম হয় জীবন্ত বলে। বলা বাহুল্য যাঁরা জড় প্রস্তর-

খণ্ডে এই জীবন্ত ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন কেউই তাঁরা হেঁজিপেঁজি পাথরকাটা মিস্ত্রী নন, সকলেই শিল্পজগতের দস্তুরমত কেউকেটা।

ওখান থেকে আমরা চলে এলাম আর্নো নদীর ধারে, নদীর ধার ঘেঁষে চলতে চলতে অদূরে পেলাম এক সেতু। বেশ মজার নাম সেতুটার। 'ভেচ্চো সেতু' (Ponte Vecchio) অর্থাৎ প্রাচীন সেতু। কেবল প্রাচীন নয়, বস্তুতঃ ফ্লোরেন্স-এর প্রাচীনতম সেতু ওটা।

আর্নো নদীর ওপর ওই সেতুটি হল বর্তমানকালে ফ্লোরেন্স-এর এক ও অদ্বিতীয় সেতু। বলতে পার "সবে ধন নীলমণি"। আগে আরও পাঁচটি সেতু ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আঠারো দিন ধরে জার্মানদের বেধড়ক বোমা বর্ষণে সেগুলো হয়েছে ভূমিসাৎ বা ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধ ভাষায় জলসাৎ। আর ওই অঞ্চলের নদীর দুপারেরই পথঘাট বাড়িগুলোকেও রেয়াত করেনি, বিস্ফোরক দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিয়েছিল তারা। এখন অবশ্য সে অবস্থা আর নেই। এতদিনে সেখানেই আবার গড়ে উঠেছে আধুনিক ধাঁচের নতুন নতুন অট্টালিকা।

ভেচ্চো সেতু ঠিক মামুলী সেতু নয়। কেন তা বলি শোন। ভেচ্চো সেতু আদিতে ছিল কাঠের তৈরী। যখন দেখা গেল আর্নো নদীর বন্যার তোড়ে সে সেতু কেবলই ভেঙে যাচ্ছে বার বার, তখন নতুন সেতু বেশ মজবুত করে তৈরী হল কাঠের পরিবর্তে পাথর দিয়ে। সেও প্রায় ছশ বছর আগেকার কথা। তখন সুপ্রশস্ত সেতুর দুধারে বসত মাংস আর নানা ভোজ্যবস্তুর বাজার। তাদের নাক ঝাঁজান তীব্র পাঁচমিশালী দুর্গন্ধ এড়াবার জন্য কোনক্রমে রুমাল নাকে চেপে সেতু পার হত পথিকরা। মেডিসি বংশীয়রা যখন দেশের শাসনভার হাতে নিলেন, তাঁরা সেতুর ওপর থেকে তুলে দিলেন ওই বাজার আর তার জায়গায় বসালেন সারি সারি জহুরী আর সেকরার দোকান। সেই দিন থেকে আজও তারা চোখ ঝলসান হীরা জহরত আর অপূর্ব কারুকার্য-করা সোনা-রুপোর বিবিধ ঝকমকে অলংকারের বেসাত সাজিয়ে বসে ওই সব পরিপাটী দোকানে। রাত্তিরে আলো ঝলমলে সেই সেতুর বিচিত্র প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে যেন আনন্দে আর গৌরবে কাঁপতে থাকে আর্নো নদীর জল।

● শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

তাই বলছিলাম ভেচ্চো সেতু ঠিক মামুলী সেতু নয়। ওকে সেতু বলা চলে, জহুরী বাজার বলা চলে আবার দুটি প্রাসাদের মধ্যবর্তী দালানও যে না বলা চলে তা নয়। দুটি প্রাসাদের একটি উফফিৎসি প্রাসাদ আর একটি হল নদীর বিপরীত কূলে পিত্তি প্রাসাদ (Palazzo Pitti)।

উফফিৎসি প্রাসাদের মত পিত্তি প্রাসাদও ফ্লোরেন্সে-এর অন্যতম প্রধান দর্শনীয় প্রাসাদ। মধ্যযুগের এই বিরাট প্রাসাদের গৃহসজ্জা আর হরেক রকম বিচিত্র আসবাবপত্র দেখলে বেশ বোঝা যায় গৃহস্বামী যাঁরা ছিলেন তাঁরা যে কেবল টাকার কুমিরই ছিলেন তা নয়, তাঁরা যেমন শৌখিন ছিলেন তেমনি মার্জিত ছিল তাঁদের রুচি। ওই প্রাসাদসংলগ্ন শিল্পসংগ্রহালয়ে কম-সে-কম আটাশটি বড় বড় কক্ষে স্বনামখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা যে সব সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, তা দেখলে আরও বোঝা যায় যে তাঁরা ছিলেন চিত্রকলারও দস্তুরমত সমঝদার আর শিল্পীদের অকৃত্রিম গুণগ্রাহী।

পিত্তি প্রাসাদের লাগোয়া যে 'বোবোলি উদ্যান' আছে, নানা রকমের আর নানা রঙের ফুলে আলো করে আছে সে উদ্যান। আর তারই মাঝখানে আছে এক রঙ্গমঞ্চ।

উদ্যানের প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'ক্যাসাইন পার্ক-এর (Cascine Park) কথা। ফ্লোরেন্স-এর আপামর জনসাধারণের বড় প্রিয় শহর থেকে কিছু দূরের নদী তীরবর্তী সুবিস্তীর্ণ ও সুপরিকল্পিত এই পার্কটি। ওর কোথাও ঘাসে ঢাকা এলাহি মাঠ—যেন একটা সুবিস্তৃত সবুজ কার্পেট বিছান, কোথাও ফুলগাছের কেয়ারি, কোথাও গাছগাছালি সমাচ্ছন্ন শ্যামল বনভূমি, কিংবা ছায়া সুনিবিড় সুদীর্ঘ বনবীথি, কোথাও অশ্বচালনার জন্য আলাদা পথ। একদিকে টেনিস খেলা হচ্ছে আর একদিকে ছেলেরা চালাচ্ছে সাইকেল কিংবা সকলরবে করছে চড়ুইভাতি।

প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে সারা শহরের স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়ো, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গাড়িতে, কেউ বা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে জমায়েত হয় এই পার্কে। কেবল তাই নয়। মধ্যে মধ্যে এই পার্কেই কখনও হয় কুসুমোৎসব, কখনও ঘোড়দৌড় কখনও বা খুব ঘটা করে হয় কোন প্রদর্শনী অথবা বার হয় কোন জমকাল মিছিল। তখন তাই দেখতে দাঁড়িয়ে যায় শত শত কৌতূহলী লোক কাতারে কাতারে।
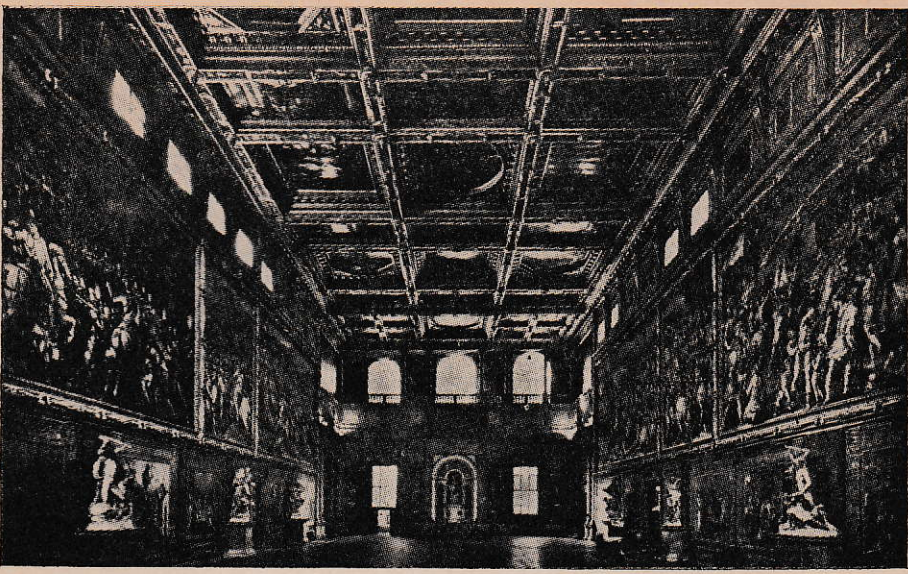
'পালাৎসো ভেচ্চোর' ভেতর নানা অমূল্য সংগ্রহ সাজান আছে।

এ ছাড়া এই পার্কে আর একদিন হয় আর এক মজার কাণ্ড। দিনটার নাম 'ক্রিকেট ডে' বা 'ঝিল্লী দিবস'। ইস্টার দিবসের ঠিক চল্লিশ দিন পরে বৃহস্পতিবারে পড়ে সেই দিনটা। সেদিন শহরের লোক—বিশেষতঃ ছেলে ছোকরারা খাঁচা হাতে দলে দলে অভিযান করে এই পার্কে আর ঝিল্লী অর্থাৎ ঝিঁঝি পোকা ধরে খাঁচায় পুরে ফিরে যায় যে যার বাড়ি। যে যত বেশী পোকা ধরতে পারে তার বাহাদুরি তত বেশী। না হলে সঙ্গীদের কাছে লজ্জায় মুখ চুন।

এই পার্কের কথা আজও ভুলতে পারিনি কিন্তু আর একটি কারণে। পার্কের ভেতরকার এক বনভূমির মধ্য দিয়ে একদিন প্রায় আড়াই মাইল গিয়ে পার্কের এক প্রান্তে সবিস্ময়ে দেখেছিলাম রাজারাম ছত্রপতি নামে এক ভারতীয় নৃপতির স্মৃতি-চিহ্ন। তিনি শেষ বয়সে ফ্লোরেন্স শহরে বাস করতেন আর ওই শহরের প্রতি নাকি ছিল তাঁর প্রাণের টান। সেই কারণে ১৮৭০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের উদ্যোগে ফ্লোরেন্স-এর ওই পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সুদূর প্রবাসে জনসাধারণের একটি পার্কে ভারতীয় নৃপতির সেই স্মৃতিচিহ্ন একটু অসাধারণ মনে হয়েছিল বলেই সে কথা আজও গাঁথা আছে আমার মনের মধ্যে।

ইটালির 'নবজাগরণের' বা রেনেসাঁসের যুগের কথা তোমাদের বলেছি।

● শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

আলোকের যুগও বলা যায় সেই যুগকে। ঠিক তার আগের যুগটা ছিল মধ্যযুগ। রেনেসাঁসের যুগ যেমন ছিল আলোকের যুগ, মধ্যযুগ তেমনি সকল দিক থেকেই ছিল অন্ধকারের যুগ। কিন্তু ওই অন্ধকার যুগের শেষের দিকেই দেখা যায় আলোকের আভাস। রেনেসাঁসের সূচনা হয় তখন থেকেই। নবযুগের কয়েক জন অগ্রদূতের তখনই হয় আবির্ভাব। তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিশ্ববরেণ্য কবি দান্তে।

ফ্লোরেন্সই ছিল দান্তের জন্মভূমি। শৈশবকাল থেকে সাঁইত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফ্লোরেন্সেই কেটেছে তাঁর। অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমেছিলেন তিনি। তার পরিণামে বিরুদ্ধ পক্ষের ষড়যন্ত্রে জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করার মিথ্যা অভিযোগে নির্বাসিত করা হয় তাঁকে। উপরন্তু তাঁর ওপর এই আদেশ জারি হয় যে ফ্লোরেন্স-এর চতুঃসীমার মধ্যে তাঁকে দেখা গেলে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হবে তাঁকে। সুতরাং সেই দিন থেকে তাঁর অবশিষ্ট জীবন কেটেছে র‍্যাভেন্না (Ravenna) নামক ইটালির অপর একটি শহরে অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। সহায়সম্বলহীন হয়ে ছিন্নদীর্ণবেশে উন্মাদের মত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি দিনের পর দিন; বছরের পর বছর। অথচ আশ্চর্য এই যে সেই নির্বাসন কালেই তিনি একজন কীর্তিধন্য কবিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁর অমর কাব্য 'ডিভিনা কমেডিয়া' রচনা করে।

যে ফ্লোরেন্স থেকে একদিন তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেই ফ্লোরেন্সই আজ তাঁর গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁর নামালংকৃত রাস্তা Via Dante Alighieri-এর ওপর অবস্থিত যে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পুণ্যতীর্থরূপে আজ তার বিপুল সমাদর সারা জগতের সুধী সমাজে। অননুকূল অবস্থাতেও প্রতিভা যে চাপা থাকে না সেই কথাই আমরা উপলব্ধি করলাম একদিন দান্তের সেই জন্মস্থান দেখার সময়।

কেবল দান্তে নয়, আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক এক সময়ে বাস করতেন ফ্লোরেন্সে। শিল্পসৃষ্টি, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতির মত অর্থনীতিতেও ফ্লোরেন্স সেকালে কম প্রভাব বিস্তার করেনি সারা ইওরোপে। ফ্লোরেন্স-এর মহাজনরা তখন আর্থিক লেনদেন করত সমস্ত ইওরোপের সঙ্গে। ক্রমে তাদের কারবার এমন ফেঁপে ওঠে যে কাজের সুবিধার জন্য আধুনিক মুদ্রার প্রচলনও করে তারা। ফ্লোরিন

নামক স্বর্ণমুদ্রারও প্রচলন হয় সেই সময় ইওরোপের বাজারে। জগতের অন্যতম প্রধান ব্যাঙ্ক-নগরীরূপে পরিগণিত তখন ফ্লোরেন্স। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইওরোপের কোন কোন দেশে মুদ্রা হিসাবে এখনও চালু ফ্লোরিনের ব্যবহার।

শিল্প-নগরী বলতে যা বোঝায়, বর্তমানকালে ফ্লোরেন্স ঠিক তা না হলেও শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে তার যে কোনই গুরুত্ব নেই, তাও বলা যায় না। শহরে কারখানা আছে কত জান? পাঁচ হাজারেরও বেশী। সেগুলোতে নানা রকম রুপোর জিনিস, মনোহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, মৃৎশিল্পদ্রব্য (ceramics), সাবান প্রভৃতি কম তৈরী হয় না। তা ছাড়া আরও তৈরী হয় রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেল, কৃষকদের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। কাঠ, পাথর অথবা আলবেসটারের ওপর খোদাই-এর কাজও হয় দেখেছি চমৎকার।

কাঁচা চামড়াকে পাকা করার কারখানা(tannery)র সংখ্যাও ফ্লোরেন্সে নিতান্ত কম নয়। পাকা চামড়ার ওপর কারুকার্য-করা যেসব বই-এর প্রচ্ছদ, মেয়েদের শৌখিন হ্যাণ্ড-ব্যাগ প্রভৃতি ফ্লোরেন্সে তৈরী হয়, বিদেশী পর্যটকদের কাছে কদর তার খুব। আমরাও সে রকম দুচারটা জিনিস যে না কিনেছি তা নয়।

রেনেসাঁসের সময় বা তার ঠিক আগে পরে ফ্লোরেন্সে যেসব মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের অনেকেরই এমন বহুমুখী প্রতিভা ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁদের অন্যতম ছিলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। তিনি যে কেবল চিত্রশিল্পেই অসাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক, লেখক, স্থপতি, যান্ত্রিক (engineer) এবং শারীরস্থান বিশারদ।

একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বিস্ময়কর নয়? এই প্রসঙ্গে আর একজন মনীষীর নাম উল্লেখ অপরিহার্য। তাঁর নাম মাইকেল এঞ্জেলো। তিনিও কম গুণী লোক ছিলেন না। তিনিও ছিলেন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি ও কবি। শারীরস্থান বিষয়েও যে তাঁর কি গভীর জ্ঞান ছিল, তাঁর বহু ছবি ও মূর্তিতেই আছে তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

রেনেসাঁস যুগের গুণী জনরা অনেকেই নানা শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন

বলেই সেকালে পাশ্চাত্য দেশগুলি বিবিধ শিল্পে অভূতপূর্ব পারদর্শিতা লাভ করেছিল। আর সেই একই কারণে তাঁদের স্বষ্ট সেই সব অমূল্য শিল্পসামগ্রীতে ইটালির বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের বিশেষতঃ রোম ও ফ্লোরেন্স-এর ম্যুজিয়মগুলি আজও জমজমাট। জাতীয় ম্যুজিয়ম, বার্গেল্লো ম্যুজিয়ম প্রভৃতি অন্ততঃ বাইশ তেইশটি ম্যুজিয়ম আর শিল্পদ্রব্যসমৃদ্ধ তের চোদ্দটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ আছে কেবল ফ্লোরেন্সেই। তোমাদের মনে কৌতূহল জাগাবার জন্য আমি তাদের দু' চারটির কথা মাত্র সংক্ষেপে বললাম। নিজের চোখে না দেখে কেবল তাদের একঘেয়ে বিবরণ শোনাটা তোমাদের নীরস ও ক্লান্তিকর মনে হতে পারে জেনেই আমি সে সব বিষয়ে আর কিছু লেখা থেকে বিরত থাকলাম।

কিন্তু সুযোগ সুবিধা হলে বড় হয়ে ফ্লোরেন্সে গিয়ে তোমরা স্বচক্ষে সে সব দেখবার চেষ্টা কর। দেখলে কেবল যে তোমাদের ইটালির সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হবে তা নয়, সে সব উচ্চাঙ্গের চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতির নিখুঁত কারুকর্ম দেখে নিশ্চয় তোমরা মুগ্ধ হবে আর অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠবে তোমাদের মন।

তবে ততদিনে কত শিল্পসামগ্রী যে কালের কবলে কবলিত হবে তা মানুষের ধারণার বাইরে। কারণ এই তো সেদিন মাত্র ১৯৬৬ সালের প্রবল বন্যায় বহু অমূল্য শিল্পসম্পদ নষ্ট হওয়ায় কি অপূরণীয় ক্ষতিই হয়ে গেল ফ্লোরেন্সের! তোমাদের দুর্ভাগ্য যে সে সব সম্পদ আর দেখতে পাবে না তোমরা।

শহর থেকে দূরে আর্নো নদীর অপর পারে মাইকেল এঞ্জেলোর সম্মানে তাঁরই নামে আছে একটি সুন্দর চত্বর—পিয়াৎসা মাইকেল এঞ্জেলো।

একদিন আলোঝলমলে মিষ্টি সকালে গেলাম আর্নো নদীর ওপারে। সোনা-গলা আলো তখন ঝিকমিক করছে নদীর জলে।

নদীর তীর থেকে চমৎকার একটি আধুনিক পথ ধরে চললাম সেই চত্বরের উদ্দেশে। পথের দুধারে উঁচু উঁচু গাছ। ছায়াস্নিগ্ধ পথ ক্রমশঃ উঁচু হয়েছে। চার মাইল পথ হেঁটে অক্লেশে পৌঁছে গেলাম পিয়াৎসা মাইকেল এঞ্জেলোতে।

শহর থেকে ৩৪০ ফুট উঁচুতে সেই বিশাল চত্বর, রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিঙের

"পিয়াৎসা দেল্লা সীনিয়রিয়া" নামে সুবিস্তীর্ণ চত্বর।

ধারে দাঁড়ালে যে দিকে চাও অবারিত দৃশ্য বহু দূর অবধি। উপত্যকার শেষে ধূমল অ্যাপেনাইন পর্বতশ্রেণী। আর একদিকে স্বপ্নছবির মত ফ্লোরেন্স শহর। গম্বুজ মিনার সব মাথা তুলেছে আকাশে। আগে যে প্রাচীন নগরপ্রাচীরের কথা উল্লেখ করেছি তাও হল প্রত্যক্ষ। মাইকেল এঞ্জেলোর স্রষ্ট 'ডেভিড'-এর যে বিশ্ববিখ্যাত মূর্তি আমরা দেখেছি শহরের মধ্যে ললিতকলা আকাদেমি সংলগ্ন প্রদর্শকক্ষে, ব্রোঞ্জে তৈরী তারই প্রতিরূপ চত্বরে শোভা পাচ্ছে শিল্পীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।

ওখান থেকে অদূরবর্তী একটি ছোট পাহাড়ের ওপর উঠলাম একটি চার্চ দেখতে —সান মিনিয়াটো চার্চ (Chiesa di San Miniato)। যেমন দর্শনীয় তার স্থাপত্য, তেমনি অপূর্ব তার মর্মরমণ্ডিত মেঝে আর দেওয়াল-চিত্র।

চার্চের লাগোয়া ভজনালয়ে আছে সন্ত মিনিয়াটোর সমাধি। তাঁর নামেই চার্চের নাম। সন্ত মিনিয়াটোর পুণ্য কাহিনী শুনলাম। সেই অলৌকিক কাহিনী তোমাদের উপহার দিয়ে শেষ করি আমার ভ্রমণকাহিনী।

সাধুসন্ত বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, গোড়ার দিকে মিনিয়াটো বা মিনিয়েটাস সেরকম কিছুই ছিলেন না। আর্মেনিয়ার রাজবংশের ছেলে তিনি,— ভরতি হয়েছিলেন রোমানদের সৈন্যদলে। যে কারণেই হোক, পৌত্তলিক সম্রাট্

● শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ডিসিয়াসের বিষনজর ছিল তাঁর ওপর। সম্রাটের হুকুমে তাঁর ওপর নৃশংস অত্যাচার ছিল প্রায় নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু যতবার যত অত্যাচারই হোক, আশ্চর্য এই যে প্রতিবারই তিনি থেকেছেন অক্ষত যেন আমাদের পুরাণের প্রহ্লাদের মত। তাই দেখে সম্রাট্ ডিসিয়াস অবশেষে একদিন রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে জল্লাদকে হুকুম দিলেন, —দাও ওর মুণ্ডুটাকে ধড় থেকে নামিয়ে।

জল্লাদ তো তৈরীই ছিল। সম্রাট্ মুখের কথা খসিয়েছেন কি না খসিয়েছেন, সে জোর করে তাঁর চুলের মুঠি ধরে হাঁটু গাড়িয়ে বসালে আর তারপরই তার শাণিত অস্ত্রের এক কোপে তাঁর রক্ত-মাখা মুণ্ডটা দেহচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটল ঠিক তারপরেই। নতজানু মিনিয়েটাস তাঁর সেই রক্ত-মাখা ছিন্ন মুণ্ড নিজের হাতে তুলে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর তখনই দৃঢ়পদে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে গিয়ে সেখানে তাঁর মুণ্ডটা নামিয়ে রেখেই তাঁর কবন্ধ দেহরক্ষা করলেন সেইখানেই।

কারো আর বুঝতে বাকী রইল না, সামান্য সৈনিক তিনি নন, অসাধারণ ঐশী শক্তিতে তিনি শক্তিমান। তখন থেকেই সন্ত মিনিয়েটাস নামে পরিচিত হলেন তিনি।

পরবর্তী কালে তাঁকে উপলক্ষ্য করেই ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে সান মিনিয়াটো চার্চ, যেখানে দেশবিদেশের ঈশ্বরভক্তরা ধন্য হন তাঁদের অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে।

স্বচ্ছ সুনীল আকাশের নীচে সেই গণ্ডশৈলের ওপর দাঁড়িয়ে সন্ত মিনিয়াটোর অলৌকিক কাহিনী শুনতে শুনতে সেদিন মনের মধ্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম শস্ত্রের বল কত তুচ্ছ সত্যের বলের কাছে। সত্যের বলে যিনি বলীয়ান, তিনিই মৃত্যুঞ্জয়। তাঁদের সম্বন্ধেই বিশ্বকবি বলেছেন,—

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

পশ্চিমের হাওয়া

কুমারেশ ঘোষ

সেবার কদিন পর-পর ছুটি থাকায় ভাবলাম, কাছাকাছি দেওঘরটা একবার ঘুরে আসি। হিল্লী-দিল্লী হয়েছে, অথচ হাতের কাছে দেওঘরটা হয়নি। মানে, সময় হয়নি, খেয়ালও হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, হাতের কাছে বলে 'গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না' অবস্থা ঐ দেওঘরের। যাঁদের ওখানে বাড়ি আছে, মানে, টিকি বাঁধা আছে—তাঁরাই বাধ্য হয়ে বছরে একবার করে হাওয়া বদলাতে আর বাড়ি দেখা-শোনা করতে যান !

অথচ দেওঘরের ভাড়াও এমন বেশী নয়। উপরন্তু ওখানে যাওয়া মানে—আমার পক্ষে পশ্চিমের হাওয়া খাওয়া আর তীর্থ করা দুই-ই হয়ে যাবে—অনেকটা রথ দেখা আর কলা বেচার মতই।

তাছাড়া সেখানে থাকবার খরচও আমার লাগবে না, খাওয়ার খরচও নয় ! শুধু যাবার সময় কলকাতা থেকে কিছু ছানার সন্দেশ কিনে নিয়ে গেলেই চলবে। ওখানকার ক্ষীরের পেঁড়া খাওয়ার মুখ বদলাতে পারবেন কাশীশ্বর খুড়ো।

কাশীশ্বর খুড়ো হচ্ছেন মায়ের দূর সম্পর্কের কাকা। দেওঘরে বাড়ি তৈরি করে সেখানেই থাকেন। হয়তো 'কাশীশ্বর' বলে দেওঘর বা 'বৈদ্যনাথধাম'-ই তাঁর পছন্দ। হাজার হোক শিবস্থান!

কাশীশ্বর খুড়ো আমাদের কলকাতার বাড়িতে খুব কমই আসতেন, কারণ কলকাতায় এলে নাকি ভিড়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যায়, আর হই-হল্লায় নাকি তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে। তবে মায়ের মুখে কাশীশ্বর খুড়োর গল্প আমরা খুবই শুনতাম এবং কোন সময় তিনি আমাদের কাছেও 'কাশীশ্বর খুড়ো' হয়ে গেছলেন। মানে, কাশী খুড়ো কোনদিন আর বুড়ো হয়ে 'দাদু' হলেন না। তাছাড়া ব্যাচেলার খুড়ো শেষপর্যন্ত খুড়োই রইলেন!

একদিন বাক্স-বিছানা বেঁধে আর এক বাক্স কড়াপাকের সন্দেশ নিয়ে গিয়ে উঠলাম তাঁর দেওঘরের বাড়িতে। অবশ্য, আগেই চিঠিতে খবর দিয়েছিলাম।

দু'তিন বিঘে জমিতে ফুলের বাগানের মাঝখানে ছোট্ট ছবির মত বাড়িখানি। সেখানে দিব্যি তিনি হাত-পা মেলিয়ে থাকেন এবং পেনশনের টাকায় দিব্যি দিন কাটিয়ে দেন। কাছে থাকে একটি উড়িয়া মালী। একাধারে সে মালী, রাঁধুনা এবং চাকর। যাকে বলে, একের মধ্যে তিন!

কাশী খুড়ো তখন তাঁর গোলাপ বাগানে মালীকে কী যেন বোঝাচ্ছিলেন। লম্বা টিংটিঙে চেহারা, কাঁচা-পাকায় চুল, গায়ে ফতুয়া, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর পায়ে মোটা চটি।

আমাকে দেখেই কাশী খুড়ো বললেন, এখন এলি?

—হ্যাঁ।—বললাম: ট্রেনটা একটু লেট্ ছিল।

শুনে কাশী খুড়ো হেসে বললেন, ট্রেন তো লেট্ হয়েই থাকে। তবে you are also late—too late. খুব দেরিতে এলি...

—কেন? কেন? অবাক্ হলাম খুড়োর কথায়।

—কেন আবার? খুড়ো বললেন, সেই এলি পশ্চিমের হাওয়া খেতে, আর পঁচিশটে বছর আগে আসতে পারলি নে?

শুনে হেসে বললাম, খুড়ো, তখন আমি এই ধরাধামেই আসিনি, তা এই বৈদ্যনাথধামে আসবো কেমন করে?

কাশী খুড়ো আমার সে কথায় অপ্রস্তুত না হয়ে বরং হেসে রসিকতা করে বললেন, এখন যখন এই অধমের ধামে এসে পড়েচিস্, তখন যা পাবি সেটুকুই লাভ মনে করিস্।...আয় ভেতরে আয়।

বলে রাখি, কাশী খুড়োর বাড়ির নাম কিন্তু সত্যিই 'অধমের ধাম'।

মায়ের কাছ থেকে আগেই শুনেছিলাম, কাশী খুড়ো নাকি বড্ড বেশী বকেন এবং অনেক কিছুই আজে-বাজে বকেন।

গিয়ে দেখি, কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্যি!

আর উঠতে বসতে কেবল হা-হুতাশ: এই সেকালে ঐ ছিল, আর একালে সব গেল! মাথা খারাপ হয়ে গেল শুনতে শুনতে। অথচ শুনতেই হয়...। হোটেল খরচা বাঁচাতে গেলে host-এর খেয়াল-খুশি মাফিক মাথা না নেড়ে উপায় নেই।

...আর পঁচিশটে বছর আগে আসতে পারলি নে? [পৃঃ ৩৫৮

কাজেই কটা দিন ভক্ত-শিষ্যের মত মাথা নেড়ে নেড়েই কাটানো গেল।

শেষে একদিন, মানে, দেওঘর থেকে ফেরবার আগের দিন কাশী খুড়ো আমার জন্যে স্পেশাল ডিশের ব্যবস্থা করলেন: মুরগীর মাংস আর ভাত।

দু'জনে খেতে বসেচি, খুড়ো জিগ্যেস করলেন, কেমন পশ্চিমের হাওয়া খেলি বল্?

● কুমারেশ ঘোষ

ঝোলে-ভাতে এক গরস মুখে তুলে বললাম, ভালই।

—ঘোড়ার ডিম!—খুড়ো বললেন, এখন এখানে সে হাওয়া আর আছে? না, সে খাওয়া আর আছে? আগে কলকাতার সব 'ড্যাঙ্কি' বাবুরা এসে 'ড্যাম চীপ ড্যাম চীপ' করে এদের চালাক করে বাজারে আগুন লাগিয়ে গেচে আর এখন অর্থ-দানবরা এসে পশ্চিমী হাওয়াটাকে বিষিয়ে দিচ্চে।

শুনে অবাক্ হলাম, কী রকম?

—কী রকম আবার। খুড়ো দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, দেখলি নে আকাশে সব চিমনি আর ধোঁয়া? সব কারখানা হচ্চে! শিল্প হচ্চে। গুষ্টির মাথা হচ্চে! আরে বাবা, তোরা কি আর ইংরেজের মত ইনডাসট্রি গড়তে পারবি? সে জাতই আলাদা!

মুরগীর একটা ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, তা বটে!

—নইলে লোকে যে খরচ করে পশ্চিমের হাওয়া খেতে আসতো সাধে? —বলেই কাশী খুড়ো বললেন, শোন্ তবে বলি একটা ঘটনা। এই পশ্চিমী হাওয়ার গুণ কেমন শোন্—

—বলুন। বাটি থেকে একটি মাংসের টুকরো তুলে নিলাম মুখে।

কাশী খুড়ো দেখলেন, শ্রোতাটি বেশ মোসাহেবী মার্কা। তাছাড়া এখন সে, যে মৌখিক অবস্থায় আছে, তাতে তার নাকে যদি কড়া গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া যায়, সেটা তাকে গিলতেই হবে।

তা গিলতেই হলো।

কাশী খুড়ো বলতে লাগলেন, সে অনেক দিনের ব্যাপার। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এলো এখানে, আমার দিদিমার খুব অসুখ। প্রায় শেষ অবস্থা। আমাকে দেখতে চায়।...চাইবেই তো! একমাত্র নাতি তার, খুব আদরের ছিলাম কিনা—

আমি কৌতূহলের ভাব দেখালাম, তা কী করলেন আপনি?

—আর কি! খুড়ো বললেন, তখুনি ছুটলাম কলকাতায়, ঐ যে ঐ সাইকেলে—

খুড়ো তাঁর সাইকেলটা দেখালেন।

—সাইকেলে ? এবার সত্যিই অবাক্ হতে হলো ঃ কেন ? ট্রেন ছিল না ?

কাশী খুড়ো উদাস হয়ে বললেন, ট্রেন ? তা ছিল হয়তো। তবে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় ছিল না তখন। তাছাড়া ভেবে দেখলাম, ট্রেনে টিকটিক করে যাওয়া মানে—অনেক সময় নষ্ট করা।

—নষ্ট ? আমার খাওয়াও যেন নষ্ট হবার উপক্রম।

—হ্যাঁ। কাশী খুড়ো বললেন, তাই সময় আর নষ্ট না করে তখুনি বাঁই-বাঁই করে বেরিয়ে পড়লাম বাইসাইকেলে। একটুও কষ্ট হলো না। পশ্চিমের হাওয়ায় মানুষ তো।

—তা তো বটেই।—বুঝলাম গাঁজায় দম দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমিও দম ধরেই থাকলাম।

—হ্যাঁ। খুড়ো বললেন, জোর প্যাডেল করে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে দেখি—দিদ্‌মার তখন শেষ অবস্থা। ঘর ভরতি ডাক্তার আর আত্মীয়স্বজন। সবার মুখ শুকনো—আমচুর। কেউ কেউ কাঁদচে। আর দেখলাম, দিদ্‌মাকে গ্যাস দেওয়া হচ্চে।

—কি গ্যাস খুড়ো ? একটু মজা করবার জন্যেই জিগ্যেস করলাম।

—কী গ্যাস আবার! খুড়ো মোটেই অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, ঐ যে—যে গ্যাসে রান্না হয়, রাস্তার আলো জ্বলে।

আমি মাথা নীচু করে হাসি চেপে বললাম, অ!

কাশী খুড়ো বলতে লাগলেন, দিদ্‌মার অবস্থা দেখে আমারও কান্না পেতে লাগলো। অথচ কিছুই করবার নেই। কী যে করা যায়।

এমন সময় বড় ডাক্তারবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, Too late, বড্ড দেরি হয়ে গেচে। এসব রোগীকে পশ্চিমে নিয়ে গিয়ে হাওয়া বদল করাতে পারলে…। কিন্তু এখন সে কথা তুলে লাভ নেই। It is out of question now.

—How ? আমি প্রায় হামলে পড়ে বললাম, আমি ব্যবস্থা করচি।

মানে, আমার মাথায় তখুনি একটি বুদ্ধি ঝিলিক খেলে গেল। বুক ফুলিয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু, I will manage.

—Are you mad? বড় ডাক্তারের কুতকুতে চোখ দুটো বড় হয়ে গোল হয়ে গেল—এ রোগীকে এক ইঞ্চি সরাতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মানে then and there expired হয়ে যাবে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, বেশ, সিকি ইঞ্চিও সরাবো না। আপনি দেখুন।

আমি দেখলাম, ডাক্তারবাবু তো বটেই, ঘরসুদ্ধ লোক থ হয়ে গেছে। কিন্তু তখন সে সব চোখ চেয়ে দেখবার সময় ছিল না আমার। আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলাম নীচেয়। সেখানে বারান্দায় আমার ধুলোমাখা সাইকেলখানা দেওয়ালে হেলানো ছিল, আমি সেখানা টেনে হেঁচড়ে উপরে রুগীর ঘরে নিয়ে এলাম। এখন একটা রবারের নল দরকার। কোথায় পাই? এদিক ওদিক চাইতেই নজরে পড়লো রবারের নল লাগানো ডুস একটা রয়েচে দূরে ঘরের কোণে। তাড়াতাড়ি তার রবারের নলটা খুলে নিলাম আর আমার সাইকেলের সামনের চাকাটার ভ্যালভটা আলগা করে জুড়ে দিলাম তাতে। তারপর হ্যাঁচকা টানে দিদ্‌মার নাক থেকে গ্যাসের পাইপটা টেনে বার করে নিয়ে ঐ ডুসের নলটার আর একটা মুখ যাতে কালো শক্ত মত—

—নজল্।—গম্ভীর হয়ে বললাম।

—ঐ হোলো। নজল্‌টাকে ঢুকিয়ে দিলাম দিদ্‌মার নাকে!

—নাকে?—আমার ভাতের গরসও বুঝি নাকে ঢুকে যাবার যোগাড়!

—হ্যাঁ, নাকে। খুড়ো বললেন, এবং একটু পরেই সবাই দেখলো দিদ্‌মা চোখ মেলে চাইচে। পরে পেছনের চাকার হাওয়া খুলে তার নাকে দিতেই দিদ্‌মা স্রেফ চাঙ্গা হয়ে বিছানায় উঠে বসলো।

বললো, ঘরে এত লোক কেন? কী হয়েচে?

দিদ্‌মার নাক থেকে নলের কালো মুখটা মানে, নজল্ না কী বললি—সেটা খুলে নিয়ে বললাম, কিছু হয়নি দিদ্‌মা। এই ছাখো আমি এয়েচি।
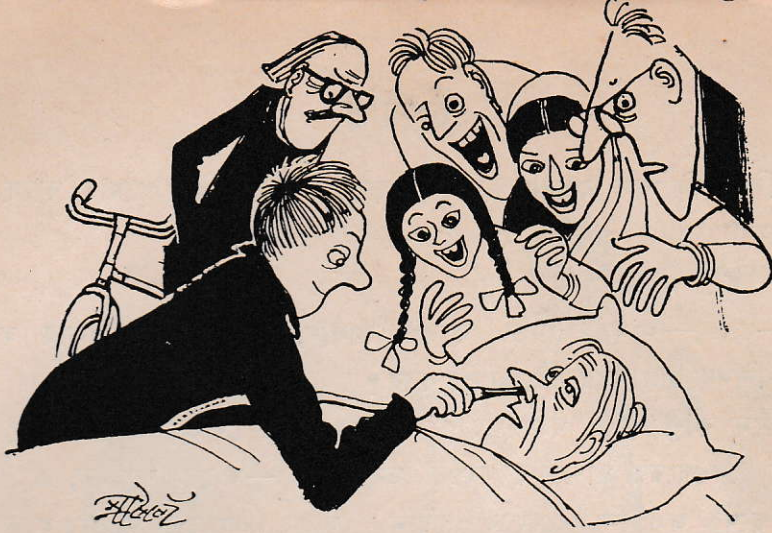
সবাই দেখলো দিদ্‌মা চোখ মেলে চাইচে। [পৃঃ ৩৬২

—বেশ করেচিস দাদু, বেঁচে থাক। কখন এলি ?—বলেই দিদ্‌মা বললো, হ্যাঁরে, আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ আসচে যেন !

—ইস্।—শুনেই জিব কাটলাম মনে মনে। তাড়াতাড়িতে খুব ভুল হয়ে গেচে তো। দিদ্‌মার নাকে দেবার আগে ঐ কালো নলের মুখটা, মানে, তোর ঐ নজল্‌টা ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়াই হয়নি ! তাই হকচকিয়ে বললাম, ও কিছু নয় দিদ্‌মা ! আচ্ছা, দাঁড়াও, মানে, ব'সো। ব্যবস্থা করচি—

বলেই ঘরের বাইরের বারান্দায় রাখা তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা পেঁয়াজ এনে তার খোসা ছাড়িয়ে সেটাই দিদ্‌মার নাকে চেপে ধরলাম।

দেখে সবাই হাঁ-হাঁ করে উঠলো ঃ বিধবা মানুষ, পেঁয়াজ—

তাড়া দিয়ে বললাম, পেঁয়াজ তো আর খাচ্চে না, শুঁকলে কোন দোষ নেই। ও সব মাটির সবজি—। আরো বুঝিয়ে দিলাম ঃ তাছাড়া দিদ্‌মার তো পুনর্জন্ম হলো। আর বিধবা নেই, মরে কুমারী হয়ে জন্ম নিয়েচে। কী বলো দিদ্‌মা ?

যাক, ঘরময় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর বড় ডাক্তার তারই ধাক্কায় তাঁর এসিস্ট্যান্টকে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

এদিকে আমার ততক্ষণে দম ফাটবার অবস্থা ! তবু নিজেকে কোন রকমে

সামলে নিয়ে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু খুড়ো, একটা জিনিস আমার কাছে কিন্তু পরিষ্কার হলো না।

—কি ?

—মানে,—আমতা-আমতা করেই বললাম, সাইকেলের চাকার হাওয়ায় আপনার দিদিমা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন কী করে ?

শুনে কাশী খুড়ো গম্ভীর হয়ে বললেন, আরে বোকা, ঐ চাকা দুটোতেই তো এই দেওঘরের পশ্চিমের হাওয়া ভরা ছিল।—আরো বললেন, হুঁঃ! তবু তো পশ্চিমের জল নিয়ে যেতে পারিনি। মানে, দিদ্‌মার যে দরকার হতে পারে, ভাবতে পারিনি। নইলে সে জল খাওয়াতে পারলে দিদ্‌মা হয়তো যৌবন ফিরে পেতো।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার হঠাৎ বিষম লেগে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আসন থেকে।

● চাঁদা আদায়ের সোজা উপায়
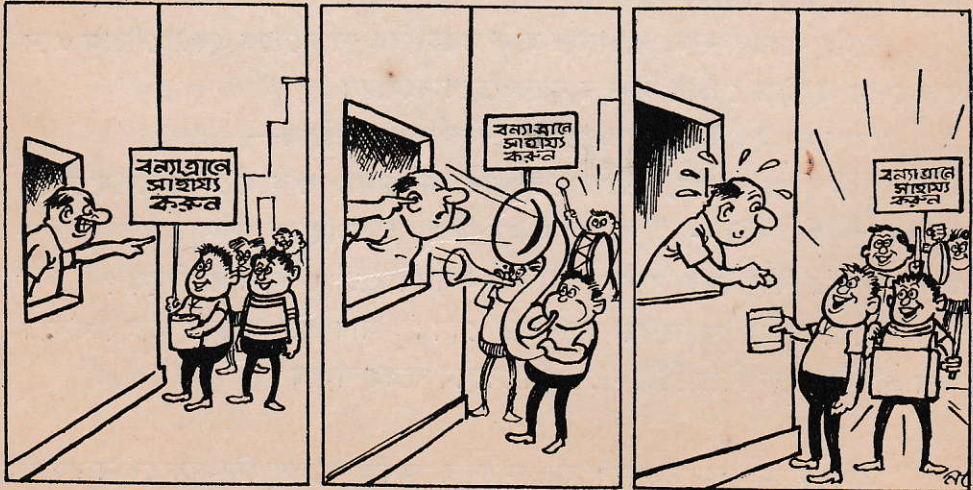
হিমঘর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর কাঞ্জিলাল আরামকেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

ধবধবে সাদা চুল, ধবধবে সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। চোখ কাগজের ওপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ। যেন কোন দিকেই হুঁশ নেই। এটা তাঁর বহুদিনের স্বভাব। যখন যা করবেন তাতে তন্ময় হয়ে যাবেন তখন।

গরমের ছুটির আর বেশী দেরি নেই। ছেলেমেয়েরা কলকাতার বাইরে কোথাও বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যাবে কোথায়? পাহাড়ী শহরগুলোতে তো গিসগিস করছে লোক। হোটেলগুলোতে একটুও জায়গা নেই, পথে সর্বদাই ভিড়। মনে হচ্ছে বছর কয়েক বাদে পৃথিবীতে আর নড়বার-চড়বারও জায়গা মিলবে না।

কিন্তু লোকগুলো যাবেই বা কোথায়? এক, যদি মানুষ অন্য গ্রহ-উপগ্রহ জয় করে সেখানে উপনিবেশ গড়তে পারে! বিজ্ঞানীরা যেমন তোড়জোড় লাগিয়েছেন তাতে চাঁদে হয়তো তাঁরা অল্পদিনের মধ্যেই গিয়ে হাজির হতে পারবেন। কিন্তু উপনিবেশ হিসেবে চাঁদ যে খুব লোভনীয় হবে এমন মনে হয় না। তবে যদি মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যায়! কিন্তু তারও হুজ্জত কম নয়।

বছরখানেক আগে একখানা মার্কিন রকেট মঙ্গলের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল বটে। বোধ হয় আট হাজার মাইল দূর দিয়ে। টেলিভিশন মারফত তার কিছু কিছু ছবিও পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সে রকেট আর ফেরেনি। হালে নাকি রুশরা চেষ্টা করছে মঙ্গলের গায়েই রকেট নামিয়ে দেবে। কিন্তু তাতেও কি আর লোক পাঠানো চলবে? সাত আট মাস একটানা রকেট-প্লেনে বসে থাকা সহজ কথা নয়। তারপর যদিই বা মঙ্গলে পৌঁছল আবার ফিরে আসবার কি ব্যবস্থা হবে?

আজকের কাগজেও এ নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা বেরিয়েছে। তারই মধ্যে ডুবে ছিলেন ডক্টর কাঞ্জিলাল।

ডক্টর কাঞ্জিলালের বয়স প্রায় পঁচাত্তর হতে চলল, কিন্তু এখনও তাঁর কর্মশক্তি অটুট। বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি তাঁর বড় কম নয়, আর মজা, বিজ্ঞানের শুধু একটা দিক্ নিয়েই তিনি পড়ে নেই—বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি গবেষণা করেছেন এবং সর্বত্রই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। আর, শুধু বিজ্ঞানই বলব কেন, অবসর সময়ে তিনি ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এসব নিয়েও চর্চা করে থাকেন। এগুলোকে তাঁর "হবি" বলা চলে।

ডুগ্ ডুগ্…ডুগ্ ডুগ্…ডুগ্ ডুগ্…

হঠাৎ বাইরে রাস্তায় ডুগডুগির শব্দ শোনা গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বুলেটের বেগে ঘরে ঢুকল তাঁর নাতনী বুবু।—"দাছু, দাছু, সেই ভালুকওলাটা যাচ্ছে, ডাকব?"

বড় আদরের নাতনী, দাছুর 'না' বলার উপায় নেই। ডক্টর কাঞ্জিলাল হেসে বললেন, "আচ্ছা, ডাক্।"

থপ থপ করে এক বিরাট কালো ভালুক এসে দাঁড়াল রাস্তার ধারে। তাকে ঘিরে এক দঙ্গল লোক—ছেলে, বুড়ো কেউ বাদ নেই।

"কি খেলা দেখবে খোঁখী?"—ভালুকওয়ালা বুবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। বুবু তার অনেক দিনের পুরোনো খদ্দের।

"নতুন কি খেলা শিখিয়েছ তাই দেখাও। এদ্দিন কোথায় ছিলে?"—বুবু অভিমানের স্বরে বলল।

ভালুকওয়ালা হেসে বলল, "নোতুন আর কি শিখলাব? এইতো ওর নিদ্ ভাঙ্গল। সমুচা শীতটা শুধু ঘুম—ঘুম আর ঘুম। কুচ্ছু খাবে না, দো মাহিনা ভোর শুধু নিদ্ যাবে। তাই তো পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসি, হামিও মুলুক চলে যাই। গরম পড়ল তো ফিন্ চলে আসি। পাহাড়ে চলে যাই। ও-ও নিদ্ ভাঙ্গলে ঠিক চলে আসে। পোষ মেনে গেছে কিনা।"

● হিমঘর

"বল কি ! সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তোমার ভালুক ? কিচ্ছু না খেয়ে ?"—বুবুর চোখ দুটো ছানাবড়ার মত বড় হয়ে উঠল।

ভালুকওয়ালা বুবুর অজ্ঞতা দেখে মনে মনে হাসল, বলল, "খোঁখী, তুমি কুছু জান না। ভাল্লু, সাঁপ, বেঙ,—এরা তো সমুচা শীত ঘুম লাগায়। কুছু হয় না ওদের। আচ্ছা, আভি নাচ দেখো···নাচ্ ভাল্লু, নাচ্······" ডুগ্ ডুগ্···ডুগ্ ডুগ্···ডুগ্ ডুগ্।

ভালুকওয়ালা চলে গেলে বুবু এসে দাদুর কাছে বসল।

"আচ্ছা, দাদু, পাহাড়ী ভালুক বুঝি সারা শীতকাল ঘুমোয় ? তা, না খেয়ে বেঁচে থাকে কি করে ?"

"ঘুমোবার আগে ওরা খুব করে খেয়ে নেয় ; গায়ে চর্বি জমে। ঘুমোবার সময় ঐ চর্বিই ওদের খাবারের কাজ করে। পেটে না খেলেও ঐ জমানো চর্বিই ওদের শরীরকে তাজা রাখে। তারপর যখন লম্বা ঘুম ভাঙ্গে তখন অবিশ্যি খিদেটা ভাল করেই পায়।"

"ভারী মজা তো ! আমি যদি দু'মাস ওভাবে ঘুমোতে পারি তাহলে আমারও তো খাওয়া-দাওয়ার দরকার হবে না ! সত্যি, সারা শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে কি মজাটাই না হত ! টেরও পেতাম না কোথা দিয়ে শীত কেটে গেল। বিচ্ছিরী লাগে আমার শীতকালটা।"

বুবু হয়তো আরও অনেকক্ষণ বকবক করে যেত কিন্তু তার আগেই লছমন সিং এসে জানালে যে সেই পার্সেলের বাক্সটা এসে গেছে।

"এসে গেছে ? বাঃ !"—ডক্টর কাঞ্জিলাল বললেন।—"আমার লাইব্রেরী ঘরে তুলে রাখতে বল।"

আগেই বলেছি ভাষাতত্ত্ব ডক্টর কাঞ্জিলালের একটা 'হবি'। তাঁরই এক পুরোনো ছাত্র মিলিটারীতে যোগ দিয়ে কিছুদিন আগে নেফা অঞ্চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে পাহাড়ের ওপরে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে ক্যাম্প পড়েছিল ওদের। চিরতুষারের রাজ্য সেটা। সেইখানেই টেণ্ট বসাবার জন্য বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে ওরা বরফের নীচে কয়েকটা কাঠের বাক্স পায়। হয়তো কোন অতীত যুগে ওখানে কোনও বৌদ্ধ-বিহার বা মন্দির-টন্দির ছিল। তারই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিল ঐ বাক্সগুলো। মন্দির বা বিহারের চিহ্ন এখন আর নেই, কিন্তু কয়েকটা বাক্স ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে এবং দীর্ঘদিন বরফচাপা থাকায় এখনও নষ্ট হয়নি। ভারী মজবুত কাঠের বাক্স, ওপরে কারুকাজ-করা। তারই একটা বাক্সের ভিতর বিচিত্র ভাষায় লেখা কতকগুলি পুঁথি পাওয়া যায়। ওদের পাঞ্জাবী কম্যাণ্ড্যাণ্ট্ সেগুলো আবর্জনায় ফেলে দিয়ে বাক্সগুলো জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন। ছাত্রটির কিন্তু কৌতূহল হয়—ঐ পুঁথিগুলিতে কি লেখা আছে জানতে হবে।

● শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

কম্যাণ্ড্যান্টকে বলে-কয়ে সে ঐ পুঁথির বাক্সটা চেয়ে নেয়, কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য ভাষা বুঝবার মত বিদ্যে তার ছিল না। তখন তার মনে পড়ে ডক্টর কাঞ্জিলালের কথা। তাঁর হবির কথাও ওর জানা ছিল। তাই একটা চিঠি দিয়ে সে বাক্সটা রেলওয়ে পার্সেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। লছমন সিং সেই পার্সেলটার কথাই বলছিল।

দুপুরে ডক্টর কাঞ্জিলাল সাধারণতঃ ল্যাবরেটরীতেই কাটান সেই রাত পর্যন্ত। কিন্তু আজ রবিবার। আজ আর ল্যাবরেটরী নয়, আজ শুধু লাইব্রেরী। খাওয়াদাওয়ার পর একটু পড়াশোনা করবার জন্য তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকলেন আর তখনই মনে পড়ল সেই কাঠের বাক্সটার কথা।

পুরু, দামী কাঠের তৈরী বাক্স, ভেতরে একতাড়া হাতে লেখা পুঁথি। বোধহয় কোনও গাছের ছালের ওপর লেখা, কিন্তু প্রায় কাগজের মতই মসৃণ এবং পাতলা।

ডক্টর কাঞ্জিলাল সাবধানে একটা পুঁথি তুলে নিলেন। সোজা সোজা, ওপর থেকে নীচে টানা, অনেকটা ছবির হরফে লেখা। কি ভাষা এটা? খুব প্রাচীন কোন ভাষাই হবে বোধ হয়। ছবির অক্ষর দেখে তাই তো মনে হয়। চীনে ভাষার সঙ্গে তাঁর অল্পস্বল্প পরিচয় আছে, এগুলো কি তবে প্রাচীন চীনে ভাষায় লেখা? তিব্বতের কাছে পাওয়া গেলেও তিব্বতী ভাষা এগুলি নয়, কারণ তিব্বতীরা তাদের অক্ষর বা লিপি ভারতের কাছ থেকেই নিয়েছিল, তাদের নিজস্ব কোন লিপি ছিল না।

কিন্তু কোন্ সময়কার ভাষা এটা? বৌদ্ধ যুগের, নাকি তারও অনেক আগের? ছবির ভাষা দেখে সেই রকমই তো একটা সন্দেহ জাগে।

একটা জিনিস কিন্তু ডক্টর কাঞ্জিলালের কাছে বেশ আশ্চর্য লাগল। অত পুরোনো লেখা, কিন্তু সে তুলনায় তা এখনও যেন বেশ অবিকৃত আছে। কাগজটাও, আসলে গাছের পাতা হলেও, তেমন মুচমুচে হয়ে যায়নি। একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্ল্যাস নিয়ে ডক্টর কাঞ্জিলাল পাতাগুলো উলটে যেতে লাগলেন।

অনেকগুলো পাতা উলটে হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। একটা ইঞ্চি তিনেক মাপের পোকার ফসিল পাতাটার গায়ে লেপটে আছে। পোকাটার আকৃতি অদ্ভুত! শরীরের একটা অংশ খোলা দিয়ে ঢাকা, বাকিটা তার তলা দিয়ে উঁকি মারছে। কিসের ফসিল বলে মনে হচ্ছে? ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস্?

ডক্টর কাঞ্জিলাল ফসিল নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছেন। ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস্

গিনিপিগ্‌টাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডক্টর কাঞ্জিলাল···বললে

(হিমঘর···পৃঃ ৩৭২)

নামে এক জাতের ফসিলের কথা তিনি জানতেন। এই জীব বহুদিন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। এদের ফসিলও বেশ দুষ্প্রাপ্য। এখন যেখানে হিমালয় পাহাড়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সেখানে ছিল সমুদ্র—বিজ্ঞানীদের দেওয়া নাম টেথিস সমুদ্র। হিমালয় পাহাড়ের বুকে এখনও অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমুদ্র পালটে যখন ডাঙ্গা হল তখন একদল সামুদ্রিক প্রাণীও ধীরে ধীরে চেহারা বদলে ডাঙ্গার প্রাণীতে নিজেদের রূপান্তরিত করল। অবশ্য এই পরিবর্তন একদিনে বা এক-আধ পুরুষে সম্ভব হয়নি—লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টাতেই হয়তো এরকম হয়েছে। যাই হোক, পরিবর্তনের মাঝামাঝি সময়ে যে সব প্রাণী দেখা দিয়েছিল তাদেরই একটি হচ্ছে এই ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিক্যাস্। এরা জল আর ডাঙ্গার মাঝামাঝি জীব।

কিসের ফসিল বলে মনে হচ্ছে? ডাইক্যালিপ্টো-ইউসেনিকাস? [পৃঃ ৩৬৮

অবশ্য ডাঙ্গা হবার পরও এদের বেঁচে থাকতে কোন বাধা ছিল না, তবে যতদূর জানা যায় বহুদিন যাবৎ এরা লোপ পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত এদের সামান্য ২।৩টি ফসিল মাত্র পাওয়া গেছে।

ফসিলটা দেখে ডক্টর কাঞ্জিলাল ভারী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। অতি যত্নে অতি সাবধানে সেটি তুলে জানালার ধারে নিয়ে রাখলেন, যাতে রোদের আলোয় ভালো করে দেখা যায়। গরমের দিন, রোদের তাতও বড় কম নয়। ফসিলের গায়ে রোদ পড়ে তার কালচে রংটাও যেন ঝকমক করতে লাগল।

বেশ খানিকক্ষণ পোকাটাকে ভালো করে দেখে কাঞ্জিলাল উঠে গেলেন লাইব্রেরী থেকে একটা প্যালিয়ণ্টলজীর বই আনতে—যার মধ্যে এদের কথা ভালো করে লেখা আছে। মিনিট দশেক

● শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
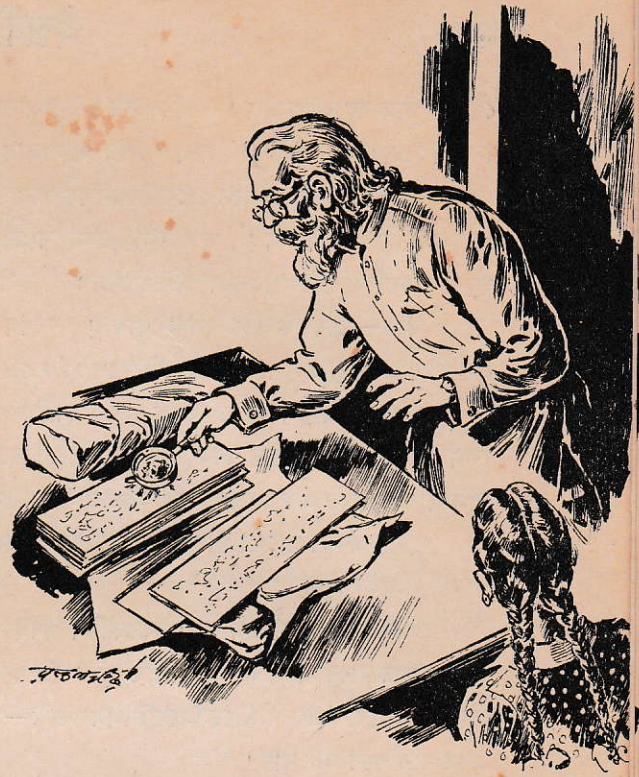
খোঁজাখুঁজির পর বই বেরুল। ফসিলটার বর্ণনা আছে তাতে, একটা ছবিও আছে তার। বইটা নিয়ে ফিরে এলেন ডক্টর কাঞ্জিলাল আবার জানালার কাছে।

কিন্তু পোকাটা যেখানে রেখেছিলেন সেখানে তো সেটা নেই! বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে। কি করে এল! ভাবছেন, এমন সময় দেখেন পোকাটা আবার নড়ে উঠল, তারপর সুড়সুড় করে আবার খানিকটা এগিয়ে গেল।

তবে—তবে কি এটা জ্যান্ত পোকা! ফসিল নয়? কিন্তু—কিন্তু কি করে হয়? অত দিনের লুপ্ত জীব এখনও, এই পরিবর্তিত পরিবেশেও কি বেঁচে থাকতে পারে?

ডক্টর কাঞ্জিলাল আস্তে আস্তে একটা কাঠি দিয়ে এবার পোকাটাকে উলটে দিলেন। পোকাটা কিলবিল করে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চেষ্টা করে উলটে সোজা হয়ে গেল, তারপর বিদ্যুৎগতিতে জানালার গরাদের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল। নাঃ, জ্যান্ত পোকাই বটে!

ছোট্ট একটা জালের খাঁচায় পোকাটাকে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

এরপর ডক্টর কাঞ্জিলালকে কয়েকদিন খুবই চিন্তান্বিত মনে হল। সারাদিন লাইব্রেরীতেই কাটান আর মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরীতে ছুটে গিয়ে এটা ওটা পরীক্ষা করেন। বাড়িতেই একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরী বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি—যাতে সব রকম পরীক্ষারই কিছু কিছু একসঙ্গে একই ঘরে বসে করা যায়।

একদিন দেখা গেল ডক্টর কাঞ্জিলাল বরফের কুচির সঙ্গে এটা ওটা নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে ক্রমাগত কি লক্ষ্য করছেন। বরফের সঙ্গে নুন মেশালে বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়। অন্য কোন মসলা মিশিয়ে আরও ঠাণ্ডা করা যায় কিনা সম্ভবতঃ তাই ছিল তাঁর পরীক্ষার বিষয়। শুধু বরফ নিয়েই পরীক্ষা নয়, ল্যাবরেটরীতে ঠাণ্ডা করার আরও যত রকম কৌশল ব্যবহার করা হয় সব নিয়ে তিনি পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। মনে হল এও বোধ হয় তাঁর একটা নতুন হবি।

শেষে একদিন দেখা গেল ল্যাবরেটরীতে যে গিনিপিগের খাঁচা ছিল তারই সামনে দাঁড়িয়ে গিনিপিগগুলোকে বাছাই করছেন তিনি। অনেকক্ষণ দেখে সাদাকালো ছোপ ছোপ রঙের একটা মোটাসোটা গিনিপিগ বেছে নিয়ে তিনি সেটা বার করে ফেললেন। গিনিপিগটার একটা কানের খানিকটা ছিল কাটা।

দাহুর হাতে গিনিপিগ দেখতে পেয়ে বুবু ছুটে এল। "কি করবে দাহু কাটাকানিকে দিয়ে?" বুবু ওঁর খাঁচার সব কটি বাসিন্দা গিনিপিগ, খরগোশ—প্রত্যেকটিকেই চেনে। ওদের এক-একটা

নামও সে দিয়ে রেখেছিল। এই গিনিপিগটার কান কাটা বলে এটার নাম দিয়েছিল সে 'কাটাকানি'।

ডক্টর কাঞ্জিলাল হেসে বললেন, "দেখ্ না কি করি!"

বিরাট্ একটা সিন্দুকের মত যন্ত্র ল্যাবরেটরীর এক কোনায় দাঁড় করানো ছিল। এটি হালে তৈরী করানো হয়েছে ফরমাশ দিয়ে। গিনিপিগটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ডক্টর কাঞ্জিলাল নাতনীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম;—ভালুকের মত লম্বা ঘুম! ঘুমোক আরামসে।"

ছ'মাস পরের কথা। গিনিপিগটার কথা বুবু ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ দাদুকে সেই সিন্দুকের মত যন্ত্রটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখে সেও এগিয়ে এল—দরজায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখতে লাগল। দাদুর অনুমতি ছাড়া এ ঘরে ঢোকা বারণ।

কাঞ্জিলাল সিন্দুকের পাল্লা খুলে ফেলেছেন, আর সন্তর্পণে একটা চিমটে দিয়ে আলগোছে সেই গিনিপিগটাকে টেনে বার করছেন। বুবু দেখল সেটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ঘুম তার ভাঙ্গেনি তখনও কিন্তু চেহারা তেমনি মোটাসোটাই রয়েছে। কাটা কান দেখে এটাই যে তার সেই কাটাকানি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না। সেই সাদা-কালো ছোপ ছোপ রং।

ডক্টর কাটাকানিকে এনে রোদের মধ্যে ফেলে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে হট্ ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দিতে লাগলেন ওর গায়ে। মিনিট পনেরো এইভাবে কাটলে কাটাকানি হঠাৎ নড়ে উঠল। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। কিন্তু তার জড়তা তখনও কাটেনি।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই বুবু দেখল দাদু তাকে ফের খাঁচার মধ্যে পুরেছেন আর সেখানে সে অন্য গিনিপিগদের সঙ্গে দিব্যি ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে।

মাস কয়েক পরে দেখা গেল, ডক্টর কাঞ্জিলালের বাড়িতে কয়েকজন বিদেশী সাহেব এসেছেন অতিথি হয়ে। এঁরা এসেছেন রাশিয়া থেকে, সকলেই নাম-করা বিজ্ঞানী। ডক্টর কাঞ্জিলালের সঙ্গে দিবারাত্র চলল তাঁদের শলা-পরামর্শ। তারপর একদিন দেখা গেল দমদম এরোড্রোমে একটা বিরাট জেট প্লেনে চেপে তাঁরা দেশে ফিরছেন এবং ডক্টর কাঞ্জিলালও এবার তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন।

ইতিমধ্যে চাঁদে যাবার জন্য মানুষের তোড়জোড় সমানে চলছিল। রাশিয়া আর আমেরিকা কোমর বেঁধে লেগেছে কে আগে সেখানে সশরীরে লোক নামিয়ে দেবে। আর ঠিক তখনই একদিন অবাক্ হয়ে সবাই কাগজে পড়ল রাশিয়া এবার খোদ মঙ্গলগ্রহের দিকে একটা রকেট ছুড়ে দিয়েছে।

● শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সেটা সাত মাস পরে মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হবে আর সেবারকার আমেরিকান রকেটের মত তার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে না গিয়ে মঙ্গলের গায়ে গিয়েই আঘাত করবে। নামবার সময়ে যাতে জোরে ধাক্কা না লাগিয়ে ধীরে ধীরে মঙ্গলের গায়ে নামতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে রকেটে। ভেতরে কি আছে? স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি, টেলিভিশন যন্ত্র—এসব তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা ছাড়া?......

সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নীরব।

ডক্টর কাঞ্জিলাল সেই যে রাশিয়ায় চলে গেছেন, আর ফেরেননি। তাঁর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন এ যাবৎ অবশ্য তাঁর চিঠিপত্র নিয়মিতই পাচ্ছিল—কিন্তু কিছুদিন হল হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কি ডক্টর কাঞ্জিলাল অসুস্থ? নাকি ওখানে গিয়েও এমন কোন গবেষণায় মেতেছেন যার ফলে চিঠিটুকু লেখবার পর্যন্ত ফুরসত নেই তাঁর?

ওদিকে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুটে-চলা রকেটটির কথা প্রায় ভুলেই গেছে লোকে, এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন দুই ইঞ্চি হেড লাইন দিয়ে খবরের কাগজগুলো সরব হয়ে উঠল।

কি ব্যাপার?

সোবিয়েত রকেট মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নেমেছে। না, ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়নি, এমন কি উলটেও যায়নি। দিব্যি ধীরে ধীরে প্যারাসুটের মতই মন্থর বেগে মঙ্গলের ডাঙ্গায় গিয়ে পৌঁছেছে। ব্যস, খবর ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তারপর?

কোন খবর নেই!

কিন্তু এ রকম তো কখনই হয়নি! রকেটে কি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ছিল না? টেলিভিশন ক্যামেরার ব্যবস্থা ছিল না? তা কি অচল হয়ে গেল?

না, ছিল না। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির বদলে ছিলেন স্বয়ং একজন অভিযাত্রী, মঙ্গলগ্রহে প্রথম মানুষ। যন্ত্রপাতি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর তা চালাবার ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন।

বারো ঘণ্টা পরে সত্যিই টেলিভিশনে খবর আর ছবি এক সঙ্গে ভেসে উঠল:

"মঙ্গলগ্রহ থেকে কথা বলছি। শুনুন—আমার নাম কাঞ্জিলাল। সত্যিই আমি শেষ পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহে এসে পৌঁছেছি, এবং বেঁচেও আছি। এখানে এখন চমৎকার আবহাওয়া। অবশ্য পৃথিবীর তুলনায় এখানকার বাতাস খুবই হালকা, তাই আমাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে-আনা অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছে। প্রচুর অক্সিজেন আমি সঙ্গে এনেছি, এ ক'মাস তার একটুও খরচ হয়নি। মনে হচ্ছে এ দিয়ে আমার এখনও বেশ কয়েক মাস চলে যাবে। ইতিমধ্যে আমি মঙ্গলগ্রহের পরিবেশে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেবার চেষ্টা করব। তখন হয়তো আর বাড়তি অক্সিজেনের দরকারও হবে না আমার।

"কি দেখছি মঙ্গলে? এখনও ভাল করে ঘুরে দেখিনি। দেখে, ক্রমশঃ তার কথা বলব। তবে শরীরটা বেশ হালকা লাগছে। ওজনটা যেন অনেক কমে গেছে। না, কোন খাল,—কাটা বা স্বাভাবিক, কিছুই এখন পর্যন্ত নজরে পড়েনি, কিন্তু ছোট ছোট গাছপালা, ঝোপঝাড় এদিক্-ওদিক্ ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক সবুজ নয়, ঈষৎ পাণ্ডুর, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম নয়। তবে পায়ের তলায় কাঁটা ঝোপ ছাড়া ঘাস পাইনি,—সবই প্রায় বালি। উঃ, কত বালি! চার ধারেই বালি আর বালির পাহাড়। এজন্যই বোধহয় পৃথিবী থেকে এ গ্রহটাকে এত লাল লাগে—বালির ওপর সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে কিনা! আর সেই বুদ্ধিমান্ প্রাণী? না, এখনও তাদের কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। যদি সত্যি তারা থাকে তবে কিভাবে আমাকে তারা আতিথ্য দেবে তা ভাববার কথা।"

হেলমেটের আড়ালে ডক্টর কাঞ্জিলালের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু গলার স্বরে হাসির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল ঠিকই।

মঙ্গলগ্রহ থেকে কথা বলছি। শুনুন—আমার নাম কাঞ্জিলাল। [পৃঃ ৩৭২

একটু থেমে আবার টেলিভিশনে শব্দ ভেসে এল।

"কি করে এখানে এলাম সে রহস্য সবাই জানেন না। আপনাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য সংক্ষেপে বলছি ঃ

"আমার ল্যাবরেটরীতে পর পর কয়েকটা ঘটনা লক্ষ্য করে আমার ধারণা হয়েছিল যে উপযুক্ত পরিবেশে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমাট করে দিয়ে নির্জীব পদার্থের মত সজীব প্রাণীকেও দীর্ঘদিন ধরে 'সংরক্ষিত' করে রাখা যায়। ঐ সময়ে জীবনের সমস্ত লক্ষণই অনির্দিষ্ট কালের জন্য থেমে থাকে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা একে বলি "ডরম্যাণ্ট" বা "সুপ্ত" অবস্থা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পোকাকেও আমি এইভাবে বরফের নীচে হাজার হাজার বছর বরফ চাপা

● শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

পড়ে থাকার পর রোদের তাপে পুনর্জীবন লাভ করতে দেখেছি। নিজের পরীক্ষাগারে গিনিপিগকে ঠাণ্ডায় জমাট করে রেখে দিয়ে ছ' মাস পরে আবার বার করে রোদে রেখে আর সেঁক দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছি। এ যদি সম্ভব হয় তবে মানুষের বেলায়ও তা সম্ভব হবে না কেন? সেই চেষ্টাই আমি এর পর করতে থাকি এবং নিজেকে এ কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সমর্পণ করি। আমার বন্ধু সোবিয়েত বিজ্ঞানীরা আমাকে এইভাবে ঠাণ্ডায় "ফ্রীজ্" ক'রে মঙ্গলগ্রহযাত্রী রকেটে পুরে দিয়েছিলেন। এই সাত মাস আমি সজীব থেকেও জীবনের সমস্ত লক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছিলাম—তাই আমার দেহে কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ আমিও এই সাত মাস 'ডর্ম্যাণ্ট' অবস্থায় কাটিয়েছি।

"এখানে এসে রকেট থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আমি ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পাই। ধীরে ধীরে বাইরের মুক্ত আবহাওয়ায় এসে আমি আবার চেতনা ফিরে পাই, জীবনের স্পন্দন আবার শুরু হয় আমার। মঙ্গলের আবহাওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেকটা মিল থাকায় এ ব্যাপার ঘটতে কোন অসুবিধা হয়নি।—বরঞ্চ হয়তো পৃথিবীতে যতটা সময় লাগত তার আগেই আমি চেতনা পেয়েছি। আমার সঙ্গে-আনা অক্সিজেনও আমি ঠাণ্ডায় জমিয়ে শক্ত করে এনেছি। কাজেই অতি স্বল্পপরিসর জায়গায়ও বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন আনা সম্ভব হয়েছে। ধীরে ধীরে আমি তা ব্যবহার করব। এই ক'মাস আমার কোনও খাবারের দরকার হয়নি, এখন থেকে হবে। কিছু জমাট-করা খাবার আমার সঙ্গেই আছে। বেশ কিছুদিন চলে যাবে তাতে। ইতিমধ্যে অবশ্য এখান থেকেও তা কিছু কিছু সংগ্রহের চেষ্টা করে নিতে হবে। না পেলে কি করব এখনও ভাবিনি। তবে পাব বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"পৃথিবীতে আমি আবার ফিরতে পারব কিনা জানতে আপনাদের নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য হচ্ছে? এখন পর্যন্ত সে রকম কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাতায়াতের কোন উন্নততর ব্যবস্থা সম্ভব হয় তবে হয়তো আমারও ফেরা সম্ভব হতে পারে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা হয়তো সে ব্যবস্থা একদিন করবেন, তবে আমার জীবনে তা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ, যদি না-ই হয়, আমার বিন্দুমাত্র আপসোস নেই। জীবনের পঁচাত্তর বছর আমি পৃথিবীতে থেকে তার সুখদুঃখ ভোগ করেছি, বাকি ক'টা দিন না হয় মঙ্গলের অভিজ্ঞতা নিয়েই কাটিয়ে দেব। আমার ডায়েরীতে সে অভিজ্ঞতার কথা আমি লিখেও রেখে যাব। তার পর······"

টেলিভিশনের পর্দা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে এল। সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ডক্টর কাঞ্জিলালের কণ্ঠস্বরও।

——

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

কালী পূজাও শেষ হয়ে গেছে।

পূজার দালানে জৌলুসের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। কর্তারা বালাখানার নীচের তলায় বারান্দায় নিঃশব্দে শূন্যমনে বসে আছেন। সবারই মন ভারী।

শুধু বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পূজার আনন্দ এখনই শেষ করে দিতে রাজী নয়। পূজামণ্ডপের সামনের প্রশস্ত উঠানে তারা নানারকম খেলা জুড়ে দিয়েছে। পূজার আনন্দের জের আরো কয়েকদিন তারা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বাড়ির বিস্তৃত অংশ জুড়ে তাদের খেলা। এই অন্দরের উঠানে, এই পূজামণ্ডপের সামনের উঠানে। তাতেও কুলোচ্ছে না।

রেবা বলল, এই, বালাখানার ওপরে পুজোর ভাঁড়ারে যাবি? ফল মিষ্টি কিছু পড়ে থাকতে পারে।

সরিৎ চালাক ছেলে। ঠোঁট উলটে বললে, থাকবে! সরকারমশাই একটা ছুঁচ ফেলে রাখবে না।

রেবা বললে, তা বুঝি জানিস না? সরকারমশাই আজকাল চোখে কম দেখেন। চল না দেখিগে যদি কিছু পড়ে থাকে।

কিছু পড়ে থাকবে না সবাই জানে। কিন্তু ওদের একটা কাজ তো চাই। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তাড়া খাচ্ছে। অন্দর থেকে তাড়া খেয়ে বাইরে এসেছে। এখানেও তাদের চিৎকারে কর্তারা বিরক্ত। বালাখানার ওপরে কেউ নেই। সেখানে নিশ্চিন্তে চিৎকার চলতে পারে। খেলাটা কিছুই নয়, চিৎকারটাই আসল। চিৎকার নইলে খেলা জমে না। সে কথা বড়রা কেন যে বোঝেন না ভেবে ছোটরা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং দুটো আপেল বা একটা নাশপাতির লোভে ঠিক নয়, আসলে কলরব করে খেলবার জন্যেই তারা সদলে বালাখানার ওপরে উঠল।

বালাখানার ওপরে একখানি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে পূজার ফলমূলাদি রাখা হয়। প্রথমে দূর্গা পূজা তারপরে লক্ষ্মী পূজা, তার পর কালী পূজা। সেখান থেকে পূজার দালানে আসবার একটা সিঁড়ি আছে। সেই ঘরে ফলমূল কাটা হয়। মধ্যেকার হলঘরে প্রতিমা আসেন। ওপাশের ঘরে বাড়ির মেয়েরা বসে পূজা দেখেন।

রেবারা দেখলে ভাঁড়ার ঘরের দরজা খোলা। কেনই-বা খোলা থাকবে না। ভাঁড়ারে কিছুই তো নেই।

হুড়মুড় করে ওরা সব ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘর অন্ধকার। কারণ জানালাগুলো বন্ধ। সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকে ওরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগল ঃ

কয়েকটা ভাঙা ঝুড়ি। কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা। ভাঙা মালসা। আর······

ওদিকের কোণে কালো মতন একটা কি !!!

ওরে বাবারে !

ছুট, ছুট, ছুট। পড়ি-তো-মরি ছুট !

কর্তারা ব্যস্তভাবে চিৎকার করে উঠলেন ; কি হল রে ?

রেবারা তখন হাঁপাচ্ছে। ভয়ে তাদের মুখ কাগজের মতন সাদা হয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তারা খুব ভয় পেয়ে গেছে। তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না।

কোন রকমে বললে, মড়ার মাথা !
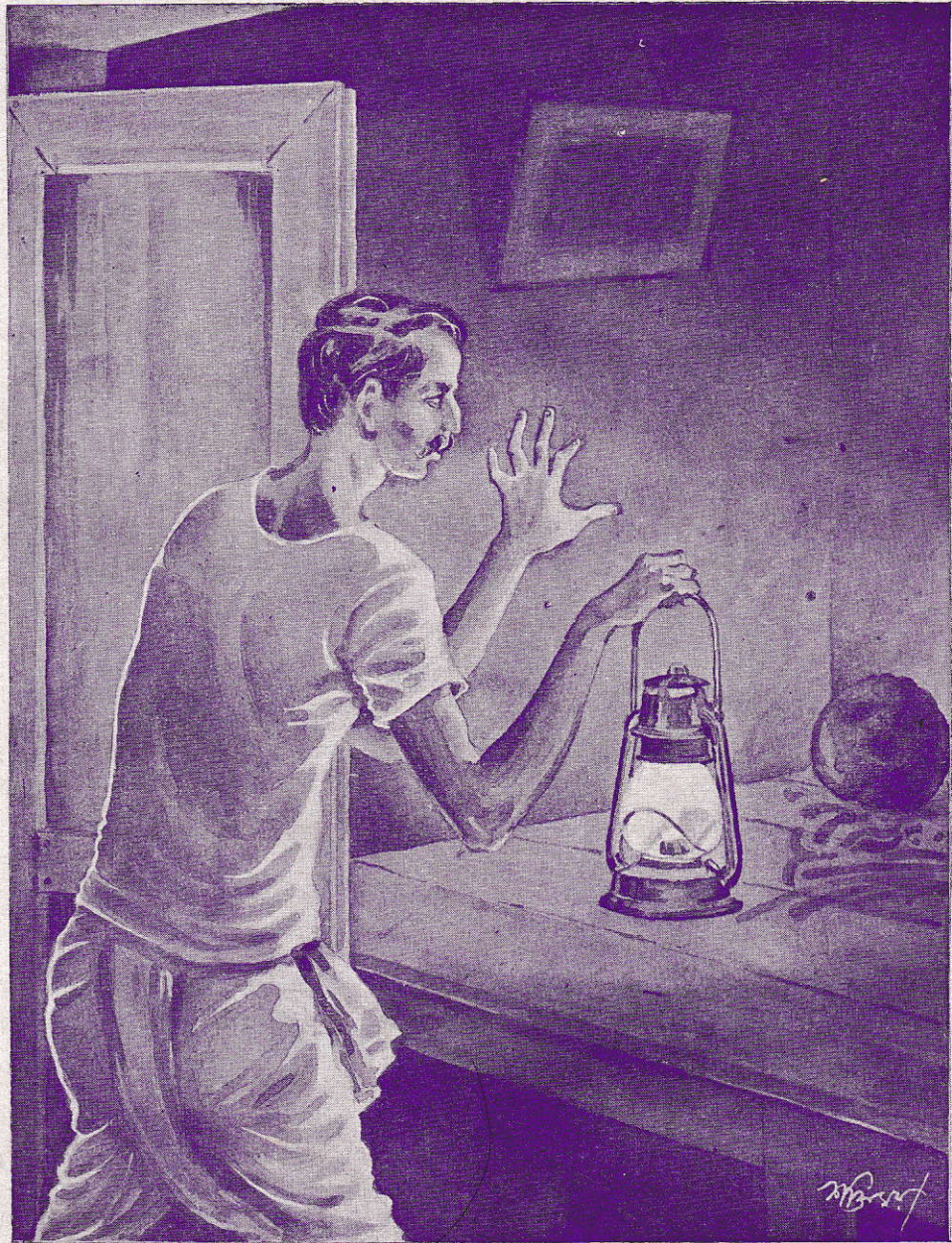
রতন কয়েক পা এগিয়ে গেল

(মড়ার মাথা···পৃঃ ৩৮১)
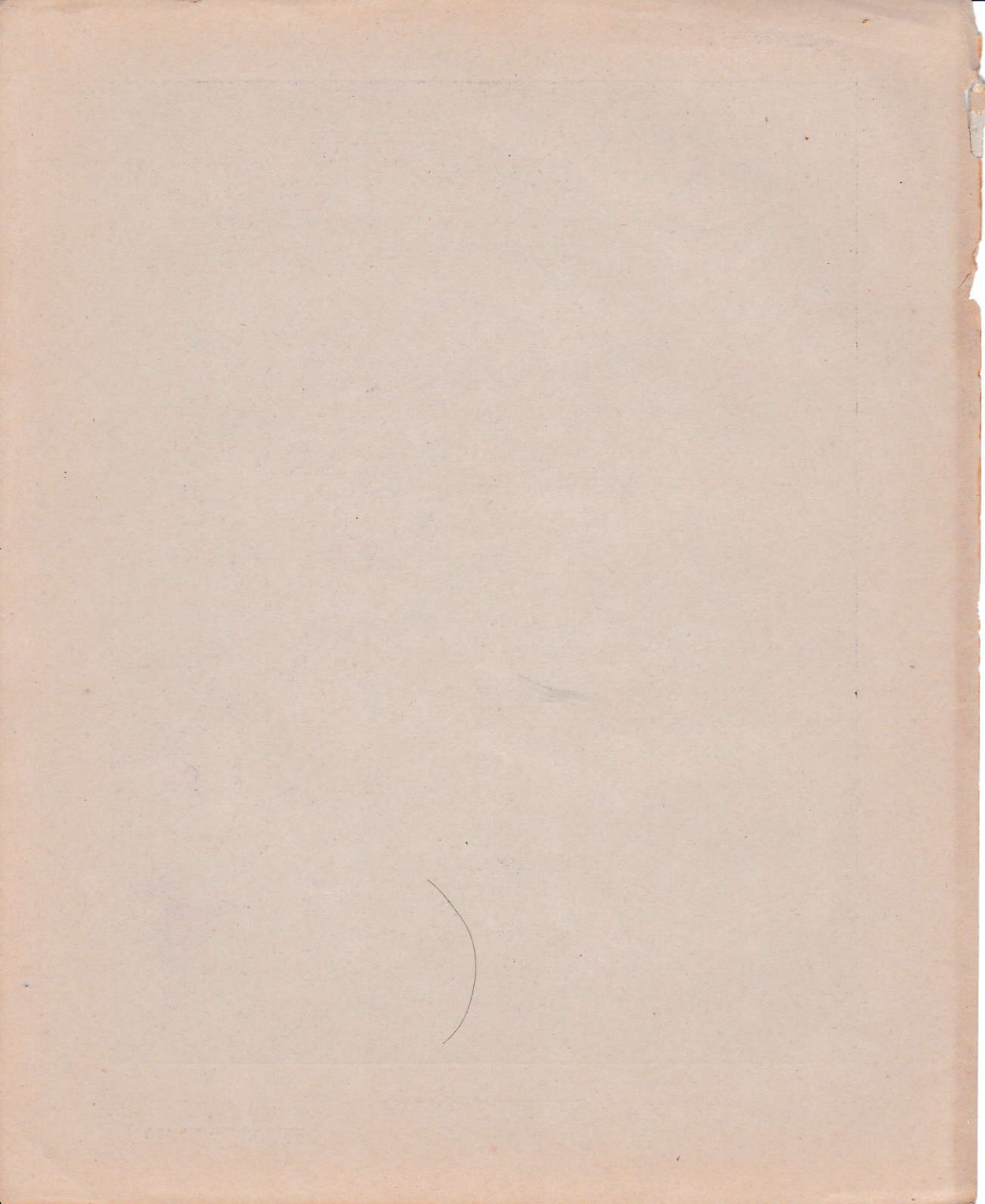
—মড়ার মাথা কি রে ?

—হ্যাঁ মড়ার মাথা।

বড়কর্তা বললেন মড়ার মাথা কি রে ? ওখানে মড়ার মাথা আসবে কি করে ?

মেজকর্তা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন, বিচিত্র নয়। কাছেই শ্মশান। শেয়াল কুকুরে এনে থাকবে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বড়কর্তা বললেন, বাড়িতে একপাল ঝি চাকর দারোয়ান, এতগুলো লোক, কারো চোখে পড়ত না।

মেজকর্তা বললেন, রাত্রে আমরা তো এখানে থাকি না। সেই সময় এনে থাকবে।

যুক্তির দিক দিয়ে অকাট্য।

বড়কর্তা রেগে গেলেন। বললেন, দারোয়ানটা কোথায় গেল ?

—ওর কথা আর বলবেন না। আমি কতদিন দেখেছি সন্ধ্যের পর সদর দরজা হাট করে খুলে রেখে ও রুটি বানাতে বসে। রুটি বানায় আর গুনগুন করে ভজন গায়।

মেজকর্তা হাসলেন।

বালাখানার ওপরে পূজোর ভাঁড়ারে মড়ার মাথা আসার রহস্য আর অস্পষ্ট রইল না।

—সদর দরজা হাট করে খুলে রেখে !—বড়কর্তা হুংকার দিলেন,—দারোয়ান !

দারোয়ান সেলাম করে এসে দাঁড়াল।

লোকটি ভোজপুরি। কিন্তু পাঁচ ছয় পুরুষ এখানেই বাস। সুতরাং ভোজপুরিত্বের আর অবশিষ্ট নেই লাঠিগাছটি ছাড়া। তবু তার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তার গায়ে নাকি এত জোর যে হাতের লাঠি দিয়েই একটা বাঘ মেরে ফেলতে পারে। আর সাহস তো সকলে চোখেই দেখেছে। একটা বিষধর কেউটে সাপকে অবলীলাক্রমে লেজে ধরে তুলে ঘোরপাক দিয়ে ফেলে দিতে পারে।

বড়কর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ধ্যের পর তুমি সদর দরজা খুলে রুটি বানাও ?

ব্যাপারটা দারোয়ান বুঝতে পারে নি। কয়েক পুরুষ থাকার ফলে বাংলা সে ভালোই বলে। ইতস্ততঃ করে বললে, কোনো কোনো দিন করি হুজুর।

—কেন কর ? চোর ঢোকে যদি ?

চোরের নাম শুনে দারোয়ান তাচ্ছিল্যভরে বললে, আমি থাকতে চোর আসবে না বাবু।

দাঁত খিঁচিয়ে বড়কর্তা বললেন, আমি থাকতে চোর আসবে না বাবু। যদি কুকুর কি শেয়াল আসে ?

ধমক খেয়ে দারোয়ান কিছুটা ভড়কে গেল। বিনীত ভাবে বললে, কুকুর ঢুকতে পারে হুজুর, কিন্তু শেয়াল ঢুকবে কেন ?

—কেন ঢুকবে তা শেয়ালকে জিগ্যেস কর। দেখছি ঢুকেছিল।

—শেয়াল !

—হাঁ, শেয়ালই হবে।

—আপনি দেখেছেন হুজুর ?

—আমি দেখবো কেন ? প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ঢুকেছিলো। নইলে মড়ার মাথাটা বালাখানার ওপরে কি করে এলো ? নিশ্চয় শেয়াল।

মেজকর্তা বললেন, বাঘও হতে পারে।

দারোয়ান বাঘ কিংবা শেয়ালের ধার দিয়েই গেল না। মড়ার মাথার নাম শুনে সভয়ে তিন পা পিছিয়ে বললে, মড়ার মাথা হুজুর !

বড়কর্তা বললেন, হাঁ মড়ার মাথা। যাও না ওপরে গিয়ে দেখে এসো গে না।

দারোয়ান পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না, দেখে আসবার লক্ষণও পাওয়া গেল না।

বড়কর্তা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? দেখে এসো না।

দারোয়ান তথাপি নড়ে না।

সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু অন্ধকার এখনও কালো হয়ে নামে নাই। ইতিমধ্যে
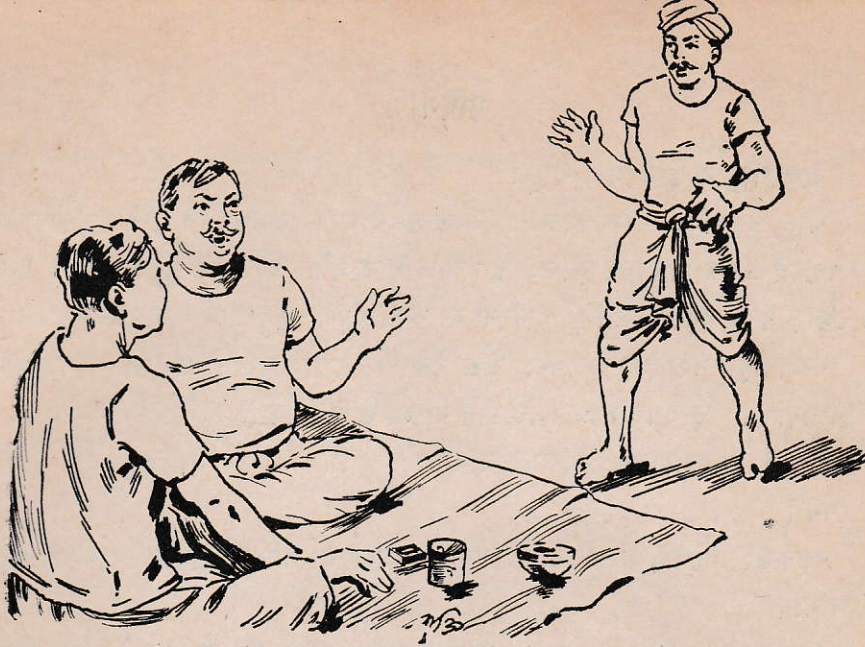
মড়ার মাথা হুজুর ! [পৃঃ ৩৭৮

ছেলে-মেয়েতে, পাড়া প্রতিবেশী লোকজনে সামনের উঠান ভরতি হয়ে গেছে। গিসগিস করছে লোক। সবাই দারোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু দারোয়ান নড়ে না চড়ে না কথাও বলে না।

বড়কর্তা হুংকার দিলেন ; তোমারি গাফিলতিতে এটা ঘটেছে। তোমাকেই মড়ার মাথা ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

দারোয়ান বাঘকে ভয় পায় না, সাপকেও ভয় পায় না কিন্তু ভূতে তার ভীষণ ভয়। সেটা কেউ জানে না। নিজে বরাবর গোপন করে গেছে। যে মড়ার মাথা সেটা ভূত হয়ে আশে পাশেই তো ঘুরছে তাতে ভুল নেই। শেয়াল কুকুর পারে, ওদের সঙ্গে হয়ত ভূতের একটা রফা আছে, কিন্তু মানুষের সাধ্য কি ঐ মড়ার মাথা অদূরবর্তী শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসে। অন্ততঃ দারোয়ানের তো নেই।

সে গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বললে, আমি বামুনের ছেলে মড়ার মাথা ছোঁব না বাবু। কি জাতের মড়া কে জানে !

বড়কর্তা বললেন, মড়া তোমাকে ছুঁতে হবে না।

● শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বলে পাঁচুকে ডাকলেন, পাঁচু।

পাঁচু বড়বাবুর খাস চাকর। অত্যন্ত বাধ্য। কর্মতৎপর পেয়ারের চাকর। ডাক শুনেই প্রভুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পারলে। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, আমি পারবো না কর্তাবাবু। ভূতে আমার বড্ড ভয়।

কর্তাবাবু সহাস্যে বললেন, ভূত কোথায় পেলি রে! ও-তো মড়ার মাথা। নির্জীব পদার্থ। তারপর সঙ্গে দারোয়ান যাচ্ছে লাঠি নিয়ে।

শুনেই দারোয়ানও কাঁদতে লাগলঃ আমিও পারব না হুজুর। আমাকে মাপ দেন।

বড়কর্তা বললেন, দশটা টাকা দেব। আসবার সময় ত্রিবেণী থেকে গঙ্গাস্নান করে আসবি।

দারোয়ান তথাপি নারাজ। সজোরে মাথা নেড়ে বললে, লাখ টাকা দিলেও পারব না হুজুর। অন্য কাউকে বলুন।

অন্য কেউও রাজী নয়। ভৃত্যবর্গ যারা ব্যাপারটা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছিল কে কোন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বড়কর্তা মহা ফাঁপরে পড়লেন।

রতন একাধারে সরকার এবং গোমস্তা। বাজারহাট করে, ফাইফরমাস খাটে আবার খাজনাও আদায় করে, জমিদারী খাতাও লেখে। শীর্ণ রুগ্ন দেহ। হাঁপানির রুগী। দূরে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, মড়ার মাথাটা দেখল কে?

—দেখলে?—বড়কর্তা বললেন,—তাই তো দেখলে কে?

মেজকর্তা বললেন, ছেলেমেয়েগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে ওপর থেকে নেমে এল। তারাই বলল।

কিন্তু ওই অপূর্ব বস্তুটিকে দেখবার গৌরবের আশ দিতে রেবা নারাজ।

এগিয়ে এসে সগর্বে বললে, আমি দেখেছি দাদু, সব প্রথম আমি দেখেছি।

রতন তাকে বললে, তুমি আমার সঙ্গে এসো তো দিদি। দেখিয়ে দেবে কোথায়।

কিন্তু দিদি দ্বিতীয় বার যেতে নারাজ। দিদিও না অন্য কেউও না।

মৃদু হেসে রতন অগত্যা একাই ওপরে গেল।

অন্ধকার ঘর। রতন দেশলাইটা জ্বাললে।

হ্যাঁ ওদিকের কোণে মড়ার মাথার মতন কি একটা রয়েছে বটে।

হাঁকলে একটা হারিকেন আন তো কেউ।

কে আনবে? হারিকেন নিয়েও কেউ ওপরে যেতে রাজী নয়। রতনকে নিজেই নীচে নেমে হারিকেনটা নিয়ে আসতে হল।

হ্যাঁ মড়ার মাথাই বটে। কিন্তু

রতন কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর আরো কয়েক পা। আরো কয়েক পা এগিয়ে এসেই সশব্দে হো হো করে হেসে উঠল। হাঁপানি রোগীর হাসি, বিটকেলে হাসি।

নীচের লোকগুলো শিউরে উঠল।

বড়কর্তা সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, কি হল রে!

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবং তারপর হারিকেনের আলোর ছটা দেখতে পাওয়া গেল।

তারপর মড়ার মাথা নিয়ে রতনের প্রবেশ।

সিঁড়ি থেকে ছিটকে কতকগুলো লোক নীচে পড়ে গেল।

বড়কর্তা জবুথবু মানুষ। লাফ দেবার ক্ষমতা নেই। দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে আর্তনাদ করতে লাগলেন। মেজকর্তা দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন এবং বিড়বিড় করে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াচ্ছেন।

সকলের অবস্থা দেখে রতন চিৎকার করতে লাগল; মড়ার মাথা নয়, মড়ার মাথা নয়। চোখ মেলে দেখুন এটা কি।

বড়কর্তা চিৎকার করছিলেন। সে চিৎকার থামলো না। তারই জের টেনে বলতে লাগলেন, কি ওটা?

রতন হেসে বললে, একটা পচা বাতাবি লেবু। পচে মাথার দিকটা কালো হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে মড়ার মাথা।

● শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী
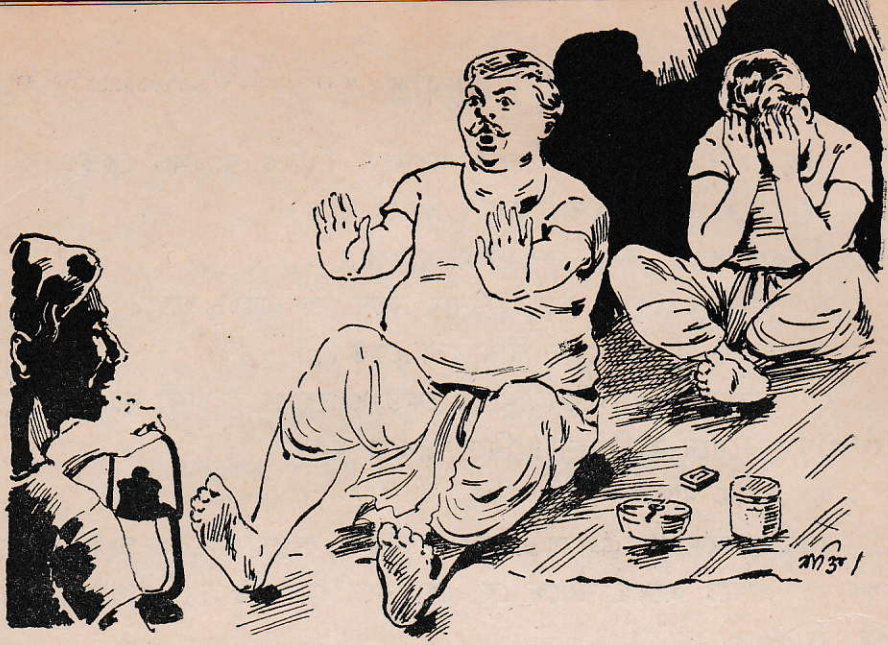
দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে আর্তনাদ করতে
লাগলেন বড়বাবু। [পৃঃ ৩৮১

ক্রোধে অগ্নিশর্মা বড়কর্তা চিৎকার করে বললেন, মনে হচ্ছে তো আগে বলিসনি কেন হতভাগা। ইয়ারকি পেয়েছিস? মড়ার মাথা নিয়ে রসিকতা! তোমাকে আমি খড়ম পেটা করব হারামজাদা।

রতন বেকুফ। ভীতু লোকেদের রাগ বেশী হয়। সকলের রাগ তার ওপর এসে পড়ল। বিশেষতঃ বালাখানার বারান্দা থেকে লাফাতে গিয়ে যারা জখম হয়েছে তাদের।

মেজবাবুর মন্ত্র আবৃত্তি থেমে গেছে। তিনি স্বভাবতঃই শান্ত এবং স্বল্পভাষী। মৃদুহাস্যে বললেন,—অপরাধ তো রতনই করেছে। সবাই মিলে মার ওকে। আর যারা ওপরে যেতে সাহস করলে না তাদের ডাল রুটি বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মেজকর্তার কথা শুনে বড়কর্তা লজ্জা পেলেন এবং রসটা উপলব্ধি করলেন। করে সশব্দে হেসে উঠলেন। তার সঙ্গে সমবেত জনতাও।

শ্রীতুষার চ্যাটার্জী

লাল মানুষের ডেরাতে ভাই!
মিস্টার লিং! মিস্টার ফাই!
দুঃসাহসে আকাশে আজ লাগায় অভিযান।
বুদ্ধিটাকে নেয় সানিয়ে!
ছুতোর ডেকে নেয় বানিয়ে!
তৈরি করে স্পুটনিক এক, আজব আকাশযান।

অনেক মাথা ঘামিয়ে শেষে!
কচ্ছপের এক খোলে ঠেসে!
জ্বালিয়ে দিয়ে তার ভেতরে চুল্লি আণবিক।
চিমনি দিল সঙ্গে এঁটে!
না যায় শেষে চুল্লি ফেটে!
ধোঁয়া যত তার থেকে ভাই বেরিয়ে যাবে ঠিক!

গ্রহর ছবি তুলতে হবে!
মিস্টার লিং তাই না ভেবে!
কিম্ভূত ফ্লেক্স ক্যামেরা নেয়
দারুণ যে তার গতি।
আকাশ মাঝের যত খবর
উঠবে ক্যামেরাতে জবর!
উঠবে ফটো সূর্যদেবের
নাম-না-জানা জ্যোতি।

মিস্টার ফাই বুদ্ধি করে!
ঘণ্টা ঝোলান লাঠির 'পরে!
ঘটে যদি কোন বিপদ্
আকাশ ভ্রমণমাঝে।
বুদ্ধিতে ওরা নয় কো কাঁচা!
বিজ্ঞানী ছিল ওদের চাচা!
দুজনেতে খাটে খালি
"যান" ওড়াবার কাজে।

বন্ বন্ বন্ উড়ল রে "যান"!
মিস্টার লিং করে আনচান!
তুলবে কখন আকাশ পথের আজব ছবিগুলি।
মিস্টার ফাই ব্যাপার দেখে!
দড়ি বেঁধে দিলেন তাকে!
শূন্যে নেবে হারিয়ে না যান তাদের কথা ভুলি।

কচ্ছপের মাসতুতো ভাই

(উড়ে পালাও দাদা···পৃঃ ৩৮৬)
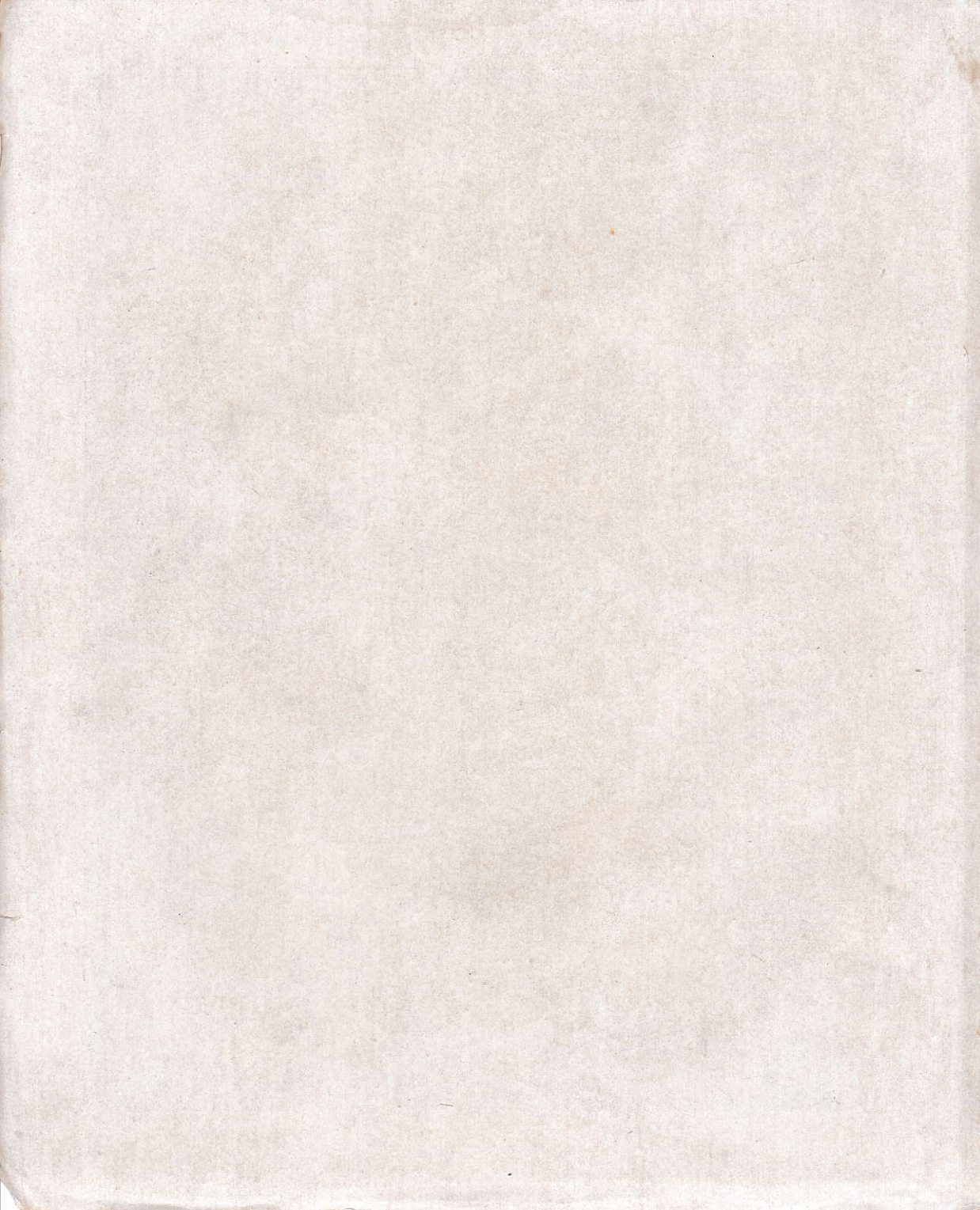
মিস্টার লিং ধরিয়ে পাইপ
মেজাজখানা করে সরিফ!
আলোর তরে জ্বেলে দিলেন
একটি মোমের বাতি।
পথ দেখবেন সেই আলোতে!
মিস্টার লিং ওঠেন মেতে!
লাফিয়ে পড়েন শূন্য মাঝে
ফুলিয়ে বুকের ছাতি।

মিস্টার ফাই বুদ্ধি করে!
ফ্ল্যাস লাইটের আলোর তরে!
সোনার চাকি ঝুলিয়ে দিল
একটি ছোট বাঁশে।
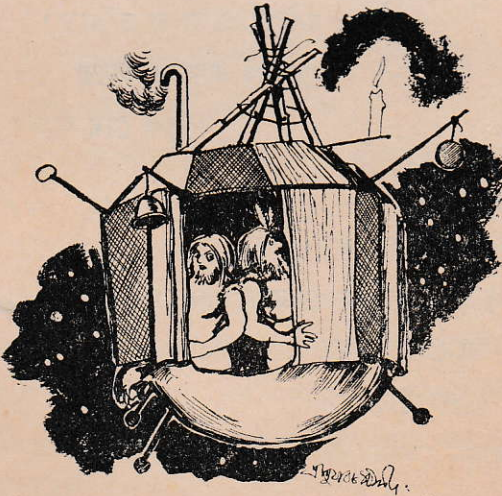
মোমের আলো পড়লে তাতে!
ঠিকরে যাবে আকাশপথে!
সেই আলোতে মজার ছবি
উঠবে আশেপাশে।

● শ্রীতুষার চ্যাটার্জী

তুলছে ছবি মিস্টার লিং
আনন্দেতে তিড়িং বিড়িং
শূন্যে ঘোরা আজব ব্যাপার
লাগে না পায়ে ধূলি।
ক্যামেরাটা চোখে এনে
ক্লিক্ করে সাটার টেনে।
যেই তুলেছে মনের মত
মজার ছবিগুলি!

হঠাৎ একি লাগল তাড়া!
চক্ষু হল ছানাবড়া!
ঘটল একি বিপদ্ বল
আকাশ মাঝে আজ!
মিস্টার ফাই ছুটে গিয়ে!
ঘণ্টা পেটান ঢং ঢঙিয়ে!
বিনামেঘে আকাশ মাঝে
পড়ল যেন বাজ!!

কচ্ছপেরই মাসতুতো ভাই!
কিংবা জিরাফ লম্বা গলাই!
রাক্ষসেরই পিসের খুড়ো নাকটা বেজায় খাঁদা।
ফটো তোলা উঠল মাথায়!
মিস্টার ফাই বলে তাহায়
বাঁচতে চাও তো দড়ি কেটে উড়ে পালাও দাদা!!!

———
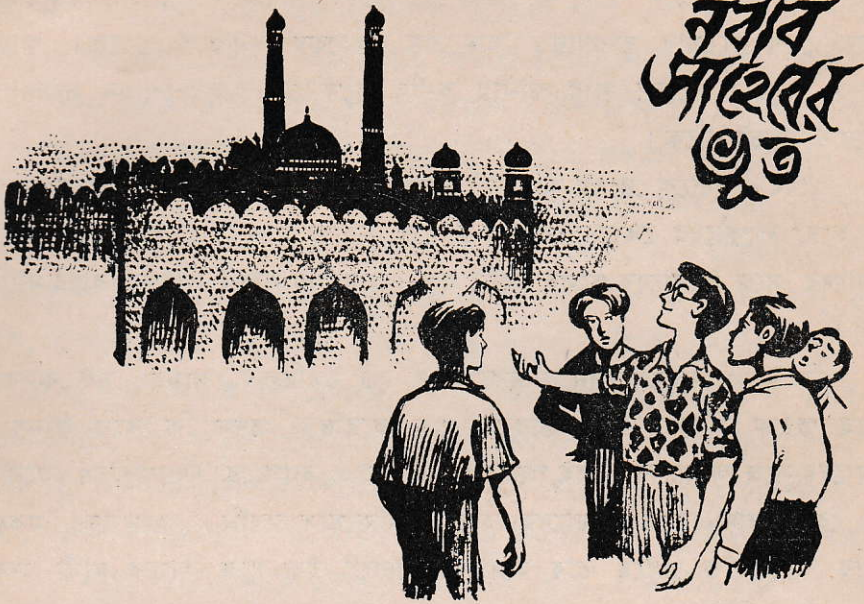
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নীলুদার ওপর আমার টান বেশী কি রাগ আর হিংসে বেশী, আমি নিজেই ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারি না।

মানুষটা বাইরে থেকে এলো আর দু'দিন যেতে না যেতে সক্কলের মন জয় করে নিল। পাড়ার ছেলেগুলো সব যেন ও একদিন আসবে সেই অপেক্ষাতেই ছিল।

আমার রাগ বা হিংসের কারণ বোঝা একটুও শক্ত নয়। এতদিন আমি যেন ছিলুম পাড়ার ছেলেদের মধ্যে কাশবনে শেয়ালরাজা। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এক সিংহ এসে হাজির। যাকে বলে জাতের সিংহ। যেমন উদার তেমনি গম্ভীর। চেহারায় তেমনি জলুস। আবার হাঁক দেয় যখন, অর্থাৎ মুখ খোলে যখন, তখন বাকী সব মুখ বোবা। ও আসার ক'টা দিনের মধ্যে দলের মধ্যে আমি যেন একেবারে 'কেউ না' হয়ে গেলাম।

আবার টানেরও একটু কারণ আছে। সত্যিকারের শৌর্যবীর্য দেখলে তার প্রতি একটু-আধটু টান কার না থাকে? টানের আরো কারণ, ওর বাড়ি গেলেই নীলুদা বেশ খাওয়ায় দাওয়ায়। মস্ত বড় লোকের ঝকঝকে ছেলে। আগ্রার ডালমুঠ, মথুরার সন্দেশ আর স্থানীয় অর্থাৎ লক্ষ্ণৌয়ের হালুয়া-শোহন্ সর্বদা তার বাড়িতে মজুতই থাকে।

প্রথম নীলুদাকে দেখেই আমরা ভেবেছিলাম আমাদের থেকে কয়েক বছরের বড় হবে, লক্ষ্ণৌয়ের কোনো কলেজ-টলেজে ভরতি হবে। পরে দেখা গেল সে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্কুলেই ভরতি হল—আমাদের সঙ্গেই সামনের বারে ম্যাট্রিক দেবে।

কি উপলক্ষে স্কুলে তখন দিনকয়েকের ছুটি চলছিল। আমরা সেই ক'দিনের মধ্যেই তাকে 'নীলুদা' বলে ডাকতে শুরু করেছি। তখন কি করে জানব সে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্কুলেই পড়বে? নীলুদা এ ব্যাপারে মুখব্যাদানও করেনি। যাই হোক দাদা বলে আমাদের কারো আফসোস হয়নি। আমাদের সকলের মাথার আধ হাত ওপরে তার মাথাটা। চোখে ইয়া পুরু কাচের দামী চশমা। আর সাজ-পোশাক? সে সাজ-পোশাক দেখলে আমাদের চোখ ঠিকরেই যেত এক-একদিন।

পরনে মখমলের মত নরম কালো বা বাদামী রংয়ের ট্রাউজার। আর গায়ে রকমারী গেঞ্জি প্যাটার্নের রোঁয়া-ওঠা জামা। কোনোটাতে সাদার ওপর হাঁসের পালকের কালচে ছোপ, কোনোটাতে জিরাফের বুটি, কোনোটাতে বাঘের ডোরা-কাটা। এই সব গেঞ্জি-জামার ভেতর দিয়ে যেন আলো ঠিকরাতো। আমরা হাঁ করে শুনতাম এই সব জামার কোনোটাই দিশি রদ্দি মাল নয়। এর কোনোটা এসেছে বিলেত থেকে, কোনোটা আমেরিকা থেকে, কোনোটা বা হনলুলু্ থেকে।

মস্ত বড় লোকের ছেলে আমাদের নীলুদা। বাপ নামজাদা সিভিল-সার্জন। দিল্লী থেকে বদলি হয়ে লক্ষ্ণৌয়ে এসেছে। নীলুদা কিন্তু বাপের কাছে দিল্লীতে থাকত না। থাকত মাসীর কাছে কলকাতায়। বাপ হুট হুট করে আজ এখানে

কাল ওখানে বদলি হচ্ছে। সেই সঙ্গে তারও স্কুল বদল চললে তো পড়ার দফা গয়া। কিন্তু এবারে তার বাবা লক্ষ্ণৌএ বদলি হয়েছে শুনে এখানেই চলে এলো। হাজার হোক নবাবের দেশ। এ জায়গার আলাদা একটা মান-মর্যাদা।

কিন্তু বড়লোকের ছেলে হলেই বা ঝকমকে পোশাক-আশাক পরলেই সকলের মন জয় করা যায় না। এর ওপর মন জয় করারও অজস্র গুণ নীলুদার ছিল। খেলাধুলো শিকার বা সাহসের কথা উঠলে দেখা যায় নীলুদার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অপরিসীম। ফুটবলের 'গোল্ড্ পাস' ক্রিকেটের 'উইকেট বোলিং', হকির 'হুকিং' সম্পর্কে নীলুদা যা বলত শুনে আমরা হাঁ। এসব এখনো চালু হয়নি নাকি, গবেষণা চলছে। চালু হলে সাড়া পড়ে যাবে। নিজে বেচারী এখন আর খেলতে পারে না, তার কারণ চোখের ওই পেল্লায় পুরু কাচের চশমা। চোখ এত খারাপ হলো কি করে? সে এক দুঃখের কাহিনী। কলকাতায় অল্-ইণ্ডিয়া ইন্টার স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলায় মস্ত একটা অঘটনই ঘটে গেল। খেলা হচ্ছিল ওর আর মাদ্রাজের পিল্লু রমণের সঙ্গে। টু-নীল্এ জিতছিল নীলুদা। হঠাৎ বিরাট জোরে একটা 'শট্' এসে লেগে গেল তার চশমায়। তখন সামান্য পাওয়ার ছিল কাচের। সেই কাচ ভেঙে সোজা চোখে বসে গেল। চোখের চিকিৎসা করতে সিভিল সার্জন বাবা তাকে সুইজারল্যাণ্ডে পর্যন্ত নিয়ে গেছে। বহু চিকিৎসার পর এখন এই অবস্থা। চশমা ছাড়া অন্ধ।

এ-সব যে গল্প কথা নয়, তা আমরা ওর বাড়িতে গেলেই টের পাই, কাচের তালাবন্ধ আলমারিতে থাকে থাকে কাপ মেডেল সাজানো।

আর সাহস? এই বয়সে এত সাহস আমরা সচরাচর দেখিনি। যাকে বলে ডাকাতে সাহস। নীলুদার ডিকশনারিতে ভীরু শব্দটা লেখা নেই। নীলুদার ভরসাতেই এখন আমরা হেডমাস্টারের নাকের ডগা দিয়ে স্কুল পালাতে পারি। কথাবার্তা যা বলার নীলুদাই সটান হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলে আসে। অন্য টিচাররা তো সব তার কাছে চুনোপুঁটি।

দল বেঁধে সাইকেলে কোথাও বেরুলে নীলুদা আমাদের লীডার। সে থাকলে আমরা যেন দিগ্‌বিজয়েও বেরুতে পারি।

● আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
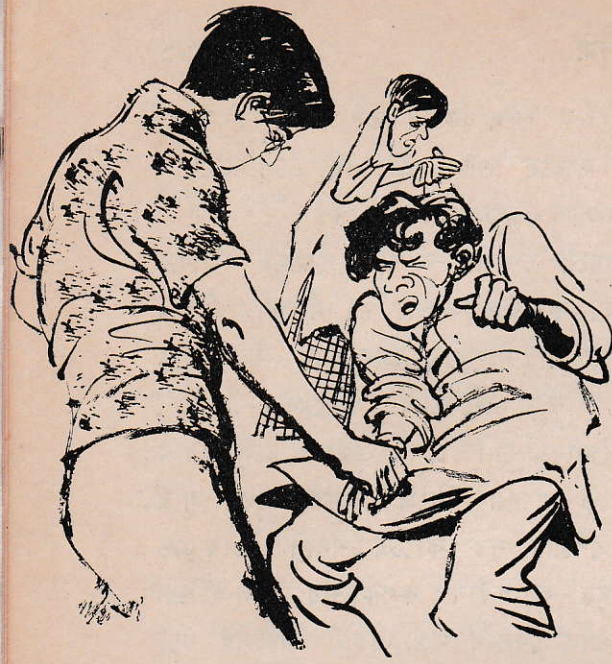
নীলুদা ওদের দু'জনকে দু'হাত ধরে সামান্য একটু চাপ দিয়েছিল।

না, নীলুদার তুলনায় আমি সত্যিই কিছুই নয়। কিন্তু প্রতিপত্তি খোয়া গেলে কার না একটু-আধটু ঈর্ষা হয়?

তিন মাস না যেতে নীলুদার সাহসের আরো নজির হাতে নাতে পেলাম আমরা। অন্য পাড়ার দুটো গুণ্ডা গোছের ছেলেকে আমরা যথাসম্ভব এড়িয়েই চলতাম। এক-জনের নাম হামিদ আর একজনের আলতাপ। বয়সে আমাদের থেকে অনেক বড়। যেমন পাজী, তেমনি বেপরোয়া। ওরাই যেন শাহেন-শা-বাদশা এখন লক্ষ্ণৌয়ের।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম নীলুদা যেন জাদুমন্ত্রে ওদের দুটোকেই ঢিট করেছে। শেষে এমন হল যেন দুটো রাগী পোষা কুকুর তার বাড়িতে বাঁধা। আমরা স্বচক্ষে ওদের নীলুদার সামনে হাত জোড় করতে দেখেছি, আর স্বকর্ণে নীলুদাকে ওদের ওস্তাদ বলে ডাকতে শুনেছি। প্রথম কি করে ওদের বশ করল আমরা নীলুদাকে জিজ্ঞাসা না করে পারিনি। শুনেছি, নীলুদা ওদের দু'জনকে দু'হাত ধরে সামান্য একটু চাপ দিয়েছিল। তাইতেই সর্বাঙ্গ পঙ্গু ওদের—যেন ইলেকট্রিসিটি পাস করে গেছল। তারপর থেকেই আর কি—

নীলুদা সর্বদা বলত, সাহসটাই সব, বুঝলি? সে-রকম সাহস থাকলে শক্তিরও রং বদলায়।

শুনে আমরা মুগ্ধ হতাম, অবাক্ হতাম, বিশ্বাস তো করতামই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ঢালা অবকাশ আমাদের। আড্ডা দিয়ে রাত

করে বাড়ি ফিরি। দল বেঁধে আমরা আড্ডা দিই। কায়সারবাগের মরিস কলেজের এ ধারের নিরিবিলি মাঠে বসে। সন্ধ্যার পরে লোকচলাচল কমে আসে ওদিকটায়। চত্বরের অদূরে মস্ত একটা এলাকার মধ্যে নবাব সাদাত আলী আর তার রানী মুরশিদ জাদীর সমাধিক্ষেত্র। পাঁচ ছ' তলা উঁচু বিরাট দুটো গম্বুজ। ভিতর দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাওয়া যায়। কিন্তু নবাবের সেই গম্বুজে কেউ দিনের আলোতেও উঠে না বড়। সকলেই জানে ওখানে প্রেত আত্মার আনাগোনা আছে। ওখানে গিয়ে এযাবৎ কত লোক যে ভয় পেয়েছে আর চাক্ষুষ ভূত দর্শন করেছে ঠিক নেই। সন্ধ্যার পর ওদিকে আর জনমানব দেখা যাবে না।

আড্ডায় সেদিন নবাব সাহেবের ভূতের প্রসঙ্গই উঠেছিল। নীলুদা হঠাৎ প্রস্তাব করল, চল একদিন ভূত দেখে আসা যাক্। এ প্রস্তাবে সহসা আমরা হকচকিয়ে গেলাম। কেউ বলল, অতটা উঠতে হাঁপ ধরে যাবে, কেউ বলল উচিত হবে না। আমি সাহস করে বললাম, কাল সকালে যাওয়া যাক, চলো—।

সকালে না, গেলে রাত্তিরেই যাব।

ব্যস্। আমার মুখে আর কথা সরল না।

আমাদের মধ্যে কে একজন হঠাৎ চ্যালেঞ্জ করে বসল, রাতে তুমি একলা যেতে পারো ?

অম্লান বদনে নীলুদা বলল, পারি, কত বাজি ?

আমরা বললাম দশ টাকা !

নীলুদার কাছে দশ টাকা কিছুই নয় জানি, কিন্তু আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলেও দশ টাকার বেশী ভাবতে পারি না।

নীলুদা বলল, বেশ তাতেই রাজী। আজ শুক্রবার, কাল শনিবারেই প্রশস্ত দিন। রাতে আমি একা গিয়ে ওই গম্বুজের চূড়ায় উঠব।

আমি বললাম, বুঝব কি করে তুমি উঠেছ ?

নীলুদা জবাব দিল, একটা মোমবাতি নিয়ে যাব'খন। তোরা এখানেই বসে থাকবি। আমি চূড়ায় উঠে মোমবাতি জ্বেলে তোদের দেখাব, তারপর সেটা সেখানে রেখে আসব।

● আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরদিন।

সন্ধ্যার পরে আমরা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছি। এক একবার মনে হচ্ছে নীলুদাকে আটকালেই ভালো হয়। কোথা দিয়ে কি বিপত্তি ঘটে—ঠিক কি। আবার ভূতের ব্যাপারে এমনই রোমাঞ্চ যে দেখতেও ইচ্ছে করে কি হয়। দুঃসাহসের এত বড় নজির লক্ষ্ণৌ শহরে কমই আছে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে সব ঢেকে গেল। তারও আধ ঘণ্টা পরে নীলুদা পান চিবুতে চিবুতে হাজির। হাতে মোমবাতি। আমাদের তখন এমন অবস্থা যে তাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম।

নীলুদা হেসে বলল, সব আছিস দেখছি। তোরা বোস তা হলে, আমি নবাব সাহেবের সমাধির চুড়োয় চেরাগ জ্বেলে দিয়ে আসি।

বলতে বলতে নীলুদা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আমরা নির্জীবের মত বসে আছি। বুকের ভেতরটা এত জোরে ঢিব ঢিব করছে যে কানে শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। অন্ধকার ফুঁড়ে দূরে সমাধির চুড়োয় মোমের আলো দেখা যাচ্ছে। আলোটা আমাদের দিকে আমাদের লক্ষ্য করেই ঘোরানো হচ্ছে! দুরুদুরু বুকে আমরা দেখলাম, সেই মোমের আলো ঢাকা কার্নিসে বসানো হল।

তারপর নীলুদার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে গেল, নীলুদার দেখা নেই কেন? তবে কি কোনো বিপদ হল!

আবারও আচমকা আঁতকেই উঠলাম আমরা—পিছন থেকে অন্ধকারে গুটিগুটি এসে বিদঘুটে একটা শব্দ করে আমাদের বিষম চমকে দিল। তারপর সে কি হাসি নীলুদার।—তোরা সব এক-একটা ভীতুর ডিম দেখছি, দুনিয়ায় এত ভয় নিয়ে কি করবি রে তোরা, অ্যাঁ?

সেই থেকে দু' তিন দিন আমাদের কেবল এই আলোচনা। দুঃসাহসের প্রতীক বটে! কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে আমি রসিকতা করেই বললাম, কাজটা কিন্তু ভালো হল না নীলুদা, শান্তির ব্যাঘাত ঘটালে নবাব সাহেবের
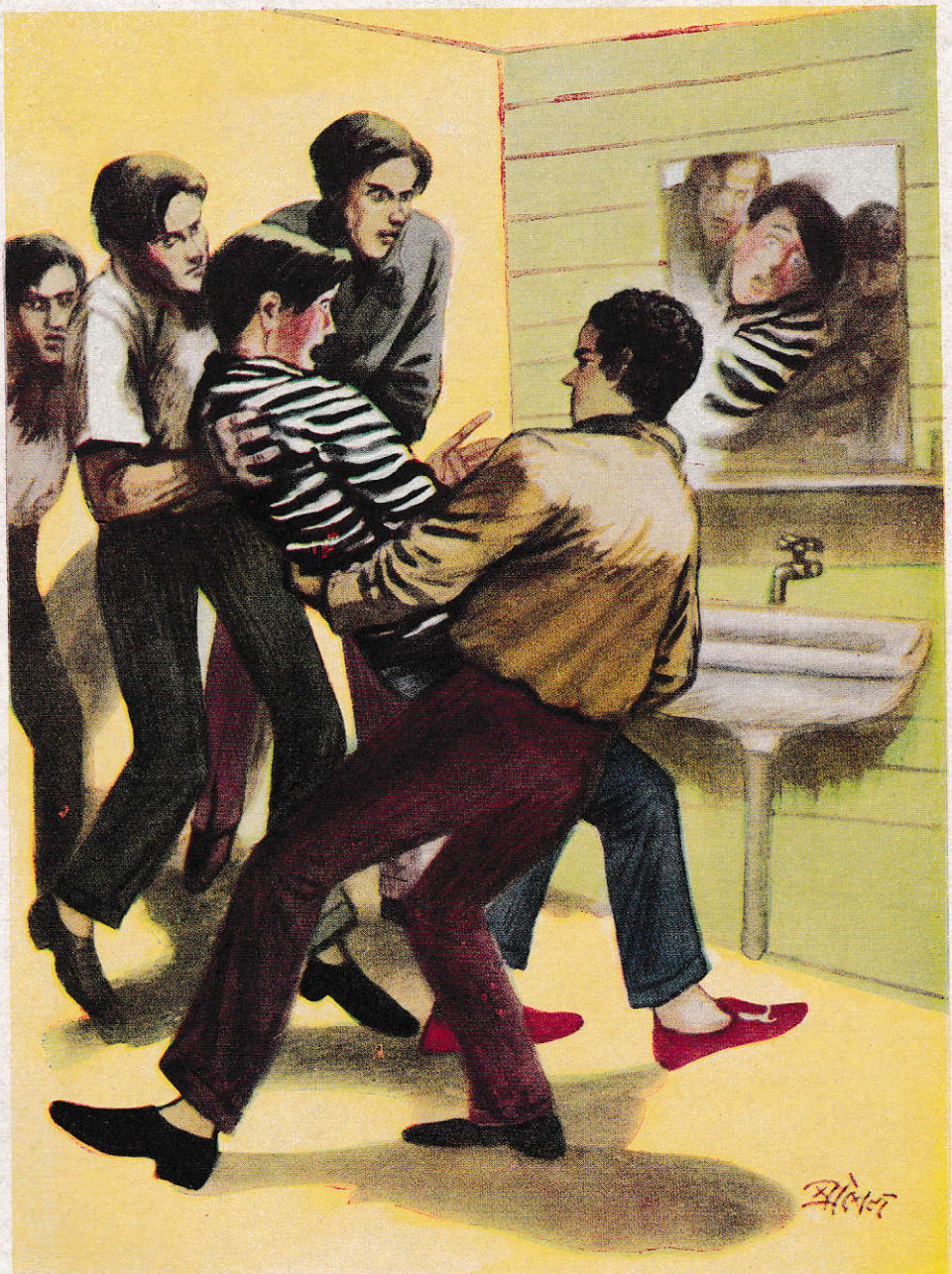
সামনের দিকে তাকিয়েই দাঁত-কপাটি লাগার দাখিল

(নবাব সাহেবের ভূত…পৃঃ ৩৯৪)

আত্মা শুনেছি অনেক কাল পর্যন্ত ভোলে না, আর যেখানে সেখানে এসে চড়াও করে।

নীলুদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।—তোকে কে বলল ?

—এই রকমই যেন শুনেছিলাম।

নীলুদা অন্যমনস্কের মত কি ভাবতে লাগল। বুঝলাম নীলুদার আজ 'মুড্' নেই।

এর তিন-চার দিন পরেই বেড়াবার এক মওকা পেয়ে গেলাম আমরা। যেমন তেমন বেড়ানো নয়—লক্ষ্ণৌ থেকে একেবারে দিল্লী! আমাদের সমীরের দাদার বিয়ে। বিয়ে দিল্লীতে। সমীররাও বেশ অবস্থাপন্ন। সমীরের বাবা তার ছয় সাতটি অন্তরঙ্গ বন্ধুকে সেকেণ্ড ক্লাসে দিল্লী যাতায়াতের খরচা দিতে রাজী হয়েছে।

শুনে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। নীলুদাসহ সদলবলে আমরা যাব।

সমীর তার বাবার সঙ্গে আগেই দিল্লী চলে গেল। আমরা রওনা হব বিয়ের আগের দিন রাতের ট্রেনে। সকালে দিল্লী। তারপর আনন্দের হাট।

সেই দিন এলো। নীলুদা হঠাৎ বলে বসল, সেকেণ্ড ক্লাসে নয়, ফার্স্ট ক্লাসে যাব। বাড়তি ভাড়া যা লাগে সব আমি দেব।

শুনে আনন্দে আত্মহারা আমরা।

রাতে খেয়ে দেয়ে আমরা নীলুদার বাড়িতে এলাম। সেই রকমই কথা ছিল। সেখান থেকে তাদের গাড়িতে স্টেশনে আসব।

নীলুদার এই দিনের সাজ দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গেল। পরনে কালো প্যাণ্ট, গায়ে তেমনি কালো কুচকুচে তোয়ালে গেঞ্জি, তাতে ধপধপে সাদা জেব্রা-স্ট্রাইপ। কালোর ওপর সেই সাদা ডোরায় নীলুদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

যাক, দুর্গা বলে বেরুনো গেল। যথা সময়ে ট্রেন ছাড়ল। ফার্স্ট ক্লাসে হই-হুল্লোড় করে আমরা প্রায় রাত একটা পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম। তারপর ঘুমে চোখ ভেঙে আসতে লাগল।

যে যার শুয়ে পড়লাম।

নীলুদার এই দিনের সাজ দেখে আমাদের চোখ ঠিকরে গেল। [পৃঃ ৩৯৩

চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা বিকট আর্তনাদে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। লাফিয়ে উঠে বসলাম আমরা। কি হল ? সকলেই একসঙ্গে স্বপ্ন দেখলাম আমরা! ঘুম চোখে কিছুই ঠাওর করতে পারছি না।

হঠাৎ দ্বিতীয় দফা চমক, নীলুদা কোথায় ? তার বেড খালি কেন ?

পরক্ষণে বাথরুমে গোঁ-গোঁ শব্দ। ছুটে গেলাম আমরা। তারপরেই যা দেখলাম, দু' চক্ষু স্থির আমাদের।

বাথরুমের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে নীলুদা, ফরসা মুখ নীলবর্ণ, গোঁ-গোঁ শব্দ করছে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে।

তার অবস্থা দেখে আমাদেরই কাঁপুনি ধরেছে। ধরাধরি করে টেনে দাঁড় করালাম তাকে। আমাদের দেখে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালো নীলুদা, পরক্ষণে আবার সামনের দিকে তাকিয়েই দাঁত-কপাটি লাগার দাখিল। আমাদের আঁকড়ে ধরে গোঁ-গোঁ করে বলে উঠল, নবাব সাহেবের ভূত! সাদা পাঁজর!

সবিস্ময়ে আমরা সামনের দিকে চেয়েই হতভম্ব। সামনের ছোট আয়নায়

নীলুদারই তো মূর্তি দেখছি, কালো গেঞ্জির ওপর মোটা সাদা জেব্রা স্ট্রাইপগুলো দেখা যাচ্ছে!

তক্ষুনি ব্যাপারটা মাথায় এলো আমার। নীলুদার চোখে চশমা নেই—চশমা ছাড়া সে চোখে একেবারে আবছা দেখে। দৌড়ে গিয়ে তার চশমাটা এনে চোখে পরিয়ে দিলাম।

তারপরে ?

তারপরে আর বেশী লিখে কাজ নেই। ব্যাপারখানা সকলেই বুঝেছে। মাঝরাতে উঠে চশমা ছাড়াই বাথরুমে গেছল নীলুদা। তার ওপর ঘুম-চোখ। আয়নায় কুচকুচে কালো জামার ওপর তাই জেব্রা-স্ট্রাইপের ধপধপে সাদা মোটা ডোরাগুলোই শুধু চোখে পড়েছে তার, আর তাতেই এই বিপত্তি।

দিল্লীতে পা দিয়েই নীলুদার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়ল।

বিয়ে বাড়ি ছেড়ে ফেরার সময়ও আর তার দেখা মিলল না। ক'দিন বাদে লক্ষ্ণৌ এসে তার বাড়িতে খবর নিয়ে শুনি, দিল্লী থেকে ক'দিন আগেই ফিরে এসে নীলুদা কলকাতায় মাসীর বাড়ি চলে গেছে। সেখানে কলেজে পড়বে।

আরো দিন কয়েক পরের কথা। আমরা বন্ধুরা নীলুদার প্রসঙ্গ নিয়েই জটলা করছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ সেই দুই গুণ্ডা—হামিদ আর আলতাপ আমাদের সামনে এসে হাজির। একজন রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, নীলুবাবু কোথায় ?

আমরা জবাব দিলাম, তাকে তো আর পাবে না, কেন বলো তো ?

বিরসমুখে ওরা বলল, আমাদের কিছু-কিছু মেহনতের টাকা এখনো পেতে বাকী—আর সে এখানে আসবেই না ?

বিমূঢ় মুখে সকলে মাথা নাড়ল।

কি ভেবে আমি ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, নবাব সাহেবের সমাধির চুড়োয় চেরাগ জেলে রেখে আসার টাকাও এখনো পাওনি বোধহয় ?

আরো রাগত মুখে ওরা জবাব দিল, না!

———

ছটি প্রাণের দাম

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মহাভারতে আছে, পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার মতলবে কৌরবরা কৌশল করে তাদের বারনাবত বলে এক ছোট শহরে পাঠান। জায়গাটি নাকি খুব মনোরম। কী একটা মেলাও যাচ্ছিল—পাঠাবার ছুতোরও অভাব হল না। পাণ্ডবরা অত বুঝতে পারেন নি, তাঁরা সহজেই রাজী হলেন। তখন দুর্যোধন পুরোচন বলে এক কর্মচারীকে আগে পাঠিয়ে ধুনো-গালা-তেল-শন প্রভৃতি দিয়ে একটা বিরাট চকমিলানো বাড়ি তৈরি করালেন। তার বাইরের দিকে কোন জানলা কি দরজা রইল না, বাড়ির মধ্যে ঢোকবার একটিমাত্র প্রবেশপথ বাদে। ঘরের জানলা-দরজা সব ভেতর দিকে, উঠোন-দালান সবই ভেতরে। তখন বেশির ভাগ বাড়ি ঐ ভাবেই তৈরী হত। পশ্চিম অঞ্চলে এখনও এইভাবে তৈরী পুরনো বাড়ি অনেক দেখা যায়। শত্রুর ভয় তো ছিলই, তা ছাড়াও শীতে দারুণ হিম আর গ্রীষ্মকালে গরম বাতাস ঢোকার ভয়ে কেউ বাইরের দিকে জানলা রাখত না।

পাণ্ডবদের কয়েকদিন অন্য বাড়িতে রেখে পুরোচন পাকাপাকিভাবে এই বাড়িতে এনে তুলল এবং দিনরাত চোখে চোখে রেখে দিল। রাত্রে পাহারা দেবার নামে সদর-দরজা আগলে শুত—যাতে তাকে না-জাগিয়ে কেউ না বাইরে যেতে পারে। পাণ্ডবরা অবশ্য বাড়িতে এসে দেওয়ালের গন্ধেই টের পেয়েছিলেন যে এটা জতুগৃহ, সহজে আগুন লাগে এমন উপকরণে তৈরী। তাছাড়া বিদুরও তাঁদের আগে থাকতে ইঙ্গিতে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি পরে একটা লোকও পাঠিয়ে দিলেন, সে দিনে ঘাপটি মেরে থাকত আর রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মেঝের মাটি কেটে সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ত। দেখতে দেখতে বহুদূর পথ তৈরী হয়ে গেল—যাতে অনেকটা দূরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উঠতে পারেন এঁরা।

পালাবার ব্যবস্থা তো হল, কিন্তু যুধিষ্ঠির ভেবে দেখলেন যে তাঁরা যদি এমনি পালান তো পুরোচন তখন হয়ত পিছুপিছু লোকজন নিয়ে ধাওয়া করে সোজাসুজি মেরে ফেলবে। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুযোগ একটা এসেও গেল। একদিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে শহরের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁরা। ইতর-ভদ্র সব ধরনের লোকই এল ভোজ খেতে। এক নিষাদী মানে নিষাদ বা ব্যাধ জাতীয় মেয়েছেলেও তার পাঁচটি ছেলে নিয়ে খেতে এসেছিল। ভোজে ভাল ভাল খাবারই শুধু নয়—যারা নীচু জাতের লোক, নিষাদ বা চণ্ডাল, তাদের জন্যে মদেরও ব্যবস্থা ছিল। এত ভাল খাবার আর সেই সঙ্গে এমন অঢেল মদ অনেকদিন কপালে জোটে নি। নিষাদী আর তার ছেলেগুলো আকণ্ঠ খেল বসে বসে, ফলে নেশার চোটে আর বাড়ি ফিরতে পারল না, সেইখানেই দাওয়ায় পড়ে ঘুমোতে লাগল। পাণ্ডবরা দেখলেন এ-ই উত্তম সুযোগ। তাঁরা নিজেরাই বাড়িটার চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে পড়লেন এবং রাতারাতি বহুদূর চলে গেলেন।

বাড়ির মধ্যে যারা শুয়ে ছিল—নিষাদী, তার পাঁচ ছেলে আর পুরোচন—সবাই সে বেড়া-আগুনে পুড়ে মল। নেশা করার ফল হাতে হাতে মিলল। পরের দিন সকালে আগুন নিভলে গ্রামবাসীরা এসে সেই পোড়া দেহগুলো দেখে ভাবল পাণ্ডবরাই পুড়ে মরেছে, সেইসঙ্গে পাজী পুরোচনটাও। ‘বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল’ এই বলে পাণ্ডবদের জন্যে শোক করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল তারা। কৌরবরাও এই খবর পেয়ে তাঁদের কাঁটা পাণ্ডবরা সরে গেল ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন।

● গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এই পর্যন্ত মহাভারতে আছে। ঐ নিষাদী কে, কী তার নাম, তার আর কেউ ছিল কি না—এসব কোন কথাই নেই। যুধিষ্ঠির—যাঁকে ধর্মরাজ বলা হয়, যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি বলে যাঁর রথের চাকা মাটি থেকে উঠে থাকত—তিনিই বা কি করে অম্লানবদনে নিজের সুবিধার জন্য নিরপরাধ ছটা মানুষকে পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করলেন—তাও মহাভারতে লেখা নেই।

তা মহাভারতে লেখা না থাক, আমিই আজ ঐ নিষাদীদের গল্প বলব। তোমাদের ইচ্ছে হয় বিশ্বাস ক'রো—না হয় ক'রো না।

যে নিষাদীটি তার পাঁচ ছেলে নিয়ে পুড়ে মারা গেল তার নিষাদ স্বামী—ধরো তার নাম নমুচি—তখন বারনাবতে ছিল না। পাহাড়ের দিকে শিকার করতে গিয়েছিল। এমন প্রায়ই যেত, সাত আট দশ দিন কাটিয়ে ফিরত। এবারেও জতুগৃহদাহের আট দিন পরে যথারীতি মরা ছাগল-হরিণের চামড়ার বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে তার কুটির শূন্য, হা-হা করছে খালি পড়ে—না আছে তার বউ আর না তার পাঁচ ছেলে।

তবু তখনও অত কিছু ভাবে নি, এমনভাবে ছেলেদের নিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ওর বউয়ের স্বভাব। হয়ত গ্রামান্তরে কোন ভোজের খবর পেয়ে ছেলেপিলে নিয়ে খেতে গেছে—কাল-পরশু ফিরবে। কিন্তু এমনি কাল-পরশু করতে করতে যখন বেশ কয়েকদিন কেটে গেল তবুও নিষাদী ফিরল না—তখন একটু ভাবনায় পড়ল। এদিক ওদিক, পাড়ায়, পাড়ার বাইরে—যতটা পারল খোঁজখবর করল—কেউই কিছু বলতে পারল না বিশেষ। সে রাজাদের ওখানে ভোজে গিয়েছিল এটা অনেকেই দেখেছে, তারপর কী হল তা কেউই জানে না।

তবে কি ঐখানেই পুড়ে মরেছে?—নমুচির একথাও মনে হল একবার।

কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ওখানে তো পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, দেবী কুন্তী আর সেই দুরাত্মা পুরোচন ছাড়া কারও অস্থি পাওয়া যায় নি!

অনেক ভাবল নমুচি, অনেক খুঁজল, অনেক কান্নাকাটি করল। বউয়ের জন্যে তত না—ছেলেগুলোর জন্যেই তার শোক বেশী। বিয়ে আর একটা ইচ্ছে করলেই করতে পারে,—কিন্তু যে ছেলেগুলো মারা গেল তাদের পাওয়া যাবে না আর। স্বাস্থ্যবান, ডাগর ছেলে। তারা থাকলে ওর ব্যবসার সহায় হত। অত্যধিক মায়ায় পড়েই পাহাড়ে নিয়ে যেত না—সেইটেই বুঝি কাল হল! যদি বড় দুটোকেও সঙ্গে নিয়ে যেত বুদ্ধি করে! অনেক বেশী মাল ঘরে আসত—সে ছেলে দুটোও চোখের ওপর থাকত, এমন করে সকলকে হারাতে হত না।

ছেলেদের শোকে ক্রমশঃ পাগলের মতো হয়ে উঠল নমুচি, কাজকারবার জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ঘরে গুম্ হয়ে বসে থাকত শুধু—পাড়ার লোক কেউ দয়া করে খেতে দিলে খেত—নইলে উপোস করেই পড়ে থাকত। শেষে তাও ভাল লাগল না আর—একদিন 'দুত্তোর' বলে ঘর দোর সব ফেলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ল। তবে—বেরোবার আগে কী জানি কি মনে হল—সেই পোড়া জতুগৃহের ছাইয়ের মধ্যে খুঁজে-খুঁজে কয়েকটা হাড়ের টুকরো—যা তখনও একেবারে পুড়ে কয়লা হয়ে যায় নি—সংগ্রহ করে পিঠের চামড়ায় তৈরী তূণের মধ্যে পুরে নিল। কদিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে ছাইয়ের মধ্যে থেকে সাদা হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছিল—ছাইয়ের মধ্যেও দেখতে কোন অসুবিধা হল না।

পিঠের চামড়ায় তৈরী তূণের মধ্যে পুরে নিল।

এর পর এদেশ ওদেশ বহুদেশ ঘুরে অনেকদিন পরে একসময় পাঞ্চাল দেশে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে দেখল মহাসমারোহ ধুমধাম চলেছে—রাজধানীতে উৎসবের হুল্লোড় চলেছে। কী ব্যাপার? শুনল রাজা দ্রুপদের মেয়ের বিয়ে—কদিন আগে স্বয়ংবর হয়ে গেছে, এইবার অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রমশঃ সব খবরই শুনল নমুচি। পাণ্ডবরা মরেন নি, সুড়ঙ্গপথে জতুগৃহ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন—অর্জুন স্বয়ংবরের পণে জিতে দ্রৌপদীকে পেয়েছেন—কিন্তু পাহাড়ীদের মতো পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। এত ক'রেও পাণ্ডবদের মারা যায় নি, বরং তাঁদের বদ মতলবের কথাটা প্রচার হয়ে গেল দেখে কৌরবরা লজ্জা পেয়েছেন, তাঁরাও নাকি লোক পাঠিয়ে একটা মিটমাট করে নিয়েছেন,

● গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পাণ্ডবদের আদ্ধেকটা রাজ্য ছেড়ে দেবেন, আর একটা রাজধানী তৈরি করে পাণ্ডবরা সেখানে রাজত্ব করবেন।

পাণ্ডবরা মরেন নি। নিজেরাই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেছেন। তারপর আবার লোক দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখটা মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছেন ওঁরা—যাতে পালাবার কথা না কেউ টের পায়।

তাহলে সে অস্থিগুলো কার ?

ছটি মানুষের অস্থি ?

একটি মেয়েছেলে আর পাঁচটি ছেলের পোড়া হাড় !

কারা অমন বেঘোরে পুড়ে মারা গেল ? কে তারা ? কি পরিচয় ?

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে উত্তর পেয়ে গেল নমুচি। নিশ্চয়ই তার বউ আর পাঁচ ছেলে।

কিছুই আর বুঝতে বাকী থাকে না নমুচির। পেট ভরে খেতে পাবে ভেবে অনাহূতই গিয়েছিল ভোজ খেতে। সেখানে বিনাপয়সার মদ পেয়ে তাও খুব গিলেছে, ছেলেগুলোকেও গিলিয়েছে! তারপর বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়ত ইচ্ছে করেই বেশী বেশী মদ খাইয়েছে পাণ্ডবরা, যাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। কত দিন সাবধান করেছে সে বউকে—মদ খাওয়ার বিপদ বুঝিয়েছে—শোনে নি। এবার তার ফল পেল। পাণ্ডবরা ওদের নেশার সুযোগ নিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়েছে—নিষাদী আর তার পাঁচ ছেলেকে ইচ্ছে করে পুড়িয়ে মেরেছে—যাতে সবাই মনে করে যে, কুন্তী আর পাণ্ডবরাই মারা গেছে পুরোচনের দেওয়া আগুনে।

নিশ্চয়ই এই।

যতই ভাবে নমুচি, সব দিক তলিয়ে চিন্তা করে—ততই মনে হয় যে ঠিক এমনিটাই ঘটেছিল। কৌরবরা না পিছু পিছু তাড়া করে—এই ভয়ে তার বউ আর ছেলেকে মেরেছে পাণ্ডবরা।

ভাবতে ভাবতে এতদিনের দুঃখ আবার যেন নতুন করে জেগে ওঠে মনের মধ্যে। আহা, বাছারা না জানি কত কষ্টই পেয়েছে, নেশা আর ঘুমের মধ্যে থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠে বিহ্বলভাবে ছুটোছুটি করেছে নিশ্চয়, বাঁচবার জন্যে, সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরোবার জন্যে কত চেষ্টা করেছে—চেঁচিয়েছে কেঁদেছে—তাদের সে কান্না কেউ শোনে নি, কেউ তাদের বাঁচাতে ছুটে আসে নি !…

শেষ পর্যন্ত নমুচি মরীয়া হয়ে উঠে রাজপ্রাসাদের দিকে গেল। এর একটা হেস্তনেস্ত করবে সে, জবাব চাইবে যুধিষ্ঠিরের কাছে, কেন এই নিষ্ঠুর কাজ করলেন তিনি।

অবশ্য মুখে বলা যত সহজ—রাজারাজড়ার কাছে পৌঁছনো তত সহজ নয়। বিশেষতঃ উৎসবের বাড়ি—নমুচির সেই ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, রুক্ষ জটা-পাকানো চুল আর পাগলের মতো চোখের দৃষ্টি দেখে দারোয়ান সান্ত্রীরা গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। যতবারই চেষ্টা করে—ততবারই এক ফল হয়। বারবার ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়।

কিন্তু নমুচিও ছাড়বার পাত্র নয়।

সে শেষে একটা মতলব বার করল মাথা থেকে।

বিবাহের পর বর-কনেরা যখন দ্রুপদরাজার প্রাসাদ থেকে বেরোচ্ছেন—চারিদিকে প্রজারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রাজার জামাইদের জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর ফুল ছুঁড়ছে—সেই ভিড়ে গা ঢেলে নমুচি এসে দাঁড়াল একেবারে পথের ধারে। পাণ্ডবরা একে একে বেরিয়ে এলেন ঘোড়ায় চেপে, পিছনে চতুর্দোলে দ্রৌপদী। নমুচি সকলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে একেবারে যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে দাঁড়াল। 'দাঁড়াও রাজা, আমার কথার জবাব দিয়ে তবে বউ নিয়ে যেতে পাবে, নইলে পথ ছাড়ব না। আমার নালিশ শুনে যাও যাবার আগে!'

যথারীতি রাজবাড়ির রক্ষীরা ওকে মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল পথ থেকে, যুধিষ্ঠিরই নিষেধ করলেন। বললেন, 'কে তুমি, কী তোমার নালিশ বলো? আর কার নামেই বা নালিশ?'

নমুচি বলল, 'নালিশ আমার পাণ্ডবদের নামে। তোমার নামে। তুমি না রাজা, তুমি না ধার্মিক—তোমাকে না লোকে ধর্মরাজ বলে? তবে তুমি কেন আমার নিরাপরাধ স্ত্রী আর পাঁচটা বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারলে, তারা কী দোষ করেছিল? ভাল খেতে পাবে এই লোভে তোমার দোরে গিয়েছিল বলে? তোমরা এমনিই একদিন পালাতে পারতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, পুরোচনটাকে মারলে কোন দোষ হ'ত না—আমার বউ আর পাঁচটা ছেলেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারলে কেন রাজা? এর কি বিচার—কী শাস্তি তুমিই ঠিক করো এবার!'

বেশ চেঁচিয়েই বলেছিল নমুচি, সকলকার কানেই গিয়েছিল কথাটা। শুনে পাণ্ডবরা সকলেই কিছুক্ষণের জন্য মাথা হেঁট করলেন—যুধিষ্ঠির সুদ্ধ। তবে তিনিই

প্রথম মাথা তুললেন, আবার শান্তকণ্ঠে বললেন, 'নিষাদ, আত্মরক্ষার জন্যে সব কিছুই করা যায়—সেক্ষেত্রে কোন কাজই অন্যায় বা গর্হিত বলে ধরা হয় না। শাস্ত্রে একথা লেখা আছে। আমরাও আত্মরক্ষার জন্যে তোমার স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়েছি। তাছাড়া, ভেবে ছাখো—রাজার জন্যে প্রাণ দেওয়া প্রজা মাত্রেরই কর্তব্য, সেদিক দিয়ে ধরলে তোমার বউ ছেলেরা তাদের কর্তব্যই পালন করেছে।'

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, 'যাই হোক, তোমার এখনও তেমন বয়স হয় নি। তুমি আর একটি বিবাহ করে সংসার পাতো, তোমার কল্যাণ হোক, বরং আমি আমার অমাত্যদের নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে কিছু অর্থ দেবে, যাতে তুমি আবার সুবিধামতো ঘরবাড়ি করে সংসার পেতে বসতে পারো।'

নমুচি ঘৃণার সঙ্গে উত্তর দিল, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে আমার ছেলেদের রক্তের দাম নেওয়া হবে। ছেলের রক্ত বেচে না-ই বা খেলাম। ও টাকা আমার কাছে বিষ্ঠার সমান। থাক্—তুমি বউ নিয়ে ঘরে যাও, আমার বিয়ের কথা ভাবতে হবে না তোমাকে। তুমি রাজা, ধর্মরাজ,—তোমার কাছে বিচার চেয়েছিলাম, তুমি নিজের সুবিধামতো বিচার করলে। এ নালিশ আমার তোলা রইল। রাজার ওপরেও একজন রাজা আছেন—ভগবান, দেখব তিনি আমার নালিশ শোনেন কিনা, সুবিচার করেন কিনা!'

এই বলে সে পথ ছেড়ে দিয়ে আবার ভিড়ে মিশে গেল।

এরপর নমুচি এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। সেই যে হাড়গুলো নিজের তূণে রেখেছিল—এখন তো বোঝাই গেল যে তার স্ত্রী আর ছেলেদেরই হাড়—সেগুলো কিন্তু গঙ্গায় দেওয়া বা শ্রাদ্ধ তর্পণের ব্যবস্থা করা, কিছুই করল না। বরং হাড়গুলো ঘষে ঘষে আরও সাফ করে, কয়েকটা পাশা তৈরি করল। তারপর সেইগুলো নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে একমনে তপস্যা করতে লাগল। ভগবানকে ডাকল না—পিশাচের সাধনা করতে লাগল, যাতে কোন পিশাচ তার বশ হয়।

তারপর—সম্ভবতঃ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেই আগের লোকালয়ে ফিরে এল। সাধারণ কোন লোকালয় নয়—রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এসে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি জাত-ব্যবসা ফেঁদে বসল, হরিণ শিকার করে এনে মাংস বিক্রী করতে লাগল, একটা দোকানও দিল মাংসের।

প্রাসাদের কাছাকাছি থাকে, রাজপ্রাসাদের অনেক লোকই তার দোকানে আসে মাংস কিনতে। কোন কোন দিন রাজার রান্নাশালা থেকেও কিনে নিয়ে যায়। তাদের মুখে নানা গল্প শোনে নমুচি, প্রাসাদের অনেক কাহিনী। পাণ্ডবদের কে কেমন, দ্রৌপদী কেমন মানুষ, পাণ্ডবদের অন্য স্ত্রীরা কেমন—শালাসম্বন্ধী কুটুম্ব—অনেকের কথাই কানে আসে। জ্ঞাতিদের ঈর্ষা, সে ঈর্ষার আগুনে কারা ঘি ঢালে—কর্ণ শকুনি—তাদের কথাও বলে যায় কোন কোন লোক। দাসীচাকরদের কোন কথাই জানতে বাকী থাকে না—কৌশলে নমুচি তাদের কাছ থেকে সব কথা আদায় করে নেয়।

ক্রমে ময়দানব এসে নতুন সভাগৃহ তৈরি করল, রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হল, দেশবিদেশ থেকে কত রাজামহারাজা এলেন, তাঁদের শিবিরের কানাত পড়ল চারিদিকে—লোকলস্করে গিজগিজ করতে লাগল রাজধানী, নমুচির মাংসের কারবার চালানোই দায় হয়ে পড়ল। চাহিদা অনেক কিন্তু মাল নেই—আশপাশের বনজঙ্গল অনেকদিন আগেই মৃগশূন্য হয়ে গেছে। এত লোক ক্রমাগত খেতে থাকলে আর জঙ্গলে হরিণ ছাগল থাকে কতদিন?

যাই হোক—কারবার চলুক আর না চলুক, মাংসের যতই অভাব হোক, নমুচির খবরের কোন অভাব রইল না। অতি গোপন কথাও কানে আসতে লাগল তার। কৌরবদের কি দুর্দশা হয়েছে নতুন স্ফটিকে তৈরী সভাগৃহে এসে, পদে পদে কী লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে, তার ফলে দুর্যোধন যে দিনরাত লাঠির-খোঁচা-খাওয়া সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছেন—আর তাঁকে অনবরত তাতিয়ে যাচ্ছেন শকুনি—সব খবরই নমুচিকে শুনিয়ে যেতে লাগল প্রাসাদের দাসী-চাকররা।

এর মধ্যে কৌরবদের কয়েকটি চাকরকেও বাগিয়ে নিয়েছিল সে, তাদের কাছ থেকে ওপক্ষের পরামর্শও শোনার কোন অসুবিধা হল না। বরং দেখা গেল এখন ওদের খবরেই নমুচির উৎসাহ বেশী। যজ্ঞ শেষ হতে কৌরবরা যখন হস্তিনায় ফিরে গেলেন সেও কয়েকদিনের জন্যে শিকারে যাবার নাম করে হস্তিনায় এসে আড্ডা জমাল। এবং সেইখান থেকেই খবর পেল—শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন বিদুরকে পাঠিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নিমন্ত্রণ জানাতে। আরও খবর পাওয়া গেল, যুধিষ্ঠিরের নাকি পাশাখেলার শখ খুব—কিন্তু তেমন শিক্ষা নেই, শকুনি অত্যন্ত ধূর্ত, দুর্যোধনের হয়ে তিনি-ই পাশা খেলবেন—এবং পাণ্ডবদের সব সম্পত্তি জিতে নেবেন—এই আশা কৌরবদের।

● গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এই সংবাদের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল নমুচি। সে প্রাসাদের একটি ভৃত্যকে পাঁচটি নিষ্ক বা মোহর ঘুষ দিয়ে নিভৃতে শকুনির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল। সেই ভৃত্যটি গিয়ে বলল, পাণ্ডবদের জব্দ করা যেতে পারে যে উপায়ে—এমন গোপন কথা বলতে চায় লোকটি, এই জন্যেই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এতদূর এসেছে।

শকুনি ওর বেশভূষা দেখে একটু বিরক্তই হলেন।

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী চাই বাপু তোমার? তোমার কাছে এমন কোন জরুরী খবর থাকবে বলে তো মনে হয় না। কী মতলবে এসেছ খুলে বলো দিকি?'

নমুচি দূর থেকে তাঁকে নমস্কার করে নিজের কাহিনী খুলে বলল। বলল, 'প্রতিহিংসা ছাড়া আমার জীবনে এখন আর কোন লক্ষ্য নেই। সেই উদ্দেশ্যেই আমি এক চণ্ডালবালক বধ করে তার মৃতদেহের উপর বসে সাধনা করে পিশাচ সিদ্ধি লাভ করেছি। কথা আছে আমি স্মরণ করলেই যে কোন সময়ে পিশাচ একবার এসে আমার প্রিয় কার্য সমাধা করে যাবে। পাণ্ডবদের বধ করার কথা বলেছিলাম তাতে সে বলেছে—পাণ্ডবরা দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত—তাদের ওপর ওর কোন জারিজুরি খাটবে না। সেই জন্যেই আমি সুযোগের অপেক্ষা করছি এতকাল। শুনলাম আপনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ডেকেছেন তাদের সর্বস্ব অপহরণের জন্যে—আমি আপনাকে এই কয়টি পাশা দিয়ে যেতে চাই। আমার ছেলেদের হাড়ে তৈরী এ পাশা, আমার কথায় পিশাচ এর মধ্যে ভর করবে—আপনি যেমন করেই খেলুন—নিশ্চয় জিতবেন।'

শকুনি ধূর্ত লোক। তিনি সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'তুমি যে সত্যি কথাই বলছ তা আমি বুঝব কি করে? তাছাড়া—আমি সর্বস্ব অপহরণের জন্যে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় ডেকেছি তাই বা কে বলল? খেলার শখ হয়েছে তাই ডেকেছি। আর পাশাখেলা আমি ভালই জানি—তোমার ও পিশাচে-পাওয়া পাশায় কোন দরকার নেই।'

নমুচি এবার নিজমূর্তি ধরল। বলল, 'ছাখো ঠাকুর, বেশী চালাকি করো না। তোমার মতলব জানতে আমার বাকী নেই। আমি যে সত্যি কথা বলছি—তা যে-কোন দিব্যি গেলে বলতে পারি, তাও বিশ্বাস না হয় আমাকে ধরে কারাগারে বেঁধে রাখো, মিথ্যে প্রমাণ হলে আমাকে কেটে ফেলো। আর নিজের ওপর অত বিশ্বাস রেখো না, যুধিষ্ঠির ভাল খেলতে জানে না এটা ঠিক—কিন্তু সে নিত্য অভ্যাস করে। রোজ এক জায়গায় জল পড়লে পাথর ক্ষয়ে যায়—নিত্য অভ্যাসে তার হাত একটুও

পাকবে না—তা সম্ভব নয়। কেন মিছিমিছি ঝুঁকি নেবে? আমার এই পাশা তুমি ফেলে ছাখো—যেমন হুকুম করবে তেমনি পড়বে।'

কথাগুলোয় যে যুক্তি আছে তা মানতে হল শকুনিকে। এবার তিনি ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন লোকটাকে; পাগলের মতো চেহারা—কিন্তু পাগল নয়। মিথ্যা কথা বলছে বলেও বোধ হল না। তখন তিনি পাশাগুলো ওকে মাটিতে রাখতে বলে, নিজে তুলে নিয়ে এমনি চেলে দেখলেন, ঠিকঠিক হুকুম মতোই পড়ল। তারপর খুশী হয়ে পাশাগুলো নিজের বটুয়াতে পুরে কয়েকটি নিষ্ক পুরস্কার দিতে গেলেন।

নমুচি কিন্তু এতখানি জিভ কেটে পিছিয়ে সরে গেল, হাতজোড় করে বলল, 'মাপ করবেন, ছেলেদের অস্থির দাম নিতে পারব না। পাণ্ডবদের সর্বনাশ হলেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে। আপনার কাজ শেষ হলে বরং—যদি সম্ভব হয়, পাশাগুলো কোন জলাশয়ে ফেলে দেবেন, গঙ্গায় দিলে আরও ভাল হয়।'

ছাখো ঠাকুর, বেশী চালাকি করো না। [পৃঃ ৪০৪

এর পরে যা ঘটল তা সবাই জানে। নমুচিও ভিড়ে লুকিয়ে থেকে সব দেখল নিজের চোখে। পাণ্ডবরা সর্বস্ব হেরে কৌরবদের দাস হলেন, দ্রৌপদীকে সুদ্ধ প্রকাশ্য সভায় এনে লাঞ্ছনা করল কৌরবরা, আবার সেই দ্রৌপদীর কথাতেই ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের সব ফিরিয়ে দিলেন; আর একবার পাশা খেলে কৌরবরা ওঁদের তেরো বছরের জন্যে বনে পাঠালেন, বারো বছর এমনি বনবাস, এক বছর অজ্ঞাতবাস। সবই দেখল সে, ওর

সামনে দিয়ে বনবাসে যাত্রা করলেন পাণ্ডবরা, যুধিষ্ঠির মুখে কাপড় চাপা দিয়ে গেলেন, দ্রৌপদী গেলেন নিজের চুলে মুখ ঢেকে—খালি পায়ে একবস্ত্রে হেঁটে বনে গেলেন সকলে। তবু কিন্তু নমুচির তৃপ্তি হল না। এত কাণ্ড করে এ কী হল? বনে গেল বটে—তবে বেশ সগৌরবেই তো গেল। প্রজারা সব হায় হায় করছে, কত লোক ওদের সঙ্গে সঙ্গে বন পর্যন্ত গেল, তাছাড়া সবাই একসঙ্গে থাকবে যখন—এমন আর কী দুঃখ বোধ করবে! বাকী স্ত্রী যারা তারা তো ছেলেমেয়ে নিয়ে যে যার বাপের বাড়ি চলে গেল—সুখে-ভোগেই থাকবে। মা কুন্তী বিদুরের বাড়িতে থেকে গেলেন, তাঁরও যত্নের কোন ত্রুটি হবে না! একটা যে কারও জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে—তাও তো মনে হচ্ছে না। এই জন্যেই কি এত কষ্ট করল নমুচি?

খুব মুষড়ে গেল সে। এতকাল ভেবে রেখেছিল পাণ্ডবদের সর্বনাশ দেখে তৃপ্ত হয়ে দূর পাহাড়ে বা বনে কোথাও চলে যাবে—ভগবানের নাম করে কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা—কিন্তু এ সর্বনাশে সে-তৃপ্তি হল না। ছেলেদের মৃত্যুর শোধ উঠল বলেও মনে করতে পারল না।

না, পাণ্ডবদের এতে এমন কোনো অনিষ্টই হল না। বরং মূর্খ কৌরবগুলো বুঝতে পারল না—সর্বনাশ তাদেরই হল। এই তেরবছর পরে পাণ্ডবরা যখন ফিরবে তখন কি আর এ অপমান এ অনিষ্টের শোধ তুলবে না!

নমুচির আর পাহাড়ে জঙ্গলে যাওয়া হল না। সে ইন্দ্রপ্রস্থেও ফিরল না, হস্তিনাতেই থেকে গেল। ঐখানেই জাত-ব্যবসা শুরু করে দিল আবার। পাণ্ডবদের খবর রাখতে হলে এখন এদের কাছাকাছিই থাকা দরকার। দুর্যোধনের গুপ্তচর নিত্য খবর আনছে বন থেকে, সে খবর নমুচির পেতে কোন অসুবিধা নেই। পাণ্ডবদের শেষ না দেখে, স্ত্রী আর ছেলেদের অপঘাত মৃত্যুর দেনা উশুল না করে সে কোথাও নড়তে পারবে না, তা তার জন্যে যতদিনই অপেক্ষা করতে হোক করবে।......

দীর্ঘকালই রইল সে হস্তিনায়। তেরো বছর কাটল, পাণ্ডবরা এসে রাজ্য দাবী করলেন, কৌরবরা দিলেন না। যুদ্ধের তোড়জোড় হল, যুদ্ধ বাধলও—কাছে থেকে সব দেখল নমুচি। ওর সুবিধেও হয়ে গেল খানিকটা, সৈন্যদের খাওয়ার জন্যে মাংস দরকার, অনেক নিষাদকেই সেকাজে নিযুক্ত করা হল। নমুচিও চেষ্টা করে একটা ইজারা সংগ্রহ করল। মাংস যোগান দেবার নাম করে যখন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে লাগল সে।

ফলে ভীষণ সেই লড়াইয়ের অনেকখানিই সে দেখল, হাজার হাজার লোক মারা গেল ওর চোখের সামনেই, কত রাজা মহারাজা যোদ্ধা, কত বীরপুরুষ, কত যুবা কত বালক! কিন্তু তাতেও কোন তৃপ্তি পেল না। এদের মৃত্যু তো সে চায় নি। পাণ্ডবরা একজনও যদি ওর চোখের সামনে পড়ত—তবেই একটু শান্তি পেত সে। পাঁচজনই মারা যাবে কি পাণ্ডবপক্ষ হারবে—এমন দুরাশা তার ছিল না—তবু, যদি একজনও মরে, দৈবাৎ—এমন কি হতে পারে না? এই আশাতেই সে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে ছিল। কিন্তু কিছুই হল না, ওর চোখের সামনেই ভীমের গদার ঘায়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে দুর্যোধন রক্তবমি করতে লাগলেন—ওর শেষ আশাটুকুও মিলিয়ে গেল।

তাহলেও কিন্তু সে সেখান থেকে যেতে পারল না। দুর্যোধন বেচারী আহত হয়ে পড়ে আছেন—নড়তে পারছেন না, তাঁকে জীবন্ত অবস্থাতেই শিয়াল কুকুর ছিঁড়ে খেতে আসছে—কোনমতে হাত তুলে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন এক একবার—আবার মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছেন। লোকটা বেঁচে আছে জেনেও পাণ্ডবরা কেউ একটা পাহারা দেবার লোক ব্যবস্থা করতে পারল না! আশ্চর্য নৃশংস মানুষ বটে! নমুচির মনে পাণ্ডবদের সম্বন্ধে আক্রোশ আরও খানিকটা বেড়েই গেল।

সে অবশ্য কাছাকাছি ছিল, দুর্যোধন অপারগ হয়ে পড়লে সে নিজেই তাড়াত—তবে তার আগে কাছে যেতে সাহস হল না। মহামানী রাজা দুর্যোধন, সামান্য নিষাদ একজন সাহায্য করতে চাইছে বা সহানুভূতি জানাচ্ছে শুনলে হয়ত অপমানেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। সুতরাং সে চুপ করেই বসে রইল।

কিন্তু খানিক পরে যখন অশ্বত্থামা, তার মামা কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা বলে একটা লোক দেখা করতে এল, আর সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও দুর্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন, অশ্বত্থামাও 'পাণ্ডব আর পাঞ্চালদের নিশ্চয় বধ করব' এই ভরসা দিয়ে চলে গেল—তখন আর 'মড়া-পাহারা' দিয়ে বসে থাকতে পারল না নমুচি, নতুন আশায় বুক বেঁধে অন্ধকারেই অশ্বত্থামাদের পিছু পিছু গেল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর রাত্রি গভীর হলে ওরা রথ থেকে নেমে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম করতে লাগল। কৃপ ও কৃতবর্মা ঘুমিয়েই পড়ল—অশ্বত্থামা জেগে রইল শুধু। সকালের আগে কিছু করা যাবে না—এইটেই ওরা ধরে নিয়েছিল। নমুচি ওদের এই কাণ্ড দেখে বিষম বিরক্ত হল, এত বড় বড় কথার এই পরিণাম!

● গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সকাল হলে দিনের আলোয় যুদ্ধ করে ওরা পাণ্ডবদের হারাবে! তবেই হয়েছে। 'হাতি ঘোড়া গেল তল—ব্যাঙ বলে ক'হাত জল!'

চলেই যাচ্ছিল সে—আবার কী ভেবে একটুখানি বসে রইল। সে ব্যাধ, শিকারের জন্যে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অন্ধকার রাতে ফাঁদ পেতে বসে শিকার ধরে—তার চোখ অন্ধকারে অনেক জিনিস দেখতে পায়। সেইখানে বসে বসেই সে দেখল গাছের মাথাতে একটা কালপেঁচা এসে কাকের বাসায় পড়ে ঘুমন্ত কাকগুলোকে মারছে একে একে! দেখতে দেখতেই তার একটা মতলব মাথায় এল, সে অশ্বত্থামার কাছে এসে বসে চুপি চুপি বলল, 'ঠাকুর, কই পাণ্ডবদের মারতে গেলে না?'

চমকে উঠল অশ্বত্থামা, 'কে রে? কে তুই?'

'আমি কে তা জেনে তোমার লাভ কি হবে? আমি কোন বদ মতলবে আসি নি, তাহলে আগেই সাবাড় করে দিতুম। সে কথা যাক, এখন যা বলছি শোন, তোমার এই যে চার পাশে এত কাকের পালক পড়ে আছে, তোমার মাথাতেও পড়েছে—এগুলো কেন পড়ছে বুঝেছ?'

অশ্বত্থামাকে স্বীকার করতে হল যে সে বোঝে নি।

'এই গাছের মাথাতে কাকের বাসা আছে। কাকগুলো ঘুমিয়ে ছিল, সেই ফাঁকে নিশ্চয় কালপেঁচা এসে তাদের মেরে খেয়েছে। পেঁচাকে শুধু শুধু জ্ঞানী বলা হয় না। ওর যুক্তি নাও। দিনের আলোয় লড়াই করে তোমার বাবাই পাণ্ডবদের হারাতে পারেন নি, তুমি তো ছেলেমানুষ। এই রাত্রেই যাও ওদের শিবিরে, ঘুমন্ত পাণ্ডবদের বধ করে এসো। এমন সুযোগ আর পাবে না, সবাই ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, সোজা শিবিরে ঢুকে যেতে পারবে।'

এই বলে, যেমন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে কাছে এসেছিল—তেমনি অন্ধকারেই আবার মিলিয়ে গেল নমুচি।

এর পরের ঘটনা তোমরা জানো। পাণ্ডবদের পায় নি অশ্বত্থামা, পাণ্ডবদেব পাঁচ ছেলেকে, আর পাঞ্চাল দেশের বড় বড় বীর অনেককে মেরে দুর্যোধনকে গিয়ে খবর দিয়েছিল, ফলে মরবার আগে তবু একটু শান্তি পেয়ে গিয়েছিলেন রাজা দুর্যোধন।

নমুচিরও এবার শান্তি পাবার কথা। তার পাঁচ ছেলের বদলে পাণ্ডবদের পাঁচ
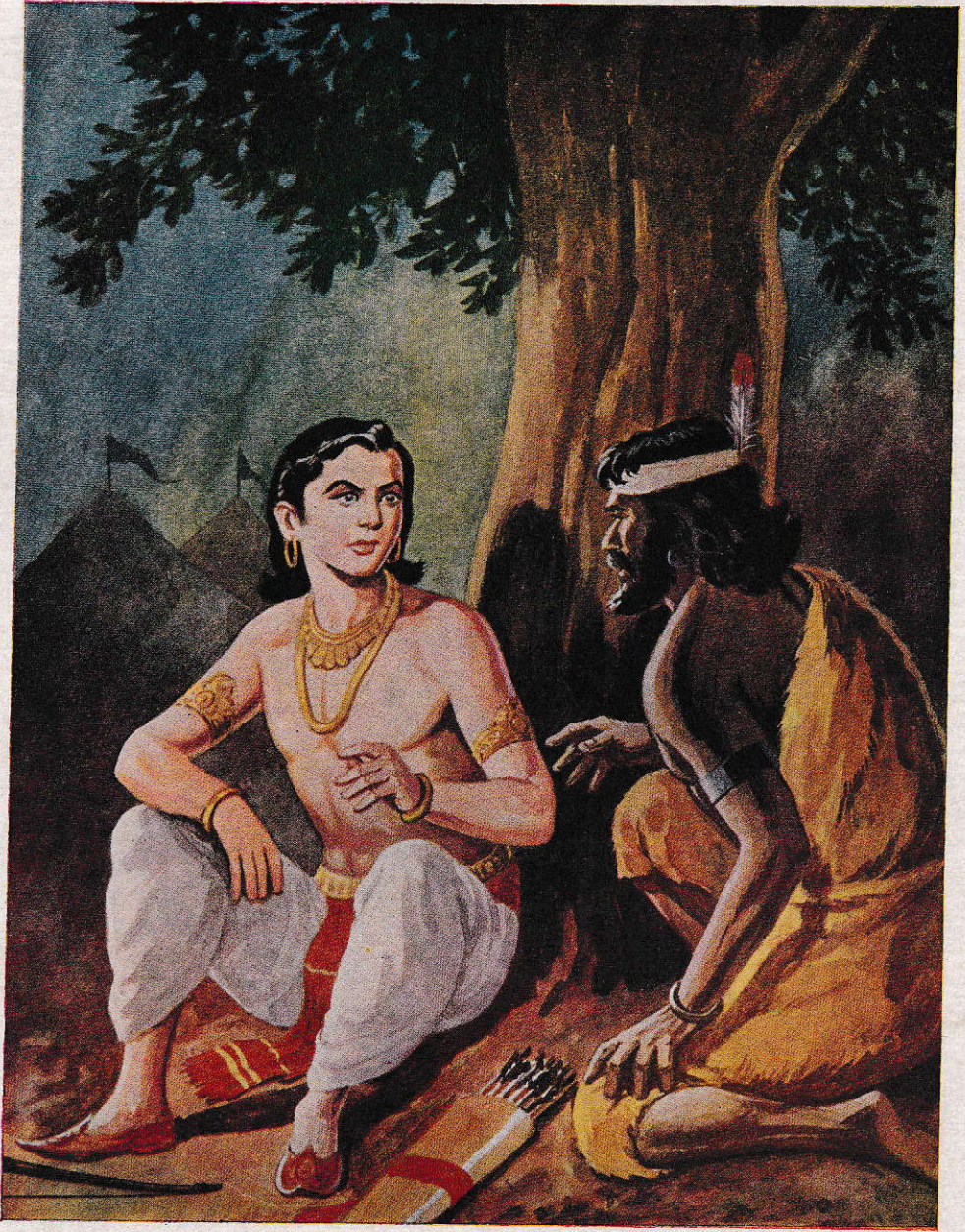
'ঠাকুর কৈ পাণ্ডবদের মারতে গেলে না?'
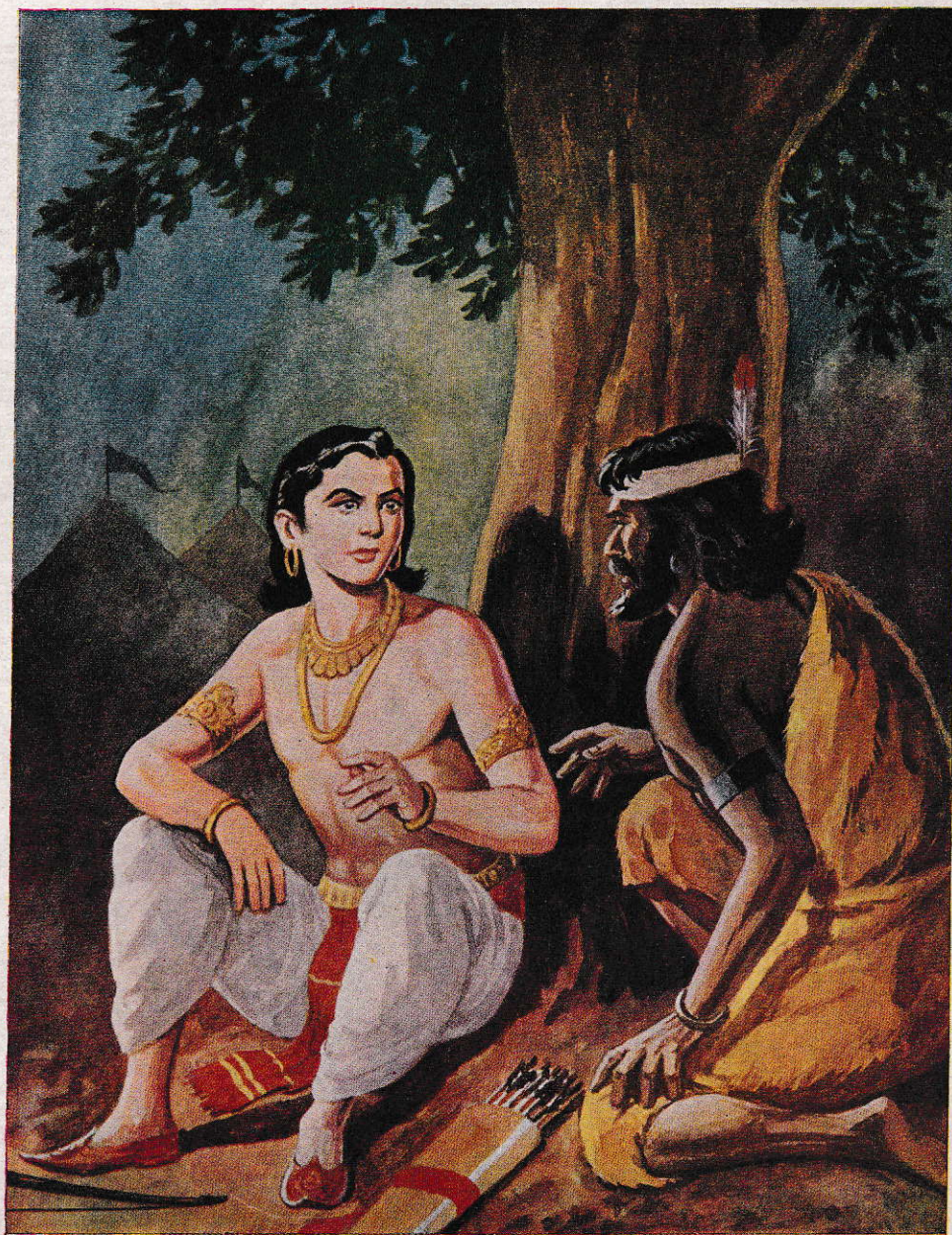
(ছটি প্রাণের দাম···পৃঃ ৪০৮)

'ঠাকুর কৈ পাণ্ডবদের মারতে গেলে না ?'

(ছটি প্রাণের দাম···পৃঃ ৪০৮)

ছেলে গেছে। ওদের আর বংশই রইল না বলতে গেলে। এতদিনের পোষা আক্রোশ জুড়িয়েছে, প্রতিশোধ উঠেছে।

কিন্তু কে জানে কেন, নমুচি শান্তি পায় না। পাণ্ডবদের স্ত্রীরা হাহাকার করে করে কাঁদছে, পাণ্ডবরা, দ্রৌপদী সবাই আছড়ে পড়ে শোক করছে– এমন কি সমস্ত কুরু বংশ শেষ হয়ে গেল বলে কৌরবদের রানীরাও দুঃখ করছেন। সে কান্না যেন নমুচির দুটো কানে আগুন ঢেলে দেয়। এই প্রথম ওর মনে হয়—এত কাণ্ড করে কী লাভটা হল তার? এর ফলে কি ওর পাঁচ ছেলে ফিরে এল? না কি—এই যে বলতে গেলে সারা জীবন ধরে এই প্রতিহিংসা বয়ে নিয়ে বেড়াল, নিজের খাওয়া শোওয়া আরাম কোনদিকে তাকাল না, জঙ্গলী পশুর মতো জীবনযাপন করল—তারই কোন দাম উঠল? তাদের প্রাণ তো গিয়েই ছিল, ওর প্রাণটাও গেল—সুখ শান্তি আরাম কোনদিনই কিছু পেল না, আর কিছু পাবার আশাও রইল না। আর কি কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধতে পারবে? কেউ তো কোথাও নেই? আত্মীয় যা দুচার ঘর ছিল—তারা এখন কে কোথায় থাকে তার খবরও রাখে না সে। পাণ্ডবদের ছেলেরা ম'ল, তারা দুঃখ পেল ঠিকই—তাতে নমুচির কি লাভ হল, সে কি পেল? সেদিনের সে জীবন কি আর ফিরে আসবে? এখন কি করবেই বা সে?

যতই ভাবে ততই যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়ে। কিছুই ভাল লাগে না। যেদিকে দুচোখ যায়—শ্মশানের ছবিই চোখে পড়ে। শুধুই মৃতদেহ, তার কতক শেয়ালে শকুনিতে খেয়েছে, কতক বা এখনও টানা-ছেঁড়া করছে। চারিদিকেই কান্নার শব্দ, শোকের হাহাকার।

পুরো দুটো দিন না খেয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল নমুচি। ক্রমে বুঝল যে হিংসায় হিংসার শোধ ওঠে না; যা ক্ষতি হবার তা হয়েই যায়, প্রতিহিংসা নিতে গেলে অপরের হয়ত খানিকটা ক্ষতি করা যায়—তাতে নিজের কোন লাভ হয় না, আগের ক্ষতির পূরণ হয় না।···

শেষে আর থাকতে না পেরে ছুটে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল, 'রাজা আমার অপরাধের সীমা নেই, আমার বিচার করো, আমাকে বধ করো।'

সব শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমাদেরই অপরাধের সীমা নেই, তোমার কি বিচার করব ভাই! তুমি যা করেছ আত্মীয়শোকে বিহ্বল হয়েই করেছ। আত্মীয়শোক

● গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যে কী তা আমরা এখন বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। তুমি যাও, ভগবানকে ডাকো—তাহলেই শান্তি পাবে।'

নমুচি একে একে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—সকলের কাছেই গেল। কেউই তাকে বধ করতে রাজী হলেন না। অনেক প্রাণ নিয়েছেন তাঁরা—আর নয়। তখন সে গভীর জঙ্গলে চলে গিয়ে চুপ করে বসে রইল এক জায়গায়—যদি কোন হিংস্র জন্তু দয়া করে খেতে আসে। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, খাওয়া তো দূরের কথা—একটা বাঘ ভালুক কাছেও এল না। কদিন অপেক্ষা করে থেকে হতাশ হয়ে আবার কুরুক্ষেত্রে ফিরে এল। তখন ওখানকার মৃতদেহ, দেহের টুকরো—শিয়াল শকুনে খেয়েও যেটুকু বেঁচেছে—জড়ো করে করে কয়েকটা বড় চিতায় দাহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এদিক ওদিক দেখে—কেউ না দেখতে পায় এইভাবে—তারই একটাতে সটান উঠে গেল। তার অনুতাপের জ্বালা এতই বেশী যে—আগুনের জ্বালাও তুচ্ছ মনে হল তার কাছে। নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে প্রাণ দিল সে, একটু একটু করে সারা দেহটা পুড়ল তবু একটা শব্দ করল না বা পালাবার চেষ্টা করল না। এইভাবে প্রতিহিংসার প্রায়শ্চিত্ত করল নমুচি।

● ষাঁড়ের গোঁ
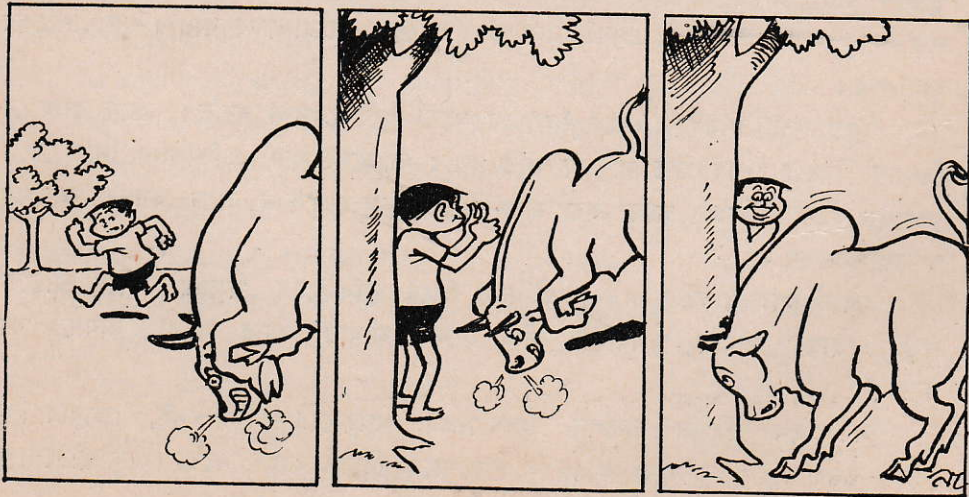
টেনিদা আর ইয়েতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্যাবলা বললে, 'ইয়েতি—ইয়েতি। সব বোগাস।'

চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল সেন।

'হ, তুই কইলেই বোগাস হইবো! হিমালয়ের একটা মঠে ইয়েতির চামড়া রাইখ্যা দিছে, জানস তুই?'

'ওটা কোনো বড় বানরের চামড়াও হতে পারে।'—চশমাসুদ্ধু নাকটাকে আরো ওপরে তুলে ক্যাবলা গম্ভীর গলায় জবাব দিলে।

হাবুল বললে, 'অনেক সায়েবে তো ইয়েতির কথা লেখ্ছে।'

'কিন্তু কেউই চোখে দেখেনি। যেমন সবাই ভূতের গল্প বলে—অথচ নিজের চোখে ভূত দেখেছে—এমন একটা লোক খুঁজে বের কর দিকি?'

এইবারে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় টেনিদা এসে চাটুজ্জেদের রোয়াকে পৌঁছে গেল। একবার কটমট করে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে মোটা গলায় বললে, 'কী নিয়ে তোরা তক্কো করছিলি র‍্যা ?'

আমি বললুম, 'ইয়েতি।'

'অ—ইয়েতি।'—টেনিদা জাঁকিয়ে বসে পড়ল : 'তা তোরা ছেলেমানুষ—ও সব তোরা কী জানিস ? আমাকে জিজ্ঞেস কর।'

হাবুল বললে, 'ঈস—কী আমার একখান ঠাকুর্দা আসছেন রে !'

টেনিদা বললে, 'চোপরাও। গুরুজনকে অচ্ছেদ্দা করবি তো এক চড়ে তোর কান আমি—'

আমি 'ফিল আপ দি গ্যাপ' করে দিলুম : 'কানপুরে পৌঁছে দেব।'

'ইয়া—ইয়া—কারেক্ট্।'—বলে টেনিদা এমন জোরে আমার পিঠে থাবড়ে দিলে যে হাড়-পাঁজরাগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। তারপর বললে, 'ইয়েতি ? সেই যে কী বলে—অ্যাব্—অ্যাব্—অ্যাবো—'

ক্যাবলা বললে, 'অ্যাবোমিনেব্‌ল্ স্নোম্যান।'

'মরুক্ গে—ইংরিজিটা বড্ড বাজে—ইয়েতিই ভালো। তোরা বলছিস নেই ? আমি নিজের চক্ষে ইয়েতি দেখেছি।'

'তুমি !'—আমি আঁতকে উঠলুম।

'অমন করে চমকালি কেন—শুনি ?'—চোখ পাকিয়ে টেনিদা বললে, 'আমি ইয়েতি দেখব না তো তুই দেখবি ? সেদিনও পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খেতিস, তোর আস্পর্ধা তো কম নয় !'

হাবুল বললে, 'না—না, প্যালা দেখবো ক্যান্ ? আমরা ভাব্‌তা ছিলাম—ইয়েতি তো দেখবো প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা—তুমি ওই সব ভ্যাজালে আবার গেলা কবে ?'

ঘনাদার নাম শুনে টেনিদা কপালে হাত ঠেকালো : 'ঘনাদা ! তিনি তো মহাপুরুষ। ইয়েতি কেন—তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন। তাই বলে আমি একটা ইয়েতি দেখতে পাব না, এ কথার মানে কী ?'

ক্যাবলা বললে, 'তুমিও নিশ্চয় দেখতে পারো—তোমারও অসাধ্য কাজ নেই। কিন্তু কবে দেখলে, কোথায় দেখলে—'

'শুনতে চাস ?'—কথা কেড়ে নিয়ে টেনিদা বললে, 'তা হলে সামনের ভুজাওলার দোকান থেকে ছ' আনার ঝালমুড়ি নিয়ায়—কুইক্!'—আর তৎক্ষণাৎ আমার পিঠে একটা বাঘাটে রদ্দা কষিয়ে বললে, 'নিয়ায় না—কুইক্!'

রদ্দা খেয়ে আমার পিত্তি চটে গেল। বললুম, 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'তা হলে ক্যাবলাই দে। কুইক্।'

রদ্দার ভয়ে ক্যাবলাই পয়সা বের করল। শুধু কুইক্ নয়, ভেরি কুইক্।

ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, 'এই গরমের ছুটিতে এক মাস আমি কোথায় ছিলুম বল্ দিকি ?'

আমি বললুম, 'গোবরডাঙায়। সেখানে পিসীমার বাড়িতে তুমি আম খেতে গিয়েছিলে।'

'ওটা তো তোদের ফাঁকি দেবার জন্যে বলেছি। আমি গিয়েছিলুম হিমালয়ান এক্স্‌পিডিশনে।'

'অ্যাঁ—সৈত্য কইতাছ ?'—হাবুল হাঁ করল।

'আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি ?'—টেনিদা গর্জন করল।

'বালাই ষাট—তুমি মিথ্যে বলবো কেন ?'—ক্যাবলা ভালো মানুষের মতো বললে, 'কোথায় গিয়েছিলে ? এভারেস্টে উঠতে ?'

'ছো—ছো—ও তো সবাই উঠছে, ডাল-ভাত হয়ে গেছে। আর ক'দিন পরে তো স্কুলের ছেলেমেয়েরা এভারেস্টের চুড়োয় বসে পিকনিক করবে। আমি গিয়েছিলুম—আরো উঁচু চুড়োর খোঁজে।'

'আছে নাকি ?'—আমরা তিন জনেই চমকালুম।

'কিছুই বলা যায় না। হিমালয়ের কয়েকটা সাইড তো মেঘে কুয়াশায় চির-কালের মতো অন্ধকার—এখনো সে-সব জায়গার রহস্যই ভেদ হয়নি। লাস্ট্ ওয়ারের

থাম ইডিয়ট। তা হলে তো কাগজে কাগজে
আমার ছবিই দেখতে পেতিস।

সময় দু-জন আমেরিকান পাইলট বলেছিল না? পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরেও তারা পাহাড়ের চুড়ো দেখেছিল একটা—তারপর সে যে কোথায় হারিয়ে গেল—'

'তুমি সেই চুড়ো খুঁজে পেয়েছ টেনিদা?'—আমি জানতে চাইলুম।

'থাম ইডিয়ট। তা হলে তো কাগজে কাগজে আমার ছবিই দেখতে পেতিস। আমি কি আর তবে তোদের ওই সিটি কলেজের ক্লাসে বসে থাকতুম, আর প্রক্সি দিতুম? কবে আমাকে মাথায় তুলে সবাই দিল্লী-টিল্লী নিয়ে যেত—আমি কি বলে—একটা পদ্ম-বিভীষণ হয়ে যেতুম।'

ক্যাবলা বললে, 'উঁহু, পদ্ম-বিভূষণ।'

'একই কথা।'—ঝালমুড়ির ঠোঙা শেষ করে টেনিদা বললে, 'চুপ কর—এখন ডিস্টার্ব করিসনি। না—নতুন চুড়ো খুঁজে পেলুম না। সেই যে কী বলে—পাহাড়ের কী তুষার ঝড়—'

ক্যাবলা বললে, 'ব্লিজার্ড।'

'হাঁ, এমন ব্লিজার্ড শুরু হল যে শেরপা-টেরপা সব গেল পালিয়ে। আমি আর কী করি, খুব মন খারাপ করে চলে এলুম কালিম্পঙে। সেখানে কুট্টিমামার ভায়রা ভাই হরেকেষ্ট বাবু ডাক্তারী করেন, উঠলুম তাঁর ওখানে।'

'তা হলে ইয়েতি দেখলে কোথায় ?'—আমি জানতে চাইলুম : 'সেই ব্লিজার্ডের ভেতর ?'

'উঁহু, কালিম্পঙে।'

'কালিম্পঙে ইয়েতি।'—হাবুল চেঁচিয়ে উঠল : 'চাল মারনের জায়গা পাও নাই ? আমি যাই নাই কালিম্পঙে ? সেইখানে ইয়েতি ? তা'ইলে তো আমাগো পটলডাঙায়ও ইয়েতি লাইমা আসতে পারে।'

টেনিদা ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'পারে—অসম্ভব নয়।'

'অ্যাঁ।'—আমরা তিন জনে এক সঙ্গে খাবি খেলুম

টেনিদা বললে, 'হাঁ, পারে। ওরা ইন্‌ভিজিব্‌ল্—মানে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে থাকে। তাই লোকে ওদের পায়ের দাগ দেখে, কিন্তু ওদের দেখতে পায় না। যেখানে খুশি ওরা যেতে পারে, যখন খুশি যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই রূপ ধরতে পারে—কিন্তু সে রূপ না দেখলেই ভালো। আমি কালিম্পঙে দেখেছিলুম—আর দেখতে চাই না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু ওখানে ইয়েতি এল কী করে ?'

'ইয়েতি কোথায় নেই—কে জানে ! হয় তো এই যে আমরা কথা কইছি—ঠিক এখুনি আমাদের পেছনে একটা অদৃশ্য ইয়েতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।'

আমরা ভীষণ চমকে তিনজনে পেছন ফিরে তাকালুম।

টেনিদা বললে, 'উঁহু, ইচ্ছে করে দেখা না দিলে কিছুতেই দেখতে পাবি না। ওকি এত সহজেই হয় রে বোকার দল ? ওর জন্যে আলাদা কপাল থাকা চাই।'

ক্যাবলা বললে, 'তোমার সেই কপাল আছে বুঝি ?'

হাঁটু থাবড়ে টেনিদা বললে, 'আলবৎ।'

হাবুল বললে, 'কালিম্পঙে ইয়েতি দ্যাখ্‌লা তুমি ?'

'দেখলুম বই কি।'

ক্যাবলা বললে, 'রেস্তোরাঁয় বসে ইয়েতিটা বুঝি চা খাচ্ছিল ? না কি বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রভানুর ওদিকটায় ?'

'ইয়ারকি দিচ্ছিস ?'—বাঘা গলায় টেনিদা বললে, 'ইয়েতি তোর ইয়ারকির পাত্তর ?'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান্ দাও—পোলাপান।'

'পোলাপান ? ওটাকে জলপান করে ফেলা উচিত। ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি ক্যাবলা, তা হলে এক ঘুষিতে তোর চশমাসুদ্ধু নাক আমি—'

আমি বললুম, 'নাসিকে উড়িয়ে দেব।'

'ইয়া—একদম কারেক্ট্!'—বলে আমার পিঠ চাপড়াতে গিয়ে টেনিদার হাত হাওয়ায় ঘুরে এল—আগেই চট্ করে সরে গিয়েছিলুম আমি।

ব্যাজার মুখে টেনিদা বললে, 'দুৎ—দরকারের সময় একটা পিঠ পর্যন্ত হাতের কাছে পাওয়া যায় না। রাবিশ।'

হাবুল বললে, 'কিন্তু ইয়েতি ?'

'দাঁড়া না ঘোড়াড্ডিম—একটু মুড আনতে দে।'—টেনিদা মুখটাকে ঠিক গাজরের হালুয়ার মতো করে, নাকের ডগাটা খানিক খুচখুচ করে চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'হুঁ—ইয়েতির সঙ্গে ইয়ার্কিই বটে। আমিও ইয়েতি নিয়ে একটু ইয়ার্কিই করতে গিয়েছিলুম। তারপরেই বুঝতে পারলুম—আর যেখানে ইচ্ছে চালিয়াতি করো—ওঁর সঙ্গে ফাজলেমি চলে না।'

আমি বললুম, 'চলল না ফাজলেমি ?'

'না।'—খুব ভাবুকের মতো একটু চুপ করে থেকে টেনিদা বললে, 'হল কী জানিস, এক্স্পিডিশন থেকে ফিরে কালিম্পঙে এসে বেশ রেস্ট নিচ্ছিলুম। আর ডাক্তার হরেকেষ্ট বাবুর বাড়িতেও অনেক মুরগী—রোজ সকালে 'কঁকর-কঁকর' করে তারা ঘুম ভাঙাত, আর দুপুরে, রাত্তিরে—কখনো কারী, কখনো কাটলেট, কখনো রোস্ট্ হয়ে খাবার টেবিলে হাজির হত। বেশ ছিলুম রে!

তা ওখানে একদিন এক ফরাসী টুরিস্টের সঙ্গে আলাপ হল। জানিস তো আমি খুব ভালো ফরাসী বলতে পারি—'

ক্যাবলা বললে, 'পারো বুঝি ?'

'পারি না? ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক ইয়াক—তা হলে কোন্ ভাষা?'

হাবুল বললে, 'যথার্থ। তুমি কইয়া যাও।'

'লোকটার সঙ্গে তো খুব খাতির হল। এ-সব টুরিস্টদের ব্যাপার কী জানিস তো? সবকিছু সম্পর্কেই ওদের ভীষণ কৌতূহল। ইণ্ডিয়ানদের টিকি থাকে কেন—তোমাদের কাকেদের রং এত কালো কেন, তোমাদের দেবতা কি খুব ভয়ানক যে তোমরা 'হরিব্ল-হরিব্ল' (মানে হরিবোল আর কি!) চ্যাঁচাও—ইণ্ডিয়ান গুবরে পোকা কি পাখিদের মতো গান গাইতে পারে, এদেশের ছুঁচোরা কি শুয়োরের বংশধর? এই সব নানা কথা জিজ্ঞেস করতে করতে সে বললে, আচ্ছা মসিয়ো—তুমি তো হিমালয়াজে গিয়েছিলে, সেখানে ইয়েতি দেখেছ?

আমার হঠাৎ লোকটাকে নিয়ে মজা করতে ইচ্ছে হল। তার নাম ছিল লেলেফাঁ। আমি বেশ কায়দা করে তাকে বললুম, তুমি আছো কোথায় হে মসিয়ো লেলেফাঁ? ইয়েতি দেখেছি মানে? আমি তো ধরেই এনেছি একটা।'

—'অ্যাঁ, ধরে এনেছ!'—লোকটা তিনবার খাবি খেলো: 'কই আজ পর্যন্ত কেউ তো ধরতে পারেনি!'

আমি লেলেফাঁর বুকে দুটো টোকা দিয়ে বললুম, 'আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—সবাই যা পারে না, আমি তা পারি। আমার বাড়িতেই আছে ইয়েতি।'

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ!

মসিয়ো লেলেফাঁ খানিকটা হাঁ করে রইল, তারপর ভেউ ভেউ করে কাঁদার মুখ করলে, আবার কপ-কপ করে তিনটে খাবি খেল—যেন মশা গিলছে। শেষে একটু সামলে নিলে চোটটা।

—আমায় দেখাবে ইয়েতি?

—কেন দেখাব না?

শুনে এমন লাফাতে লাগল লেলেফাঁ যে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। আর একটু হলেই গড়িয়ে হাত ত্রিশেক নীচে একটা গর্তে পড়ে

যেত, আমি ওর ঠ্যাং ধরে টেনে তুললুম। উঠেই আমাকে দু হাতে জাপটে ধরল সে আর পাক্কা তিন মিনিট ট্যাঙো ট্যাঙো বলে নাচতে লাগল।

—চলো, এক্ষুণি দেখাবে।

আমি বললুম, 'সে হয় না মসিয়ো, যখন তখন তাকে দেখানো যায় না। সে উইকে সাড়ে তিন দিন ঘুমোয়, সাড়ে তিন দিন জেগে থাকে। ঘুমের সময় তাকে ডিস্টার্ব করলে সে এক চড়ে তোমার মুণ্ডু—'

আমি জুড়ে দিলুম, 'কাঠমুণ্ডুতে উড়িয়ে দেবে।'

টেনিদা বললে, রাইট। আমি লেলেফাঁকে বললুম, কাল থেকে ইয়েতি ঘুমুচ্ছে। জাগবে পরশু বারোটার পর। তারপর খেয়েদেয়ে যখন চাঙ্গা হবে—মানে তার মেজাজ বেশ খুশি থাকবে, তখন—মানে পরশু সন্ধ্যের পর তোমাকে ইয়েতি দেখাব।

লেলেফাঁ বললে, আমার ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলতে পারব তো?

—খবরদার, ও কাজটিও কোরো না। ইয়েতিরা ক্যামেরা একদম পছন্দ করে না—চাই কি খ্যাঁচ করে তোমায় কামড়েই দেবে হয়তো। তখন হাইড্রোফোবিয়া হয়ে মারা পড়বে।

—ইয়েতি কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হয়?

—'হাইড্রোফোবিয়া তো ছেলেমানুষ। কালাজ্বর হতে পারে, পালাজ্বর হতে পারে, কলেরা হতে পারে, চাই কি ইন্দ্রলুপ্ত—এমন কি সনন্ত যণ্ডন্ত প্রত্যয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।'

ক্যাবলা প্রতিবাদ করল: 'সনন্ত যণ্ডন্ত প্রত্যয় কী করে—'

'ইয়ু শাটাপ্ ক্যাবলা—সব সময়ে টিকটিকির মতো টিকিস-টিকিস করবিনি বলে দিচ্ছি। শুনে লেলেফাঁ ফরাসীতে বললে, মী ঘৎ! মানে—হে ঈশ্বর।'

ক্যাবলা বললে, 'ফরাসীরা কি মী ঘৎ বলে নাকি?'

'শাটাপ্ আই সে!'—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: 'ফের যদি তক্কো করবি, তা হলে এখুনি এক টাকার আলুর চপ আনতে হবে তোকে। যাকে বলে ফাইন।'

ক্যাবলা কুঁকড়ে গেল, বললে, 'মী ঘৎ! থাক, আর তর্ক করব না, তুমি বলে যাও।'

'তবু তোকে আট আনার আলুর চপ আনতেই হবে। তোর ফাইন। যা—কুইক !'

আমি বললুম, 'হুঁ, ভেরি কুইক।'

বেগুনভাজার চাইতেও বিচ্ছিরি মুখ করে ক্যাবলা চপ নিয়ে এল।

'বেড়ে ভাজে লোকটা'—চপে কামড় দিয়ে টেনিদা বললে, 'যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস !'

আমি আকুল হয়ে বললুম, 'কিন্তু ইয়েতি ?'

'ইয়েস—ই য়ে স, ই য়ে তি। বুঝলি, আমার মাথায় তখন একটা প্ল্যান এসে গেছে। বাড়ি গিয়ে হরেকেষ্ট বাবুকে বললুম সেটা। কুট্টিমামার ভায়রাভাই তো, খুব রসিক লোক, রাজী হয়ে গেলেন। তারপর ম্যানেজ করলুম কাইলাকে।'

—খবরদার ও কাজটিও করো না। [পৃঃ ৪১৮

হাবুল বললে, 'কাইলা কেডা ?'

'ও একজন নেপালী ছেলে—আমাদের বয়েসীই হবে। হরেকেষ্ট বাবুর ডাক্তারখানায় চাকরি করে। খুব স্ফূর্তিবাজ সে। বললে, দাজু, রামরো—রামরো। মানে—দাদা, ভালো, খুব ভালো।'

ওদিকে সায়েবের আর সময় কাটে না।

—তোমার ইয়েতি কি এখনো ঘুমুচ্ছে ?

—নাক ডাকাচ্ছে।

—সময়মতো জাগবে তো ?

—সময়মতো মানে? ঠিক বারোটায় উঠে বসবে। এক সেকেণ্ডও লেট হবে না।

যা হোক—দিন তো এল। হরেকেষ্ট বাবুর দোতলার হলঘরে আমি একটা কালো পর্দা টাঙালুম। প্ল্যান হল, খুব একটা ডিম লাইট থাকবে—আমি ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে দেব। ইয়েতিকে দেখা যাবে। মাত্র দু মিনিট কি আড়াই মিনিট। তারপরেই আবার পর্দা ফেলে দেব।

আমি বললুম ঃ 'কিন্তু ইয়েতি—'

'ইয়ু শাটাপ্—পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল! আরে, কিসের ইয়েতি? হরেকেষ্ট বাবুর বাড়িতে মস্ত একটা ভালুকের চামড়া ছিল, প্ল্যান করেছিলুম কাইলা সেটা গায়ে পরবে, আর একটা বিচ্ছিরি নেপালী মুখোস এঁটে গোটা কয়েক লাফ দেবে—চেঁচিয়ে বলবে—দ্রাম-দ্রুম—ইয়াহু—মিয়াহু! ব্যাস্—আর দেখতে হবে না, ওতেই মসিয়ো লেলেফাঁর দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

সব সেইভাবে ঠিক করা রইল। সায়েব যখন এল, তখন ঘরে একটা মিটমিটে আলো—সামনে একটা কালো পর্দা, তার ওপর আমি কাল থেকে সায়েবকে ইয়েতি সম্পর্কে অনেক ভীষণ ভীষণ গল্প বলছিলুম। বুঝতে পারলুম, ঘরে ঢুকেই তার বুক কাঁপছে।

মজা দেখবার জন্যে হরেকেষ্ট ছিলেন, তাঁর কম্পাউণ্ডার গোলোকবাবুও বসে ছিলেন। বেশ অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার তৈরী হয়ে গেলে—ওয়ান-টু-থ্রী বলে আমি পর্দাটা সরিয়ে দিলুম। আর—'

আমরা একসঙ্গে বললুম, 'আর?'

'একি! এ তো কাইলা নয়! তার ভালুকের চামড়া পড়ে গেছে, মুখোস ছিটকে গেছে—চিৎপাত অবস্থায় ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সে ঠায় অজ্ঞান। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাদ পর্যন্ত ছোঁয়া এক মূর্তি। সে যে কি রকম দেখতে আমি বোঝাতে পারব না। মানুষ নয়, গরিলা নয়—অথচ গায়ে তার কাঁটা-কাঁটা বাদামী রোঁয়া—চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা। তিনটে সিংহের মতো গর্জন করে সে পরিষ্কার বাংলায় বললে, ইয়েতি দেখতে চাও—না? তবে নকল

নকল ইয়েতি দেখবে কেন—আসলকেই দেখো

(টেনিদা আর ইয়েতি···পৃঃ ৪২১)

ইয়েতি দেখবে কেন—আসলকেই দেখো। বলে হাঃ-হাঃ করে ঘর ফাটানো হাসি হাসল—তিরিশখানা ছোরার মতো ধারালো দাঁত তার ঝলকে উঠল, তারপর চোখের সামনে তার শরীরটা যেন গলে গেল, তৈরী হল একরাশ বাদামী ধোঁয়া—সেটা আবার মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যেন হিমালয়ের সেই ব্লিজার্ডের মতো একটা ঝড়ো হাওয়া, রক্ত জমে গেল আমাদের—বন্ধ দরজার পাল্লা দুটো তার ধাক্কায় ভেঙে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর সেই হাওয়াটা হা-হা করতে করতে শাল আর পাইন বনে ঝাপটা মেরে একেবারে নাথুলার দিকে ছুটে গেল।

আমি তো পাথর। সায়েব মেঝেতে পড়ে কেবল গিঁগিঁ করছে। কম্পাউণ্ডার অজ্ঞান। হরেকেষ্ট বাবু চেয়ারে চোখ উলটে আছেন, আর বিড়বিড় করে বলছেন—'কোরামিন—কোরামিন! সায়েবকে নয়—আমাকে দাও—এখুনি হার্ট ফেল করবে আমার।'

টেনিদা থামল। বললে, 'বুঝলি, এই হচ্ছে আসল ইয়েতি। তাকে নিয়ে ফস্টি-নস্টি করতে যাসনি—মারা পড়ে যাবি। আর তাকে কখনো দেখতেও চাসনি—না দেখলেই বরং ভালো থাকবি।'

আমরা থ হয়ে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর ক্যাবলা বললে, 'স্রেফ গুলপট্টি।'

'গুলপট্টি?'—টেনিদা কটকট করে তাকালো ক্যাবলার দিকেঃ 'ওরা অন্তর্যামী। বেশি যে বকবক করছিস, হয় তো এখুনি একটা অদৃশ্য ইয়েতি তার সিংহের মতো থাবা তোর কাঁধের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে—'

'ওরে বাবা রে!'—এক লাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ে বাড়ির দিকে টেনে দৌড় লাগাল ক্যাবলা।

হাল খাতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চৈত্র সংক্রান্তির পরদিন, পয়লা বৈশাখে হালখাতার উৎসব। এ উৎসব অবশ্য গাঁয়ের নয়, গঞ্জের। সংক্রান্তির দিন শশী সাহার বারবাড়ি আর বাড়ির লাগা ফাঁকা জমিতে বিরাট মেলা বসত। সেই মেলায় আমরা নানারকম জিনিসপত্র কিনতাম। ছুরি, মারবেল, টেনিস বল, পকেট-বায়োস্কোপ, আরো কত কি। সেইসঙ্গে কিনতাম একখানা করে এক আনা দামের পকেট পঞ্জিকা।

আর পঞ্জিকা খুলেই পয়লা বৈশাখের হালখাতার পাতাটি বার করে দেখতাম। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজার তারিখ বছরে বছরে বদলায়। কিন্তু হালখাতার তারিখটি পয়লা বৈশাখে একেবারে বাঁধা। এর আর এগোনো পেছনো নেই। আর হালখাতার ছবিটিও অবিকল এক। দোকানদারের ফরাশপাতা গদিতে কয়েকজন ভদ্রলোক রুপোবাঁধানো হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন আর দোকানদার কোঁচানো চাদর গলায় ঝুলিয়ে সবিনয়ে সহাস্যে তাঁদের আপ্যায়ন করছেন।

পঞ্জিকায় সেই ছবি দেখে কানু বলল, 'কালই তো হালখাতা। কবে যে রসরাজ দাসের গদিতে পায়ের ওপর পা তুলে বসতে পারব আর অমন আয়েশ করে রুপোর হুঁকোয় তামাক খাব তাই ভাবি।'

অনাথ ধমক দিয়ে বলল, 'ফাজিল কোথাকার। বয়স এখনো বারো পেরোয়নি কিন্তু পেকে একেবারে কাঁঠাল হয়েছ। এখনই গদিতে বসে হুঁকো টানার শখ।'

অনাথ নামে আমাদের বাড়ির চাকর। কিন্তু আসলে ওই মনিব। ওর সর্দারি আমরা মেনে নিই। যখন তখন হুকুম তামিল করি। কারণ অনাথ আমাদের সব কাজের সহায়। ও ফুটবলের মাঠেও আছে। ওর সঙ্গে আমরা গ্রাম গ্রামান্তরে কবি আর যাত্রাগানের আসরে গিয়ে বসি। তাই ওর গালমন্দ, একটি দুটি কানমলা আমরা মাথা পেতে মেনে নিই।

আমি কানুর পক্ষ নিয়ে বললাম, 'সত্যি-সত্যি তো আর টানে না, মুখেই বলছে।'

অনাথ গম্ভীরভাবে বলল, 'যাক তোমাকে আর সাফাই গাইতে হবে না।'

বাঞ্ছুর মন তামাকের দিকে ছিল না। সে অন্য কথা ভাবছিল। আমাদের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল, 'কাল খুব রসগোল্লা খাব দাদা। বিশটা পঁচিশটা। দোকানে দোকানে রসগোল্লা খাব।'

লিকলিকে ফরসা চেহারা। মাথায় কটা কটা চুল। কানুর চেয়ে ও ছ'মাসের ছোট, আমার চেয়ে আড়াই বছরের। কিন্তু দুটি ব্যাপারে ও আমাদের ছাড়িয়ে গেছে। অঙ্কে ওর দারুণ মাথা। একশর মধ্যে একশ পায়। গোটা শুভঙ্করীখানা ওর মুখস্থ। ঊনিশের ঘরের নামতা পর্যন্ত ও গড়গড় করে বলতে পারে। আর খেতে পারে রসগোল্লা। আমাদের সবাইয়ের চেয়ে বেশী খায়।

দিদিভাই বলেন, 'অবাক্ কাণ্ড। ওই তো কাঠির মত দেহ। এত রসগোল্লা তুই রাখিস কোথায়?'

বাঞ্ছু জবাব দেয়, 'জানো না বুঝি? আমার পেটের মধ্যে মস্ত বড় একটা হাঁড়ি আছে যে, তার মধ্যে রাখি।'

হালখাতার দিনটি সত্যিই যেন রসগোল্লার রসে ভেজা।

রসগোল্লা আমরা সারাবছরে অন্যদিনেও খাই। বাবা মাঝে মাঝে ভাঙ্গার বাজার থেকে নিয়ে আসেন। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে গেলে পাতে সবচেয়ে শেষে রসগোল্লা পড়ে। কাঠ আর লোহার ব্যবসায়ী রসরাজ দাসের গদিতে গেলে

● নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তিনিও আমাদের তিনভাইকে রসগোল্লা খাওয়ান। কিন্তু বছরের প্রথম দিনে শুভ হালখাতা মহরতে যে রসগোল্লা আমরা খাই তার যেন তুলনা হয় না। তার আকার তত বড় না হলেও স্বাদ ভারী মিষ্টি।

আসলে স্বাদ তো শুধু খাওয়ার মধ্যে নয়, দলবল নিয়ে খেতে খেতে যাওয়ার মধ্যে। খুব ছেলেবেলায় দেড়মাইল পথ হেঁটে গিয়ে আমরা হালখাতা করার অনুমতি পেতাম না। বাড়িতেই রসগোল্লার হাঁড়ি এসে পৌঁছত। কাকা অনেক রাত্রে হাতে করে নিয়ে আসতেন। আমরা আশায় আশায় ঘুমিয়ে পড়তাম। পরদিন সকালে আমরা সেই মিষ্টি খেতাম। বাসী বিয়ের মত বাসী হালখাতা।

কিন্তু বড় হওয়ার পর আমরা নিজেরাই যেতে পারি। আরও পাঁচখানা দশখানা গাঁয়ের লোক সেজেগুজে যায়। আমরা তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটি। পিছনে পড়লে ছুটে এগিয়ে যাই। সেই শোভাযাত্রায় যাত্রী হওয়ার যে আনন্দ তার যেন তুলনা ছিল না।

সব বার তো এই আনন্দ আসে না, কোন কোন বার হয়তো ঝড়বৃষ্টি এসে গেল। যাওয়া আর হল না। কোনবার হয়তো জ্বরজ্বারি হল, আর বেরোন হল না। এমন কত বাধাবিঘ্ন আছে।

কিন্তু এবার কোন বাধা নেই। সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার। বাবা কাকা কোর্টে বেরিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা বিকালে খেয়া পার হয়ে রসরাজ দাসের গদিতে হালখাতা করতে আসবেন।

অনাথকে বলে গেলেন, 'তুই ওদের নিয়ে যাস।' শুনে মনে মনে আমরা খুব খুশী। বড়দের সঙ্গে যেতে হলে যেন তেমন যাওয়ার আনন্দ থাকে না। তার চেয়ে অনাথকে সাথী হিসাবে পেলে আমরা হাতে স্বর্গ পাই।

সেদিন পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে স্কুল ছুটি। তবু বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই আমরা নেয়ে খেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম।

দিদিভাই হেসে বললেন, 'অন্য দিন তোদের ঠেলে ঠেলেও নদীর ঘাটে নেওয়া যায় না। আজ একেবারে সাত সকালে নাওয়া খাওয়া সারা। হালখাতা তো সেই বিকালবেলায়। এখনই অত তাড়া কিসের?'

তাড়া কিসের তা বুড়ী ঠাকুরমাকে কী করে বোঝাব? তাঁর আনন্দ আমাদের ঘরে আটকে রাখায়। আমাদের আনন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ায়।

আমরা খেয়েদেয়ে উঠে আর একবার মাথা আঁচড়ালাম, জুতো ব্রাশ করলাম। মাকে তাগিদ দিয়ে ধোয়া জামা কাপড় বের করে নিলাম।

কিন্তু অনাথের কাজ যেন আর ফুরোয় না। সে গরুকে ঘাসজল দিল, কুয়োর বালতিতে নতুন দড়ি পরাল তারপর পাশের বাড়ির হলধর ধুপীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে লাগল। আমি অধীর হয়ে বললাম, 'কী অনাথ যাবে না? তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

অনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'নিচ্ছি নিচ্ছি। এখনই কি? খাওয়াদাওয়া তো সেই বিকালবেলায়।'

মনে মনে বললাম, 'লোক বুঝি শুধু খেতেই যায়?'

ভাঙ্গা আমার অচেনা জায়গা নয়। দশ এগার বছর বয়স থেকে রোজ আমি সেখানকার স্কুলে যাই। ইচ্ছা করলে আজও আমি একাই যেতে পারি। কিন্তু একা একা যাওয়ায় তো মজা নেই। দল বেঁধে যাব বলেই তো সাধাসাধি ডাকাডাকি।

শেষ পর্যন্ত অনাথ খেয়েদেয়ে তৈরী হয়ে নিল। দিদিভাই বললেন, 'এই ভরদুপুরের সময় তোরা কোথায় যাচ্ছিস?'

অনাথ বলল, 'না গিয়ে করি কী বুড়োঠাকরুন। পল্টুর জ্বালায় কি একটু তিষ্ঠোবার জো আছে? দেখছেন না সেই সকাল থেকে চলো চলো বলে কিরকম অস্থির করে তুলেছে। না বেরিয়ে উপায় আছে নাকি?'

আসলে ব্যাপারটা যে কি তা আমি জানি। বাবা অনাথকে ডেকে বলে গিয়েছিলেন সকাল সকাল যেতে। রসরাজ দাস বাবার বন্ধু। কাজ করবার লোকজন অবশ্য তাঁর অনেক আছে। তবু আমাদের বাড়ির অনাথ যদি সঙ্গে সঙ্গে থাকে একটু কাজকর্ম করে দেয়, ব্যাপারটা দেখায় ভালো।

সেইজন্যেই অনাথ তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছে। নইলে খেয়েদেয়ে অন্য দিনের মত আজও দু তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে তবে উঠত।

দিদিভাই বললেন, 'এই রোদের মধ্যে বেরোচ্ছিস ছাতা নিয়ে যাস তোরা। নইলে পুড়ে একেবারে খাক হয়ে যাবি।'

কিন্তু বাবা কাকা দুজনে দুটি ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন। আর যে দু তিনটে ছাতা আছে তার কোনটাই আস্ত নেই।

অনাথ বলল, 'দূর, এই ভাঙ্গা ছাতা নিয়ে কি হবে। চল তোমাদের নদীর ধার দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় নিয়ে যাব। তত রোদ লাগবে না।'

নদীর ধার দিয়ে মানে একেবারে জলের ধার দিয়ে নয়। নদী থেকে খানিকটা দূরে সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে নীচু পায়ে হাঁটা পথ। আমাদের ওই অঞ্চলের ভাষায় একে বলা হত 'হালোট'। এই পায়ে চলা পথ বর্ষার দিনে জলে ডুবে থাকে। প্রথমে তিরতির করে অল্প জল আসে। পায়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে। তারপর সেই জল বেড়ে বেড়ে হাঁটু অবধি ওঠে, কোমর অবধি ওঠে, বুক অবধি ওঠে, শেষে ডুব দিয়েও আর থই পাওয়া যায় না। তখন পায়ে চলা পথ হয় নৌকো চলা খাল। কিন্তু সে শুধু বর্ষায় আর শরতে। বাকী চারটি ঋতুতে এই খাল শুকনো খটখট করে।

এ পথ সত্যিই ছায়াঘন। দু দিকেই জংলা ভিটে, আম কাঁঠালের বাগান, বাঁশ ঝাড় আর তার ফাঁকে ফাঁকে বসতবাড়ি। হঠাৎ এক একবারে সবুজ বরণ জঙ্গলের আবরণ সরে যায়। স্বচ্ছ নদীর ধারা চোখে পড়ে। বেশ স্রোত আছে নদীতে। নদী ছোট হলেও বছরের সবসময় জল থাকে। শীতে গ্রীষ্মে কখনোই শুকোয় না।

খানিকটা পথ এগোতেই বড় একটা জংলা ভিটেয় কয়েকটি আমগাছ চোখে পড়ল আমাদের।

ডালে ডালে বহু আম ফলে আছে। সবুজ বরণ কাঁচা কাঁচা আম। দেখে চোখ জুড়োয়।

অনাথ বলল, 'এই বাগানে একটা কাঁচামিঠে আমের গাছ আছে।'

বাঙ্কু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'পেড়ে নাও না অনাথ, গোটা কয়েক পেড়ে নাও।'

কানু ধমক দিয়ে বলল, 'সন্দেশ রসগোল্লা কতরকমের মিষ্টিই তো আজ খাবি। আবার মিঠে আম দিয়ে কী হবে। বরং টক আম দু একটা নিলে হয়। মাঝে সাঝে টক খেয়ে নিলে বেশী মিষ্টি খাওয়া যায়। খেতে ভালোও লাগে।'

অনাথ বলল, 'ঠিক বলেছিস। টক আমই দু একটা পেড়ে পকেটে করে নিয়ে যাব।'

বলতে বলতে অনাথ গোটা দুই লাফ দিল। উঁচু ডালে যে আমগুলি ঝুলছে তার একটা দুটো ছিঁড়ে নেবে। কিন্তু অনাথ আমাদের সবাইয়ের চেয়ে মাথায় বড় হলে কি হবে উঁচু ডালের ফলগুলির সে কিছুতেই নাগাল পেল না।

কানু হেসে বলল, 'অনাথ, তুমি ওভাবে লাফালাফি করে একটা আমও ছিঁড়তে পারবে না। আম পাড়তে চাও তো গাছে ওঠো।'

অনাথ বলল, 'কেবল হুকুম চালাচ্ছ? তুমি ওঠো না। বুঝি ক্ষমতা।'

কানু মালকোঁচা মেরে গাছে উঠতে যাচ্ছে, আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'দরকার নেই। কার না কার গাছ। শেষে এসে বকুনি লাগাবে। বছরের প্রথম দিন। যাচ্ছি একটা ভালো কাজে—'

অনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। তুমি আর বাঞ্ছু তাহলে চলে যাও, আমরা আমটাম পেড়ে নিয়ে পরে যাচ্ছি।'

কিন্তু ওদের দুজনকে ফেলে এগিয়ে যেতে আমার মন সরল না। পরের গাছ থেকে আম চুরি করায় ভয় যেমন আছে, মজাও তো তেমনি কম নেই। সেই মজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা কি সোজা? আমার এক পা নড়ল আর এক পা নড়ল না। যাব কি যাব না ভাবতে ভাবতে হাঁটুভাঙা দয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

এদিকে অনাথ লাফিয়ে গিয়ে গাছে উঠল। নীচু ডালগুলিতে অনেক আম ছিল। কিন্তু ও সে সব ডাল থেকে আম না পেড়ে ক্রমেই উঁচুতে উঠতে লাগল। তারপর সেই ঘন ডালপালার মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ল আমরা ওকে দেখতেই পেলাম না। উঁচুতে ওঠার একটা নেশা আছে, লুকোচুরি খেলার একটা মজা আছে! হালখাতার কথা ভুলে গিয়ে অনাথ সেই মজায় মেতে রইল। আর মাঝে মাঝে কাঁচা আম তলায় পড়তে লাগল। যেন ঝড় উঠেছে।

আমি সভয়ে বললাম, 'অনাথ করছ কি। শিগগির নেমে এসো। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সে কথা অনাথের কানে গেল না।

কিন্তু আমার কথা কানে না গেলে কী হবে, পিছন থেকে একটা বাজখাঁই আওয়াজ শোনা গেল, 'কে রে?'

আমি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দেখলাম পাকাচুল দাড়িওয়ালা এক বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে বাঁশের লাঠি।

পরনে লুঙ্গি, খোলা গা। বুকের ঘন চুলগুলিও পেকে গেছে। বুঝতে পারলাম মুসলমান পাড়ার কেউ।

তিনি আবার হাঁক দিলেন, 'কে রে? কাঁচা আমগুলির সর্বনাশ করছে?'

এতক্ষণ হাঁটুভাঙা দ হয়েছিলাম এবার একেবারে থ। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

একটু বাদে আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'মিঞাসাহেব, কিছু মনে করবেন না। আমরা একটা কাঁচামিঠে আমের খোঁজ করছিলাম।'

● নরেন্দ্রনাথ মিত্র

‘কী হয়েছে শেখসাহেব ? ব্যাপারটা কী ?’

বুড়ো চেঁচিয়ে বললেন, ‘কাঁচামিঠে ! তোদের প্রত্যেকের পিঠে যদি একখানা করে লাঠি না ভাঙ্গি আমার নাম ইসুফ আলি নয়।’

অনাথ ততক্ষণে গাছ থেকে নেমে এসেছে। যেন কিছুই হয়নি তেমনি একটা মুখের ভঙ্গী করে হেসে বলল, ‘কী হয়েছে শেখসাহেব ? ব্যাপারটা কী ?’

বুড়ো শেখসাহেব চটে উঠে বললেন, ‘ব্যাপারটা কী। যেন কিছুই জানেন না। আম চুরি করতে গাছে উঠেছিলি ? ব্যাটা উল্লুক। আমি সবাইকে এক্ষুণি পুলিসের হাতে দেব।’

ভিতরে ভিতরে ভয় পেলেও অনাথ মুখে বেশ সাহসের ভাব দেখাল। হেসে বলল, ‘কী যে বলেন শেখসাহেব। আমরা কি চোর যে আপনি থানা পুলিস করবেন ? আপনার গাছের আম কেমন মিষ্টি হয়েছে তাই একটু চেখে দেখতে গিয়েছিলাম। আহাহা, কাঁচাতেই এমন গুড়, পাকলে কী অমৃতই না হবে।’

শেখসাহেব বললেন, ‘আমার অমৃতে দরকার নেই। যে আমগুলি পেড়েছ ফেরত দাও, আর তোমরা এসো আমার সঙ্গে। আমি সবাইকে আমার গুদামঘরে কয়েদ করে রাখব।’

তিনি হাত বাড়িয়ে আমাদের সবাইকে ধরতে এলেন।

অনাথ তাড়াতাড়ি বলল, ‘শেখসাহেব, যা বলবার আমাকে বলুন। ওদের গায়ে হাত দেবেন না। ওরা সব মিত্তিরমশাইয়ের ছেলে, ভাইপো।’

শেখসাহেব একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর একটু হেসে বললেন, ‘তাই না কি ? আল্লা আল্লা ! মিত্তিরমশাই আমার বন্ধু। আমার অনেক উপকার করেছেন। এক

ডাকে সবাই তাঁকে চেনে। তোমরা তাঁর ছেলে হয়ে—ছি ছি ছি! মানুষ নষ্ট মেলে, খাটান নষ্ট তেলে। নিয়ে যাও আমগুলি। যা নষ্ট করেছ নিয়ে যাও। ওই কাঁচা আম দিয়ে আমি আর কী করব।'

কিন্তু আমাদেরও মান অপমান বোধ আছে।

একটা আমও আমরা নিলাম না। অনাথও নিজের পকেটের আমগুলি সব তুলে নিয়ে শেখসাহেবের সামনে ফেলে দিল।

শেখসাহেব বললেন, 'ওগুলি দিয়ে আমি কী করব?'

অনাথ বলল, 'বিবিকে দেবেন। গামলা গামলা অম্বল রেঁধে খাওয়াবেন।'

শেখসাহেব কিছু বলবার আগেই অনাথ তাড়াতাড়ি পথে নেমে পড়ল। আমরাও তার পিছনে পিছনে ছুটলাম।

মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। বছরের প্রথম দিনে কাজটা ভালো হল না। আমাদের এই কীর্তি-কাহিনী বাবার কানে উঠলে কারো কানই আস্ত থাকবে না।

খানিক দূর গিয়ে অনাথ আর এক কাণ্ড করে বসল। কাছাটি খুলে ফেলল।

আমি বললাম, 'ও কি অনাথ, ও আবার কী হচ্ছে?'

অনাথ কোন কথা না বলে কাছার খুঁটের গিঁঠ খুলতে লাগল। তারপর একটি আম বের করে আমাদের সবাইয়ের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এই দেখ।'

আমরা অবাক্ হয়ে রইলাম। একটু বাদে আমি বললাম, 'তুমি তাহলে একটা আম এনেই ছাড়লে?'

অনাথ বলল, 'আনব না? এত কষ্ট করলাম কি মিছামিছি? তামাম দুনিয়া তোলপাড় করলেও এই আমটি খুঁজে বার করা শেখের সাধ্য ছিল না।'

নদীর ধারের পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা উঁচু রাস্তায় উঠলাম। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধানো রাস্তা। খুব বেশী বর্ষা না হলে এ রাস্তা জলে ডোবে না। ডানদিকে শূন্য মাঠ ধুধু করছে। বাঁ দিকে গৃহস্থদের বাড়ি। সবই প্রায় চাষী মুসলমান। কোন কোন বাড়ি থেকে মোরগের ডাক শোনা গেল।

হালখাতা করবার জন্যে আশপাশের গাঁ থেকে আরো জোয়ান আছে, বুড়োও আছেন। আমাদের মত অল্পবয়সী ছেলেরাও আছে। মুসলমান ভদ্রলোকদের মাথায় টুপি। দেখলেই চেনা যায়। কারো কারো সঙ্গে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে।

অনাথ নীচু গলায় বলল, 'মহাজনের গদিতে দেবে তো একটি করে টাকা, কিন্তু কতগুলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে তাই দেখ। সব রসগোল্লার লোভ।'

আমি বললাম, 'ওদের দোষ দিচ্ছ কেন। রসগোল্লা বুঝি আমরাই কিছু কম ভালোবাসি!'

অনাথ কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাঙ্কু তোমাদের ভূগোলে তো লেখা আছে, পৃথিবীটা রসগোল্লার মতই গোল।'

বাঙ্কু ভুল শুধরে দিয়ে বলল, 'না না, কমলালেবুর মত।'

অনাথ বলল, 'যাই হোক গোল তো নিশ্চয়ই। ধর, গোটা পৃথিবীটা যদি মস্ত বড় একটা ছানার রসগোল্লা হত, কী করতিস তাহলে?'

বাঙ্কু বলল, 'তুমিও যা করতে আমিও তাই করতাম। উঠে বসতাম তার ওপর।'

'তারপর?'

'তারপর খানিকটা করে ভেঙে ভেঙে খেতাম। কোনদিন ফুরোত না।'

যেতে যেতে গোটা দুই কাঠের পুল পেরোলাম। বর্ষার সময় এই পুলের নীচ দিয়ে নৌকা চলে। গঞ্জের মুখেই নদীর ধারে অনেকখানি খোলা জায়গা। বড় বড় গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে। করাতীরা করাত চালাচ্ছে। দাসেদের কাঠের থলি। আরো খানিকটা পথ যাবার পর আমরা দাসেদের দোকানঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকানঘরটি আজ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। দুদিকে দুটি কলাগাছ পোঁতা! জলভরা দুটি মাটির কলসী তার গোড়ায়। গাছের ডালে ডালে রঙীন কাগজের শিকল জড়ানো।

দোকানে তখনো তেমন ভিড় হয়নি। লোহার কড়া বালতিগুলি খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আজ যেন বিক্রির দিকে তেমন মন নেই দোকানদারের। ক্রেতাদের সঙ্গে আজ যেন শুধু তাঁর রসের আর রসগোল্লার সম্পর্ক।

রসরাজ দাস এই দোকানের মালিক। ছোটখাটো চেহারা। গায়ের রং কালো। কিন্তু নাক মুখের গড়ন ভারী সুন্দর। অন্য দিন খালি গায়ে থাকেন। আজ একটি ফরসা ফতুয়া পরেছেন। কপালে তিলক। গলায় তুলসীর মালা। পরম বৈষ্ণব।

তিনি নিজেই এগিয়ে এসে আমাদের আপ্যায়ন করলেন, 'এসো এসো পল্টু। বাবাজীরা এসো।'

দোকানঘরের আধখানা জুড়ে দুখানা তক্তপোশ পাতা। তার ওপর ফরাস

বিছানো। ফরাসের ওপর পাশাপাশি গোটা তিনেক হাতবাক্স। প্রত্যেকটি বাক্সের ওপর একখানা করে লাল খেরো বাঁধানো বড় আকারের খাতা। প্রত্যেকটি বাক্সের পিছনে একজন করে কর্মচারী বসে আছেন। এঁদের প্রত্যেককেই আমরা চিনি। লম্বা রোগা শচীন রায়, টিকোলো নাক আর সরু গোঁফের হরিপদ দাস আর সবচেয়ে কম-বয়সী বেঁটেখাটো গোলগাল মতিলাল। বাক্স আর খাতাগুলিতে সিঁদুরের পুত্তলী আঁকা। শুভ চিহ্ন। কর্মচারীদের কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা।

সামনে বিরাট একখানি থালা। সেই থালা টাকায় টাকায় ভরে উঠেছে। রুপোর টাকাই বেশী। নোটও পড়েছে।

খদ্দেররা সব টাকা জমা দিচ্ছে। বাকী বকেয়া যা ছিল সব আজ নতুন বছরের শুরুতে শোধ করে দিতে হবে। যার বাকী নেই সে কেবল একটি টাকা দিচ্ছে। তাতেই তার নাম উঠে যাচ্ছে খাতায়। আমার বহুদিনের সাধ ওই তিনটি খাতার কোন একটিতে আমার নাম ওঠে। কিন্তু তার উপায় নেই। নাম লেখা হবে বাবার! আমরা শুধু রসগোল্লা খাবার জন্যে এসেছি।

ক্রমে দোকানের ভিড় বাড়তে লাগল।

অনাথ কাজে লেগে গেল। আমরা তিনভাই ফরাশের একদিকে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। আর কতবার ঝারি থেকে আমাদের গায়ে গোলাপ জল এসে পড়ে তাই গুনতে লাগলাম।

একটু বাদে পরিচিত গলার ডাক শুনে চমকে উঠলাম। 'দোস্ত, তোমরা এখানে বসে আছো। খেয়ে নাও, তোমরা এবার খেয়ে নাও। এই বৈঠকে বসে যাও তোমরা।'

চোখ তুলে দেখি আমাদের গাঁয়ের জীবন শীল। কাছাকাছি বাড়ি আমাদের। পরামানিকের ব্যবসা জীবনের। ওদের বাড়ির বকুলতলায় বসে সারা গাঁয়ের লোকের চুল ছাঁটে, দাড়ি কামায়। ওরই পাশে বসে কাজ করে জীবনের ভগ্নীপতি রামনিধি। সে আবার ডান হাতে কাজ করতে পারে না। বাঁ হাতে ক্ষুর কাঁচি ধরে। কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা করে বলে বামনিধি। রামনিধি ভারী সরল আর শান্ত মানুষ। জীবন তার উলটো, খুব চালাক চতুর। চোখে মুখে কথা বলে। ক্ষুরের ফলার মতই ওর বুদ্ধি, লোকে বলে। লোকে আরো নানাকথা বলে। আমরা কিন্তু জীবনকে খুব ভালোবাসি। জীবন আমাদের তিন ভাইয়েরই দোস্ত। খোদ দোস্ত অবশ্য আমিই। জীবন আমার চেয়ে বয়সে দুগুণ আড়াইগুণ বড়। কিন্তু রঙ্গ রসিকতায় সমবয়সী।

কোন্ শৈশবে আমি যে তার সঙ্গে 'দোস্তি' পাতিয়েছিলাম তা আমার মনেও নেই। একটু বড় হওয়ার পরেই দেখছি বাবা কাকা মামা দাদার মত দোস্ত ডাকটাও আমার মুখ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই বেরিয়ে আসছে। আমার মুখ থেকে শুনে শুনে কানু বাঞ্ছুও জীবনকে দোস্ত বলেই ডাকে।

দোস্তের মাথায় ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল। তারও গলায় তুলসীর মালা। ভঙ্গীতে বিনয়, কথায় মধুরতা।

জীবন শীল শুধু বাড়িতে বসেই দাড়ি কামায় না, ভাঙ্গার বাজারে ও বটতলায় বসে ক্ষৌরকর্ম করে। কত দিন বাবা কাকার সঙ্গে বাজার করতে এসে তাকে ক্ষুর কাঁচি চালাতে দেখেছি। আমি এম. ই. স্কুল থেকে পাস করে হাইস্কুলে ও দুই ক্লাস জাতিভেদ, গুণকর্মের তারতম্যভেদ সম্বন্ধে আমার চেতনা বেড়েছে। কিন্তু ক্ষুরধারী জীবন শীলকে দোস্ত বলতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই।

আজ পয়লা বৈশাখে রসরাজ দাসের দোকানে জীবন শীলের অন্য ভূমিকা। তার হাতে আজ রসগোল্লার বালতি, সন্দেশের থালা, দইয়ের হাঁড়ি। কোমরে লাল গামছা জড়ানো জীবন শীল আজ মধুর রসের পরিবেশক।

'তোমরা এবার বসে যাও দোস্ত।'

জীবন শীল আমাদের ডেকে ভিতরে নিয়ে গেল।

অন্যান্য দোকানে হালখাতার মিষ্টি দুটি চারটি। লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটির খোরায় করে খায়। কেউ বা হাতকেই পাত্র করে। কিন্তু লোহা আর কাঠের ধনী ব্যবসায়ী রসরাজ দাসের দোকানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। এখানে হাত পেতে খাওয়া নয়, বিয়ে অন্নপ্রাশনের মত এখানে পাত পেতে ভূরিভোজের বন্দোবস্ত।

জীবন শীলের পিছনে পিছনে গিয়ে দোকানঘরের উত্তরদিকে আর একটি লম্বামত ঘরে আমরা খেতে বসে গেলাম। সারি সারি আরো কতজনে বসেছে। তাদের খুব কম লোককেই চিনি। বসবার জন্যে কুশাসন আর ভোজনপাত্র হিসাবে তাজা সবুজ কলাপাতা সামনে পাতা।

বসতে গিয়ে একটি ভারী জিনিস বুকপকেটে অনুভব করলাম। পকেটে হাত না দিয়েও বুঝতে পারলাম বস্তুটা কী। শেখসাহেবের গাছের সেই আমটা। অনাথ কাছা থেকে খুলে কোন্ ফাঁকে আমার পকেটে গলিয়ে দিয়েছে।

কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। তবু চেপে গেলাম। চেপে বসলাম খেতে।

জীবন শীল পরিবেশন করতে লাগল। তার সহায়তা করছে দোকানের আরো দু'তিনজন কর্মচারী। অনাথও কাজে লেগে গেছে। পিতলের জাগ থেকে জল ঢেলে দিচ্ছে মাটির গ্লাসে।

কানু একসময় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'দেখেছ দাদা। অনাথের দুটো গাল কেমন ফোলাফোলা। নিশ্চয়ই একগালে রসগোল্লা আর একগালে সন্দেশ ভরে নিয়েছে।'

বাঙ্কু বলল, 'দূর। তাহলে একটা গাল গোল আর একটা গাল চ্যাপটা দেখাত। দুটো গালই যখন গোল ওর দুই গালেই রসগোল্লা আছে।' সবাইকেই যাচাই করে খাওয়ানো হল। জীবন শীল আমাদের বন্ধু। সে তো বেশী করে দেবেই। আমরা কতক খেলাম, কতক পাতে ফেলে রাখলাম।

কাঁচা আম খেয়ে রুচি বাড়াবার দরকার হল না। আনারসের চাটনি পড়ল পাতে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেলে আসরের সবাই উঠে পড়ল। কিন্তু বাঙ্কু আর ওঠে না।

আমি আতঙ্কিত হলাম। পেট-রোগা বাঙ্কুটা কিছু একটা ঘটিয়ে বসেনি তো?

বললাম, 'কী হল তোর?'

বাঙ্কু বলল, 'খাওয়ার সময় কষি খুলে নিয়েছিলাম। এখন এক হাতে পরতে পারছিনে, পরিয়ে দাও।'

আমি ওকে সাহায্য করলাম।

তখনকার দিনে আমাদের সেই হাফটিকিটে ট্রেনে আর স্টীমারে ওঠার বয়সেও হাফপ্যাণ্ট আমরা কদাচিৎ পরতাম। বিশেষ করে উৎসব অনুষ্ঠানে ফুল কোঁচা ঝুলিয়ে সবাই ফুলবাবু হয়ে বেরোতাম।

খাওয়া শেষ করে বড় দোকানঘরে এসে দেখি বাবা কাকা এসে ফরাশের পাশে দুখানি চেয়ারে বসে আছেন। দাসমশাইয়ের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলছেন।

আমাদের দেখে বাবা হেসে বললেন, 'কী হালখাতা হল তোমাদের?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাঙ্কুর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'কী জ্যাঠামশাই, রসগোল্লা কটা হল?'

কানু বলল, 'বাঙ্কু এবার বেশী খেতে পারেনি। সাতটা কি আটটা হয়েছে।'

বাঙ্কু প্রতিবাদ করে বলল, 'না না দশটা।'

কাকা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, 'কাল রামডাক্তারকে ডাকতে না হলেই বাঁচি।'

● নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কিন্তু বাবা আর একটি গুরু-দায়িত্ব দিলেন আমাদের—'এই তিনটি টাকা নিয়ে যাও। আরো তিন ঘরে হালখাতা করে আসবে। পূর্ণ সা, হরকুমার সা আর সান্যালদের দোকানে হালখাতা সেরে এসো।'

আমি কাতরমুখে বললাম, 'কিন্তু খেতে পারব না কিছু।'

বাবা বললেন, 'খেতে হবে না। শুধু টাকা দিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে আসবে।'

গঞ্জের তিনটি দোকানই আমাদের চেনা। একটি তামাক পাতার আড়ত আর একটি তেল নুন মসলাপাতির বড় দোকান আর একটি দোকান কাপড়ের। সব দোকানেই আজ নিমন্ত্রণ সারতে হবে।

গঞ্জের কাঁচা মাটির রাস্তার ছুদিকে সারি সারি সব টিনের গুদামঘর, দোকানঘর। দলে দলে লোক ঢুকছে বেরোচ্ছে। কেউ বা পান খেতে খেতে আসছে, কেউ বা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। আজ বাজারের চেহারাই অন্যরকম। সব বাড়িই যেন বিয়েবাড়ি।

বাঙ্কু যেতে যেতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে এরা সব করে! সবাইকেই পয়লা বৈশাখে হালখাতা করতে কে বলেছে? পাঁজিতে দোসরা বৈশাখ তেসরা বৈশাখ তারিখগুলিও তো আছে, কী বলো দাদা? এক এক দোকানে যদি এক এক দিন পয়লা বৈশাখ হত—'

কানু বলল, 'হ্যাঁ, তাহলে তোর খুব সুবিধা হত। রোজ দশ বারোটা করে রসগোল্লা চালাতে পারতিস।'

অন্য দোকানগুলিতে রসরাজ দাসের দোকানের মত অমন রাজকীয় ব্যবস্থা নয়। তবু আমরা সব দোকানেই সমাদর পেলাম। টাকা দিয়ে হালখাতা করলাম। কিন্তু কিছুই প্রায় খেতে পারলাম না। লক্ষ্য করলাম বাঙ্কু পর্যন্ত মিষ্টিগুলি অন্য সবাইয়ের চোখের আড়ালে ফেলে দিচ্ছে। কোন কোন সময় আমরা চুরি করে খাই। আবার চুরি করে না খাওয়ার সময়ও আসে।

তামাকের আড়তদার পূর্ণ সার মাথার সব চুল পাকা। আর কথার সবটুকুতে রস। বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে আমরা ঠাকুরদা বলে ডাকি। তিনি সেই সুবাদে ঠাট্টা তামাশা করেন। আসবার সময় হুঁকোটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে ভায়া একটা ছুটো টান দিয়ে যাও। তামাকের দোকানে এসেছ, তামাক খেয়ে যাবে না সে কি কথা?'

বাটাভরা পান ছিল। পান অবশ্য আমাদের দিলেন না। কিন্তু চুনের বোঁটা বুলিয়ে বুলিয়ে বাঞ্ছুর দুটি গালে চুনকাম করে দিলেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে বাঞ্ছু রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'বুড়ো তো ভারী ইয়ে—।'

রাত হয়েছে। দোকানে দোকানে হ্যাজাক লাইট জ্বলছে। কোন কোন দোকানে চৌদ্দ লাইট। ছড়ানো বড় ঢাকনির নীচে লম্বা চিমনি। ঘরের মাঝখানে ঝুলিয়ে সারা ঘর ঝলমল করা হয়েছে। শুনেছি চৌদ্দটি বড় বড় মোমবাতির আলো আছে এতে। তাই চৌদ্দ লাইট।

অন্য দোকানগুলিতে হালখাতা সেরে আমরা আবার দাসমশাইয়ের দোকানে ফিরে এলাম। দোকানে তখনো ভিড়। গোলাপজলের ঝারি থেকে অতিথিদের গায়ে জল ছিটানো হচ্ছে। ভিতরে আসরের পর আসর বসছে। নদীর উত্তর পারে উকিল মোক্তার মুন্সেফরা থাকেন। তাঁরা এসেছেন হালখাতা করতে। সবাই তাঁদের সঙ্গে সমীহ করে কথা বলছেন।

মাঝখানে খাবারঘরে না ভাঁড়ারঘরে কিসের যেন একটা গোলমাল উঠল। দোকানের কর্মচারীদের সেদিকে যেতে দেখলাম। দাসমশাই নিজে গিয়ে সেই গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে এলেন!

আমি যেতে চাইছিলাম। বাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'থাক। ওদিকে তোমার যেতে হবে না।'

কানু আর বাঞ্ছুর চোখ তখন ঘুমে ঢুলুঢুলু। দাসমশাই ভিতরের একটা ঘরে নিয়ে ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

একটু বাদে লক্ষ্য করলাম আমার দোস্ত জীবন শীল আর পরিবেশন করছে না। ভাঁড়ারের ধারে কাছেও যাচ্ছে না। মুখ ভার করে এদিকওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মুখে তো কেউ চুনের বোঁটা বুলিয়ে দেয়নি, তবু সে অমন মুখ চুন করে রয়েছে কেন? কেন যেন দেখে ভারী কষ্ট হল।

আরও খানিকক্ষণ পরে দাসমশাইয়ের দোকানের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বাবা এবার সবাইকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠে পড়লেন। এত রাত্রে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা আর হেঁটে যাব না, নৌকোয় যাব।

দাসেদের দোকানের পিছনেই নদীর ঘাট। সেই ঘাটে এক-মাল্লাই নৌকো আছে কয়েকখানা। তারই একখানা নৌকো বাবা ভাড়া করলেন। দাসমশাই দই আর

রসগোল্লার হাঁড়ি দিয়েছেন আমাদের বাড়ির জন্যে। অনাথ সেগুলি তুলল। কানু বাঞ্ছুকেও টানাটানি করে নৌকোয় তোলা হল। অনাথ বাঞ্ছুকে আড়কোলে তুলে নিয়ে বলল, 'এটাও তো এক রসগোল্লার হাঁড়ি।'

জীবন শীল ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। জিনিসপত্র তোলায় সাহায্য করছিল।

বাবা তাকে বললেন, 'তুমিও চলে এসো জীবন! নৌকোয় এসো।'

জীবন বলল, 'আমি হেঁটেই যেতে পারব মেজোকর্তা।'

কাকা বললেন, 'আরে হেঁটে যাবে কেন। নৌকোতেই এসো।'

ওঁরা ছইয়ের মধ্যে বসলেন। আমি বসলাম বাইরে অনাথের কাছে।

গরমের দিন। এতক্ষণ লোকজনের ভিড়ে ঘরের গুমোটের মধ্যে কাটছিল। এখন বাইরের হাওয়া আর জলের ছোঁয়ায় ভারী ভালো লাগতে লাগল। আকাশে চাঁদ নেই। কিন্তু অগুনতি তারা রয়েছে। সেই তারার আলোয় গাঁয়ের হাটুরেরা ভারী বোঝা নিয়ে পথ চলে, গাঙের মাঝি নৌকো বায়। আমাদের নীল লুঙ্গি পরা, কালো দাড়িওয়ালা মুসলমান মাঝিটিও একটানা বৈঠা বেয়ে যাচ্ছিল।

নদীর দুদিকে গাছের সারি। আম জাম, বাঁশঝাড়। এখন আর আলাদা করে কোন গাছকে চেনা যাচ্ছে না। মাঝির কালো চাপদাড়ির মতই অন্ধকারে সব একাকার হয়ে আছে।

ছইয়ের ওদিকে বসে বাবা মৃদুস্বরে জীবন শীলকে কী যেন বলছিলেন। খানিকটা খানিকটা আমার কানে যেতে লাগল।

'কাজটা ভালো করনি জীবন। দাসমশাই তোমাকে অমনিই দেন। তবু এ কী স্বভাব তোমার।'

প্রতিবাদে জীবন কী বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আমি অনাথকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হয়েছে অনাথ?'

অনাথ বলল, 'এখন নয়, বাড়ি গিয়ে বলব।'

অনাথ কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'জীবন এক বালতি রসগোল্লা সরাবার চেষ্টা করেছিল। ধরা পড়ে গেছে। বেঁটে মতিলাল তক্কে তক্কে ছিল। ওকে হাতে হাতে ধরেছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। জীবন শীল আমার দোস্ত, আমার বন্ধু। কিন্তু একী কাণ্ড! ঠিক ঘৃণা নয়, রাগ নয়। কিসের যেন একটা অসহায় দুঃখ আর অভিমানে আমার মন ভরে উঠল।
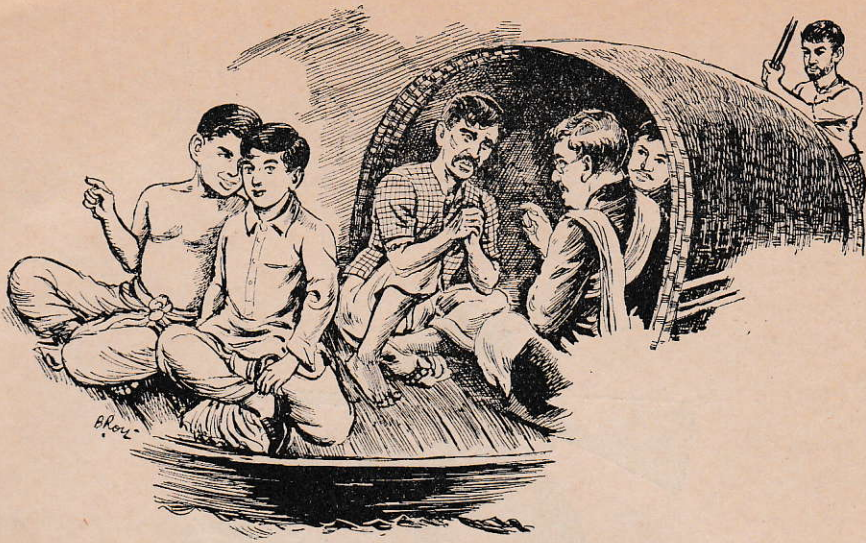
● হাল খাতা

কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, [পৃঃ ৪৩৬

আমার মনে পড়ল প্রতিবছর হালখাতার পরের দিন জীবন শীলের বাড়িতে আর একটি নেমন্তন্ন হয়। জীবনের ছেলেমেয়ে হয়নি। পাড়ার ছেলেদের ডেকে নিয়ে জীবন তাদের মিষ্টি খাওয়ায়। সেই আসরে আমাদেরও ডাক পড়ে। জীবন আর তার বউয়ের হাত থেকে আমরা আর একদফা রসগোল্লা নিই। কে জানে সেই রসগোল্লায় এত গোল। কে জানে সেই সব মিষ্টি জীবনের কতগুলি নিজের হাতে কেনা, আর কতকগুলিই বা হাতসাফাই করা।

আমি নৌকোর একেবারে ধারে এসে বসেছিলাম।

অনাথ সতর্ক করে দিয়ে বলল, 'ঢুলতে ঢুলতে পড়ে যাবে পল্টু। সরে বোসো।'

ঘুমে আমি কিন্তু ঢুলছিলাম না। তবে সরে বসলাম। সরে বসতে গিয়ে পকেটের ভারী জিনিসটা ফের অনুভব করলাম। বুঝতে পারলাম বস্তুটা কী! চোর না হয়েও চোরের থলিদার হয়ে রয়েছি।

অন্ধকারে সবাইয়ের অলক্ষ্যে পকেটে হাত ঢুকালাম। তারপর সবাইয়ের অগোচরে আমটা তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলাম।

———

শিকারী শিম্পু

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শিম্পু শিকারে যায় বুক ফুলিয়ে
গুলিভরা বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে।
সঙ্গে জাম্বু থাকে তার শুধু 'ছবি'
ক্যামেরায় ধরে রাখা শিকারের ছবি।

কুরুর! কুরুর! ক্র্যাক্! কাল পেঁচা ডাকে
হেঁটমুখো বাদুড়েরা ঝোলে শাখে শাখে।
ঘুটঘুটে রাত্তিরে ঘন জঙ্গলে,
খুড়ো ভাইপোর হাতে জোড়া টর্চ জ্বলে।

মাঝে মাঝে গুলি ছোটে গুড়ুম গুড়ুম
চারদিকে হুড়োহুড়ি পালাবার ধুম।
বাঘ তো পগার পার খাড়া লেজ তুলে
অজগর জুজুবুড়ি বটগাছে ঝুলে।
বন্দুক কাঁধে খুড়ো চলে থুপথুপ,
পশুরাজ সিঙ্গিও আতঙ্কে চুপ ;
লাফিয়ে চতুর চিতা ওঠে মগডালে
লুকোয় সবুজ ঘন পাতার আড়ালে।

গণ্ডার শিম্পুকে দেখে ভয়ে কাঠ,
প্রাণ নিয়ে পালাবার খোঁজে পথ ঘাট।
খেদায় আটক পড়ে বোকা বুনো হাতি
নিভে যায় লাখো লাখো জোনাকির বাতি।
কাঁটা ঝোপে মুখ গুঁজে ভাল্লুক কাঁপে
আচমকা জ্বর আসে প্রচণ্ড তাপে।
লতায় জড়িয়ে যায় হরিণের শিং
বানর লাফায় নাকো তিড়িং মিড়িং।
জিরাফ জেব্রা দেয় ভয়ে পিট্টান
নিঝ্‌ঝুম মশাদের গুনগুন গান।
উলুবনে মুখ গোঁজে ভীরু খরগোশ
হিংসুটে কেউটের থামে ফোঁস্‌ফোঁস্।
শিম্পুর বন্দুকে বাপরে কী টিপ্!
উড়ো পাখি ভয়ে কাঁপে বুক ঢিপঢিপ্।
গুড়ুম শব্দ শুনে ফুলের ওপর
মৌমাছি প্রজাপতি কাঁপে থরথর॥

● বিমলচন্দ্র ঘোষ
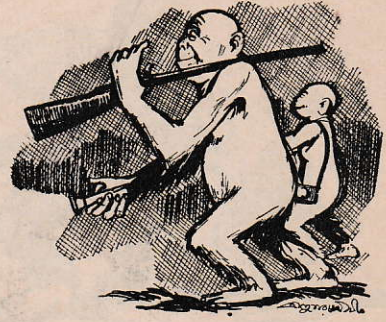
থেমে যায় মাছিদের ভনভন সুর
ঝিল্লির পাখনায় বাজে না নূপুর।
বন্দুকে শিম্পুর মোক্ষম তাক
আওয়াজে পালায় উড়ে পায়রার ঝাঁক ॥
ছাতারে চড়ুই ফিঙে বুলবুলি বক
বাসায় ঝিমোয় পেয়ে বুক-কাঁপা 'শক্'।
কুমির তোলে না মাথা জলে ডুবে থাকে,
ক্যা হুয়া হুক্কা হুয়া ! শিয়ালেরা ডাকে ॥

দুমদাম্ ফটাফট্ শুনে হাঁকা-ডাকা
বুনো হাঁস উড়ে যায় ধুধু বিল ফাঁকা।
ফাঁকা বন ফাঁকা মাঠ নদ নদী খাল,
শিকারের খোঁজে হ'ল শিম্পু নাকাল ॥

থোঁতা মুখ ভোঁতা করে খুড়ো ফেরে বাড়ি।
জাম্বুকে বলে, "তুই অপয়ার ধাড়ি!"
বেচারী জাম্বু বলে, "দোষ কি আমার?
তুমিই তো গুলি ছুড়ে তাড়ালে শিকার ॥"

খুড়ো বলে, "চোপ্ রও!" রেগেই আগুন,
"শিকারের কি বুঝিস আইন কানুন?"
হঠাৎ শিম্পু খুড়ো ছাড়ে চিৎকার,
"এই তো মরেছে এক জবর শিকার ॥"

দু' আঙুলে চিট্‌কেনা ইঁদুরটা তুলে
উল্লাসে শিম্পুর বুক ওঠে ফুলে।
জাম্বু লাফিয়ে বলে, "সাবাস! সাবাস!"
ক্লিক্! ক্লিক্! ছবি তোলে ক্যামেরার ফ্ল্যাস্ ॥

দু' আঙুলে চিট্‌কেনা ইঁদুরটা তুলে······

(শিকারী শিম্পু···পৃঃ ৪৪০)
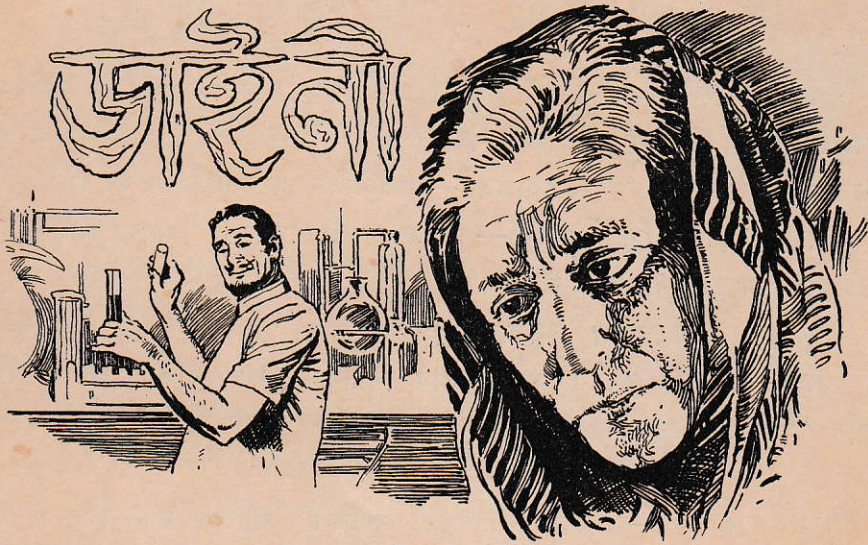
ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

"নিরুদ্দেশ। নিরুদ্দেশ।

নাম—মেরী মেলন। উচ্চতা—মাঝারি। গড়ন—দোহারা। নিম্ন ঠিকানায় পাচিকার কাজ করতেন। কাল সন্ধ্যা ছ'টার পর থেকে নিখোঁজ। কেউ সংবাদ পেলে দয়া করে জানাবেন।"

* * * *

"সাবধান। সাবধান।

আপনি কি নতুন কোন পাচিকা অথবা পরিচারিকা নিয়োগ করেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে বিস্তারিত বিবরণ সহ জানান। নিকটবর্তী পুলিস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করুন। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।"

* * * *

"মেরী মেলন—কাগজের এই চিঠি পড়ে আশ্বস্ত হোন। লোকে যা বলে

বলুক—আমরা জানি আপনি ডাইনী নন। আপনি মানুষ। দয়া করে আপনাকে পরীক্ষা করতে দিন। স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন।"

* * * *

১৯০৬ সালের কথা। সেই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনগুলো বেরুচ্ছিল তখন আমেরিকার কাগজগুলোতে। ডাইনীবুড়ীর জন্যে শহরের সবাই যেন পাগল। খোঁজ খোঁজ রব। হন্যে হয়ে ঘুরছে পুলিস দপ্তরের লোকজন—স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তার দল।

ধরা পড়েছিল সেই ডাইনী—পাচিকা মেরী মেলন। বিচার হল। মেনে নিতে হলো তাকে নির্বাসিতার জীবন।

কিন্তু কী তার দোষ? অভিযোগ?

থাক—সে কথা পরে। আগে তার নির্বাসনের কথা বলি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের ইতিহাসের কথা।

কারাগার নয়,—সরকারের দেওয়া কুটির। শাস্তি নয়—মুক্তি। তবু যন্ত্রণা—নির্বাসন। এক-দু বছর নয়—পঁচিশটি বছর।

হ্যাঁ, পঁচিশ বছর ধরে মেরী মেলন আশ্চর্য এক যন্ত্রণা আর দুঃখে জ্বলছিলেন। আমেরিকার নর্থ ব্রাদার আইল্যাণ্ডে তিনি ছিলেন বন্দিনী। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে মেরী মেলন তখন আর মানুষ নন—পড়ো বাড়িটায় সত্যি সত্যি যেন এক ডাইনী। সবাই ডাকত ডাইনীবুড়ী।

ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত ডাইনীবুড়ী। রুপোর তারের মত সাদা চুল, ঘোলাটে চোখ, মুখের রেখায় বয়সের হিজিবিজি। ছোট বাড়িটায় দিন কাটাত একা একা। মানুষের পায়ের শব্দে চমকে উঠত—ভয় পেত। ছুটে পালাত ঘরে।

ঘর!

না ঘর নয়—যেন অন্ধকূপ। সেই বাড়ির দরজা জানালা সব সময়ই বন্ধ। কাউকে মুখ দেখাত না ডাইনীবুড়ী। কেউ দেখতে পেত না—কেউ না। কেবল দেখতে পেত খাবার দিতে আসা সরকারের লোকজন।

তখন দরজা খুলে দিত বুড়ী। কলের পুতুলের মত হাত বাড়াত। খাবার ভরতি টিফিন ক্যারিয়ার বুড়ীর হাতে তুলে দিয়েই দৌড়ে পালাত লোকেরা। রাস্তায় পৌঁছে বুকের ভয়টা কমত বুঝি। ডাইনীবুড়ীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি সোজা কথা ?

…তুলে দিয়েই দৌড়ে পালাত লোকেরা।

ভয় পেত বাচ্চারা। "ডাইনীবুড়ী আসছে—ঐ আসছে বুড়ী।" নাম শুনলেই আতঙ্কে শিউরে উঠত। কান্না থামাত। মুখ লুকোতো মার বুকে।

বাড়ির গায়ে ঢিল ছুড়তো ডানপিটে সব ছেলের দল। চিৎকার করে উঠত—"এই ডাইনী, তোর লম্বা নখ দেখা, বিরাট শিং দেখা, কুলোর মত জিভ দেখা।"

ওসব কিছু ছিল না মেরী মেলনের। সে ছিল সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ। ছেলেদের কথায় কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘরে বসে থাকত ডাইনীবুড়ী। কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে ততদিনে। তখন আর কান্না নেই—আছে দীর্ঘশ্বাস। আর আছে বুকফাটা নীরব আর্তনাদ—"ভগবান্, আমার কী দোষ? আমি যে ভাগ্যদোষে দোষী। আমার মৃত্যু দাও প্রভু।"

এমনি করে দিন কাটছিল বুড়ী মেলনের।

* * * *

১৯৩২ সাল।

নর্থ ব্রাদার আইল্যাণ্ডে সেদিনটা বড়দিন। চারদিকে আনন্দ শুধু আনন্দ। ছুটির আমেজে রাস্তাঘাটে কাতারে কাতারে লোক—হইচই—গণ্ডগোল। রোজকার মত সেদিন খাবার নিয়ে এসেছে সরকারের লোক—মিঃ জন। দরজার সামনে এসে থামল। কড়া নাড়ল।

● ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

কিন্তু ডাইনীবুড়ী কোথায়? বারবার কড়া নেড়ে সাড়াশব্দ না পেয়ে বিরক্তি ধরে গেল জনের। অধৈর্য হয়ে পড়ল। কী হল মেরী মেলনের? রোজ আসতে না আসতেই দরজা খোলে বুড়ী—খাবার নেয়। আজ দেরি কেন?

কৌতূহলী হয়ে পাশের নড়বড়ে জানালাটার দিকে ভয়ে ভয়ে এগোল জন। ধাক্কা দিতেই জানালা খুলে গেল। চমকে উঠল ও। ঘরের মেঝেয় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বুড়ী। চোখ দুটোয় যন্ত্রণার কাঁপন। মুখে অস্ফুট আর্তনাদ। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে ডাইনীবুড়ী—চেয়ে আছে অসহায়ের দৃষ্টি মেলে।

দৌড়ে অফিসে ফিরল জন। খবর দিল। লোকজনেরা এল, এল চিকিৎসক আর অ্যাম্বুলেন্স। ডাইনীবুড়ী ভরতি হল হাসপাতালে—নামকরা রিভারসাইড হাসপাতাল।

* * * *

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮।

সায়েন্ট রেমণ্ড কবরখানায় তখন দিনের আলো নিভু নিভু। কেমন এক ছায়া ছায়া অন্ধকার। রাশি রাশি ফুল আর লতায় পাতায় ছাওয়া জায়গাটায় কেমন এক বিষণ্ণতার ঢল। থমথমে নির্জনতায় দাঁড়িয়ে আছে শ'য়ে শ'য়ে প্রস্তরফলক। বুকে লেখা নাম-ধাম-পরিচয়। সমাহিত সব লোকজনদের ঠিকানা।

বিকেল থেকেই ভিজিটাররা আসে। কেউ আসে ফুল নিয়ে। কেউ বা সমাধির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। বুকে ক্রশ এঁকে সম্মান জানায়। কারও বা চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে।

সেই দিনের শেষে কবরখানার পাশে এসে দাঁড়াল অ্যাম্বুলেন্স। এলো রিভারসাইড হাসপাতাল থেকে। মৃতাধার সঙ্গে নিয়ে নামল দুজন মানুষ। ঘেন্নার সাথে কফিনটা যেন ছুড়ে দিল কবরস্থানে।

ওখানকার অফিসের খাতায় নতুন নাম উঠে গেছে ততক্ষণে—মেরী মেলন। ঠিকানা—রিভারসাইড হসপিটাল।

না, মৃত্যুর দিনেও কেউ আসেনি বুড়ীর সঙ্গে। ফুল আনল না, 'ক্রশ' করল না—ছলছলে হয়ে উঠল না কারও দুটো চোখ।

● ডাইনী

কিন্তু কেন এই অবজ্ঞা বঞ্চনা অপমান? কী দোষ ছিল ডাইনীবুড়ীর? তাহলে বলতে হয় সেই পুরোনো কথা। ফিরে যেতে হয় সেই ১৯০৬ সালে—বিজ্ঞাপনের কালে।

অপমান।

তা নয়ত কি? স্বাস্থ্যদপ্তরে বসে বড় সাহেবের চিঠিটা বারবার পড়েন ডাক্তার জর্জ সোপার। যত পড়েন ততই যেন মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

এ লজ্জা তাঁর শুধু নিজের নয়—সবার। সমস্ত সহকর্মীদের। কৈফিয়ত তলব করেছেন বিভাগীয় অধিকর্তা, "টাইফয়েড হঠাৎ কেন হচ্ছে? কি করছ তোমরা? জবাব দাও।"

হাঁ, অসুখটার নাম টাইফয়েড।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে তখন কোথায় এত ওষুধ আর ইঞ্জেকশন? তখন টাইফয়েড মানেই যেন মৃত্যু। একজনের অসুখ হয়ত হাজার লোকের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। লোকে তাই টাইফয়েডের নামে কাঁপে।

কিন্তু এ বছর অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন ডাঃ সোপার। শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাতটা বাড়িতে দেখা গিয়েছে এই অসুখ। প্রাণ হারিয়েছে অনেকে।

কোথা থেকে এল রোগের জীবাণুরা? কি করে হল টাইফয়েড?

রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে কম চেষ্টা করেননি সোপার সাহেব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছেন, অসুখ হওয়া বাড়িতে বাড়িতে। জীবাণু বহনকারী জল, খাবারদাবার—সবই পরীক্ষা করেছেন তন্নতন্ন করে। কিন্তু না—জীবাণু কোথাও নেই। নিরাশ হয়ে গেলেন ডাঃ সোপার। তবু হাল ছাড়লেন না।

খুঁজতে খুঁজতে আশ্চর্য এক সূত্র পেয়ে গেলেন ডাঃ জর্জ সোপার। জানতে পারলেন পাচিকা মেরী মেলনের কথা। হঠাৎ টাইফয়েড হওয়া প্রত্যেক বাড়িতে কাজ করতো এই মেরী। কোথাও বলে কয়ে কাজ ছাড়েনি সে। অসুখ দেখা দেবার সাথে সাথেই উধাও হয়ে গেছে নিঃশব্দে। জুটিয়েছে নতুন কাজ।

মৃত্যুর অশুভ সংকেত সঙ্গে বয়ে বেড়ায় যেন মেরী। কাজ নেবার কিছুদিন

পরই বাড়িতে দেখা যায় অসুখ—টাইফয়েড। তাই যারা মেরীকে চেনে তারা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। বলে—ডাইনী। বলে—পেত্নী। কাজ দেয় না।

কিন্তু শহরে সবাই তো আর চেনে না মেরীকে। তাই নতুন সব জায়গায় কাজ পায় মেরী। ছড়িয়ে দেয় টাইফয়েড।

প্রত্যেক জায়গায় মেরীর উপস্থিতির সাথে যোগ রয়েছে অসুখটার। এটা কি আকস্মিক? না—অন্য কিছু?

ভেবে ভেবে কূলকিনারা পেলেন না ডাঃ সোপার। মেরী রোগের জীবাণু নিজের শরীরে বয়ে বেড়ায় নাকি? মেরীকে পরীক্ষা না করলে কি করে বুঝবেন ডাক্তাররা? এ দিকে মেরী মেলন যে বেপাত্তা—নিরুদ্দেশ।

পুলিসের সাহায্য চাইলেন ডাঃ জর্জ সোপার। বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে কাগজে।

অবশেষে ধরা পড়ল মেরী মেলন।

ডাঃ সোপারের সন্দেহ সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। মেরীর শরীরে পিত্তথলিতে মল, মূত্রে পাওয়া গেল টাইফয়েড রোগের জীবাণু।

সুস্থ আর নীরোগ দেহে লোকের মাঝে ঘুরে বেড়াত মেরী। পাচিকার কাজ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই খাবারদাবারে ছড়িয়ে দিত জীবাণু। তার নিজের কি দোষ? তবু সে যেন ভাগ্যদোষে দোষী। লোকের চোখে ডাইনী।

মেরী মেলনের কাছ থেকে রোগ যাতে আর ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন স্বাস্থ্যদপ্তর। সরকার ভার নিলেন ভরণ-পোষণের। আলাদা হয়ে থাকবার জন্যে ছোট একটা বাড়ি তৈরি করে দিলেন শেষ পর্যন্ত। খাবারদাবারও পাঠাতে লাগলেন নিয়মিত।

মেরীকে লোকে ডাইনী বলুক আর পেত্নীই বলুক—চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে মেরী মেলনের নাম অবিস্মরণীয়! টাইফয়েড রোগের ইতিহাস পড়তে গিয়ে সব চিকিৎসকই তাকে স্মরণ করেন—বলেন, "ভাগ্যবিড়ম্বিত একটি জীবন—মেরী মেলন দি ক্যারিয়ার। টাইফয়েড মেরী।"

হা ভগবান

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝণ্টুর কিরকম আক্কেল বলুন তো?

ক্লাস সেভেনে পড়ছিস তুই, বয়সের তো গাছ-পাথর নেই, আট পেরিয়ে ন'য়ে পড়েছিস—দাদুকে ওইরকম কথা বলে?

দাদু নাহয় বুড়োই হয়েছে, দাঁত ভেঙেছে, চুল পেকেছে, তুই ছুটে পালিয়ে গেলে দাদু নাহয় তোকে ধরতে পারবেন না, কিন্তু বুড়ো মানুষকে অমন করে রাগিয়ে দেওয়া ঝণ্টুর উচিত হয়নি।

সকালে উঠে দাদু বাইরের ঘরে বসে বসে লাল কালি দিয়ে রাম নাম লিখছিলেন। ঝণ্টু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখছো দাদু?

—ভগবানের নাম লিখছি ভাই।

ঝণ্টু ফট্ করে বলে বসলো, ভগবান আছে নাকি?

দাদুর চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠলো।—কে বললে ভগবান নেই?

ঝণ্টু বললে, আমাদের সেকেণ্ড স্যার বলেছে।

—কি বলেছে?

—বলেছে—ভগবান বলে কিছু নেই। মানুষই ভগবান তৈরি করেছে।

—আর কি বলেছে?

—বলেছে, ভূত আর ভগবান—এই দুটো জিনিস মানুষের তৈরি। ভূতও যেমন নেই, ভগবানও তেমনি নেই।

দাদু প্রথমে ধীরে ধীরে বললেন, না দাদু, ও-সব কথা শিখো না। সেকেণ্ড মাস্টার যা বলে বলুক।

ঝণ্টু জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দাদু, ভগবান যদি আছে তো আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন?

খুব কঠিন প্রশ্ন। দাদু বিপদে পড়ে গেলেন।

কিন্তু জবাব একটা দিতেই হবে। রাম নাম লিখতে লিখতে বললেন, দেখা দেন না ভয়ে।

—কাদের ভয়ে দাদু?

—মানুষের ভয়ে। এই দাও এই দাও বলে সবাই তাঁকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। এই ভয়ে তিনি দেখা দেন না—লুকিয়ে বসে থাকেন।

ঝণ্টু বললে, দাঁড়াও আমি সেকেণ্ড স্যারকে জিজ্ঞাসা করবো।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো দাদুর। বললেন, তোমাদের সেকেণ্ড স্যার আমার চেয়ে বেশী জানে?

ঝণ্টু বললে, জানে বইকি! তুমি তো ঠিকাদারি করে বড়লোক হয়েছ, আর আমাদের সেকেণ্ড স্যার রীতিমত লেখাপড়া শিখেছে। বলে, আমি ভোটে দাঁড়ালে মিনিস্টার হতে পারতাম।

এইবার রাগ করলেন দাদু।—বললেন, মিনিস্টার হতো না বাঁদর হতো ব্যাটা বুজ্‌রুক্। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

সেইদিনই দাদু গেলেন ঝণ্টুদের ইস্কুলে। হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলেন। রাগ করে অনেক কথাই বলেছেন তাঁকে। বলেছেন, আপনার সেকেণ্ড টিচারটি কিরকম মশাই? ছেলেদের মাথার ভেতরে যত সব আজগুবী আইডিয়া ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বলছে, ভগবানে তোমরা বিশ্বাস কোরো না। ভগবান নেই।

হেডমাস্টারমশাই হেসেছেন একটুখানি।

দাদু আরও চটে গেছেন। বলেছেন, হাসছেন আপনি? এত বড় সাংঘাতিক

কথা যে বলতে পারে তাকে আপনি রাখবেন ইস্কুলে ? ওকে আপনি তাড়িয়ে দিন ইস্কুল থেকে।

—আজ্ঞে না, এর জন্যে তাড়াতে পারি না। তবে এ-সব কথা না বলবার জন্যে তাকে আমি অনুরোধ করতে পারি।

দাদু চোখ রাঙিয়ে বললেন, লোকটাকে আপনি তাড়াতে পারবেন না ?

হেডমাস্টারমশাই সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞে না।

—বেশ তাহলে আমার নাতি তিনটেকে আমি ছাড়িয়ে নেবো আপনার ইস্কুল থেকে। তাদের ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দিন। কত টাকা লাগবে বলুন। টাকা আমি সঙ্গে এনেছি।

হেডমাস্টারমশাই অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু দাদু একজেদী মানুষ। কোনও অনুরোধ তিনি শুনলেন না। ঝণ্টু, বাচ্চু আর মুকুল—এই তিনটি নাতিকেই তিনি সে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন।

তারপর তিনটি নাতিকেই কাছে ডেকে বললেন, খবরদার বলছি, মাস্টারই হোক আর যেই হোক, ওই সব বাজে কথায় কান দেবে না। ব্যাটা বলে কিনা ভগবান নেই ? ব্যাটা বলে কিনা আমি ঠিকেদার ? আমি এঞ্জিনিয়ার ছিলাম। নেপালে ব্রিজ তৈরি করেছি, ভুটানে ব্রিজ করেছি, তুই ব্যাটা পারবি ? মুখেই শুধু বড় বড় কথা। বলে কিনা মিনিস্টার হবে ! ব্যাটা মিনিস্টারকা বাচ্চা !

সেকেণ্ড মাস্টারের ওপর রাগ তাঁর কিছুতেই গেল না। সুযোগ পেলেই রোজ একবার করে তাকে গালাগালি দিতে লাগলেন আর নাতিদের বলতে লাগলেন, তোমাদের সবাইকে এঞ্জিনিয়ার হতে হবে। বড় বড় বাড়ি তৈরি করবে, কারখানা তৈরি করবে, ব্রিজ তৈরি করবে। 'মেকানো সেট' এনে দেবো। তাই দিয়ে এখন ছোট ছোট ব্রিজ তৈরি কর।

ছেলেদের মাথায় সেইদিন থেকে ব্রিজ ঢুকে গেল।

—কই দাদু 'মেকানো সেট' তো এনে দিলে না ?

দাদুর আর সময় হয় না 'মেকানো সেট' কিনে আনবার। রোজই বলেন, এনে দেবো, কিন্তু একদিনও তাঁর মনে থাকে না।

● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নাতিরা তাই বলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কাঁচি দিয়ে পিচবোর্ড কেটে কেটে ব্রিজ তৈরি শুরু হয়ে গেল।

পিচবোর্ড ছাড়া ব্রিজের পাটাতন বেশ মজবুত হয় না। কিন্তু অত পিচবোর্ড কোথায় পাবে?

প্রথমে তাদের তিন ভাইয়ের পাটি-দেওয়া বইয়ের মলাটগুলো গেল। পাটিগণিত আর বীজগণিতের মলাটগুলো তো আগেই গেছে।

এইবার হাত পড়লো দাদুর মহাভারত আর রামায়ণের মলাটে।

বাচ্চু বললে, মহাভারত রামায়ণ রেখে দে মুকুল, দাদু বকবে।

ঝণ্টু বললে, তুই থাম্। আমরা তো ভগবান-ভগবান খেলা করছি না, দাদু যা বলেছে তাই করছি। ব্রিজ তৈরি করছি।

পিচবোর্ডের টুকরো, কাগজ, কাপড়, আর ময়দার আঠায় বাইরের ঘরটা নোংরা হয়ে থাকে। চাকর এসে রোজ পরিষ্কার করে দেয়। দাদুর নজরে পড়ে না।

সেদিন হঠাৎ নজরে পড়ে গেল।

'রামায়ণ' আর 'মহাভারত' এই বই দুটি তিনি মাঝে-মাঝে উলটেপালটে দেখেন। সেদিন রামায়ণ পড়তে গিয়ে দেখলেন তার বাঁধানো মলাট দুটো নেই। কাঁচি দিয়ে কে যেন পরিপাটী করে কেটে নিয়েছে।

বুঝতে বাকী রইলো না—এ তাঁর নাতিদের কাজ।

মহাভারতটির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন তারও সমান দুর্দশা।

ডাকলেন, ঝনা! বাচ্চু! মুকুল!

কারও কোনও সাড়াশব্দ পেলেন না।

এখনও কি এরা ইস্কুল থেকে ফেরেনি নাকি?

রাম-চাকর ঘরে ঢুকলো। বললে, ফিরেছে।

দাদু বললেন, ডাকো তাদের।

রাম বললে, কেউ আসবে না।

বলেই সে পাশের ঘর থেকে যে-বস্তুটি দুহাত দিয়ে অতি সাবধানে তুলে এনে

তাঁর চোখের সুমুখে নামিয়ে দিলে সেটি দেখে তিনি নাতিদের তিরস্কার করবার কথা ভুলে গেলেন।

জিনিসটিকে চারটি থামওয়ালা নদীর একটি পুলও বলা চলে, চারটি পা-ওলা একটি গরুও বলা চলে। এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুই তিনি স্থির করতে পারলেন না।

তা না পারুন, ভগবান নেই ভাবার চেয়ে অনেক ভাল।

ছেলেরা এঞ্জিনিয়ার যখন হবেই, তখন কাটুক এক-আধটা মহাভারত! ওর আর কতই বা দাম!

দাদু হেসে বললেন, ভালই হয়েছে।

দাদু হেসে বললেন, ভালই হয়েছে। যা রেখে দিয়ে আয় যেখানে ছিল।

এতক্ষণ পরে নাতিরা সুড়সুড় করে এসে দাঁড়ালো দোরের পাশে।

দাদু দেখতে পেয়েছেন। বললেন, এবার আর ঘরে নয়—বাইরে। বাড়ির পেছন দিকে ছাখোগে—বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে একটা নালার মত হয়েছে, কাঠ-কাট্‌রা দিয়ে ওইখানে একটা পুল তৈরি করগে।

দাদুর হুকুম পেয়ে গেছে।

নাতিদের আনন্দ তখন দেখে কে? তক্ষুণি তারা কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে গেল। আগে প্ল্যান, তারপর কাজ।

কাগজের ওপর প্ল্যান তৈরী হয়ে গেল। এদিকে তিনটে ওদিকে তিনটে—ছটা থামের উপর ব্রিজ তৈরী হবে। ওখানে পিচবোর্ড চলবে না, কাঠের পাটাতন চাই। মজবুত করতে হলে ছোট ছোট পেরেক দরকার। একটা হাতুড়ি দরকার। কাটারি দরকার।

● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
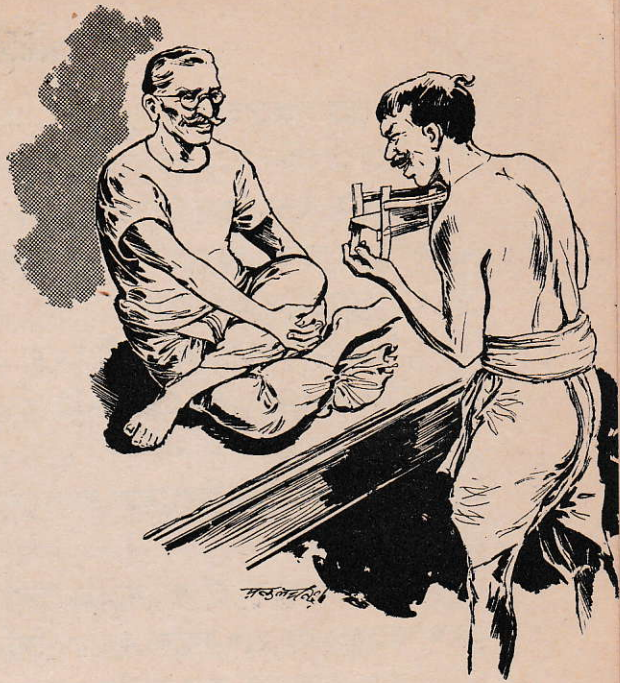
বাড়ির পেছনের দিকে বাগানের পাশে সরু প্রায় এক ফুট চওড়া একটি নালার ওপর দিয়ে ছিলছিল করে জল বয়ে যাচ্ছে। ওটাকে নদী ভাবতে দোষ কি ?

ঝণ্টুর হঠাৎ মনে পড়লো—ফাঁকা জায়গায় ব্রিজ হবে। দুদিকে দুটো ইলেক্‌ট্রিকের আলো দরকার। আলোর ভার পড়লো বাচ্চুর ওপর। বললে, বাচ্চু, তুই হবি ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার।

বাচ্চু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না। ইলেক্‌ট্রিকের হাঙ্গামা অনেক। পূজোর সময় দেখেছে—এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে তার টেনে নিয়ে গিয়ে পূজো-মণ্ডপে আলো জ্বালানো হয়।

বাচ্চু বললে, আমি পারবো না। সারা বাড়ি ফিউজ্‌ হয়ে গেলে দাদু মার লাগাবে।

ঝণ্টু বললে, দূর বোকা, সত্যিকারের আলো তোকে কে দিতে বলছে ? ব্রিজের চেয়ে আলোটা বড় হলে চলবে কেন ? জিনিসটা দেখতে ঠিক আলোর মত হবে।

বাচ্চু মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলো।

—এতে ভাববার কি আছে ? আজ আমরা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করবো, সন্ধ্যের আগেই শেষ করে দেবো দেখবি।

ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ারের মাথায় কিন্তু আলো জ্বালাবার হদিসটা তখনও পর্যন্ত ঠিক আসছে না, বাচ্চু তবু বললে, আমিও একটা করে ফেলছি ছাখ।

ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই কিছু খেয়ে নিয়ে তিন এঞ্জিনিয়ারের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। মুকুল সব চেয়ে ছোট, তাই তার ওপর ছোট ছোট পেরেক যোগাড় করার ভার।

পেরেক কিন্তু সে ঠিক যোগাড় করে আনলে।

মশারি টাঙাবার জন্য যেখানে যত পেরেক দেয়ালে পোঁতা ছিল সবগুলো সে তুলে নিয়ে এসেছে।

ঝণ্টু সব চেয়ে বড় এঞ্জিনিয়ার। পেরেকগুলো দেখেই সে 'রিজেক্ট্‌' করে দিলে।

—তুই কোনও কাজের নোস দেখছি। এত বড় পেরেক তোকে কে আনতে বললে ?

মুকুলের মাথা খুব সাফ। তক্ষুণি সে আবার ছুটলো। দাদুর খাস খানসামা মল্লিক তার পুরনো জুতো জোড়াটা আজ সকালেই সারিয়েছে। মুকুল দেখেছে—একজন মুচি তার জুতোর নীচে অনেকগুলি ছোট ছোট পেরেক দিয়ে হাফ্‌শোল বসিয়ে দিয়েছে। রান্নাঘর থেকে একটি খুন্তি আর সাঁড়াশি এনে একটি একটি করে পেরেকগুলি প্রায় সবই সে তুলে ফেললে। তিনটে পেরেক কিছুতেই উঠছিল না। না উঠলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মুকুলের তখন জেদ চেপে গেছে। ওদিকে ব্রিজের কাজ সন্ধ্যার আগেই শেষ করতে হবে। মুকুল তাড়াতাড়ি একটি ছুরি এনে চামড়াটা কেটে ফেললে। তারপর দাঁত দিয়ে পেরেক তিনটে তুলে নিয়ে ব্রিজ তৈরির জায়গায় ছুটে গিয়ে দেখলে—ঝণ্টু তখন ব্রিজের পিলারগুলো নদীর ওপর শক্ত করে পুঁতেছে। তার ওপর পাটাতন বসাবার জন্যে পেরেকের অপেক্ষায় কয়লা-ভাঙ্গা লোহার হাতুড়িটা হাতে নিয়ে বসে আছে।

ব্রিজের পাটাতন হয়েছে তিনজন এঞ্জিনিয়ারের কাঠের তিনটি ফুটরুল।

পেরেক পিটিয়ে শক্ত করে সেগুলো বসিয়ে দিতেই ব্রিজের কাজ প্রায় কমপ্লিট।

মুকুল বললে, ব্রিজটা ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হচ্ছে। ব্রিজের মাথার ওপর সেই যে আর্চের মত লোহার ফ্রেম থাকে সেগুলো কই?

প্রধান এঞ্জিনিয়ার ঝণ্টুকে ভাবিয়ে তুললে মুকুল। সত্যিই তো, সেইরকম গোটাকতক আর্চ দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু কি দিয়ে হবে?

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আকাশে বর্ষার মেঘ। বৃষ্টি হতে পারে। আজকের মত এইখানেই থাক। কাল শেষ করা যাবে ভেবে হাত গুটিয়ে তারা উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় ছুটতে ছুটতে ইলেক্‌ট্রিক এঞ্জিনিয়ার বাচ্চু এসে হাজির!

—কি রে, আলোর ব্যবস্থা করেছিস?

বাচ্চু মুখ টিপে টিপে হাসছে।

—ছাখ না কি করি। আর্চের কথা বলছিলি? এই ছাখ।

বলেই সে তার হাফ্‌প্যাণ্টের পকেট থেকে এক গোছা পাতলা-পাতলা জিব-ছোলা বের করলে। যেখানে যার যত জিবছোলা ছিল—সব সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—এইগুলো বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে পিটিয়ে দে। আর্চ হয়ে যাবে।

ছোট ছোট অনেকগুলো পেরেক বেড়েছে। ঝণ্টু তাই দিয়ে ব্রিজের মাথার ওপর জিবছোলা বেঁকিয়ে পিটোতে পিটোতে বললে, আলো কোথায়?

বাচ্চু বললে, এই ছাখ না—আমি কি করি।

প্যাণ্টের আর-এক পকেট থেকে বাচ্চু বের করলে কালো রঙের বেশ মোটা একটি গাটাপার্চার চশমা।

মুকুল বলে উঠলো, এটা যে দাদুর চশমা।

বাচ্চু বললে, এই ছাখ কাঁচ ভাঙ্গা। দাদু এটা ব্যবহার করে না। ড্রয়ারের একপাশে ফেলে রেখেছিল।

এই বলে সে পটপট করে চশমার ডাঁটি দুটো ভেঙে নিয়ে ব্রিজের দু'পাশে দুটো মাটির ওপর বসিয়ে দিলে। এ-পাশে একটা, ও-পাশে একটা লাইটপোস্ট বসে গেল।

এবার লাইট হলেই—বাস্, হয়ে গেল।

ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ার বাচ্চু তখন ছুরি দিয়ে লাইটপোস্টের বাঁকানো মাথায় দুটো খাঁজ কাটছে। বললে, এখন নয়, পরে দেখাবো। একেবারে তাক লাগিয়ে দেবো।

এদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে।

রাম-চাকর এসে দাঁড়ালো।—মাস্টার এসেছেন। পড়তে বসবেন চলুন সব।

আজ তবে এইখানেই থাক্। চল্।

হেড-এঞ্জিনিয়ার ঝণ্টুর সঙ্গে বাচ্চু আর মুকুলকেও উঠতে হলো।

হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসা।

তার পরেই খাওয়া, তার পরেই শোয়া।

ঝণ্টু, মুকুল ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু বাচ্চুর চোখে ঘুম নেই।

নীচের ঘরে বামুন-মা চেঁচাচ্ছে—'আমার মশারির পেরেকগুলো পর্যন্ত তুলে ফেলে দিয়েছে।'

মল্লিক বললে, ইঁদুর, ইঁদুর। এই এত বড় বড় বেড়ালের মত ইঁদুরগুলো আসা-যাওয়া করছে বাড়িতে।

বামুন-মা বললে, দূর মুখপোড়া! লোহার পেরেক ইঁদুরে খেলে বলতে চাস্?

মল্লিক বললে, ধেৎ তেরি, তোমার মশারির পেরেকের কথা কে বলছে? আমি বলছি আমার জুতোর কথা। কাল হাফ্‌শোল বসালাম, আজ দেখছি ইঁদুরে কেটে হাফ্‌শোলের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

মল্লিকের জুতোর বারোটাই বাজুক আর একটাই বাজুক, বাচ্চুর কিন্তু অন্য চিন্তা।

বাড়ির পেছনে বাগানের ধারে যেখানে তারা ব্রিজ তৈরি করেছে সেখানে একবার যেতে পারলে হতো!

কিন্তু অন্ধকার রাত্রি। ওদিকটায় জনমানবের চিহ্ন নেই। টিনের একটা বেড়ার পেছনে বড় বড় গাছ। গাছের গায়ে গায়ে কালো অন্ধকার যেন চাপ বেঁধে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

সেকেণ্ড টিচার যাই বলুক—ভূত ওখানে নিশ্চয়ই আছে।

ভূতের ভয় না থাকলে বাচ্চু একবার যেতো তাদের সেই ব্রিজের কাছটায়।

ঝন্টুর গায়ে হাত দিয়ে তাকে তোলবার চেষ্টা করে বাচ্চু ডাকলে, এই! এই! আমার সঙ্গে একবার যাবি?

ঘুমের ঘোরে ঝন্টু চেঁচিয়ে উঠলো, যাঃ!

বাচ্চু ভয়ে আর কিছু বললে না।

মুকুল নিতান্ত ছেলেমানুষ। তাকে ডাকা বৃথা। ঘুম তার ভাঙবে না কিছুতেই।

কিন্তু কি হবে তাহলে?

সে যে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে বলে চশমার ডাঁটের বাঁকানো মাথায় ছুরি দিয়ে ঘাট কেটে এমন একটা জিনিস সেখানে ঝুলিয়ে দিয়েছে যেটা দেখলে মনে হবে সাদা রঙের আলোর বাল্ব ঝুলছে।

অথচ সেটা আর কিছুই নয়—গোল দুটি সাদা পলা লাগানো কাঞ্চনের কানের দুটি সোনার দুল।

কাঞ্চনের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে বের করে সে নিয়ে গিয়েছিল—

সবাইকে একবার দেখিয়ে আবার চুপি-চুপি খুলে এনে রেখে দেবে এই ছিল তার মতলব।

কিন্তু কি করতে কি হয়ে গেল। ওদিকে তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আকাশে মেঘ করেছে, আবার ঠিক সেই সময় রাম গিয়ে খবর দিলে—মাস্টার এসেছে পড়াবার জন্যে।

তাড়াতাড়ি দুল দুটো সেইখানে তেমনি ঝুলিয়ে রেখেই চলে এসেছে সে।

এখন না হয় রাত্রির অন্ধকারে ভূতের ভয়ে ওদিকে কেউ যাবে না, কিন্তু ভোর বেলা?

যার নজরে পড়বে—সোনার জিনিস—সেই তো নিয়ে পালাবে।

বাচ্চু হাত দুটো তার জোড় করলে, তারপর আপনা থেকেই তার সেই জোড় হাতটা কপালে গিয়ে ঠেকলো।

বার বার প্রণাম করছে সে।

কাকে প্রণাম করছে?

তাদের সেকেণ্ড টিচার বলেছে—ভগবান নেই।

তাই কখনো হয়?

ভগবান নাই যদি থাকবে তো বাচ্চু এমন করে ব্যাকুল হয়ে প্রণাম করছে কাকে!

—হে ভগবান, তুমি কোথায় থাকো, কেমন তোমার চেহারা—কিছুই জানি না। তবু আমি তোমাকে প্রণাম করে বলছি—তুমি যদি সত্যিই থাকো তো কাঞ্চনের সোনার দুল দুটি তুমি আগলে রেখো। আমি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছুটবো সেইখানে, গিয়ে যদি দেখি, দুল দুটি কেউ নিয়ে পালিয়েছে তাহলে জানবো ভগবান নেই। আমাদের সেকেণ্ড টিচারের কথাটাই সত্যি।

আপন মনেই ভগবানকে এই সব বলতে বলতে কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বাচ্চু।

ঘুম যখন তার ভাঙলো, চেয়ে দেখে চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে। সূয্যি তখনও ওঠে নি।

ইন্দ্রনীল—

বাচ্চু বললে, এই দ্যাখ না— আমি কি করি

(হা ভগবান···পৃঃ ৪৫৪)
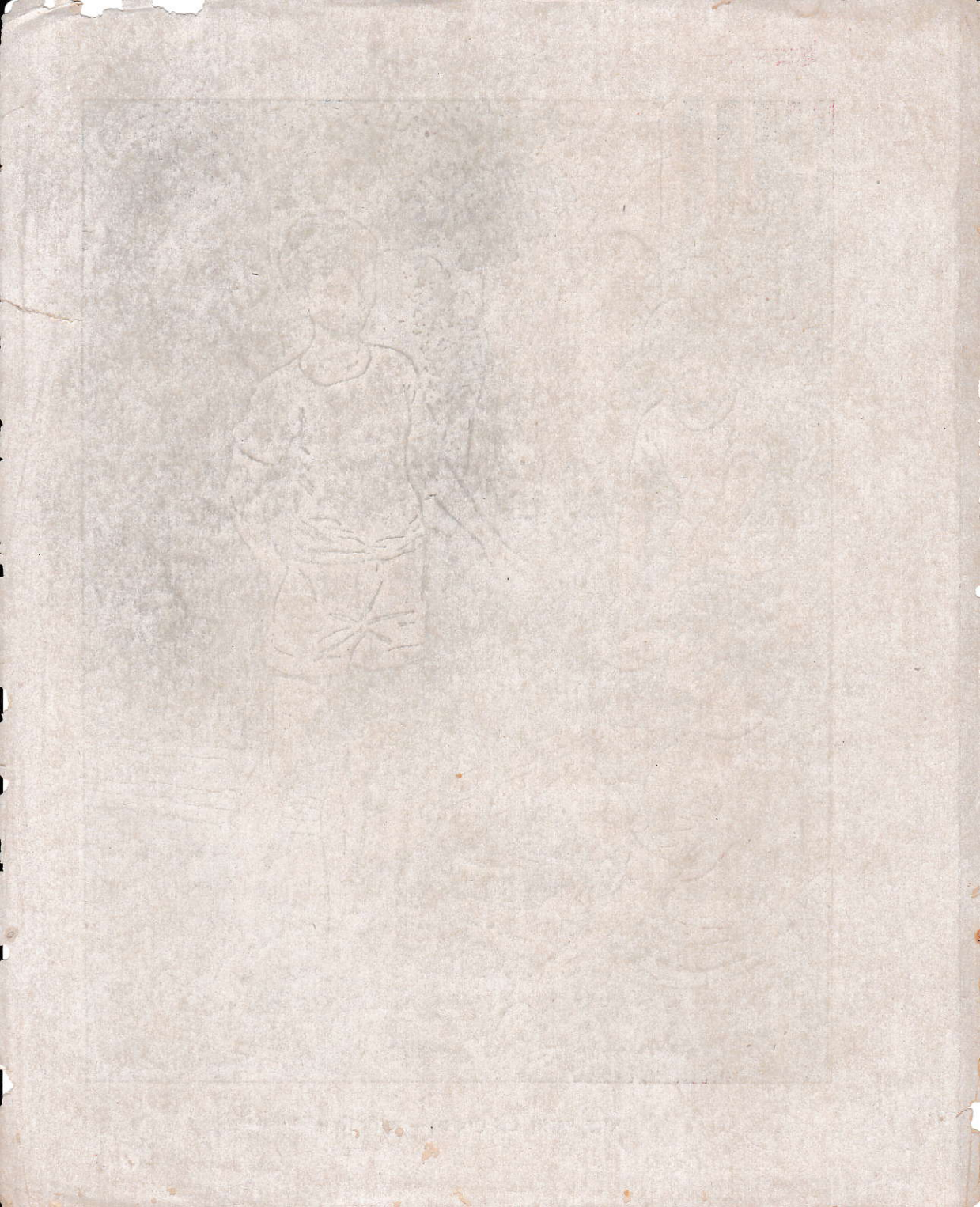
বাচ্চু ধড়মড় করে উঠে বসলো।

তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের খিলটা খুলতেই খিলটা দুম করে পড়লো।

সেই শব্দ শুনে ঝন্টুর ঘুম ভেঙে গেছে।

—কোথায় যাচ্ছিস্ রে?

বাচ্চু বললে, ব্রিজটা দেখতে।

—চল্ আমিও যাই।

ঝন্টুও ছুটলো তার পিছু পিছু।

বাচ্চু দেখলে, সোনার দুল দুটি যেখানে যেমন করে সে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তখনও ঠিক তেমনি ঝুলছে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাচ্চু চেঁচিয়ে উঠলো, আছে। ঠিক আছে।

—বাঃ, বেশ হয়েছে।

ঝন্টু তার পিছু পিছু এসে দাঁড়ালো।—কী ঠিক আছে?

পেছন ফিরে কথাটার জবাব দিতে গিয়ে বাচ্চু দেখতে পেলে একটি লাঠি হাতে নিয়ে দাদু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সেইদিকেই এগিয়ে আসছেন তিনি।

বাচ্চু বললে, দাদু তুমি ঠিক বলেছ। ভগবান আছেন। ভূতও আছে, ভগবানও আছে।

দাদু কোনও কথা না বলে নাতিদের তৈরি ব্রিজটি ভাল করে দেখলেন।

দেখে বললেন, বাঃ, বেশ হয়েছে।

বলেই তিনি রাস্তা ধরে বেড়াতে চলে গেলেন।

● শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝণ্টু বললে, ভগবান আছে আমিও বুঝতে পেরেছি।

বাচ্চু জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে বুঝলি?

ঝণ্টু বললে, দাদু ব্রিজটা দেখলে, কিন্তু ব্রিজের থামগুলো দেখলে না।

বাচ্চু জিজ্ঞাসা করলে, দেখলে কি হতো?

—হাতের লাঠি দিয়ে দাদু ঠিক আমাকে মেরে বসতো।

—কেন?

ঝণ্টু সবচেয়ে বড় এঞ্জিনিয়ার। কাজেই খুব গম্ভীরমুখে বললে, দাদুর সেই লাঠিটা দেখেছিলি? সেই যেটা কাশ্মীর থেকে আনিয়েছিল?

—দেখেছি। দাদুর সবচেয়ে ভাল লাঠি। সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাতো।

ঝণ্টু বললে, সেইটে কেটেই তো ব্রিজের থাম করেছি। ভাল জিনিস করতে হলে ভাল 'মেটিরিয়াল্' দিতে হয়।

বাচ্চু বললে, ধরা পড়লে কিন্তু ভাল মার খেতে হয়।

ঝণ্টু বললে, ধেৎ, ভগবান আছে কিং করতে?

এমন সময় মুকুলের কান্না শোনা গেল।

মুকুলের বাবা তার কানে ধরে এক চড় মেরেছে।—সকাল বেলা দাঁত মেজে কেউ জিবছোলা খুঁজে পাচ্ছে না। খেলা করবি তো ভাল জিনিস নিয়ে খেলা কর্! তা না যত সব নোংরা ঘেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথায় জিবছোলা—কোথায় আরশুলা—হা ভগবান!

ঝণ্টু হাসতে হাসতে বললে, ওই শোন্!

হবুচন্দ্র রাজার

অন্নদাশঙ্কর রায়

হবুচন্দ্র রাজার ছিল
হাতী হাজার হাজার, ছিল
ঘোড়া হাজার হাজার, ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

হবুগঞ্জ বাজার ছিল
দোকান হাজার হাজার ছিল
পশার হাজার হাজার ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

গবুচন্দ্র ওয়াজির ছিল
নবুচন্দ্র নাজির ছিল
আবুচন্দ্র কাজী ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

মোটা লোকের সাজা ছিল
রোগা লোকের খাজা ছিল
প্রজারা সব তাজা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

পাই পয়সা খাজনা ছিল
দুধভাত মাগ্‌না ছিল
ঘাম ঝরানো মানা ছিল
হবুচন্দ্র রাজার।

———

শুভ-টাকা

দৃষ্টিহীন

তার নাম ছিল শান্তি। তার মুখখানা ছিল ঢলঢলে, চোখ দুটো ছিল টানা টানা। মাথার চুল ছিল কোঁকড়া। গায়ের রং ফরসা না হলেও কালও বলা চলে না। সমস্তটা মিশিয়ে তাকে দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। বস্তির অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সে যখন মোড়ের ঐ কর্পোরেশনের স্কুলে পড়তে যেত, সে সময় তার হাসি মাখা মুখখানা দেখলে তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা হত।

স্কুল থেকে তিনটের সময় ফিরে এসে বাড়িতে দুটো বাসা রুটি খেয়ে সে যেত ওধারের রাস্তার ওপরের হোটেল বাড়িটায়। ঠাকুরের সঙ্গে সে ভাব জমিয়েছিল, তাই খেলা না করে তার মনে হত, ঠাকুরের কাছে গেলে রান্নাও শেখা হবে আর বুড়ো মানুষকে সাহায্যও করা হবে।

তার এই মিষ্টি স্বভাবের জন্য তাকে সকলেই ভালোবাসতো। বস্তির লোকেরা তো ভালবাসতোই, হোটেলের মালিক থেকে কর্মচারীরা পর্যন্ত সকলেই তাকে ভালোবাসতো। ঠাকুর যদি তাকে কিছু খেতে দিতে যেত, তাহলে সে হাসিমুখে বলতো, "আমি তো এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি, আবার কেন খাবার দিচ্ছো ?"

ঠাকুর কিন্তু তার কথা শুনতো না, তাকে জোর করে কিছু না কিছু রোজ খাইয়ে দিতো।

এমনি করেই দিন কেটে যেত।

সেদিন ছিল বিজয়া। ইস্কুল বন্ধ। আবার হয়েছে কি, পূজোর কিছু আগে থেকে শান্তির বাবার চাকরি ছিল না। কোন একটা কারখানায় নাকি কাজ করতো। কারখানা পূজোর একমাস আগে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এবারের পূজোয় শান্তির নতুন জামাকাপড় কিছুই হয়নি। সামনের বাবুদের বাড়িতে কাজ করে শান্তির মা যা রোজগার করতো, তাতে অত্যন্ত কষ্টে তাদের দিন যেত। খাওয়াই ঠিকমত তাদের হত না, কিন্তু শান্তির তাতে দুঃখ ছিল না। তার দুঃখ হত কেবল তার বাবার জন্যে। বাড়িতে বসে থেকে থেকে যেন সে কেমন হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। চোখ মুখেও যেন ক্রমশঃ কালি পড়ছে। শান্তি মনে মনে ভাবতো, তার বাবার যদি একটা চাকরি সে করে দিতে পারতো। এতটুকু মেয়ে, কিই বা করতে পারে সে ? মনের দুঃখ মনে চেপেই সে কেবল ঘুরে বেড়াতো।

বিজয়ার দিন। আজ হোটেলে নানা রকম রান্না হবে। মা দুর্গার বিজয়া করে এসেই ক্লাবের ছেলেরা ও আরো অনেক লোক এসে দলে দলে ঢুকবে ওই হোটেলটায় কিছু খাবার আশায়। তাই হোটেলটায় খাবারের আয়োজনও হয়েছে প্রচুর, ফি বারেই এই রকম হয় কিনা। ঠাকুরের আজ আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকবে না, শান্তি এ কথা জানতো। তাই সেদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরেই সে গিয়েছিল হোটেলে, ঠাকুরকে সাহায্য করতে। ঠাকুরও একজন সাহায্যকারিণী পেয়ে খুব খুশী। কখনও সে বাটনাটা এগিয়ে দেয়, কখনো বা কাটলেট গড়ায় সাহায্য

তার এই মিষ্টি স্বভাবের জন্য তাকে সকলেই ভালোবাসতো। বস্তির লোকেরা তো ভালবাসতোই, হোটেলের মালিক থেকে কর্মচারীরা পর্যন্ত সকলেই তাকে ভালোবাসতো। ঠাকুর যদি তাকে কিছু খেতে দিতে যেত, তাহলে সে হাসিমুখে বলতো, "আমি তো এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি, আবার কেন খাবার দিচ্ছো ?"

ঠাকুর কিন্তু তার কথা শুনতো না, তাকে জোর করে কিছু না কিছু রোজ খাইয়ে দিতো।

এমনি করেই দিন কেটে যেত।

সেদিন ছিল বিজয়া। ইস্কুল বন্ধ। আবার হয়েছে কি, পূজোর কিছু আগে থেকে শান্তির বাবার চাকরি ছিল না। কোন একটা কারখানায় নাকি কাজ করতো। কারখানা পূজোর একমাস আগে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এবারের পূজোয় শান্তির নতুন জামাকাপড় কিছুই হয়নি। সামনের বাবুদের বাড়িতে কাজ করে শান্তির মা যা রোজগার করতো, তাতে অত্যন্ত কষ্টে তাদের দিন যেত। খাওয়াই ঠিকমত তাদের হত না, কিন্তু শান্তির তাতে দুঃখ ছিল না। তার দুঃখ হত কেবল তার বাবার জন্যে। বাড়িতে বসে থেকে থেকে যেন সে কেমন হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। চোখ মুখেও যেন ক্রমশঃ কালি পড়ছে। শান্তি মনে মনে ভাবতো, তার বাবার যদি একটা চাকরি সে করে দিতে পারতো। এতটুকু মেয়ে, কিই বা করতে পারে সে ? মনের দুঃখ মনে চেপেই সে কেবল ঘুরে বেড়াতো।

বিজয়ার দিন। আজ হোটেলে নানা রকম রান্না হবে। মা দুর্গার বিজয়া করে এসেই ক্লাবের ছেলেরা ও আরো অনেক লোক এসে দলে দলে ঢুকবে ওই হোটেলটায় কিছু খাবার আশায়। তাই হোটেলটায় খাবারের আয়োজনও হয়েছে প্রচুর, ফি বারেই এই রকম হয় কিনা। ঠাকুরের আজ আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকবে না, শান্তি এ কথা জানতো। তাই সেদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরেই সে গিয়েছিল হোটেলে, ঠাকুরকে সাহায্য করতে। ঠাকুরও একজন সাহায্যকারিণী পেয়ে খুব খুশী। কখনও সে বাটনাটা এগিয়ে দেয়, কখনো বা কাটলেট গড়ায় সাহায্য

করে, আবার কখনো বা ছুটোছুটি করে ভাঁড়ার থেকে মাংসের মসলা নিয়ে আসে। প্রায় বিকেল পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটার সময় রান্না সব শেষ হয়ে গেল, শান্তির হাতে কোন কাজই রইলো না, শান্তি তখন বাড়ি ফেরবার জন্যে তৈরি হলো।

কিন্তু ঠাকুর তাকে ছাড়বে কেন? অতটুকু মেয়ে, সারাদিন খেটেছে। তাকে কিছু না খেতে দিয়ে সে কি যেতে দিতে পারে? ঠাকুর জোর করে তার হাতে একটা কাটলেট আর একটা চপ গুঁজে দিল।

শান্তি সেদিন আর বিশেষ আপত্তি করেনি, কারণ তার তখন বেশ খিদেও পেয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো, চপটায় কামড় মারতে, একটা শক্ত জিনিস তার দাঁতে এমন ঠেকলো, দাঁতটা তো ভেঙে যাবারই যোগাড়। তাড়াতাড়ি মুখ থেকে বের করে দেখতে চেষ্টা করলো জিনিসটা কি। আরে সর্বনাশ, এটা যে একটা টাকা, নিশ্চয়ই ওই ঠাকুরের টাকা। ভুল করে আলু আর কিমার সঙ্গে চটকে ফেলেছে।

তাড়াতাড়ি সে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললো, "এটা তো তোমার টাকা, চপের ভেতর গেল কি করে?"

ঠাকুর কিন্তু একগাল হেসে বললে, "না, ওটা আমার টাকা নয়। ওটা মালিকের টাকা। মালিক আজ এই বিশেষ দিনে টাকাটা আমায় দিয়েছিলেন চপের মধ্যে পুরে রাখতে। যার ভাগ্যে ওই শুভ-টাকাটা উঠবে, তারই লাভ হবে। তাই ও টাকা তোমাকে ফেরত দিতে হবে না। ওটা তোমার ভাগ্যেই যখন উঠেছে, টাকাটা তোমার।"

শান্তির আর আনন্দের শেষ রইলো না। একটা গোটা টাকা তার হবে? আনন্দে নাচতে নাচতে সে গিয়ে তার বাবা মাকে সব কথা বললো।

তার পরেই সে ছুটলো বড় রাস্তার মোড়ে খাবারের দোকানটায়, কিছু খাবার আনতে তার বাবা মার জন্যে। খাবারের দোকানে গিয়ে সে খাবার চাইলো। তারপর দোকানদারকে পুরো টাকাটা দেখিয়ে বললে, "এই টাকাটা আমি পেয়েছি।"

দোকানী তাকে চিনতো। আর তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে তাকে ভালও বাসতো। যখন সে শুনলো, এটা শুভ-টাকা আর কি ভাবে সে পেয়েছে, তখন তার

মায়া হল, ভাবলো আজ বিজয়ার দিন, নাইবা মেয়েটা টাকাটা খরচা করলো। তাই সে শান্তির দরকারমত সমস্ত খাবার অমনিই দিয়ে দিল।

শান্তির আনন্দের আর শেষ নেই। এতটা খাবার তার হাতে, তার ওপর শুভ-টাকাটাও বেঁচে গেছে। খরচ করতে হোল না। ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে মস্ত বড় একটা ঠাকুর যাচ্ছিল, অন্য লোকেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শান্তিও দেখলো। তারপর ঠাকুর চলে যেতে ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে যেই সে রাস্তা চলতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে সেই টাকাটা পড়ে গেল। টাকাটা রাস্তায় পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা ধারের দিকে চলে গেল। শান্তিও কুড়োবার জন্যে পেছন পেছন ছুটলো। কিন্তু টাকাটা কুড়োতে গিয়ে সে চমকে উঠলো। পাশে পড়ে এটা কি? হাতে তুলে নিয়ে দেখলো, একটা দামী সোনার হাতঘড়ি। এটা এখানে এল কি করে? তখনই তার মনে পড়লো, বোধহয় ভিড়েতে কারুর হাত থেকে পড়ে গেছে।

ঘড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে আনমনা হয়ে সে সোজা চললো বড় রাস্তা ধরে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো, একজন শৌখিন বাবু রাস্তার ধারে মুখটা গম্ভীর করে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছেন। শান্তি একগাল হেসে তাঁর কাছে গিয়ে বলে, "আপনার কি কিছু হারিয়েছে?"

লোকটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, একটা সোনার দামী ঘড়ি আমার হারিয়ে গেছে।"

শান্তি ঘড়িটা এগিয়ে ধরে বললে, "দেখুন তো, এই ঘড়িটা কি আপনার?"

ভদ্রলোক আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটাই তো। ব্যাণ্ডটা ছিঁড়ে গিয়ে কোন সময় হাত থেকে পড়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। তুমি তো ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, আমার এত দামী ঘড়িটা পেয়েও আমাকে ফেরত দিলে।" ভদ্রলোক খুশী হয়ে একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

শান্তি টাকাটা পেয়ে তো আরও খুশী। তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়ে দিল বাড়ি ফেরবার জন্যে। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই তার চোখে পড়লো একটা দৃশ্য।

"দেখুন তো, এই ঘড়িটা কি আপনার ?" [পৃঃ ৪৬৩

দেখে তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। একটা বায়োস্কোপের সামনে একজন ভিখারী ছেঁড়া জামাকাপড় পরে অঝোরঝরে কাঁদছে, কেউ সেদিকে ফিরেও চাইছে না। যে যার চলে যাচ্ছে। কিন্তু শান্তির মনে বড় দয়া হল, ভাবলো, আজ বিজয়ার দিন, হয়তো লোকটার খাওয়া হয়নি। আর জামাকাপড় ও চালচলন দেখে শান্তির মনে হল, সে তার চেয়েও গরিব।

কিন্তু শান্তি কি করতে পারে? এই শুভ-টাকাটা তাকে দিয়ে দেবে? না, না, এটি সে কারুকেই দিতে পারবে না, তার চেয়ে বরং এই দশ টাকার নোটটা সে দিয়ে দিতে পারে। শান্তি দৌড়ে বায়োস্কোপের সামনে গেল। লোকটার হাতে দশ টাকার নোটটা গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

বাড়ি ফিরে সে তার বাবাকে সব কথা বললো, বাবা মা তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে ভারী খুশী, মা কেঁদে ফেলে বললেন, "ভগবান্ তোর ভাল করবেন।"

বাবার হাতে সেই শুভ-টাকাটা দিয়ে শান্তি বললো, "বাবা তোমার যতই দরকার পড়ুক, এ টাকাটা খরচা কোর না, এটা হল শুভ-টাকা, এর থেকেই আমাদের ভাল হবে।" টাকাটা বাবা বাক্সে তুলে রাখলেন।

সেদিন ছিল কালীপূজো, সেদিন শান্তিদের অবস্থাও খুব খারাপ, টাকার

অভাবে ভাল রান্নাবান্নাও হয়নি। তবুও শান্তির মনে খুশির শেষ নেই। সে সন্ধ্যে হতেই গিয়েছিল রাস্তা পার হয়ে ওপাড়ার ঠাকুর দেখতে। খুশী মেজাজেই সে ফিরছিল। রাস্তায় সেই বায়স্কোপটা পড়ে। সেটা পার হবার সময় সে এদিক ওদিক দেখে যায়, যদি সেই ভিখারীটার সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হয়নি। শান্তি ভাবে, বোধহয় এখান থেকে সে অন্য কোথাও চলে গেছে।

কিন্তু সেদিন বায়স্কোপের সামনে যেতেই শান্তির চোখ তো একেবারে ছানাবড়া। সেই ভিখারীটা খুব দামী জামাকাপড় পরে, সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে একটা চকচকে মোটরগাড়িতে চড়ছে। শান্তি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে তাকে ভাল করে দেখছে। ঠিক সেই সময় শান্তির দিকে তার চোখ পড়লো। সে চেঁচিয়ে উঠে বললো, "এই লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? তোমাকে দেখতে পাইনি কেন?" বলতে বলতে শান্তির কাছে এসে তার হাত ধরে নিয়ে একেবারে গাড়িতে উঠে পড়লো। তারপর শান্তিকে বললো, "দেখিয়ে দাও তোমরা থাক কোথায়।"

শান্তি ভয় পেয়ে গিয়ে বললো, "আপনি সেখানে যেতে পারবেন না, সেটা একটা বস্তিবাড়ি।"

ভদ্রলোক বলেন, "তা হোক, আমি তোমার বাবা মার সঙ্গে দেখা করবো।"

শান্তি অগত্যা রাস্তা দেখিয়ে ভদ্রলোককে নিয়ে যায় তাদের বাড়ি।

শান্তির বাবাকে ভদ্রলোক বলেন, "আপনার মেয়ে ভারী লক্ষ্মী, আমার নাম অনিলকুমার।"

সকলে নাম শুনে তো চমকে উঠলো। আরে, বিখ্যাত অভিনেতা তাদের বাড়িতে?

ভদ্রলোক তারপর বলেন, "সেদিন আমি একটা ভিখারীর অভিনয় করছিলাম। ওখানে সিনেমার ছবির শুটিং হচ্ছিলো। আপনার মেয়ে ভুল করে আমাকে সেদিন দশটা টাকা দিয়ে আসে, আমি কিন্তু তখন কথা বলতে পারিনি, কাজের জন্যে। কিন্তু তারপর থেকে ওকে কত খুঁজেছি, আর দেখতে পাচ্ছিলাম না।"

আপনার মেয়ে ভুল করে আমাকে···দশ টাকা দিয়ে আসে [পৃঃ ৪৬৫

তারপর পকেটে হাত দিয়ে এগারখানা দশ টাকার নোট বার করে, একখানা শান্তির হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার সেই দশটা টাকা নাও। আর এই দশখানা নোট তোমার সততার পুরস্কার।"

শান্তির আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল। এতগুলো টাকা তার হবে? শান্তি বললো, "টাকা আমি নোব না, তার চেয়ে বরং আমার বাবাকে একটা চাকরি করে দিন।"

অনিলকুমার বললেন, "তুমি এই টাকাটা নাও, আর কাল সকালে আমার এই চিঠিটা নিয়ে ওই বায়োস্কোপের ম্যানেজারের সঙ্গে তোমার বাবা দেখা করলেই একটা চাকরি হবে।" বলেই একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখে দিলেন। তারপর সেখান থেকে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা শান্তির বাবা সেখানে যেতেই তার চাকরি হয়ে গেল। তাদের অবস্থা আবার ভাল হল।

কিন্তু শান্তির বিশ্বাস তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সেই শুভ-টাকা থেকেই।

———

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

প্রথম দৃশ্য

[সরযূ নদীর ধারে ঋষি-আশ্রম……অদূরে সূর্যোদয় হইতেছে]

সমবেত শিষ্য-মণ্ডলীকে লইয়া ঋষি-গুরু আয়োদধৌম্য সূর্যস্তব ও প্রণামে ব্যস্ত…

সমবেত স্তোত্র ঃ— "ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

আয়োদধৌম্য—ঐ সূর্য যিনি পৃথিবীর প্রাণস্বরূপ—চির অন্ধকার দূর করে যিনি আলোক-ধারায় পৃথিবীকে সৃজনশক্তি দেন, প্রীতি দেন, শান্তি দেন—সেই মহানকে প্রণাম করো…

[শিষ্যগণ সূর্যদেবকে প্রণাম জানাইল]

আয়োদধৌম্য—শিষ্যগণ! এইবার তোমরা নিজের নিজের কাজে মনোযোগ দাও…আমি চলি…শুভব্রত, আমার হোমের আয়োজন প্রস্তুত?

শুভব্রত—ঘৃত কিছু কম হবে গুরুদেব।

ঋষি—কেন ?

শুভব্রত—গোদুগ্ধ বড় অল্প ছিল···তাই,···

ঋষি—সেকি ?···গোচারণের ভার কার ওপর ?

শুভব্রত—উপমন্যুর ওপর গুরুদেব।

ঋষি—হুঁ !···উপমন্যু !

উপমন্যু—গুরুদেব !

ঋষি—গোষ্ঠের ভার তোমার ওপর···নিশ্চয়ই তুমি সে কর্তব্যের ত্রুটি ঘটিয়েছো···তাই গোদুগ্ধের এই স্বল্পতা ?···কি চুপ করে আছো যে···বল এ সত্য কিনা ?

উপমন্যু—গুরুদেব ! জ্ঞানতঃ আমি অপরাধ করিনি। নিত্যই আমি গোষ্ঠদল নিয়ে যাই শ্রাবণী বনে। কচি কিশলয় ভেঙে তাদের আমি করি সেবা। হয়ত বা ভুল পাতা খেয়ে গোদুগ্ধ কমে গেছে গুরুদেব !

শুভব্রত—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা···তুমি নিজে পেটপুরে গোদুগ্ধ পান করো তাই কমে গেছে···

উপমন্যু—না গুরুদেব···আমি মিথ্যা বলিনি।

শুভব্রত—না গুরুদেব···ওর সব কথাই মিথ্যে। দেখছেন না কেমন মোটাসোটা নাদুসনুদুস হয়েছে ওর চেহারাটা ? রোজ রোজ গরুগুলোকে গাছের গোড়ায় বেঁধে ও গোদুগ্ধ চুরি করে খায় তাইতো অমন চেহারা করেছে।

ঋষি—শুভব্রত স্থির হও···একথা আমায় সঙ্গে সঙ্গেই জানানো উচিত ছিল। এমন করে মুখোমুখি তর্ক করা তোমার উচিত নয়। উপমন্যু ! শুভব্রত যা যা বললে তাকি সত্যি ?

উপমন্যু—না গুরুদেব···এ সত্যি নয়···তবে অভিযোগ।

ঋষি—তবে এ রকম অভিযাগ তোমার নামে আসার কারণ কি ?

উপমন্যু—তা জানি না গুরুদেব ! তবে আপনার মুখেই শুনেছি, পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে মানুষকে এমন অপবাদ শিরোধার্য করে নিজেকে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়।

শুভব্রত—বেশ—তাহলে গুরুদেব। জিজ্ঞেস করি যে, কি করে ওর অমন নিটোল দেহটি হলো ?

ঋষি—চুপ কর শুভব্রত। উপমন্যু! তোমার কথাই যদি সত্য হয় তাহলে সত্যই তোমার শরীর এমন দিনের দিন পুষ্ট হয়ে উঠছে কিসের বলে?

উপমন্যু—গুরুদেব—আপনি শিখিয়েছেন নামগান করতে, আমি নিত্য তাই করি। ভগবানের নামামৃত পান করেই আমার সারাদিন কাটে—এমন কি আমি সারাদিন জলাহার করতেও ভুলে যাই।

ঋষি—তাহলে তুমি নামামৃত পান ছাড়া আর কিছুই পান কর না—তবু তোমার সহপাঠী তোমার নামে কেন এই মিথ্যা অপবাদ দেয় জানি না···এই মিথ্যা অপবাদ থেকে তোমায় মুক্তি পেতেই হবে।

উপমন্যু—বলুন গুরুদেব—কি করলে আমার হবে মুক্তি?

ঋষি—তোমার সহপাঠীর কেন তোমার প্রতি এত বিদ্বেষ—এর কারণ তোমায় স্পষ্ট করে বলতে হবে—নচেৎ তোমার দিনান্তের ভিক্ষান্ন এনে আমার হাতেই ধরে দিতে হবে—দেখবো তুমি কতদিন নামামৃত পান করে নিরাহার থাকতে পারো?

উপমন্যু—তাই করব গুরুদেব!

ঋষি—তবু তুমি বলবে না কেন তোমার সহপাঠী তোমার প্রতি এতো বিরূপ?

উপমন্যু—নিশ্চয়ই অজান্তে আমি তার ওপর কিছু অবিচার করেছি···কিন্তু তাদের বিপক্ষে বলার মত আমার কোনো নালিশ নেই গুরুদেব।

ঋষি—কিন্তু লোকমুখে শুনেছি যে তুমি যখন গোচারণে গিয়ে অমৃতের গান করো তখন তোমার সহপাঠীরা গোষ্ঠের সব গরুদের দূরে নিয়ে গিয়ে দুধ চুরি করবার প্রচেষ্টা করে···অথচ তুমি গানে এতই প্রমত্ত থাকো যে তা তোমার নজরে পড়ে না।

উপমন্যু—জানি না গুরুদেব!

ঋষি—আমায় মিথ্যা বলো না উপমন্যু!

উপমন্যু—মিথ্যা আমি বলি না গুরুদেব—কারণ মিথ্যা বলতে আপনি আমায় মানা করেছেন।

ঋষি—তবে যা যা বললাম—তা সত্য?

উপমন্যু—কিন্তু আমি যখন গান করি তখন গানই করি। তন্ময় হয়ে অমৃতকে স্মরণ করি—তাই জানি না—এ কথা সত্য কিনা।

ঋষি—তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি তবু তোমায় উপবাস ব্রত নিতে হবে শাস্তির জন্যে নয় তোমার সহপাঠীর এই অকারণ অপবাদের প্রতিবাদ-প্রায়শ্চিত্ত করতে। তোমার

● শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

স্বেচ্ছা-প্রায়শ্চিত্তে তোমার সমস্ত সহপাঠীদের প্রায়শ্চিত্ত সমাপিত হবে।—যাও, গোচারণে যাও—

[শুভব্রত ও উপমন্যুর প্রস্থান। খালি ঋষি আয়োদধৌম্য উপমন্যুর গতি লক্ষ্য করে মঞ্চে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনাঞ্চলে শুভব্রত তার বিশিষ্ট সহপাঠীদ্বয় অচিন্ত্য ও আদিত্যকে লইয়া নিভৃতে কথাবার্তা ও পরামর্শ করিতেছে—অন্যান্য সহপাঠীরা দূরে গোল হইয়া বসিয়া আছে।]

(দৃশ্যের পর্দা উঠিতেই অচিন্ত্য ও আদিত্য একযোগে হাসিয়া উঠিল)

শুভব্রত—না না—এ হাসির কথা নয়। তোরা দেখলি না উপমন্যুর বদজাতিটা। কেমন গোবেচারা সেজে থাকে গুরুদেবের কাছে…যেন আমাদের নামে নালিশ করতে জানেই না, অথচ আগেভাগে চুপিচুপি আমাদের দুধ খাওয়ার কথাটি গুরুদেবের কানে তুলে দিয়ে বসে আছে—উঃ কি ধুরন্ধর !

অচিন্ত্য—গুরুদেবেরও তেমনি একচোখমি। উপমন্যু যা বলবে তা বেদবাক্য—আমরা যেন কেউ কখন সত্যি কথা বলতে জানি না—যা কিছু সত্যি সব ঐ উপমন্যুই বলে ?

আদিত্য—তবে উপমন্যু তন্ময় হয়ে যে গান করে সে কথা সত্যি !

শুভব্রত—থাম—থাম আদিত্য…তুই একটু উপমন্যুর পা-চাটা—অমন অমৃতের গান আমরা সকাল সন্ধ্যে করছি—নামামৃত পান করে ক্ষিদে তেষ্টা ঘুচিয়েছেটা মিথ্যে নয়…

অচিন্ত্য—গুরুদেবও কিন্তু কম যান না—ঠিক বলেছেন—নামামৃত পান করে থাক্—আর খেয়ে কাজ কি…

শুভব্রত—যেতে দে ভাই ওকথা অচিন্ত্য…আমি এখন চিন্তায় পড়ে গেছি—কি করা যায়— ! চল্ আজ ফের যাই দুধ চুরি করতে—উপমন্যু আজ দুদিন ধরে খায়নি বলে গুরুদেব প্রচার করে বেড়াচ্ছেন—

আদিত্য—না প্রচার নয়—সত্যি সত্যি ও দুদিন উপবাসে রয়েছে—

অচিন্ত্য—তুইও যেমন হয়েছিস্—ওকথা বিশ্বাস করতে হয় ? বলি না খেয়ে কেউ কি বাঁচতে পারে নাকি ? কথায় বলে—ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নেই যে ধরে !

শুভব্রত—আমিও ডুব সাঁতার দিচ্ছি। একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ করে তবে ছাড়বো—ভাই অচিন্ত্য একটা কাজ করতে পারিস ?

অচিন্ত্য—কি কি ?

শুভব্রত—চট্ করে শ্রাবণীবনে ঢুকে একবার দেখে আয় যে উপমন্যু কি করছে ? ত্বদিন উপবাসের পরও গানটান গাইছে কি না !

আদিত্য—তবে, চল না আমরা তিনজনেই যাই—

শুভব্রত—না—না এখনি আমাদের বৈঁচিবনে যেতে হবে···বনভরতি বৈঁচি পেকেছে—কোঁচড় ভরে তুলতে হবে। বরং এক কাজ কর, আদিত্য তুই সব পড়ুয়াদের নিয়ে গোষ্ঠ থেকে পিঙ্গলা গাইটাকে তাড়িয়ে বৈঁচিবনের দিকে নিয়ে আয়···

—কিরে কি মতলব ভাঁজলি ?

আমি আর অচিন্ত্য বৈঁচিবনের দিকে এগুচ্ছি···দেখি কি হয়। যা—যা—আদিত্য, দাঁড়িয়ে থাকিস্ না।

[আদিত্যের প্রস্থান]

অচিন্ত্য—কিরে কি মতলব ভাঁজলি ?

শুভব্রত—পিঙ্গলাকে নিয়ে বৈঁচিবনের কাঁটায় কাঁটায় জড়িয়ে দেবো—যাতে না বেরুতে পারে—তারপর তার সব তুধটুকু মেরে দেবো—আর নীচে যে তুধটুকু ঝরে পড়বে—তাই গুরুদেবকে এনে দেখিয়ে দেবো—তাই বলছি—তুই চট্ করে চলে যা আশ্রমের দিকে—সেইখানে দাঁড়িয়ে শুনবি আমাদের বৈঁচিবনের গান—যেই গান থেমে যাবে—অমনি গুরুদেবকে নিয়ে বৈঁচিবনের দিকে রওনা দিবি !—বুঝেছিস্···

আদিত্য—তাহলে ?

● শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

শুভব্রত—এখন চল্ সব পড়ুয়াদের নিয়ে বৈঁচিবনের দিকে এগোই—ধর্ ধর্ সব গান ধর—

(সমবেত সংগীত করতালি সহযোগে)

চল্‌রে বন্ধু দল!
বৈঁচি বনে চল।
পাতায় পাতায় ঝুলছে কত
মিষ্টি পাকা ফল॥
মুঠো মুঠো ভরিয়ে ডালা,
বৈঁচি ফলে গাঁথব মালা,
পেটের জ্বালায় কাঁটার জ্বালা
ঘুচবে রে সকল॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রাবণীবন

[উপমন্যু একটি কৃষ্ণচূড়া গাছে হেলান দিয়া তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছে।]

উপমন্যুর গীত—

পাগল বাঁশি ডাকেরে—
নিখিল-নূপুর বাজেরে!
ঝরঝর ঝোরা, তানেরে,
কলকল নদী গানেরে,
ঝলমল তারা হারেরে
নিখিল-নূপুর বাজেরে!
ময়ূর-পাখায়, নাচ তুলে যায়, অর্ধ-চন্দ্র সাজেরে—
প্রজাপতি-পাখে, রামধনু রং মাখে, অলস পূরবী সাঁঝেরে!
গোধূলি-ঘণ্টা বোলেরে—
শিশু চাঁদ পথ ভোলেরে
রং ঝরা মেঘের কোলেরে
নিখিল-নূপুর বাজেরে!

[গানের মাঝে দূর থেকে 'আয়—আয়' শব্দ ভেসে আসে…'হাম্বারবে' যেন সেই ডাকের উত্তর দিয়ে গাভীরা দূরান্তের পথে চলে]

(গান থামাইয়া উপমন্যু বলে)

উপমন্যু—একি এ যে পিঙ্গলার ডাক! পিঙ্গলা—পিঙ্গলা—কোথায় তুমি—পিঙ্গলা—

[দ্রুত গাভীর সন্ধানে প্রস্থান। অদূরে—'চলরে বন্ধু দল! বৈঁচিবনে চল'—গান সমাপ্ত]

[শুভব্রতের কণ্ঠে ডাক আসে—অচিন্ত্য! অচিন্ত্য !!]

[অচিন্ত্য ও শুভব্রত দ্রুত প্রবেশ করে। শুভব্রত অচিন্ত্যকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলে—]

শুভব্রত—অচিন্ত্য, দৌড়ে যা গুরুদেবের আশ্রমে, খবর দে—গুরুদেব নিজের চোখে দেখে যান যে কেমন করে উপমন্যু গরুর দুধ চুরি করে। যা—যা—

[অপর দিক দিয়া শুভব্রত বাহির হইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

বৈঁচিবন

[পিঙ্গলা গাভী ও উপমন্যু। পিঙ্গলা গাভীকে বৈঁচিবনের ছায়ায় অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। উপমন্যুর প্রবেশ]

উপমন্যু—একি! একি করেছো পিঙ্গলা! এই ঘন বৈঁচিবনের কাঁটার মধ্যে তুমি কেমন করে এলে বল দেখি! একে আজ দুদিন উপবাসী…সারা গা ঝিমঝিম করছে—এ অবস্থায় তোমায় এই ঘন কাঁটাবন থেকে কি করে উদ্ধার করি বল দেখি? —ইস্ এ যে সারা মাটি দুধে দুধ—তবে কি—না—না—ছিঃ অপরের ওপর দোষ মনে আনলেও পাপ হয়—এ আমারই কর্মফল—কেন আমি গান গাই—কেন আমি গোষ্ঠে মনোনিবেশ করতে পারি না…এখন উপায়?

[আদিত্যের প্রবেশ]

!দিত্য—কি হয়েছে উপমন্যু…কিসের উপায়? ও!…এ কি এ যে দুধের গঙ্গা বইছে, বুঝেছি। পিঙ্গলা বুঝি তোকে উপবাসী দেখে বুকের দুধ খুলে দিয়েছে—আহা!

একি—আমার চোখের সামনে থেকে জগতের আলো যেন ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে··· [পৃষ্ঠা ৪৭৫

উপমন্যু—তাই নাকি! ও কি আমার জন্যেই এমনি করে······ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি কত বড় পাপী···আমি মনে মনে এখনি শুভব্রতকে দোষ দিতে যাচ্ছিলাম।

[শুভব্রতের প্রবেশ—সঙ্গে তার কোঁচড়ে এক কোঁচড় বৈঁচি]

শুভব্রত—এ কি রে—এখানে কি করছিস—শুনলাম আজ তুই দুদিন ধরে উপবাসী তাই বন থেকে বৈঁচি তুলে তোর জন্যে নিয়ে এসেছি—

উপমন্যু—না ভাই! ও তো আমি খাবো না—গুরুদেবকে ফলমূল যা পাবো নিয়ে গিয়ে ধরে দেবো প্রতিজ্ঞা করেছি—ওগুলো না হয় আশ্রমেই দিয়ে আয় ভাই।

আদিত্য—তোর ক্ষিদে পায় নি রে উপমন্যু?

উপমন্যু—গুরুদেবকে নিবেদন না করে, কি করে খাই বল?

শুভব্রত—তবে ভাই—আমি এগুলা আশ্রমেই পৌঁছে দি।

[দ্রুত প্রস্থান]

আদিত্য—আমি তো ভাই একদিন না খেলেই চোখে অন্ধকার দেখি।

উপমন্যু—ক্ষিদের জ্বালায় চোখে অন্ধকার আমিও দেখছি—কিন্তু উপায় নেই—চল না—পিঙ্গলাকে একটু কাঁটার বন থেকে উদ্ধার করে নি।

আদিত্য—চোখে যখন অন্ধকার দেখছিস্ তখন যা গুরুদেবকে দেওয়া যায় না তাই না হয় খা—মানে যা মানুষের আহার্য নয়।

উপমন্যু—সে আবার কি?

আদিত্য—এই ঘাস-পাতা, যা গরুতে খায়। কিন্তু কিছু না খেলে গায়ে জোর পাবি কি করে? ওগুলো তো গুরুদেবকে নিবেদন করতে হবে না···আমার কথা

বোঝ···কিছু খেলেই গায়ে জোর পাবি—তখন দুজনে মিলে পিঙ্গলাকে উদ্ধার করে নেবো।

উপমন্যু—বেশ তবে কারো দেওয়া জিনিস নিলে ভিক্ষা গ্রহণ করা হবে। আমি বরং নিজেই ওটা সংকলন করছি—পিঙ্গলাকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য—কাজেই উপবাসক্লিষ্ট দেহে তা যখন হবে না আমি সামনের গাছের পাতা দুচারখানা খাই—তুই ততক্ষণ ছুটে গিয়ে শুভব্রতকেও আমাদের সাহায্যে ডেকে নিয়ে আয়······যা ভাই [আদিত্যের প্রস্থান]······তবে তাই করি পিঙ্গলার উদ্ধারের জন্যে অন্ততঃ আমার অখাদ্য খেয়েও শরীরে বল আনতে হবে—আর এগুলা অখাদ্যই বা হবে কেন যখন গরুরা খায়—

[আকন্দ পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে গান গায়]

গীত

ঘাসে ও পাতায় শিশিরকণায় পড়েছে অমৃত গলি',
তাই দিয়ে আর তাই নিয়ে শুধু ভরিব অঞ্জলি !
এইটুকু তব দানে, শক্তি যোগায় প্রাণে
মধুভাণ্ড ভরিয়া এনেছে কুসুমের নব-কলি,
তাই দিয়ে আর তাই নিয়ে শুধু ভরিব অঞ্জলি।

[পাতা চিবাইতে চিবাইতে]

একি—আমার চোখের সামনে থেকে জগতের আলো যেন ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে··· দিনের আলো কি নিভে গেল···তবে সন্ধ্যা হয়ে গেলো—আমার দৃষ্টিশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে···তবে ? তবে কি হবে—কি করে আমি পিঙ্গলাকে উদ্ধার করব···হয়ত গুরুদেবের চরণে নতুন করে অপরাধ করে বসলাম। উঃ কি ভীষণ অন্ধকার !

গীত

হে জ্যোতিষ্মান !

আমার নয়নে জ্বালো—শতসূর্যের কনককিরণ আলো।

উঃ—[পাশের কূয়ার মধ্যে উপমন্যুর পতন। ছেলেদের বিকট হাস্যধ্বনির মধ্যে শুভব্রত বলে ওঠে]

শুভব্রত—কূয়ার মধ্যে কুপোকাত—হা-হা-হা···

● শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

আদিত্য—ও কি চোখে দেখতে পাচ্ছে না ?

শুভ—আকন্দপাতাগুলো কাঁউকাঁউ করে চিবিয়ে গিলে খেলে চোখের দৃষ্টি হারাবে না তো কি হারাবে শুনি ?

আদিত্য—হায়—হায়—আমিই যে ওকে গাছের পাতা খেয়ে শরীরে বল আনতে বলে তোকে ডাকতে গিয়েছিলাম। তোর হয়ত আনন্দ হচ্ছে শুভব্রত কিন্তু আমার যে কান্না পাচ্ছে—আমার জন্যেই যে ও দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে—এখন কি করি ?···ভাই উপমন্যু···উপমন্যু !

উপমন্যু—কে ভাই আমায় ডাকছো—আদিত্য ? তুমি আদিত্য— ?

আদিত্য—আমরা ভাই তোমায় কাপড় ফেলে দিচ্ছি তুমি উঠে এসো—তুমি কি চোখে দেখতে পাচ্ছ না ?

উপমন্যু—না ভাই—আমার কর্মফলের জন্য তোমরা কেউ দায়ী নও—আমার এই সাজাই প্রাপ্য—তাই গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে তাঁর কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা জানাচ্ছি।

আদিত্য—গুরুদেবকে ডাকতে অচিন্ত্য গেছে—ততক্ষণ তোমায় তুলে নি এসো ভাই।

উপমন্যু—গুরুদেব আমার ডাকেই আসবেন ভাই—

গীত

গুরু আমার নিত্য ধ্যানের গতি,
গুরু পদ মোর পূজার সন্ধ্যারতি।
মন্ত্র আমার গুরুর সে শুভবাণী,
মুক্তির পথ গুরুর আশিসবাণী।
আদি অনাদিতে শ্রীগুরুপ্রকাশ গুরুই নয়নজ্যোতি,
গুরুর চরণে এক হয়ে যায় প্রণবের সে প্রণতি॥

[দূর হইতে আয়োদধৌম্যের স্বর শোনা যায়]

উপমন্যু, কোথায় তুমি—কোথায় ? [ঋষির প্রবেশ]

ঋষি—এই যে শিষ্যবর্গ—উপমন্যু কোথায় ?

আদিত্য—এই কূয়ার মধ্যে গুরুদেব।

ঋষি—কূয়ার মধ্যে ? সে কি ?

আদিত্য—হ্যাঁ গুরুদেব—আমরাই এই অপকর্ম করেছি। উপমন্যুর ওপর হিংসা করে পিঙ্গলাকে বৈঁচিবনে বন্দী করে দুধ চুরির অপবাদ দেবো বলে ওকে আমরা ষড়যন্ত্র করে এইখানে এনে ফেলেছিলাম। খিদায় বুভুক্ষু উপমন্যু! আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম, আকন্দ পাতা খেয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করতে—তাই অন্ধ হয়ে কূয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

ঋষি—নিশ্চয়ই তোমরা শুভব্রতের কথায় এসব করেছো।

আদিত্য—হ্যাঁ গুরুদেব—আমাদের আপনি ক্ষমা করুন।

ঋষি—ক্ষমা চাও উপমন্যুর কাছে—উপমন্যু!

উপমন্যু—গুরুদেব!

ঋষি—উঠে এসো—

উপমন্যু—আমি যে অন্ধ—কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না।

ঋষি—তোমার নয়নে শত সূর্যের আলো জ্বলে উঠুক—জ্যোতিষ্মান! উঠে এসো— গরুড়কে স্মরণ করো, তিনি তোমায় আকাশপথে তুলে ধরবেন।

[ধীরে ধীরে কূয়া থেকে শূন্যাশ্রয়ে উপমন্যু উঠে আসে]

উপমন্যু—একি আলো—একি জ্যোতি—একি অপরূপ দীপ্তি !!

সকলে—উপমন্যু ভাই—আমাদের তুমি ক্ষমা করো [সবাই পায়ের কাছে বসে]

উপমন্যু—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—গুরুদেবের পায়ের তলায় সবাই আশ্রয় নি চলো—তিনি অনুতপ্তকে ক্ষমা করেন—

[আয়োদধৌম্যকে ঘিরে সমস্ত শিষ্যবর্গের সমাবেশ]

গীত

তাঁর ক্ষমা গলে পড়ে নিখিলের চরাচরে—
জ্ঞানের আলোক করি,
শ্রীগুরুর রূপ ধরি,
অখিল বিমানে ভাসে ওম্‌কারে।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

———

বিমল মিত্র

ছোটবেলাটা দেখেই হয়ত বোঝা যায় বড় হয়ে কে কী হবে। যে ছেলে লেখা-পড়ায় অমনোযোগী বড় হয়ে সে যে কিছুই হতে পারবে না এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

আমাদের ছোটবেলায় একটা শ্লোক প্রায়ই শুনতাম ঃ—

লেখা-পড়া করে যে,
গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে!

কথাটা যে কত বড় মিথ্যে তা বহু মহাপুরুষের জীবনে বহুবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাইভ নামে যাকে চিনি, লর্ড ক্লাইভ বললে যাকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এক ডাকে চিনে ফেলে, তাঁর আসল পরিচয়টা আজ পর্যন্ত অজানা রয়ে গিয়েছে।

বিলেত দেশটা ঠাণ্ডার।

সে শীতের ঠাণ্ডা এখানকার ঠাণ্ডা নয়। সেই শীতের দেশের ঠাণ্ডা কনকনানির মধ্যে একটা শিশুর জন্ম হয়েছিল। বড় গরিব সংসারের সেই সন্তান। শুধু গরিব নয়, সে পরিবারের যিনি কর্তা তিনি দুর্দান্ত মদ্যপ। মানে মাতাল।

ছোটবেলায় শিশু কিছু বুঝতে পারে না কোথায় সে জন্মেছে। তার কাছে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সবই সমান তখন। কিন্তু আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান হতে লাগলো, যতই বুঝতে শিখলো, ততই দেখলে যে বাবার স্নেহ-ভালবাসা তার কপালে নেই।

ভদ্রলোক বাইরে থেকে প্রচুর মদ খেয়ে এসে বাড়িতে চিৎকার করেন। পাড়ার লোকজনও ছুটে আসে সে চিৎকারে। তারপর কোনও রকমে আবার সব মিটমাট হয়ে যায়। আবার সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে।

ছোটবেলার একটা সুবিধে আছে। সে সুবিধেটা হলো তখনকার কথা মানুষ সমস্তই বড় হবার পর ভুলে যায়।

তখন মাত্র তিন বছর বয়েস ক্লাইভের, সেই সময়ে একদিন তার বাবার ওপর রাগ করে তার মা তাকে নিয়ে তার মাসীর বাড়িতে চলে গেল। মাতাল-স্বামীর সঙ্গে আর কতদিন একসঙ্গে ঘর করা যায়!

মাত্র তিন বছর বয়েস।

মানুষের স্মৃতিশক্তির পরিধি অত পেছনে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু খুব ক্ষীণ ভাবে মনে পড়তো মা যেন মাঝে মাঝে কাঁদতো। ছোট শিশুটি মায়ের জল-ভরা চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতো। হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে যেত। পরবর্তী জীবনে যাকে চিরকাল ভাগ্যের সঙ্গে অবিরল সংগ্রাম করতে হবে তারই হয়ত সূত্রপাত হয়ে গেল সেই মায়ের কোলে থাকবার সময়েই।

কিন্তু ওই তিন বছর পর্যন্তই।

তার পরেই তাকে পাঠানো হলো একটা স্কুলের বোর্ডিং-বাড়িতে। বাপের সঙ্গে আগেই বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। এবার হলো মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ।

ভাগ্যদেবতার এ-বিধান হয়ত অনিবার্য ছিল। কিন্তু ক্লাইভের পক্ষে এ নির্বাসন ভালোই হয়েছিল। রাস্তায় ফুটপাথে যে-ছেলে জন্মায় তার কি এই পৃথিবীর ওপর কোনো অধিকার থাকে না? সেও তো এই পৃথিবীরই অধিবাসী! তার জন্যে আছে অবারিত আকাশ, সূর্যের তাপ, বৃষ্টির জল আর অফুরন্ত হাওয়া। তাকে তার

তাদের বাবারা আসে মায়েরা আসে।

জন্যে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। সে আপন গরজেই মানুষের সমাজে একজন হয়ে বেড়ে ওঠে!

ক্লাইভও তেমনি আপন গরজেই বেড়ে উঠতে লাগলো।

এ-সংসারে বড় হতে গেলে অনেক মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সাধারণ হতে চাওয়ার অনেক সুবিধে। একটু আপোষ করতে জানলেই কোনও না কোনও জায়গায় একটা স্থান-সংকুলান হয়ে যায়ই।
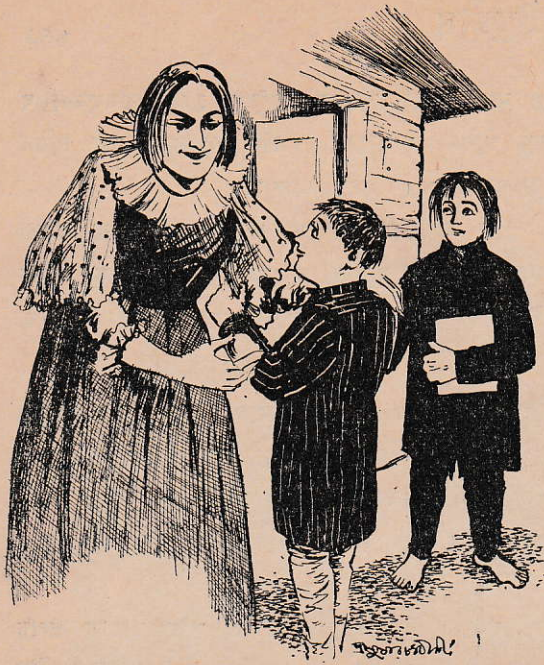
স্কুলে এসেই ক্লাইভ প্রথম অনুভব করতে পারলে যে পৃথিবীটা কত নিষ্ঠুর জায়গা। অন্য ছেলেদের বেলায় তাদের বাবারা আসে মায়েরা আসে। কত খাবার, কত স্নেহ তাদের জন্যে স্কুলের বাইরে জমা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্লাইভের জন্যে কোথাও কেউ নেই। সে একলা। মা আছে তার, কিন্তু গরিব-মায়ের থাকা না-থাকা সমান। মা থেকেও নেই। মা নিজেরই অন্ন-সংস্থানের জন্যেই পরের গলগ্রহ, ছেলের জন্যে কতটুকু দাক্ষিণ্য বাঁচাবে!

সুতরাং ঈশ্বরের করুণা আর স্নেহকে মূলধন করে বড় হয়ে ওঠা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না। তখন থেকেই ঠিক করলে ক্লাইভ যেমন করে হোক তাকে এই অকরুণ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। অকরুণ পৃথিবীটাকে নিজের বশে আনতে হবে।

যে ছেলের লেখা-পড়া হয় না সে গোল্লায় যায় বলেই সাধারণ লোকের ধারণা। তখনকার দিনে সাধারণতঃ সেই সব ছেলেদেরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

তেমনি একদিন রবার্ট ক্লাইভও চাকরি নিয়ে এল ভারতবর্ষে।

নামে 'রাইটার'। তার মানে হলো কেরানী। তখনকার দিনে কেরানীদের বলা হতো 'রাইটার', মাইনে মাসে আট টাকা। আট টাকা মাইনের কেরানী হওয়া ছাড়া আর কোনও যোগ্যতাই ছিল না তার। অন্ততঃ তার বাবা-মা, তার বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শীরা তাই-ই ভাবতো। বিশেষ করে তার চাকরি-স্থলের সবাই-ই জানতো যে ও একটা অপদার্থ!

আর আশ্চর্যের ব্যাপার, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি কত অপদার্থ যে তাদের কীর্তিকলাপ দিয়ে স্থায়ী-স্বাক্ষর রেখে গেছে তার উদাহরণ ইতিহাসের পাতাতেই অজস্র ছড়িয়ে আছে। জীবনের সার্থকতা আর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে? কার এত দূরদৃষ্টি?

প্রথমে চাকরিস্থল হলো মাদ্রাজ।

একেবারে অন্য দেশ, অন্য আবহাওয়া। হঠাৎ চেনা-জগতের আবহাওয়া থেকে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে কত দূর এক বিদেশ-যাত্রা। জাহাজেও মন খারাপ হয়ে যেত ছেলেটির। সবাই বলেছে তার কিছু হবে না। সবাই বলেছে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সবাই বলেছে সে কোনও কাজের নয়।

আফিসে বসে সে কাজ করে। কিন্তু কাজের চেয়ে সে ভাবে বেশী। কোথায় ইংলণ্ডের কোন্ এক গ্রামের একটা বাড়িতে তার জন্ম, আর কোথায় কত দূরে ইণ্ডিয়ার এক প্রান্তে তার কর্মস্থল। মা নেই, বাবা থেকেও নেই। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার এই দূরযাত্রা, এর শেষ কোথায়? তাকে দিয়ে কি কোনও কাজ হবে? পৃথিবীতে কি সে কোনও দান রেখে যেতে পারবে?

আশেপাশের যে সব ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করে সবাই তার নিজের দেশের নিজের জাতের লোক। তারা রবার্টকে ভাবে বোকা। তারাও ভাবে ছেলেটা অপদার্থ। তারাও ভাবে এ কোনও কাজের নয়।

ভাবুক। রবার্ট ভাবে যার যা খুশী তাই তাকে ভাবুক। তবু তাকে কিছু করতেই হবে। তাকে কিছু কাজ করে দেখাতে হবে সে বোকা নয়। সে সব বোঝে। সে অপদার্থ নয়। সে তাদের জাতের তাদের দেশের গৌরব।

কিন্তু তবু কিছু সুরাহা হয় না।

এক-একদিন সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে মারামারি হয়।

● বিমল মিত্র

মারামারি মানে মারাত্মক মারামারি। মেরে সে সকলকে ঘায়েল করে দেয়। অভিযোগ ওঠে ওপরওয়ালার কাছে। রবার্ট তাদের সকলকে মেরেছে।

কর্তা একদিন ডেকে পাঠান।

—তুমি মারামারি করেছ?

রবার্ট বলে—হ্যাঁ—

—কেন?

রবার্ট বলে—ওরা আমায় ঘেন্না করে।

—কে বলেছে ওরা তোমায় ঘেন্না করে?

রবার্ট বলে—হ্যাঁ আমি জানি। ওরা মনে করে আমি অপদার্থ। ওরা মনে করে আমি কোনও কাজের নই। কিন্তু আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমি ওদের চেয়ে কোনও অংশে কম নই। আমিও ওদের মত মানুষ, ওদের মত আমারও রাগ ঘৃণা ভালবাসা আছে, ওদের মত মারলে আমারও ব্যথা লাগে।

কর্তা বললেন—যাও—

বললেন বটে 'যাও', কিন্তু অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেন আরো ওপরওয়ালার কাছে। ওপরওয়ালারা আরো ওপরওয়ালাদের কাছে জানিয়ে দিলেন যে রবার্ট ক্লাইভ রাইটার খুবই অযোগ্য ব্যক্তি। শুধু অযোগ্য নয়, অভদ্রও বটে!

কিন্তু তাতে রবার্ট ক্লাইভের কিছু এসে গেল না। সে তেমনিই নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলো।

শেষে জীবনের ওপর একদিন ঘৃণা হলো। যে-জীবন ব্যর্থ সে-জীবন রেখে কী লাভ? একদিন ঠিক করলে সে আত্মহত্যা করবে।

ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে একদিন সে তার পিস্তলটা নিয়ে নিজের বুকের দিকে তাক করলে। তারপর আস্তে আস্তে ট্রিগারটা টিপলে।

কিন্তু গুলি বেরোল না।

অবাক্ কাণ্ড। আবার তাক করলে নিজের বুকের দিকে। আবার ট্রিগার টিপলে।

কিন্তু সেবারও গুলি বেরোল না।

তখন ক্লাইভের কেমন যেন সন্দেহ হলো।

পিস্তলটা ভালো করে পরীক্ষা করলে। কিন্তু না, কোথাও কোনও খুঁত নেই। গুলি ভরা রয়েছে।

তখন পরীক্ষা করবার জন্যে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপলে। প্রচণ্ড শব্দ করে গুলি তীব্র বেগে ছুটে বেরোল।

রবার্ট ক্লাইভ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

এটা কী হলো। এও তো এক দৈব-ঘটনা! রবার্টের মনে হলো ঈশ্বরের বোধহয় ইচ্ছে নয় সে আত্মহত্যা করুক। ঈশ্বরের হয়ত অভিপ্রায় যে তাকে দিয়ে কিছু মহৎ কাজ করাবেন। তাহলে তা-ই হোক, সে বেঁচে থাকবে। সে বেঁচে থেকে একটা-না-একটা মহৎ কাজ করে তার স্বদেশবাসীকে দেখিয়ে দেবে যে সে মহৎ!

মেরে সে সকলকে ঘায়েল করে দেয়। [পৃঃ ৪৮২

ঘরের দরজা খুলে সে বাইরের উদার আকাশের তলায় বেরিয়ে এল।

তখন থেকে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। যে মানসিক অশান্তিতে রবার্ট ভুগছিল তা থেকে সে খানিক মুক্তি পেল।

এর পরেই একটা অদ্ভুত সুযোগ এসে গেল তার জীবনে।

মাদ্রাজের লাটসাহেব মিস্টার মর্শের একটা বিরাট লাইব্রেরী ছিল। তিনি একদিন নিজের লাইব্রেরীটা রবার্টকে ব্যবহার করতে দিলেন। সে এক নতুন জগৎ। লাইব্রেরীর বিভিন্ন লেখকের বই পড়তে পড়তে রবার্টের মনে হলো জীবনে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। হতাশাই পাপ। অতীতে যাঁরাই বিখ্যাত হয়েছেন, স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আজন্ম সংগ্রাম করতে হয়েছে। সংগ্রামই জীবন। যে জীবনে সংগ্রামশীলতা নেই সে বড় সাধারণ। সংগ্রামে কেউ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার সংগ্রামই কাউকে প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে পৌঁছিয়ে

দিয়েছে। শত্রু-সৃষ্টি শক্তিরই লক্ষণ! যার শত্রু নেই সে দুর্বল অক্ষম। রবার্টের যে শত্রু আছে তার কারণ সে বলবান। বলবানেরই শত্রু থাকে, দুর্বলের কে শত্রুতা করবে?

তারপর রবার্টের দৃষ্টিতে পৃথিবীটা অন্য রকম চেহারা নিলে। সেই মাদ্রাজেই এমন অনেক বন্ধুর সাক্ষাৎ পেলে যাদের প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল আছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাদের সঙ্গে মিশে দেখলে তারাও সবাই সংগ্রামী। সংগ্রাম করতে করতেই তারা এত দূর এগিয়েছে। সংগ্রাম করতে করতেই তারা আরো এগোবে।

মনটা অনেকটা শান্ত হয়ে এল তার। নতুন উদ্যম নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলো এতদিন যে পথে সে চলে এসেছে সেটা ভুল পথ। এবার তার সব ভুলের সংশোধন করতে হবে। কিন্তু কিসে কেমন করে তা সম্ভব তা তখন তার মাথায় এলো না।

কিন্তু যে সত্যিকারের উদ্যমী, সুযোগের তার কখনও অভাব হয় না। সুযোগ অনেকটা সৌভাগ্যের মত। তাকে চিনতে পারা চাই, তাকে গ্রহণ করতে পারা চাই।

রবার্ট ক্লাইভ ঠিক এই সময়ে এমনি সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল।

ফ্রান্স আর ব্রিটেনের মধ্যে তখন প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেছে ইওরোপে। ভারতবর্ষেও তার ঢেউ এসে পৌঁছেছে।

মাদ্রাজের সেই জনপদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হতে শুরু করলো। সে বিবাদ ক্রমে পরিণত হলো যুদ্ধে।

আর সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের ভাগ্যোদয় হয়ে গেল। ফরাসী আর ব্রিটিশদের মধ্যে সেই যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের বীরত্ব দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সামান্য একটা হাবাগোবা গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলের যে এত সাহস তা আগে কে জানতে পেরেছিল? সেদিনকার সেই রক্তক্ষয়ী লড়াইতে সবাই অবাক্ হয়ে গেল তাদের রাইটার রবার্ট ক্লাইভের নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা, সংযম আর সকলের ওপর সূক্ষ্ম বিচার-বোধ দেখে। এ ক্ষমতা সকলের থাকে না। মানুষ স্বভাবগত কতকগুলো গুণের জন্যেই বড় হয়। বড় কেউ কাউকে করতে পারে না। বড় হতে হয়। কাউকে ঠেলে উপরে উঠিয়ে দিলে সে আবার পড়ে যেতে পারে। কিন্তু যে নিজের শক্তিতে ওঠে, তার ভিত বড় পাকা। তাকে ফেলে নীচেয় নামানো বড় শক্ত। রবার্ট ক্লাইভের তাই ছিল।

● রবার্ট ক্লাইভ

তাই সেদিনকার সেই ফরাসী-ব্রিটিশের যুদ্ধে এ-কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে সেন্ট্ ফোর্ট ডেভিড নামে যে কেল্লা ছিল তার উদ্ধারকর্তা হওয়ার গৌরব যদি কারোর প্রাপ্য হয় তো সে রবার্ট ক্লাইভ।

সেন্ট্ ফোর্ট ডেভিডের জয়ের সংবাদ গিয়ে পৌঁছুলো ইংলণ্ডে।

পৌঁছুলো খবরটা বাপের কাছেও।

বাপও অবাক। বাপ কোনওদিন ছেলের ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছেলে তার মানুষ হলো না বাঁদর হলো তা ভেবেও কখনও মাথা খারাপ করেনি।

খবরটা পেয়ে বাপ বললে—আরে, রবার্টটা এত বড় বীর—

এমনি হয় সংসারে। মানুষ যখন বড় হয় তখন তার বড় হওয়ার কীর্তিটাই লোকের চোখে পড়ে। কিন্তু তার পেছনের কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোর ইতিহাসের খবর ক'জন রাখে আর ক'জনই বা দেখতে পায়!

এই সময়টাই বড় সুখে কেটেছিল রবার্ট ক্লাইভের। এই ক'টা দিন। চারদিকে খাতির, চারদিকে সম্মান, পদোন্নতি, দেশের লোকের প্রশংসা। রবার্ট ক্লাইভের সেই সময়েই প্রথম মনে হয়েছিল যে তার জীবন সার্থক।

কিন্তু তখনও ক্লাইভের বয়েস তো কম তাই বুঝতে পারেনি যে জীবন অত সহজ নয়। সাফল্য সাময়িক। সাফল্যের সার্থকতা মানুষকে শুধু আরো বড় সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সাফল্য মানুষকে সুখী করে না, আরো দুর্গম পথের যাত্রী করে বৃহত্তর সাফল্যের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রলুব্ধ করে।

ক্লাইভের জীবনেও তাই হলো।

তখন ক্লাইভের বিয়ে হয়ে গেছে। মাদ্রাজে থাকতেই একটি স্বজাতীয় মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ সমাধা হয়ে গেছে। অর্থ হয়েছে, সম্মান হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে। আর কী চাই!

যুদ্ধ থেমে যাবার পর স্ত্রীকে নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছুলো রবার্ট ক্লাইভ। সেখানে তখন প্রচুর অভিনন্দন তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। শুধু শুকনো অভিনন্দন নয়, তার সঙ্গে পদ, পদবী, পদমর্যাদা। নানা লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কৃতার্থ হয়ে গেল রবার্ট ক্লাইভ।

ছিল সামান্য একজন দুঃস্থ পিতার সন্তান। অখ্যাত অবজ্ঞাত। হলো সম্মানীয় স্মরণীয় পূজনীয় ব্যক্তি। সমাজের একজন, দেশের গৌরবস্থল!

● বিমল মিত্র

কিন্তু বেশীদিন ভালো লাগলো না এই তথাকথিত নিষ্ক্রিয়তা। পুরুষ-সিংহ যে, সে কখনও নিষ্কর্মা থাকতে পারে না। সে চায় কাজ। একটা কাজ ফুরিয়ে গেলে আর একটা কাজ। আরো আরো কাজ। যতদিন দেহে শক্তি আছে ততদিন কাজ করার মধ্যেই সে তৃপ্তি খোঁজে।

সুযোগও এসে গেল আবার।

পুরুষ-সিংহের জন্যে বোধ হয় সুযোগের কোথাও অভাবও হয় না সংসারে।

বাঙলা দেশে তখন ব্রিটিশের ভাগ্যতরী টলমল করছে। বাঙলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা ব্রিটিশ-শক্তিকে কলকাতা থেকে হটিয়ে দিয়ে একেবারে ফলতায় পাঠিয়ে দিয়ে কোণঠাসা করেছে। যাতে আর তারা কলকাতায় ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থাও করেছে।

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে কথাটা উঠলো।

এ অপমান অসহ্য। এর একটা প্রতিকার করা অপরিহার্য! এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু কে এর প্রতিকার করবে? তেমন সাহস, তেমন নিষ্ঠা, তেমন তেজস্বিতা কার আছে? কজনের আছে?

সকলেরই মনে পড়লো কর্নেল ক্লাইভের কথা!

ক্লাইভকে সাদরে ডাকা হলো। জিজ্ঞেস করা হলো—আপনি আর একবার ভারতবর্ষে যেতে পারবেন?

—কেন?

—আমাদের ইংরেজ জাতির সম্মানহানি করেছে বাঙলার নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা। আপনি পারবেন ইংরেজের লুপ্ত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে? আপনার ওপর সমস্ত ইংরেজ-জাতের ভাগ্য নির্ভর করছে। যাবেন আপনি সেখানে?

রবার্ট ক্লাইভ এই সুযোগের জন্যেই যেন এতদিন প্রতীক্ষা করছিল। বীরের রক্ত বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পেয়ে গরম হয়ে উঠলো।

বললে—আমি রাজি—

এ সেই ১৭৫৭ সালের বাঙলা দেশ। জলা জমি আর মশা-মাছির জন্মভূমি। ঠাণ্ডা-শীতের দেশের লোক আবার এসে পৌঁছুলো এ-দেশে। আবার সংগ্রাম শুরু হলো। এবার আরও কঠিন সংগ্রাম। এখানেও ছিল ফরাসী-শক্তি।

ফরাসীরা তখন চন্দননগরের মত অঞ্চলে বেশ কেল্লা বানিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে। তাছাড়া বাঙলার নবাবের সঙ্গে তাদের বেশ ভাবও জমে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সূত্রে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

আর ইংরেজদের অবস্থা তখন শোচনীয়। তাদের এখানে না আছে চাল না আছে চুলো। থাকার মধ্যে একটা কেল্লা বানিয়েছিল কলকাতায়, তাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নবাব। বলতে গেলে তখন তাদের একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থা। ফলতার কাছে একটা জাহাজের ওপর সবাই মিলে বাস করছে। কোথাও কারো কাছে খাবার-দাবার কিনতে পায় না। ইংরেজদের কাছে কিছু বিক্রি করা নবাব আইন করে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

এ হেন অবস্থায় ক্লাইভের ওপর দায়িত্ব পড়লো আবার কলকাতায় ইংরেজদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এইখানেই ক্লাইভ তাঁর বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার চরম পরিচয় দিলেন।

এইখান থেকেই সূত্রপাত হলো ব্রিটিশ-শক্তির ভাবী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা। যে-সাম্রাজ্যে কোনও দিন সূর্য অস্ত যেত না।

কেমন করে সেদিন সেই এককালের অখ্যাত অবজ্ঞাত ছেলেটি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ পাকা-পোক্ত করে দিল সে এক দীর্ঘ কাহিনী। কী দুর্ধর্ষ সাহস, কী অপরিমেয় ধৈর্য, কী রহস্যজনক কূট-কৌশল বিস্তার, কী কঠোর নিয়মানুবর্তিতার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

সেই যুগে জালিয়াত-জুয়াচোর প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে এদেশে-ওদেশে অনেকেই ক্লাইভকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তার অধিকাংশই সত্য। কিন্তু যুদ্ধে বা কূটনীতিতে আজো এ-সব তো অবলীলায় চলে আসছে। যুদ্ধের মত ব্যাপারে আবার সততা কী বস্তু?

পলাশীর যুদ্ধই ক্লাইভের জীবনে এক অক্ষয় কীর্তি। ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্য সে এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নবাবের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতিদেরই সেই বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। ক্লাইভ শুধু সেই বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, এই তাঁর অপরাধ।

পৃথিবীর সামনে যে একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, যে তার সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সকলকে পরাস্ত করে, তার জয় যে অনিবার্য এ-কথা আর কেউ না-জানুক তার ভাগ্যলক্ষ্মী তো জানতেন।

● বিমল মিত্র

নবাব সেই যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সেই ন'ঘণ্টার যুদ্ধ!

আর ক্লাইভ হলেন বিজয়ী। বত্রিশ বছর বয়সের একজন ছেলের কাছে সাতাশ বছর বয়সের একজন নবাব পরাজিত হলেন।

ভারতবর্ষে দিনের বেলাতেই সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার সেই-ই হলো সূত্রপাত।

কিন্তু যারা সে-কাহিনী পড়বে তারা জানতে পারবে সেদিন সে শুধু সম্ভব হয়েছিল ক্লাইভের কূটবুদ্ধির কৌশলেই। মাত্র ন'ঘণ্টার তো যুদ্ধ। কিন্তু সে কেবল যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। যুদ্ধের বদলে সে যে অভিনয়ের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল তার পেছনে ছিল কর্নেল রবার্ট ক্লাইভের কূট-কৌশল।

সে-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ক্লাইভের তরফ থেকে যে-অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা আইনসংগত কি বেআইনী তা আজ বিচার করে লাভ নেই। কারণ যুদ্ধের মতন ব্যাপারে কখনও ন্যায় রক্ষিত হয়েছে এমন উদাহরণ কেউ খুঁজে দেখাতে পারবে না।

বাঙলা দেশ অধিকার করে রবার্ট ক্লাইভ সেদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশের লুপ্ত গৌরব সত্যিই পুনরুদ্ধার করলেন। ইংলণ্ডে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার হতে দেরি হলো না। সেদিন তিনি যে জয়ের সূত্রপাত করেছিলেন তা অব্যাহত গতিতে চলতে লাগলো—অনাগত শতাব্দী ধরে।

ক্লাইভ ভাবলেন এবার তার জীবনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হলো।

কিন্তু তিনি জানতেন না যে সংগ্রামীর সংগ্রামের শেষ নেই। মানুষের সংগ্রাম শেষ হয় একমাত্র মৃত্যুতেই।

তাই বড় আশা নিয়েই তিনি দেশে ফিরলেন। একদিন আট টাকা মাইনের কেরানীর চাকরি নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু যখন আবার সেখানে পৌঁছলেন তখন ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী লোক তিনি। নবাবের প্রচুর টাকা তিনি হস্তগত করে ধনী হয়ে গেছেন তখন।

কিছু লোকের এটা আর সহ্য হলো না।

তার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগ হলো তিনি অন্যায়ভাবে বাঙলার নবাবের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। কোম্পানির হয়ে কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। কোম্পানির বদনাম করেছেন।

বিস্মিত হয়ে গেলেন ক্লাইভ। রাগে দুঃখে ক্ষোভে আবার তাঁর পুরোন স্বভাব

ফিরে এল। যাদের জন্যে তিনি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে এত করেছেন তারাই তাঁকে চোর অপবাদ দিচ্ছে। তিনি যদি চাইতেন তো আরো অর্থ চুরি করতে পারতেন। আরো অনেক কোটি টাকার মালিক হতে পারতেন।

কিন্তু না, তাঁর যুক্তি কেউ শুনলো না।

সাব্যস্ত হলো তিনি জালিয়াত, তিনি জুয়াচোর।

চারদিকে রটে গেল ক্লাইভ জালিয়াত।

তিনি শেষকালে হার মানলেন। বললেন—তোমরা আমার সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নাও, কিন্তু তার বদলে আমায় আমার সম্মানটুকু শুধু দয়া করে ফিরিয়ে দাও—

একটা তাস আসতেই তিনি চিৎ করে দেখলেন। [পৃঃ ৪৯০

যে সম্মান ভালবাসা প্রীতির জন্যে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, শেষজীবনে এসে সেই সম্মানটুকুই তাঁকে দিতে তারা অস্বীকার করলে। তাঁর স্বদেশবাসীর জন্যে তিনি দিলেন সাম্রাজ্য, আর তারা তাঁকে দিলে অখ্যাতি!

এরই নাম জীবন! তখন তাঁর বয়েস পঞ্চাশে পৌঁছেছে। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অমানুষিক সংগ্রামের পর তিনি অবসন্ন। সমস্ত জীবনটা পরিক্রমা করে তিনি দেখতে পেলেন সেখানে কোথাও শান্তির একটু স্নেহচ্ছায়া নেই, নেই কোনও বিশ্রামের সুখাশ্রয়। জীবনের শেষের দিকেই মানুষের একটু বিশ্রামের দরকার হয়। তখন দেহ হয় অপটু, মন চায় একটু নির্ভরতা। তাঁর দেশবাসী তাও তাঁকে দিলে না। তিনি ভেঙে পড়লেন।

স্বাস্থ্য আগে থেকেই ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, এবার তা আরো ভাঙলো। সে বয়েসে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের আর আশা নেই। বিশেষ করে যখন সমস্ত কিছুই তাঁর প্রতিকূল।

তারপর এল সেই অবধারিত দিন।

২২শে নভেম্বর ১৭৭৪ সাল।

জন্মেছিলেন ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৭২৫ সালে। পঞ্চাশ বছর হলো। পঞ্চাশ বছর বয়েসেই তিনি অতুল কীর্তি আর অপরিমেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি সেদিন তাস খেলতে বসেছিলেন। দানের পর দান চলছিল। কেউ কোনও আভাসই পায়নি কত বড় দুর্যোগ সেই মুহূর্তে তাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

একটা তাস আসতেই তিনি চিৎ করে দেখলেন।

সেটা কী রংয়ের তাস তা কেউ জানে না। সেখানা দেখেই কিনা কে জানে তিনি হঠাৎ খেলা ছেড়ে উঠলেন। উঠে পাশের ঘরে গেলেন। গিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলেন। আর তারপরেই দুম্ দুম্ করে পিস্তলের শব্দ হলো।

দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে সবাই দেখলে তাঁর সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দুর্ধর্ষ শক্তিমান প্রতিষ্ঠাতা তার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। নিজের দেশকে তিনি যাবার আগে দিয়ে গেলেন আদিগন্ত সাম্রাজ্য আর সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এক দুরপনেয় কলঙ্ক। সেইজন্যই লর্ড রবার্ট ক্লাইভ সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের কাছে এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে আছেন।

● **সমান হতে রাজি নয়**

ধুলো
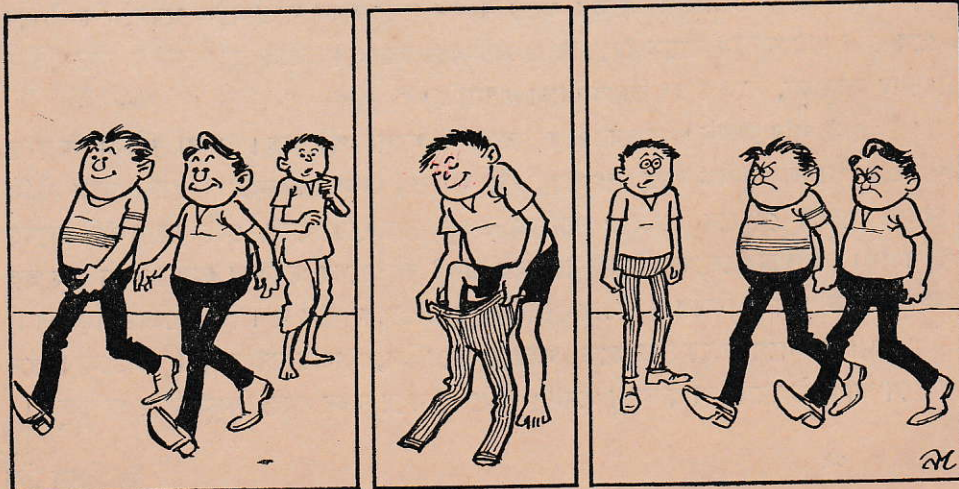
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বার্মুডা না বাহামা ?

বেনেপুকুর বোধহয় !

সেই সেকালের বটতলা উপন্যাসের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারত যে, কোন এক বর্ষণক্ষান্ত সন্ধ্যায় একটি জীর্ণপ্রায় বাড়ির দ্বিতলের একটি নাতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে কয়েকটি অপরিণত যুবক ও জনৈক অনির্দিষ্ট বয়সের কিঞ্চিৎ শীর্ণ ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

কিন্তু যত প্যাঁচ করেই বলি একথা কি কেউ সহজে বিশ্বাস করবে যে প্রথম উক্তিটি স্বয়ং ঘনাদার আর দ্বিতীয়টি আমাদের ?

ঘনাদা তাঁর মৌরসী আরাম কেদারায় বসে নিজে থেকে বার্মুডা কি বাহামা, কোথায় শিশিরের যোগানো সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁর গল্পের গুল ছাড়বেন ভাবছেন, আর আমরা বেতালা বিদ্রূপের খোঁচায় তাঁর মুখ বোজাতে চাইছি !

এও কি সম্ভব ?

অন্য দিন হ'লে ওই বেনেপুকুর নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গল্প শোনার আশা ভরসা তাইতেই ডুবত নিশ্চয়, কিন্তু আজ ঘনাদা যেন কানে তালা আর পিঠে কুলো বেঁধে বসেছেন।

ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনো পাইনি।—বলে তুচ্ছ বেনেপুকুর মার্কা বিদ্রূপ গ্রাহ্যই না করে ঘনাদা স্মৃতির ভাঁড়ার ঘটা করে ঘাঁটতে বসে গেছেন আমাদের সামনে।

আর তা সত্ত্বেও পোশাকের ওপর ওয়াটারপ্রুফ চড়িয়ে মাথায় তার হুড-এর বোতাম লাগাতে লাগাতে গেলে কি কেলেঙ্কারী-ই হ'ত? বলে আমরা মুখ টিপে হাসছি!

এমন কখনো হতে পারে বলে ভাবা যায়?

অমৃতে কি অরুচি হয়?

হয়।

হয়, অসময়ে যদি অমৃতও কেউ মুখে ঢেলে দেয় জোর করে!

ধরো, দারুণ তেষ্টা পেয়েছে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়, সে সময়ে এক ভাঁড় রাবড়ি কেউ মুখে ধরলে কেমন লাগে?

কিংবা খেলার মাঠে সকাল থেকে লাইন দিয়ে কোনো মতে ঢুকে পাক্কা দুটি ঘণ্টা খোলা গ্যালারীতে ছাতা বিহনে রামভেজা ভিজে হঠাৎ বিপক্ষ দল মাঠে নামবে না বলে ঘোষণায় প্রাণটা পর্যন্ত জল হয়ে যাবার পর গেটের পয়সা ফেরত নিতে আর এক দফা ভিজে ন্যাতা হয়ে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ছুটে এসে এক কাপ গরম চায়ের জন্যে দোকানে যখন হামলে গিয়ে পড়তে যাচ্ছি তখন যদি কেউ দরদ দেখিয়ে বাজে জায়গায় চা খাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচাতে এয়ার-কণ্ডিশন্ড্ কোনো রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে আইসক্রীম সোডার দরাজ অর্ডার দেয় কি রকম মনে হয় তখন?

ঠিক এতটাই না হোক সেদিন যা হয়েছে তা প্রায় তাই।

খেলার মাঠের ওই রাগ আর হতাশায় ব্লেণ্ড করা মেজাজ নিয়ে ভিজে সপসপে হয়ে চৌরঙ্গীর ধারের এক দোকানে সবে চায়ে চুমুক দিতে যাচ্ছি এমন সময়ে দুই মূর্তিমানের সঙ্গে দেখা।

দুই মূর্তিমান আর কে? শিশির আর গৌর।

আমরা সারা দুপুর মাঠের মাঝখানে ভিজে আমসত্ত্ব হয়েছি আর ওঁরা দুজনে দিব্যি মেসে বসে জানলা থেকে বর্ষার শোভা দেখে, আর সেই সঙ্গে রামভুজকে দিয়ে কোন না দুটো অন্ততঃ পাঁপড় ভাজিয়ে তাই দাঁতে কাটতে কাটতে অর্ধেক বিকেলটা পার করে বৃষ্টি ধরে যাবার পর সেজে গুজে এসপ্ল্যানেডে একটু টহল দিতে এসেছেন!

যে খেলা দেখার জন্যে আমাদের এই হায়রানি তার ওপর ত' ওঁদের দুজনের কারুরই কোনো টান নেই। খেলা বলতে ওঁরা বোঝেন শুধু ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান। আর সব ওঁদের কাছে বেলেখেলা।

ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের জন্যে জান দিতে যাঁরা প্রস্তুত, অন্য খেলার দিন তাঁরা মাঠের ধার মাড়ান না।

● ধুলো

দুই মূর্তিমানের ওই সাজাগোজা ফিটফাট হাওয়া-খেতে-বার-হওয়া চেহারা দেখেই ত' মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে তার ওপর ওদের বদান্যতায় আরো।

আরে! এখানে চা খাচ্ছিস কি! পেটের ভেতরটা ট্যান হয়ে যাবে। চল চল,—বলে যে সব জায়গার ওরা নাম করেছে সেগুলি কলকাতার সব সেরা রেস্তোরাঁ হলেও পেটের ট্যানিং বাঁচাতে সেখানে এই অবস্থায় গিয়ে ঢুকলে বুকে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

শিশির গৌরের উদার নিমন্ত্রণ শুধু সেই জন্যেই অবশ্য প্রত্যাখ্যান করি নি। একসঙ্গে এই দুজনের ঘাড় ভাঙবার এমন একটা মৌকার জন্যে শিবু আর আমি, নিমোনিয়ার ঝক্কিও অন্য সময় হ'লে হয়ত নিয়ে ফেলতাম। কিন্তু আমাদের আরেক গরজ তখন অনেক বেশী জবর।

কোনো রকমে মেসে ফিরে জামা কাপড়টা শুধু বদলেই আমাদের না ছুটলে নয়।

শিবু সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে গৌর শিশিরকে।

এখন রেস্তোরাঁয় যাব কি? পাইকপাড়া যেতে হবে না?

পাইকপাড়া? সেখানে আবার কেন?—গৌর শিশির যেন আকাশ থেকে পড়েছে।

একেই বলে জেনেশুনে ন্যাকা সাজা। পাইকপাড়া কোথায়, কি, কেন, সব যেন ভুলে গেছে দুজনে!

ওদিকে বুকের ভেতরটা'ত চড় চড় করছে। নিজেরা যেখানে দেউড়ি দিয়ে পা বাড়াতে না বাড়াতে পত্রপাঠ বিদায়, সেখানে আমরা সাতমহলের ছটা মহল পেরিয়ে এবার খাসমহলে ঢুকতে যাচ্ছি! মনের ভেতর সেই দুঃখই পাক্ খাচ্ছে, আবার বলে কি না,—পাইকপাড়া! সেখানে আবার কেন?

তা ওরা যদি ডালে ডালে চরে তো আমরা যাই পাতায় পাতায়।

যেন বলবার মত কিছু নয় এমনি ব্যাপারটা তুচ্ছ করে আমি বলেছি,—এমন কিছু না। ওই একটু খেলতে যাবো দুজনে।

খেলতে যাবে!—শিশির গৌরের যেন কথাটা হতভম্ব হয়ে দুবার আওড়াবার পর খেয়াল হয়েছে,—ও, আজ ত সেই ব্রীজ কম্পিটিশনের খেলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোরা যেন কোন রাউণ্ডে উঠেছিস?

রাউণ্ডে আর নেই!—পয়লা রাউণ্ডেই যারা খসে পড়েছে তাদের গায়ে চিড়বিড়িনি ধরাবার এমন সুযোগ আর ছাড়ি,—উঠেছি সেমিফাইন্যালে।

ওঃ সেমিফাইন্যালে!—তাচ্ছিল্য করবার চেষ্টা করলে কি হয় গৌরের গলাটা আফসোসে মিওনো।

● প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিশির হঠাৎ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যেই ভাবিত হয়ে উঠেছে,—কিন্তু এত ভিজেছিস্, আবার এই বৃষ্টির মধ্যে অত দূর যাবি! বাসে ওঠাই ত এখন দায়।

বাসে যদি না হয় তাহলে ট্যাক্সিতে যাবো।—শিবু যেন একটানা মুখস্থ পড়া পড়ে গিয়েছে,—ট্যাক্সি না জোটে রিক্‌শ নেবো। আর তাও যদি না পাই হেঁটে যাবো পাইকপাড়া। জোকার ক্লাবের অল বেঙ্গল ব্রীজ কম্‌পিটিশনের শিল্‌ডটা আমাদের বাহাত্তর নম্বরের বসবার ঘরে মানাবে বলেই ত মনে হয়।

শেষ কথাগুলো হয়েছে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে। মতি শীলের গলির ভাঁড়ের চা পেটে ছ্যাঁকা-লাগানো ত্বটো করে চুমুকে শেষ করে মেট্রোর সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরে তখন আমরা এসপ্ল্যানেড থেকে বনমালী নস্কর লেনে চলেছি।

ও! দেয়ালে শীল্‌ড টাঙাবার পেরেক পুতেই ফেলেছিস বুঝি!—গৌর একটু বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করেছে কিন্তু খোঁচাটাই ভোঁতা।

শিশির অন্য রাস্তা নিয়েছে। বাহাত্তর নম্বরের সামনে নেমে ট্যাক্সির ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলেছে,—কিন্তু আজ হয়ত মিছিমিছি যাবি! খেলাই হয়ত আজ বন্ধ!

কেন? রেনী-ডে বলে!—ওপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি উপযুক্ত জবাব দিয়েছি,—এ কি স্কুল পেয়েছিস? রেনী-ডে বলে ছুটি হবে! রেনী-ডে হলেই ত খেলা বেশী জমে! গিয়ে পৌঁছোতে যে পারবে না সে দল বাতিল।

শিশির গৌর আর একটা ছুতো পেয়ে গেছে এবার।

গৌর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চোখ বন্ধ করে নাকটা একটু তুলে গদগদ স্বরে বলেছে,—আঃ! গন্ধটা পাচ্ছিস?

শিশির ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে,—রামভুজ ডালপুরী বানাচ্ছে যে! এ যা পাচ্ছিস, এ ত শুধু ওর স্পেশ্যাল সব্‌জির গন্ধ। এরপর যখন ডালপুরী ভাজবে তখন ত' তর হয়ে যাবি। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা লাগবে। তারপরেই গরমা গরম!

ততক্ষণে দোতালায় পৌঁছে নিজেদের ঘরের দিকে চলেছি। শিবু একেবারে বৈরাগী বিবাগীদের মডেল হয়ে বলেছে,—গরমা গরম তোমরাই সেঁটো ভাই। আমাদের লোভ নেই।

নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে বসবার ঘরটার দিকে একবার চোখ না ঘুরিয়ে পারিনি অবশ্য।

বেশ একটু তাজ্জবই হতে হয়েছে অস্বীকার করব না।

স্বয়ং ঘনাদা সেখানে তাঁর মৌরসী কেদারা দখল করে বসে আছেন!

● ধুলো

তা থাকুন! মুনির মন টলতে পারে, কিন্তু আমাদের আজ টলায় এমন ছুনিয়ায় কোনো কিছু নেই।

শুধু জোকার ক্লাবের কম্পিটিশনে যাওয়ার জেদ ত নয়—শিশির গৌরের সঙ্গে এ এক মোক্ষম মনের জোরের পাঞ্জা লড়া।

অল বেঙ্গল ব্রীজ কম্পিটিশনের শীল্‌ডটা আমরা জিতে নিয়ে আসব, তা আবার এই আসর ঘরের দেওয়ালেই আমাদের কীর্তি দিনের পর দিন মনে করিয়ে দেবার জন্যে চোখের ওপর ঝুলবে এতটা কি সহ্য হয়!

তাই যা করে হোক আমাদের ব্রীজ খেলতে যাওয়াটা বন্ধ করতেই হবে!

বাহাত্তর নম্বরে ডালপুরীর যোগাড় জেনেও শিশির গৌরের আগবাড়িয়ে এ সময়ে এসপ্ল্যানেড টহল দিতে যাওয়ার মানেটা কি আর এতক্ষণে বুঝি নি!

ওখান থেকেই বাখড়া দেওয়া যাতে শুরু করা যায় সেই আশাতেই ওই টহলদারী। ওখানে না পেলে মেসে ফিরে এসে পর পর চালবার সাজানো ঘুটি ত আছেই। এখন যা চালছে।

যে প্যাঁচই খাটাক, আমরা কেটে বার হবার জন্যে তৈরী।

বসবার ঘরটা পেরিয়ে যাবার সময় একটু বেকায়দায় অবশ্য পড়তে হয়েছে।

আরে শিবু সুধীর যে! তপস্যা করে যাঁকে পাওয়া যায় না সেই ঘনাদা নিজে থেকে সেধে ডেকেছেন,—কোথায় ছিলে এতক্ষণ! আসর ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে! শীগ্‌গির এসে তাতাও।

হ্যাঁ, তাতাচ্ছি এই যে!—মনে মনে বলেছি। শিবুর সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখে বলেছি,—হ্যাঁ আসছি কাপড় ছেড়ে।

ছেড়ে আসতে মিনিট কয়েক মাত্র লেগেছে। শুধু পোশাক বদলেই নয় গায়ে ওয়াটারপ্রুফ-গুলো গলাতে গলাতে হুড দুটো হাতে করে নিয়ে আসর ঘরে ঢুকেছি।

তা, একটু চমক দিতে পেরেছি বইকি!

আমাদের ডাকছিলেন তখন?—বেশ একটু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে নেহাত যেন অনিচ্ছাভরে ঘরে এসে দাঁড়াবার পর আর সকলের ত বটেই ঘনাদারও ভুরু দুটো একটু যে উঠেছে তা লক্ষ্য করেছি।

নাসারন্ধ্র দুবার একটু নীরবে বিস্ফারিত করে তিনি বলেছেন,—তোমরা বেরুচ্ছ এখন!

উক্তিটা বিস্ময়ধ্বনিও নয় প্রশ্নও না।

শিবু আর আমি ততক্ষণে ওয়াটারপ্রুফ দুটো গায়ে গলিয়ে ফেলে বোতাম পর্যন্ত এঁটে ফেলেছি।

তোমরা বেরুচ্ছ এখন ! [পৃঃ ৪৯৫

না, বেরিয়ে আর করি কি !—এদিক ওদিক কিছু একটা খোঁজার জন্যে তাকিয়ে একটু যেন অন্যমনস্কভাবেই ঘনাদাকে জবাব দিয়ে আবার বলছি,—একটা ছাতা শুধু খুঁজছিলাম !

ছাতা !—একটু আশার আলো পেয়ে গৌরের গলায় সহানুভূতি উথলে উঠেছে যেন,—সত্যিই ত ছাতা একটা না হলে আজকের এই বৃষ্টি শুধু ওয়াটারপ্রুফে কি আটকায় ! কিন্তু বাহাত্তর নম্বরে ছাতা কোথায় ? সেই উল্টো নামের শ্রীমান সুশীলের ছাতা ঘনাদা রাস্তায় দান করে আসবার পর থেকে বাহাত্তর নম্বরে ছাতা আর কেউ কি দেখেছে ?

কিন্তু ছাতা একটা না হলে তোরা বেরুবি কি করে ? শিশির গৌরের চেয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

এই এমনি করে ?—বলে হুডগুলো এবার মাথায় চাপিয়েছি।

ঘনাদা যেন হঠাৎ আমাদের কথা ভুলেই গেছেন। তাঁকে ঘিরে যারা বসেছে তাদের দিকে চেয়ে স্মরণশক্তিটা উস্‌কে নেবার চেষ্টায় বলেছেন,—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ? তখন আমি ঠিক কোথায়, তাই না ? বার্মুদা না বাহামা ?

বাইরে না হোক মনে মনে আমরা ঘনাদার মতই নাসিকাধ্বনি করেছি। এসব পুরোনো প্যাঁচ আমাদের খুব জানা আছে। এতেই কাবু হবার মত কাঁচা ছেলে ভেবেছে নাকি আমাদের ?

ঘনাদার কথার পিঠে চটপট চিম্‌টিটুকু কেটেছি তাই।

ঘনাদার যেন কানে তুলো গোঁজা এমনি ভাবে তিনি নতুন কি প্যাঁচ ছেড়েছেন তা ত আগেই বলেছি।

● ধুলো

তার চোখ তাগ করেই ছুঁড়লাম সেই ধুলোভরা গোলা।

(ধুলো···৫০৩)

ঘনাদা যেন নিজের স্মৃতির ডুবুরী হয়ে হেঁয়ালির জট তুলেছেন,—ফ্লোরা কি ডোরার দেখা তখনো পাইনি!

শিবু আর আমি এ ওর মাথায় বর্ষাতি ঘোমটার বোতাম এঁটে দিতে দিতে মুখ টিপে হেসে বলেছি,—পেলে কি কেলেঙ্কারীই হ'ত!

ঘনাদার কানটা হঠাৎ কি করে শুধরে গেছে কে জানে! আমাদের কথাটা এবার নির্ভুল শুনে তাতেই জোরের সঙ্গে সায় দিয়েছেন,—কেলেঙ্কারী বলে কেলেঙ্কারী! ওদের কারুর সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা!

ঘনাদার কথায় আর কান দেবারই দরকার কি? শিবুকে তাই ধাক্কা দিয়ে বলেছি, চল! চল!

দুজনে দরজার দিকে পা বাড়াবার সঙ্গে শিশিরের ভয়ে কাঁপা গলা শুনতে পেয়েছি,—ওই ডোরা আর ফ্লোরা যা নাম করলেন, সব খুব সাংঘাতিক মেয়ে বুঝি।

তা সাংঘাতিক মেয়ে ছাড়া আর কি বলবে!—দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে এসেও ঘনাদার কথাটা কানে এল,—ডোরারটা ঠিক হিসেব নেই, কিন্তু ফ্লোরার হাতে গেছে অন্ততঃ সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জন।

সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জন খুন! গৌরের শিউরে-ওঠা আধা-চিৎকারটা বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির মুখটা পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছে —রাক্ষুসী নাকি?

রাক্ষুসী ছাড়া আর কি? ঘনাদার গলাটা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি,—দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের দ্বীপ ট্রিনিডাডের মাথার ওপর দিয়ে এসে গলা বাড়ানো হাইতির ছোট মুণ্ডুটা মাড়িয়ে কিউবার পূব কোণটা একটু ছুঁয়ে উত্তর মুখো হয়ে নিরুদ্দেশ হবার মধ্যেই ওই সাত হাজার একশ' তিরেনব্বুই জনকে সাবাড় করেছে ফ্লোরা।

শিবুকে এবার ধমক দিতে হয়েছে,—হাঁ করে আবার থমকে দাঁড়ালি কেন সিঁড়ির মাথায়?

না, দাঁড়ালাম কোথায়?

শিবু সিঁড়িতে এক ধাপ নামতেই বলতে হয়েছে, দাঁড়া, দাঁড়া, কি যেন একটা ফেলে এলাম মনে হচ্ছে।

গৌর গলা ছেড়ে তখন জিজ্ঞাসা করছে শুনতে পাচ্ছি,—নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলছেন, তার মানে ওই রাক্ষুসী খুনে মেয়েদুটোকে কেউ ধরতেও পারেনি।

সাধ্য কি তাদের কেউ ধরে! আর শুধু কি দুটো!—ঘনাদা যেন সেই সর্বনাশী মেয়েদের কথা ভাবতেই খানিক গুম হয়ে গেছেন।

● প্রেমেন্দ্র মিত্র

কই, কি ভুলে গেছিস মনে পড়ল ?—শিবু আমায় খোঁচা দিয়েছে সেই ফাঁকে।

ওঘরে না গেলে মনে ত পড়বে না ঠিক !—বেশ ব্যাজার মুখেই বলেছি,—কিন্তু গেলেই ত ভাববে লোভে লোভে ফিরে এসেছি !

ভাবুক না যা খুশি। শিবু বেপরোয়া হয়ে আমায় সাহস দিয়েছে,—আমরা কারুর ভাবনায় পরোয়া করি নাকি ? দরকার থাকলেও টিটকিরির ভয়ে ও ঘরে যাবো না ?

আলবৎ যাবো ! আমি বীরবিক্রমে এগিয়ে গেছি।

পেছনে শিবু।

খোঁচার বদলে পাল্টা খোঁচার সঙীন উঁচিয়ে তৈরী হয়েই আসর-ঘরে ঢুকেছি। কিন্তু কই টিট্‌কিরি ত দূরের কথা কেউ যেন খেয়ালই করেনি।

ঘনাদা তখনো বুঝি তাঁর সর্বনাশীদের ধ্যানে ভোম্ মেরে আছেন। গৌর তা ভাঙবার জন্যেই তখন বলছে, স্তম্ভিত গলায়,—দুটো নয় কি বলছেন ! আরো আছে ?

আছে না ?—ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসে আবার একটু চুপ।

শিবু তখন খালি একটা চেয়ারে বসেই পড়েছে।

বললাম,—বসলি যে !

চাপা গলাতেই বলেছি অবশ্য।

তা বসলামই বা !—শিবুও গলা নামিয়ে বলেছে,—তুইত' এখন কি ভুলে গেছিস মনে করবি !

শিবুর যুক্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। কি ভুলে যাচ্ছি ভাববার জন্যে আমাকেও একটু বসতে হয়েছে।

চেয়ার আর নেই কিন্তু ছোট চৌকিটায় গৌর নিজে থেকেই নীরবে একটু সরে বসেছে জায়গা করে দেবার জন্যে।

যাহোক একটু জায়গা হলেই হল। কতটুকুই বা আর বসব ! শুধু ভুলটা মনে পড়ার ওয়াস্তা।

কিন্তু ঘনাদা বসে বসেই ঘুমোলেন নাকি !

আর যারা সব তারাও ওই ফ্লোরার মতই খুনে ?—শিশির ঘনাদার চট্‌কা ভাঙাতে নাড়া দিয়েছে।

কম যায় না বড়ো !—ঘনাদা বাহামা না বার্মুডা থেকে বনমালী নস্কর লেনে ফিরে এসে বলেছেন—ফ্লোরা খতম করেছে সাত হাজারের ওপর তেষট্টি সালে, আর তার আগে উনিশ শো

আটাশ-এ আর একজনের হাতে সাবাড় হয়েছে চার হাজার। তার আবার নামও কেউ জানে না। নামই হয়নি হয়ত। নামকরাদের মধ্যে হ্যাটী, ডোনা, হিল্ডা, হেজেল, শতমারীর নিচে কেউ নয়। হেজেল দফা নিকেশ করেছেন এক হাজার একশ পঁচাত্তর জনের, হিল্ডা পঞ্চান্নতে ছ'শ, ডোনা ষাটে একশ পঁয়ষট্টি আর হ্যাটী একষট্টিতে দুশ পঁচাত্তর। এছাড়া ক্লিও অড্রে আর ছোটখাট আরো ত আছেই। মানুষকে প্রাণে যারা কম মেরেছে তারা সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে নিয়েছে ধনে। ডোনা এমনিতে ওদের দলে যাকে বলে লক্ষ্মী মেয়ে বলা যায়। জান নিয়েছে মাত্র একশ পঁইষট্টি জনের কিন্তু যেখান দিয়ে গেছে সেখানে কমসে কম সাতশ কোটি টাকার ধন দৌলত লোপাট!

এত খুনোখুনি লুটপাটের কথার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবা যায়! কি ভুলে গেছি মনেই করতে পারিনি এতক্ষণে। ডোরা ফ্লোরার জন্যে আমার কিসের মাথা ব্যথা! নেহাৎ বিদঘুটে আলোচনাটা থামাবার জন্যেই বলতে হয়েছে,—ওই খুনে মেয়েগুলো সব বুঝি আপনি যেখানে ছিলেন সেই বার্মুডা না বাহামার?

বার্মুডা নয়, ছিলাম তখন বাহামায়। এখন মনে পড়েছে।—ঘনাদা আমায় খুশি মুখেই জবাব দিয়েছেন,—আর ওরা সবাই ঠিক বাহামার না হলেও ওই অঞ্চলের বলা যায়। ছোট অ্যান্টিলিজ দ্বীপপুঞ্জের পূবদিকে উত্তর অ্যাটলান্টিক সমুদ্র। সেখান থেকে এসেছে অনেকে। কারুর কারুর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরেই জন্ম। উনিশ শো সাতান্নতে তিনশ নব্বুই জনকে যমালয়ে পাঠিয়ে অন্ততঃ একশ কোটি টাকার সম্পত্তি যে লোপাট করে দেয় সেই অড্রে ত দূর দূরান্তর কোথাও থেকে আসেনি। মেক্সিকো উপসাগর থেকে মাত্র আমেরিকার লুইসিয়ানা স্টেট-এর সীমানা ছাড়িয়ে মিসিসিপির চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছেই অড্রে নিপাত্তা। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যে যেখানে সে চোখ দিয়েছে সেখানেই শ্মশান।

একটু থেমে, পুরোনো স্মৃতির একটু চমকেই যেন শিউরে উঠে,—ঘনাদা বলেছেন,—কিন্তু ফ্লোরা, হিল্ডা, হেজেল, অড্রে এরা সব ত পাহাড়ী বিচ্ছুর কাছে ডেয়ো পিঁপড়ে! একেবারে ঠিক সময়ে না সামলালে লরা যে কি করত তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। আমেরিকার নিউ অরলিনস্ থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বংশে বাতি দিতে কাউকে বোধহয় রাখত না।

অ্যাঁ! এমন ভয়ঙ্কর মেয়ে! এ লরাকে সময় মত সামলেছিল কে? শিবুটা প্রথমে খানিক হাঁ করে থেকে, পরে আহাম্মকের মত জিজ্ঞেস করে বসেছে—আপনি?

ঘনাদার বাঁকানো ঠোঁটে অসীম ধৈর্য আর ক্ষমার একটু হাসি। টেনজিং নোরকে-কে যেন কে প্রথম এভারেস্ট-এর চূড়ায় উঠেছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, প্রথমে কে একটানা প্লেনে আটলান্টিক পার হয়েছে জানতে চাওয়া হয়েছে লিণ্ডবার্গের কাছে!

● প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিবুর আহাম্মকিতে ঘনাদা চটুন না চটুন, আমার কি আসে যায়? আমরা ত যাচ্ছি জোকার ক্লাবে! নেহাৎ কি ভুল হয়েছে ভাববার জন্যে একটু বসেছি তাই শিবুকে একটু ধমক দিতে হয়েছে। —জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করল না তোর? ঘনাদা নয়ত লরাকে আর কে সামলাবে শুনি!

শিবু অধোবদন হবার পর ঘনাদাকেই জিজ্ঞাসা করেছি,—ও মুণ্ডমালিনীকে কেমন করে সামলালেন ঘনাদা?

কেমন করে?—ঘনাদা তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন—একটু ধুলো দিয়ে!

ধুলো দিয়ে!

আমার শুধু একার নয়, আসরে যে যেখানে ছিল সবার চোখই ছানাবড়া।

হ্যাঁ,—ঘনাদা ব্যাখ্যা করেছেন,—লরা-র চোখে একটু ধুলো দিতেই কাম ফতে হয়ে গেল।

চোখে ধুলো দিয়ে কাম ফতে?—আমাদের হাঁ মুখ আর বুঝতে চায়নি!

হ্যাঁ, লরার অর্ধেক শয়তানি জারি-জুরি তাতেই চোখের জলে গলে গেল বলতে পারো!—ঘনাদা আর একটু বিশদ হয়েছেন,—তারপর যাকে বলে কানা হয়ে দিগ্বিদিক ভুলে আতলান্তিকের ওপরই উধাও হয়ে কোথায় মুখ থুবড়ে মরেছে কে জানে! কারি তাই বলত,—দাস, কোথায় ছিলে তুমি উনিশ শ চুয়ান্নতে। এক হাজার একশ পঁচাত্তর জনকে নিকেশ করার বদলে এই বাহামার মায়াগুমা দ্বীপে পৌঁছোবার আগেই হেজেল নিজে কাবার হয়ে যেত!

হেজেল বুঝি মায়াগুমা দ্বীপে হানা দিয়েছিল?—জিজ্ঞাসা করেছে শিশির।

শুধু কি মায়াগুমা দ্বীপ! ঘনাদা দুঃখের হাসি হেসেছেন,—ওইখানে ত তার উৎপাত সবে শুরু। সেখান থেকে সাগর পেরিয়ে আমেরিকার উইলমিংটন শহরের পাশ দিয়ে ফিলাডেলফিয়াকে ডাইনে রেখে সোজা সেই অনটারিও হ্রদ পর্যন্ত।

সত্যি, আপনি থাকলে ত আর এ সব হয় না!—গৌর আফসোস করেছে,—ঠিকই বলত ত ওই কি নাম বললেন যেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ কারি। ওই কারি কে?

কারি আমার বন্ধু একজন কংক্।—ব্যাখ্যা করেছেন ঘনাদা—তার সঙ্গে স্ট্রম্বস্ গাইগাস্, মানে, পঞ্চমুখী শাঁখের খোঁজে তখন বেল দ্বীপে একটা স্লুপে থাকি, আর সেই স্লুপেরই একটা ডিঙি নিয়ে তাতে কারি আর আমি পঞ্চমুখী শাঁখ খুঁজে ফিরি সমুদ্রের তলায়। ডিঙিতে আমার হাতে থাকে তলায় কাঁচ আঁটা একটা বালতি আর কারির হাতে হাল। কাঁচ আঁটা বালতির মত চোঙটা সমুদ্রের জলের ভেতর ডুবিয়ে ধরে আমি তার ভেতর দিয়ে কোথায় পঞ্চমুখী অ্যালজির ওপর চরে বেড়াচ্ছে দেখি আর দেখতে পেলে আঁকশি লগি দিয়ে তা বোটে তুলে নিই। আমার লোভ পঞ্চমুখী শাঁখের ওপর আর কারির লোভ শাঁখের শাঁসালো মাংসে। শাঁখের শাঁসই তাদের প্রধান

● ধুলো

খাত্ত বলে এই শাঁখ শিকারীদের একটা নাম কংক্। বেশীর ভাগ শাঁখ শিকারীই নিগ্রো বলে তাদের এ নামটা অবজ্ঞাভরেই দেওয়া হয়েছে।

যারা তা দিয়েছে একজন কংক্-এর দৌলতেই কত বড় ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে যে তারা রক্ষা পেয়েছে তা কোনদিন বোধহয় জানবে না।

চোখে ধুলো দিয়ে কানা করে লরার জারিজুরি আমি ভেঙে দিয়েছি ঠিকই কিন্তু কারি আমার সঙ্গে না থাকলে লরা কখন কোথায় যে রাক্ষসী মূর্তি ধরছে তা আমি জানতেও পারতাম না।

তুমি যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে।

কারিরা প্রায় চৌদ্দপুরুষ ধরে বাহামাতেই আছে, বাহামার মাটি জল হাওয়ার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ। কারির আবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা এই যে সাইজমোগ্রাফে যেমন ভূমিকম্প, ব্যারোমিটারে যেমন হাওয়ার চাপ, কারি তেমনি তার হাড়ের ভেতরে ঝড় তুফানের সব হদিস আগে থাকতে টের পায়।

সারাদিন শাঁখ শিকারের পর রাত্রে স্লুপের ডেকে তারার আলোয় ঝলমল আকাশের তলায় শুয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ কারি ধড়মড় করে তার বিছানায় উঠে বসেছে সেদিন।

কি হল কি কারি?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যেন ভূত দেখলে মনে হচ্ছে।

ভূত নয় ডাকিনী!—ধরা গলায় বললে কারি,—আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি সে জাগছে।

হাজার বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হলেও বাহামায় শাঁখ শিকার করে জীবন কাটিয়েছে। আমি তাই ব্যাপারটা কারির অন্ধ কুসংস্কার ভেবেছি। বিশ্বাস করিনি। তাকে শুধু ক্ষুণ্ণ না করার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম,—জাগছে কোথায়?

এই কাছেই!—কারি সভয়ে বললে,—প্রভিডেন্স প্রণালীতে।

এবার একটু হেসে ঠাট্টা করে বললাম,—কি বলছ কি কারি! প্রভিডেন্স প্রণালীতে ডাকিনী

জাগছে আর তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে তা টের পেলে! ও তোমার গেঁটে বাত-টাত হবে। কাল অমাবস্যা তাই একটু চাগাড় দিয়েছে।

না, না বাত নয় দাস!—কারি ব্যাকুল হয়ে উঠল আমায় বোঝাতে,—আমি সত্যি আমার হাড়ের ভেতর এ সব টের পাই। হেজেল-এর বেলা ঠিক এই রকম টের পেয়েছিলাম। তখন জানাবার কেউ ছিল না। তুমি আছ বলে তাই জানাচ্ছি। এ ডাকিনী হেজেলের চেয়ে শতগুণ সর্বনাশী। প্রভিডেন্স প্রণালীতে কাল ভোরের আগেই জেগে উঠে সৃষ্টি ছারখার করে দেবে।

এবার আর হাসতে পারলাম না। গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ভোরের আগে প্রভিডেন্স প্রণালীতে পৌঁছোতে পারবে?

কারি বললে,—পারব।

স্লুপে একটা হারপুন ছোঁড়া বন্দুক আছে না?—জিজ্ঞাসা করলাম তারপর।

হ্যাঁ আছে।—কারি অবাক হয়ে বললে,—কিন্তু হারপুন ছুড়ে এ ডাকিনীকে তুমি ঘায়েল করবে?

করব।—জোর দিয়ে বললাম,—তবে শুধু হারপুন ছুড়ে নয়, হারপুনের কামানে এ ডাকিনীর চোখ নিশানা করে ধুলো ছুড়ে তাকে কানা করে।

কি বলছ কি দাস!—কারি মাথা নেড়ে বললে,—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! নিশ্বাসে যে প্রলয় ঘটায় সেই তুফানকে তুমি ধুলো ছুড়ে জব্দ করবে!

তোমার হাড়ের খবর যদি ভুল না হয়, আর ভোরের আগে প্রভিডেন্স প্রণালীতে যদি পৌঁছে দিতে পারো এ স্লুপে, তাহলে চেষ্টা করে ত একবার দেখতে পারি।—এবার ইচ্ছে করেই সুরটা একটু নামিয়ে বললাম,—এ সব তুফানের একটা এবং একটিমাত্র চোখ থাকে জানো ত?

জানি। কারি আমার কৌশলটা বোঝবার চেষ্টা করে বলল,—সে চোখ তোমায় দেখাতেও পারব।

তাহলেই হবে।—তাকে আশা দিলাম।

হলও তাই। প্রভিডেন্স প্রণালীতে পৌঁছোলাম ভোর হবার আগেই। তুফান ডাকিনী তখন থমথমে সমুদ্রে ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে জাগতে সুরু করেছে।

কারি সভয়ে বললে,—এখন হাল্কা কথার সময় নয়! তবু ওই ঘূর্ণি দেখে আমার লরা বলে এক নাচিয়ে মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সেও সর্বনাশী মেয়ে। হাজার বুক ভেঙেছে।

বেশ তাহলে এ ডাকিনীর নামও থাক লরা।—আমি হেসে বললাম,—এবার তৈরী থাকো হারপুন কামান নিয়ে। আমি ধুলোয় ঠাসা গোলা তাতে ভরে রেখেছি।

দেখতে দেখতে লরা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। আর তার চোখ তাগ করে ছুড়লাম সেই ধুলো-ভরা গোলা!

ব্যস্! খানিকক্ষণের মধ্যেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় ঝরে পড়ে লরা নেতিয়ে পড়ে কাৎ।

ঘনাদা থামলেন।

এক একজনের মুখে তখন এক এক রকম বিস্মিত প্রশ্ন।

ওঃ! লরা ফ্লোরা মানে সব তুফান ঝড়?

ঘনাদা একটু মুচকে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কিন্তু ধুলোর গোলা যে ছুড়লেন, সে ধুলোটা কি?

হলদে রঙের একরকম ধুলোর মত গুঁড়ো। ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—তার চিহ্ন হল 'এ জি আই', আর নাম সিল্‌ভার আইওডাইড্!

সিলভার আইওডাইড! এবার আমি মৌকা পেয়ে চেপে ধরলাম, কিন্তু সে ত বৃষ্টি নামাবার জন্যে সাধারণ মেঘের ওপর ছড়ানো হয়। তাতেও তেমন কাজ হয় না। সিলভার আইওডাইডে ফ্লোরা ডোরার মত প্রলয়ঙ্করী হরিকেন থামানো যায়?

কাকে বলছি?

ঘনাদা তখন ঘরের দরজা দিয়ে তাঁর টঙের ঘরের দিকেই চলেছেন। হাতে তাঁর গোটা একটা সিগারেটের টিন। এখনো খোলাই হয়নি।

এটা যেন ঘুষ মনে হল!

শিশির গৌরের দিকে চাইলাম। তাদের মুখে যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। বললে—বোস, ডালপুরী আসছে।

ডালপুরী তোমরাই খেয়ো।—যথাসাধ্য গলায় অবজ্ঞা ফোটাবার চেষ্টা করে শিবুর দিকে ফিরে বললাম,—কই, ওঠ!

তাড়া দিয়ে শিবুকে ওঠালাম। গেলামও সেই পাইকপাড়ায় কাদা জল ভেঙে। লাভ হল না।

সময়ে না পৌঁছোবার দরুণ কম্পিটিশন থেকে আমাদের দলের নাম কাটা গেছে।
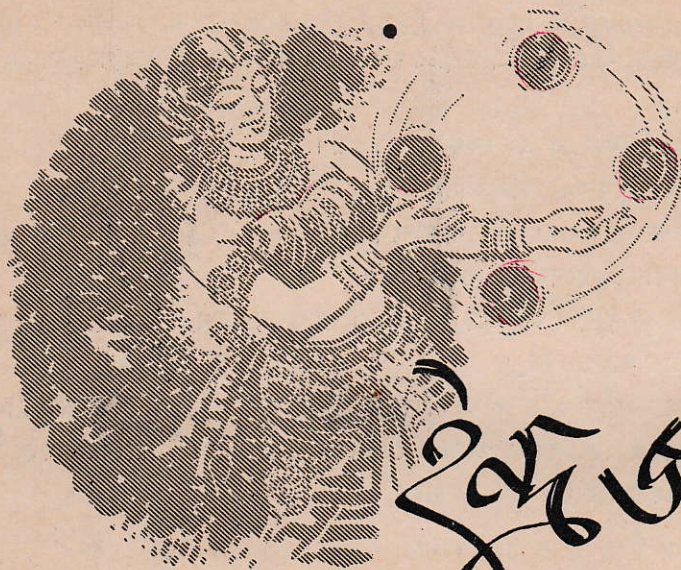
ইন্দ্রজাল

'যাদুসম্রাট্'—পি. সি. সরকার

আজকাল ভারতের ইন্দ্রজালের কথা সব জায়গাতেই শোনা যায়। এককালে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা নাকি দেখানো হ'ত, তা' থেকেই নাকি এই বিদ্যার নাম ইন্দ্রজাল হয়েছে। রাজা ভোজ এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাই নাকি ইন্দ্রজালের অন্য নাম ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজি। বিক্রমাদিত্য তনয়া ভোজরাজ ঘরণী ভানুমতীও এই বিদ্যায় খুব পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যা' থেকে এ বিদ্যার অন্য নাম হয়েছে 'ভানুমতীর খেলা'। সে ছিল ভারতের জাগরণ যুগ—তারপর আস্তে আস্তে এই বিদ্যার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। পথের নিরন্ন অশিক্ষিত বেদেরা নেহাত তাদের জীবনের একমাত্র উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে একে কোনও ভাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাদের হাতে এ বিদ্যার কোনও উন্নতি হয়নি

তবে এই বিদ্যাটিকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে—প্রাণবায়ু নিঃশেষ হতে দেয়নি। এ যেন এক নূতন অহল্যা। ভারতের ইন্দ্রজাল এককালে রাজরানী ছিল—তারপর কোন অভিশাপে যেন সে পাষাণী হয়ে গিয়েছে—কিন্তু সে নিঃশেষ হয়ে মরে যায়নি, একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। পথের বেদেরা তার আত্মাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ স্বাধীনতা লাভ করার পর আত্মসম্বিৎহারা এই জাতি যেন আবার জেগে উঠেছে—শিক্ষিত সম্প্রদায় আবার ইন্দ্রজাল বিষয়ে নূতন চিন্তা করতে শুরু করেছেন—জ্ঞান গবেষণা প্রভৃতির সাহায্যে তাঁরা ভারতের ইন্দ্রজালকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন—অহল্যার পাষাণত্ব দূর হয়েছে—ভারতের ইন্দ্রজাল এখন দেশবিদেশের সম্মান ও সুনাম কুড়িয়ে এনে তার স্বর্ণসিংহাসনে বসতে চলেছে—ঐ যে তার কণ্ঠে দুলছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুবিদ্যার স্বর্ণ স্বীকৃতি। ভারতের ইন্দ্রজাল আজ দেশবিদেশ আলোকিত করে তুলেছে। নৃত্য-নাট্য-সংগীত প্রমুখ অন্যান্য কলাবিদ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে আজ দেশবিদেশে ভারতের সুনাম ও সম্মান পতাকা বহন করে নিয়ে আসছে।

লজেন্সের খেলা

(Divination with Lozenge)

প্রথমে মিষ্টি দিয়েই আরম্ভ করা যাক। যাদুকরের সহকারী একটি ট্রেতে করে প্রায় ৪০।৫০টা লজেন্স নিয়ে এলেন এবং দর্শকদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার মধ্য থেকে কয়েকটি তুলে নিয়ে খেতে বললেন। সবাই আনন্দ করে লজেন্স তুলে নিয়ে খেলেন। লজেন্সগুলি সব রাংতা কাগজ দিয়ে মোড়ানো—কাজেই ভিতরের লজেন্সের রং বাইরে থেকে একদম বোঝা যায় না। যাদুকর দেখালেন যে রাংতা মোড়া কাগজের মধ্যে লাল, নীল, হলুদ নানা রংয়ের সুন্দর সুন্দর লজেন্স রয়েছে। সব রাংতা কাগজগুলির রং এক, ভিতরের লজেন্সের আকৃতিও সমস্ত এক—পার্থক্যের মধ্যে শুধু মাত্র রংয়ের। বাইরে থেকে ভিতরের লজেন্সের রং কেউ বলতে পারেন না।
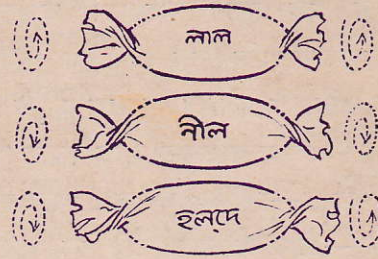
যাদুকর বললেন—'আমার হাতে আপনারা যে কোনও একটা কাগজ মোড়ানো লজেন্স তুলে দিন, আমি হাত পেছনে রেখেই যাদুবিদ্যার সাহায্যে ভিতরকার লজেন্সের রং বলে দিতে পারবো।' দর্শকেরা নিজেদের ইচ্ছামত একটি লজেন্স যাদুকরের হাতে তুলে দিলেন। লজেন্সগুলি তার আগে খুব ভাল করে এলোমেলো ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাদুকর লজেন্সটি তাঁর পেছনে ধরে রেখেই বলে দিলেন যে সেটির রং লাল। দর্শকেরা খুলে দেখলেন যে ভিতরে সত্যি সত্যি লাল লজেন্স রয়েছে।

এই খেলা দেখলে সকলেই অবাক্ হয়ে যাবেন। লজেন্সগুলি ভাল করে এলোমেলো করে মিশিয়ে দেবার পর আবার একটি লজেন্স যাদুকরের হাতে তুলে দেওয়া হল—সেবারেও যাদুকর নির্ভুলভাবে বলে দিলেন যে এর মধ্যে নীল রংয়ের লজেন্স রয়েছে। এইভাবে যাদুকর প্রত্যেকবারেই ঠিক ঠিক বলে দিয়ে সবাইকে অবাক্ করে দিতে সক্ষম। খেলাটা দেখতে যত কঠিনই হোক না কেন—আসলে কিন্তু খুবই সোজা। ম্যাজিকের মজা এই যে প্রতিটি কঠিন খেলারই একটি করে অতিশয় সহজ কৌশল থাকে। এই খেলাটাও তাই—লোকেরা এটাকে দিব্যদৃষ্টি, থটরিডিং, মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাপার মনে করেন—কিন্তু আসলে তা নয়। যে কাগজ দিয়ে লজেন্সগুলি জড়ানো থাকে তার মধ্যেই সমস্ত কৌশল রয়েছে। সবগুলি লজেন্সই (লাল-নীল-হলুদ) একই আকৃতির এবং একই রকম একই

আকৃতির রাংতা কাগজ দিয়ে সেগুলি জড়ানো। যাদুকর খেলা দেখাবার আগে সবগুলি লাল লজেন্সকে কাগজ দিয়ে মোড়াবার সময় দুই পাশে বাম মোচড় দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। সবগুলি নীল লজেন্সকে দুই পাশে ডান মোচড় দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। বাকী হলুদ রংয়ের লজেন্সগুলিকে একদিকে ডান এবং অন্যদিকে বাম মোচড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখেন। প্রদত্ত চিত্রে এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝানো হয়েছে। লজেন্সটির মোড়কের কাগজ দুই পাশে কি ভাবে কোন্ দিকে মোচড়ানো রয়েছে তাই দেখে এ খেলা করা হয়। দর্শকেরা একথা কিছুই জানেন না—তাঁরা দেখে অবাক্ হয়ে যান !

শূন্যে অবস্থান
(Floating in the Air)

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে এসে ভারতীয় যোগশাস্ত্র—মারণ, উচাটন, সম্মোহন, বশীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তিনি একটুকরা কাগজ নিয়ে হাওয়ায় ফেলে দিলেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। তিনি একবাটি জলের মধ্যে একটা আলপিন ফেললেন, সেটি সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় ডুবে গেল। যাদুকর বললেন—'সামান্য কাগজের টুকরা আমি হাওয়ায় রাখলুম সেটি সঙ্গে সঙ্গে তলায় পড়ে গেল। আমি জলের মধ্যে আলপিন রাখলুম সেটিও জলে ডুবে গেল। কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য জিনিসের ওজনের জন্য সেটি সর্বদা নীচে পড়ে যায়। কিন্তু দেখুন শত শত যাত্রী মালপত্র ওজন নিয়ে বড় বড় এরোপ্লেন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। লোহার তৈরী জাহাজ হাজার হাজার মণ ওজনের ভারী জিনিসপত্র নিয়ে সমুদ্রপথে যাতায়াত করছে। এর কারণ কি ? এক প্রকার ভারশূন্যতা—ভাসমান অবস্থার buoyancy সৃষ্টি করতে হয়। যদি সেইভাবে করা হয় তখন ভারী জিনিস শূন্যে ভেসে থাকতে পারে—জাহাজের খোলে হাজার হাজার মণ ওজন জিনিস রাখলেও সেটি জলে ভেসেই থাকবে।
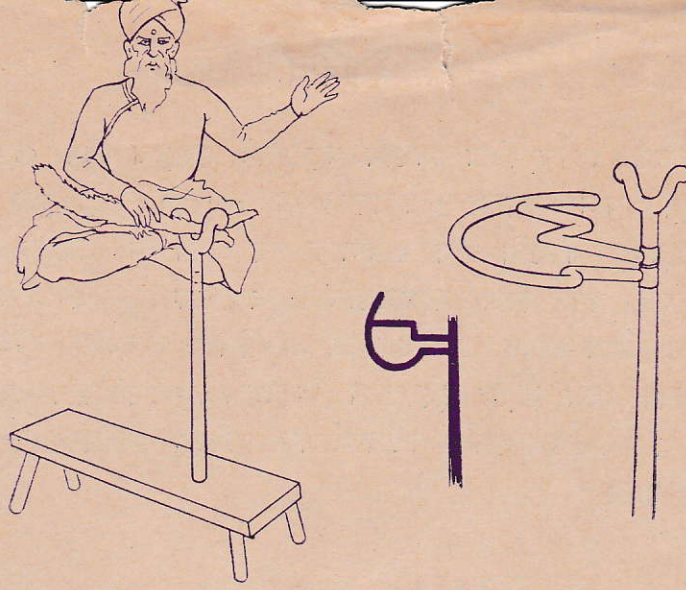
শূন্যে অবস্থান　　　　　　ভিতরকার কৌশল

আসল কথা অনুরূপ ভারশূন্য অবস্থার সৃষ্টি করার উপরেই এই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মানুষ তার নিজের দেহের ওজনকেও অনুরূপ ভারশূন্য অবস্থায় আনতে পারে। বিশেষ ধরনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি কুম্ভক-প্রাণায়াম প্রভৃতির সাহায্যে মানবদেহে অনুরূপ ভারশূন্য অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা এই সব ব্যাপারে অবিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু আমি সেই ভারশূন্য অবস্থা সৃষ্টি করে এক্ষণে শূন্যে ভাসমান সাধু বা শূন্যে অবস্থানের খেলাটি দেখাচ্ছি।

এই কথা বলে যাদুকর একটি সন্ন্যাসীর চারদিকে কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং নিজে মধ্যখানে গিয়ে নানারূপ যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। কয়েক মিনিট পরে পর্দাটি চারদিক থেকে খুলে নিতেই দেখা গেল একজন সুদর্শন সাধু শূন্যে নিরালম্ব অবস্থায় বসে আছেন। দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখে সকলে আনন্দে করতালি দিতে আরম্ভ করলেন। যাদুকর আবার সাধুকে পর্দার আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখলেন। দর্শকেরা সাধুর অথবা যাদুকরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে একেবারে মুগ্ধ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আসলে কিন্তু এতে যোগ, প্রাণায়াম, কুম্ভক কিছুই নেই।

এটি একটি সাধারণ ম্যাজিকের খেলামাত্র এবং ব্যবসায়ী যাদুকরেরা তাঁদের অপূর্ব নাটকীয় প্রদর্শনভঙ্গিমার সাহায্যে এটি চাঞ্চল্যকর ভাবে প্রদর্শন করে থাকেন।

প্রদত্ত চিত্রে এই খেলায় সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বিশদভাবে বুঝানো হয়েছে।

প্রথমে দেখানো হয়েছে শূন্যে ভাসমান সাধু দর্শকদের চক্ষুতে কেমন দেখায়। তার পরবর্তী চিত্রে এই খেলার আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি কৌশলটি পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে।

ভারতবর্ষে এই খেলাটি বহুদিন যাবৎ প্রচলিত রয়েছে।

যাদুবিদ্যার ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'শেশল' (Sheshal, the Brahmin of the Air) নামে একজন যাদুকর মাদ্রাজে এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন। তাঁর শরীরের উপর জামার নীচে লোহার তৈরী বিশেষ কাঠামো তৈরী ছিল।

প্রদত্ত চিত্রে ঘন কালো রং দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে ঐ লোহার তৈরী বিশেষ চক্রাকৃতি জিনিসটি ঐ সাধুর শরীরের পাশ দিয়ে জামার আস্তিনের মধ্য দিয়ে এসে ঐ ডাণ্ডাটির মধ্য দিয়ে একেবারে নীচে নেমে এসেছে। এতে এমন LIVERAGE সৃষ্ট হয় যে অনায়াসে একজন লোক শূন্যে ভাসমান অবস্থায় বসে থাকতে পারে।

চারদিকে কাপড় ঢাকা দেওয়া অবস্থায় এই কাজটি করতে হয় এবং একেবারে সবকিছু প্রস্তুত করে তৈরী ('রেডী'—ready) হয়ে তারপর পর্দা খুলে দর্শকদিগকে দেখাতে হয়। এই খেলার কৌশল শিখে নিয়ে ইংলণ্ডের যাদুকর সিলবেস্টার (Sylvester) এই খেলাটি বিলাতে দেখান এবং এর নাম দেন ঊলুর ফকির (The Fakir of Oolu)। বলা বাহুল্য, দর্শকদিগকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই এই সাধু বা ফকিরের সাহায্য নেওয়া হয়। এরপর জন নেভিল ম্যাস্কেলীন (John Nevil Maskelyne) এবং যাদুকর বুশিয়ার ডি কোল্টা (Bautier De Kolta) ইংলণ্ডে ও ইউরোপে এই খেলা দেখান। ফরাসী যাদুকর রোবেয়ার উঁদা (Robert Houdin) এই খেলাটিকে উন্নত পর্যায়ে

নিয়ে এরিয়েল সাসপেনশন (Aerial suspension) হিসাবে দেখিয়ে সভ্য দর্শকসমাজে হুলস্থূলের সৃষ্টি করেন।

তারপর থেকে গত একশ' দেড়শ' বছর যাবৎ পৃথিবীর সর্বদেশে এই খেলাটি নানা নামে নানা পরিবেশে বিভিন্ন প্রদর্শনভঙ্গিমায় দেখানো হচ্ছে।

মাথার উপর রান্না করা
(Cooking on Head)

ভারতীয় সাধু ফকিরেরা তাঁদের মাথার উপর একটি খালি চোঙ (cylinder) রেখে তার মধ্যে উনুনের মত আগুন জ্বালিয়ে সেখানে রান্না করে দেখাতে পারেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে তাঁরা দর্শকদিগকে বিমুগ্ধ করেন।

খালি পায়ে অগ্নিকুণ্ডের উপর চলাফেরা করা অত্যন্ত বিপদসংকুল ব্যাপার—অথচ সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের মনোবল দিয়ে নিজেদের দেহকে অগ্নির অদাহ্য করে ফেলতে পারেন। মাথার উপর একটা টিনের চোঙ রেখে তার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠ বা ঘুঁটে রেখে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে তার উপর চা তৈরি করা, ডিম রান্না করা একটা লোমহর্ষণ দৃশ্য প্রতিপন্ন হয়।

আমি ছোটবেলায় দর্শকদের কপালের উপর গরম পোলাউ রান্না করে খেলা দেখিয়েছি। সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের খেলা। বর্তমানে যে খেলাটির কৌশল প্রকাশ করা হচ্ছে সেটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

সন্ন্যাসী জটাজূটধারী জোড়াসন বা পদ্মাসন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। যাদুকর (এখানে তাঁর শিষ্যেরা) একটি খালি চোঙ (অ আ ই ঈ) (cylinder) এনে সকলকে দেখালেন। অ আ দিক দিয়ে দর্শকেরা দেখলেন যে ভিতর একদম ফাঁকা, মধ্যে কিছুই নেই। এবার কিছু খবরের কাগজ বা ঐ জাতীয় সহজদাহ্য জিনিস—রাঁদা করা কাঠের পাতলা ফালি প্রভৃতি ঐ চোঙের মধ্যে দেওয়া হল। তার আগে ঐ চোঙটি ঐ ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর মাথার উপরে প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী
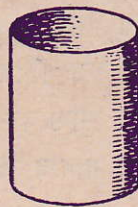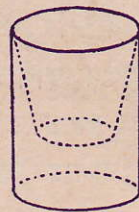
বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়। এবার ঐ কাগজে অগ্নিসংযোগ করা হল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো—চোঙের উপর দিক দিয়ে আগুনের লেলিহান জিব এবং ধোঁয়া বের হতে দেখা গেল। সন্ন্যাসীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—ধীর স্থির গম্ভীর হয়ে বসেই রয়েছেন। এই আগুনের উপর এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র ধরে তাতে রান্না করাও চলতে পারে। সবাই দেখে অবাক্। এতটা গরম আগুন কি করে সন্ন্যাসী তাঁর মাথার উপর সহ্য করতে পারছেন সেইটাই আশ্চর্যের ব্যাপার!

সবাই বললেন, সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ রয়েছেন তাঁর আত্মবোধ-বাহ্যজ্ঞান কিছুই নেই। বাইরের ঠাণ্ডা বা উত্তাপ দুইই তাঁর কাছে সমান। এটি কিন্তু ঐ সব ধ্যান ধারণ যোগ প্রাণায়াম কোন কিছুই নয়। সবই চালাকির ব্যাপার মাত্র।

অ আ ই ঈ চোঙটি বিশেষভাবে প্রস্তুত। অ আ দিক থেকে দেখলে ঐটি ভিতর দিয়ে একদম ফাঁকা দেখাবে কিন্তু আসলে ওর মধ্যে কক অংশ দিয়ে দেখানো মত আরও একটি একমুখ সরু চোঙ ভিতরে লাগানো রয়েছে—এ ধরনের চোঙ যাদু-জগতে "Ghost Tube" নামে পরিচিত। অ আ মুখের মাপ অপেক্ষা নীচের মুখের মাপ অপেক্ষাকৃত সরু এতে খ মাপের একটি টিনের গোল চাকতি ঐ চোঙের মধ্যখানে রেখে দেওয়া চলে। চোঙের ভিতরের মাপ সরু মোটা থাকার দরুন

যাদুকর খ চাকতিটি কৌশলে ঐ চোঙের মধ্যে দিয়ে দেন, তাতে ভিতরে একটি পার্টিশন তৈরী হয়ে যায়। এই পার্টিশন খ-এর উপরে কাগজ, কাঠের ছোবলা প্রভৃতি দাহ্য জিনিসপত্র দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। গ অংশ ফাঁকা—ঐ অংশ সন্ন্যাসীর মাথা থেকে আগুনের দূরত্ব বজায় রাখে। অর্থাৎ যদিও দর্শকেরা দেখেন যে চোঙটি সন্ন্যাসীর মাথার উপর বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে কাগজপত্র ফেলে দিয়ে মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ সন্ন্যাসীর মাথার ঠিক চাঁদির উপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে—সেই আগুনে যাদুকর রান্না করছেন, চা তৈরি করছেন ইত্যাদি। আসলে আগুন রয়েছে ঐ ভিতরস্থ খ পার্টিশনের অনেক উপরে। নীচে গ অংশ এবং ক ই। ক ঈ অংশ একদম ফাঁপা—ভিতর দিয়ে হাওয়া রয়েছে এবং আগুনের উত্তাপ পৌঁছাতে দিচ্ছে না।

দর্শকেরা অত সব জানেন না, তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মাথার উপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে সবাই অবাক্ হয়ে যাবেন। তাঁরা সন্ন্যাসীর এই অগ্নি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা, অসাধারণ সহনশীলতা এবং যৌগিক বল দেখে সবাই মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়ে যান। আজকাল অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা এই সব আজগুবি ব্যাপার দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে থাকেন।

রং চং-এ ছড়ার বই
ইকড়ি মিকড়ি
মধুসূদন মজুমদার
মূল্য—টা. ১·০০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রশান্তের আগ্নেয় দ্বীপ
দাম—টা. ১·২৫
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের
বাঘ-ভালুকের দেশে
শিকারের অনেক গল্প
বিধায়ক ভট্টাচার্যের
শ্রীদুর্গার পলায়ন
অমরেশের কীর্তিকলাপ
দাম—টা. ৩·০০
শিশু উপন্যাস
নির্মলকুমার রায়
একটি ছেলের কাহিনী
মূল্য—টা. ২·০০
সুনির্মল বসু
হাসিকান্না
মূল্য—টা. ১·২৫
দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত
রঙ্গীন আকাশ
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
অজানা দেশে
মূল্য—টা. ১·৫০
অজানার উজানে
মূল্য—টা. ১·৫০
শৈলবালা ঘোষ
রঘু সর্দার
মূল্য—টা. ১·৫০
এভারেস্ট
সামুক
ছেলেদের সার্কাস
গদাধর নিয়োগী
মিনু ও কাপালিক
মূল্য—টা. ১·৫০
নারায়ণ গঙ্গোঃ ও নিমাই বন্দ্যোঃ
মরণের মুখোমুখী
মূল্য—টা. ১·০০
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নদ্বীপের বিভীষিকা
স্বর্গে
মূল্য—টা. ১·২৫
১। ছোটদের চয়নিকা
২। ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন
৩। ঝলমল
৪। আজব বই ৪·০০
৫। শিশু গল্পের ৪·০০
৬। সোনার কাঠি
৭। যাদুঘর
৮। চিত্রদীপ
৯। মায়ামুকুর
১০। সোনালী ফসল ৪·০০
১১। মধুমালা ৪·০০
১২। রূপরেখা ৪·০০
১৩। বর্ষ-মঙ্গল ৪·০০
১৪। আলপনা ৪·০০
১৫। রাঙারাখী ৪·০০
১৬। নবারুণ ৪·০০
১৭। অঞ্জলি
১৯। উদয়ন
২০। অভিষেক
২১। পরশমণি ৪·০০
২২। বসুধারা
২৩। ইন্দ্রধনু
২৪। দেবালয়
২৫। জয়যাত্রা
২৮। দেব দেউল ৫·০০
২৯। অপরূপা ৫·০০
৩০। ৫·০০
৩১। অলকনন্দা ৫·০০
৩২। ছোটদের মাধুকরী ৫·০০
৩৩। শ্যামলী
৩৪। উত্তরায়ণ
৩৫। নীহারিকা ৬·০০
৩৬। অরুণাচল ৬·০০
৩৭। বেণুবীণা ৬·০০
৩৮। ইন্দ্রনীল ৬·০০
দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯
h